মাসুদ রানা

ট্রেজার হান্টার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

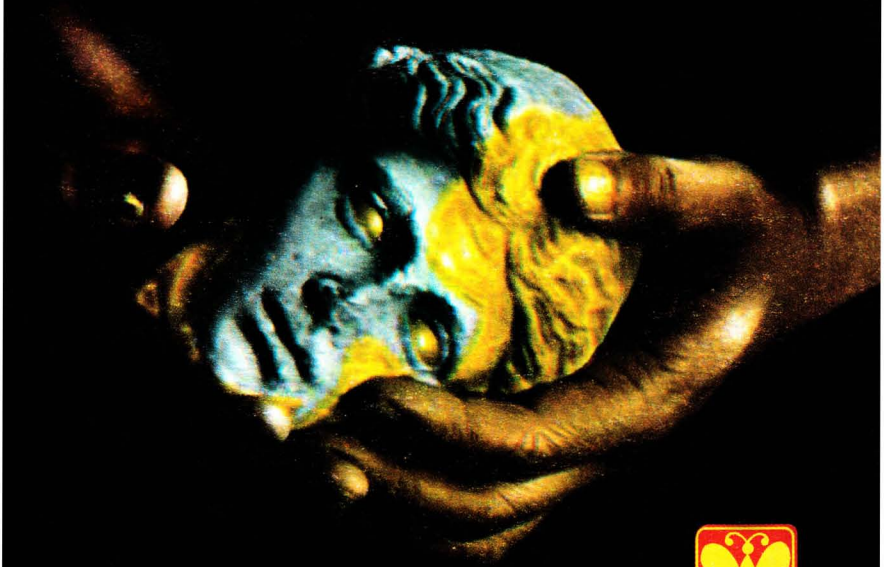

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪২১

ট্রেজার হান্টার

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

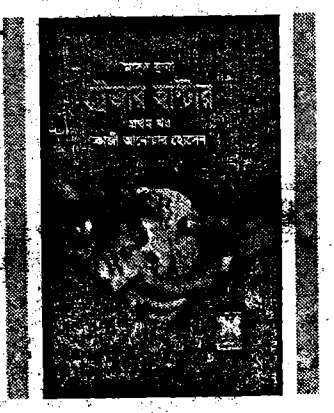

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7421-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-421
TREASURE HUNTER
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তিরাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

ছেলেটির বয়স বারো; মেয়েটি ওর এক বছরের ছোট। সম্পর্কে দু'জনে খালাতো ভাই-বোন। হাত ধরাধরি করে অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটছে। আলো বলতে ছোট্ট একটা টর্চ, ছেলেটির হাতে—সেটার মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রাচীন এক টানেল নেটওয়ার্ক। মাটির নীচে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে সুড়ঙ্গগুলো, তারই একটাতে ঢুকেছে ওরা।

'অ্যাই,' হঠাৎ ভাইয়ের হাত চেপে ধরল কিশোরী, 'চলো ফিরে যাই। আমার আর ভাল্লাগছে না।'

'ভয় পাচ্ছ?' খেপানোর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যদি পথ হারাই?' কাঁপা গলায় বলল কিশোরী।

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল কিশোর। পকেট থেকে একটা চক বের করে দেয়ালে তীরচিহ্ন আঁকল। 'এই দেখো চিহ্ন দিয়ে দিলাম। পথ হারাবার ভয় নেই আর...'

কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর কিচকিচ আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল মেয়েটির গলা দিয়ে। গায়ের রোম খাড়া করে দেবার মত দৃশ্য—শত শত বাদুড় ছাত আঁকড়ে ধরে ঝুলছে উল্টো হয়ে। যতদূর চোখ যায়, কেবল বাদুড় আর বাদুড়, গোটা ছাত ঢেকে রেখেছে বীভৎস প্রাণীগুলো। ডানা ঝাপটানোর সাঁই সাঁই শব্দ

উঠল—আলো আর মানুষের আচমকা উপস্থিতি ঘাবড়ে দিয়েছে ওগুলোকে। ডানা ঝাপটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাচ্চাদুটোর গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল বাদুড়ের স্রোত। উন্মুক্ত চামড়ায় ঘষা খেল প্রাণীগুলোর রোমশ দেহ, নখের আঁচড় লাগল এখানে-সেখানে। বোটকা গন্ধে আটকে এল দম।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। ছেলেটিও ভয় পাচ্ছে। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। বোনের এক হাত চেপে ধরেই দিল দৌড়।

কতক্ষণ দৌড়াল ওরা, বলতে পারবে না। হঠাৎ খেয়াল করল, মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আর নেই। থেমে দাঁড়াল দু'জনে, হাঁপাচ্ছে। ধপ করে ওখানেই বসে পড়ল মেয়েটি। ইতস্তত করে ছেলেটাও বসল।

ভীষণ নীরব সুড়ঙ্গ। ভীতিকর। 'আ... আমি বাড়ি যাব!' ভয়ার্ত গলায় একসময় বলল কিশোরী।

'নিশ্চয়ই,' বলল তার ভাই। 'চলো।' কিন্তু গলায় আগের জোর নেই। বাদুড়ের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে গিয়ে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় চলে এসেছে, তা নিজেও জানে না। আশপাশে নজর বোলাল। কয়েকটা সুড়ঙ্গের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ডানদিকের একটা সুড়ঙ্গ থেকে আসছে আবছা আলোর আভা। কীসের আলো?

টর্চ নিভিয়ে দিল ও। হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—সত্যি সত্যি আলো জ্বলছে ওখানে। বোনের হাত ধরল ও, এগিয়ে চলল আলোর উৎসের দিকে। কাছাকাছি যেতেই শোনা গেল মানুষের গলা। ডাকতে গিয়েও ডাকল না ছেলেটি। সাহায্য চাইবার আগে মানুষটাকে দেখে নেয়া দরকার।

মিনিট পাঁচেক পরেই বড় একটা প্রকোষ্ঠের মুখে পৌঁছাল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। দুটো লণ্ঠন জ্বলছে প্রকোষ্ঠের

ভিতর। সেই আলোয় অচেনা দু'জন মানুষকে দেখতে পেল—এক কোনায় সাজিয়ে রাখা কতগুলো কাঠের ক্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকদুটোকে দেখামাত্র সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করল কিশোর, বোনকে টান দিয়ে নিয়ে এল বড় একটা পাথরের আড়ালে। ওখান থেকে উঁকি দিল... লোকদুটো কী করে দেখতে চায়।

'...একটা একটা করে বের করতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে, লুসিয়ো,' কথা বলছে একজন। 'তারচেয়ে কয়েকজন লোক নিয়ে এসে সবগুলো একবারে বের করে নিয়ে গেলে হয় না?'

ঢাকনা খোলা একটা ক্রেটের উপর ঝুঁকে আছে লুসিয়ো নামের লোকটা। সঙ্গীর কথা শুনে মুখ তুলে বলল, 'এই জায়গার খবর যত কম লোকে জানে, ততই মঙ্গল। সময় লাগুক, আস্তে-ধীরেই নাহয় জিনিসগুলো বেচব, টিটো।'

ক্রেটের ভিতর থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল টিটো। ওটা এক ধরনের সাদা গুঁড়োয় ভরা। বলল, 'প্যাকিং ভাল হয়নি। বেশিদিন ফেলে রাখলে ড্যাম্প হয়ে যেতে পারে।'

'শুকিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল লুসিয়ো। 'তা ছাড়া... জিনিস হাতে পেলেই খুশি হবে কাস্টোমার। কোয়ালিটি নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

ভাইকে খোঁচা দিল কিশোরী। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে কথা বলছে ওরা?'

'ড্রাগস্!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কিশোর। 'নিশ্চয়ই ওরা ড্রাগসের চোরাকারবারি। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য মাটির তলায় গুদাম বানিয়েছে!'

'সর্বনাশ! এখন তা হলে আমরা কী করব?'

'পালিয়ে যেতে হবে। ওরা আমাদেরকে দেখে ফেললে যেতে

দেবে না। এসো।'

পা টিপে টিপে প্রবেশপথের কাছে চলে গেল দু'জনে। বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ঘটল বিপত্তি। মেঝেতে পড়ে থাকা নুড়িপাথরের উপর বেকায়দাভাবে পা পড়ল কিশোরীর, কাতরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ঝট্ করে মাথা ঘোরাল লুসিয়ো আর টিটো। দেখে ফেলল ওদের। টিটো চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! থামো!'

কে শোনে তার কথা! বোনের হাত ধরে ছুট লাগাল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত পরেই হৈ হৈ করে ওদেরকে তাড়া করে এল দুই দুর্বৃত্ত। একজনের হাতে শাবল, অন্যজন কোটের ভিতর থেকে বের করে এনেছে একটা পিস্তল। ট্রিগার চাপতেই বদ্ধ টানেলে কান ফাটানো আওয়াজ হলো। তবে তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে সে। এক পাশের দেয়ালে মাথা কুটল ব্যর্থ বুলেট।

পাগলের মত ছুটছে দুই কিশোর-কিশোরী। টর্চ জ্বেলে ফেলেছে ইতিমধ্যে, ডানে-বাঁয়ে সুড়ঙ্গমুখ দেখলেই ঢুকে পড়ছে তাতে। পিছন পিছন ধাওয়া করছে দুর্বৃত্তরা। চলে যাচ্ছে অচেনা টানেল নেটওয়ার্কের গভীর থেকে গভীরতর অংশে।

ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল পিছনের পদশব্দ আর হাঁকডাক। অল্পবয়েসী দুজনের সঙ্গে দৌড়ে পেরে ওঠেনি দুর্বৃত্তরা। ওদের আওয়াজ পুরোপুরি মিলিয়ে গেলে থামল কিশোর-কিশোরী। হাঁপিয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করল। টর্চও নিভিয়ে দিল, যাতে আলো দেখে ওদেরকে খুঁজে না পায় লোকদুটো।

চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই ডানে তাকাল কিশোর। খোলা একটা সুড়ঙ্গমুখে হলদে আভা দেখতে পাচ্ছে। আলো নয়, অন্য কিছু। ভয় কেটে গিয়ে মনের ভিতর জেগে উঠল কৌতূহল। বোনের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই দেখো!'

'কী ওটা?' বিস্ময় ফুটল কিশোরীর কণ্ঠে।

'জানি না। চলো দেখি।'

সুড়ঙ্গমুখ পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। ঢালু হয়ে গেছে মেঝে। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে মাঝারি আকারের একটা কামরায় পৌঁছুল। কামরার মাঝ দিয়ে গেছে একটা পাথরের তৈরি ফুটব্রিজ, তলায় হাঁ করে আছে অন্ধকার এক গর্ত। ব্রিজের ওপাশে রয়েছে চারকোনা একটা ওপেনিং, সেখান দিয়েই আসছে হলদে আভা।

আলো জ্বেলে ব্রিজ পেরুল কিশোর-কিশোরী। চওড়া একটা পাথুরে চাতালে বেরিয়ে এল। ব্যালকনির মত ওটা ঝুলে আছে অতিকায় এক গুহার উপর। ওখানে পা রেখেই চমকে উঠল ওরা। গুহাটা প্রাকৃতিক নয়... কিংবা প্রাকৃতিক হলেও মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে নিঃসন্দেহে। ভিতরটা এখন নিখুঁত কিউবের মত—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা সমান। বিস্ময়টা সেখানে নয়।

আসল বিস্ময় হলো, পুরো চেম্বারটা সোনায় গড়া! দেয়াল, ছাত, মেঝে—যেখানেই টর্চের আলো পড়ছে, সেখানেই ঝলমল করে উঠছে সোনালি রঙ। প্রতিফলিত হয়ে রাঙিয়ে তুলছে গোটা চেম্বারকে।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিসিয়ে উঠল কিশোরী। তারপরেই চুপ হয়ে গেল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেটে গেল দীর্ঘ কয়েক মিনিট। এরপর নড়ল কিশোর। বোনকে বলল, 'নীচে চলো। দেখি কী আছে এখানে।'

ব্যালকনির একপাশ দিয়ে নেমে গেছে পাথর কুঁদে বানানো সিঁড়ি। সেটা ধরে চেম্বারের তলায় নেমে এল দু'জন। পা রাখল সোনালি মেঝেতে। চেম্বারের ভিতরটা বেশ গরম, কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না—দেয়ালের কাছে, একটা অংশের মেঝে অদৃশ্য; সেখানে টগবগ করে ফুটছে মাটির নীচ থেকে উঠে আসা উষ্ণ পানি... ঠিক যেন একটা হট পুল। বাষ্প ভেসে বেড়াচ্ছে

বাতাসে।

টর্চের আলো ঘোরাল কিশোর। চেম্বারের ঠিক মাঝখানে, চারকোনা একটা ভিত বা পেডেস্টালের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোরীর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি—চেহারা এবং শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। কামরার মত মূর্তি আর পেডেস্টাল, দুটোই সোনায় গড়া। আরেকটা জিনিস আছে চেম্বারে—প্রাচীন এক সোনালি কফিন, গায়ে হরেক রকমের কারুকাজ। জিনিসটা রাখা হয়েছে উঁচু এক মঞ্চে। হট পুলের পাশ দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি উঠে গেছে সেই মঞ্চে।

মূর্তিটার দিকে এগোল কিশোর-কিশোরী। চারপাশ থেকে ঘুরে-ফিরে দেখল। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা খুঁত। মূর্তিটার একটা হাত নেই—কবজির ইঞ্চিদু'য়েক উপর পর্যন্ত গায়েব। মনে হলো ভেঙে গেছে। আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল দু'জনে... কিন্তু না, মেঝেতে পড়ে নেই ভাঙা হাতটা।

কফিনটা দেখার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল ওরা, থমকে গেল দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ শুনে। আতঙ্ক ফুটল কিশোরীর চোখে। ভাইকে বলল, 'হায় হায়! আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে গুণ্ডাদুটো!'

তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। 'জলদি এসো। লুকাতে হবে আমাদের।'

বোনকে নিয়ে সিঁড়ির তলায় চলে গেল ও। লুকানোর জন্য আদর্শ জায়গা বলা যাবে না, কিন্তু এ-মুহূর্তে আর কোনও বিকল্পও নেই। ছায়ায় শরীর মিশিয়ে দিল দু'জনে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। তিন মিনিটের মাথায় ব্যালকনিতে উদয় হলো দুই দুর্বৃত্ত। ভিতরের দৃশ্য দেখে মুখের ভাষা হারাল ওরাও। মন্ত্রমুগ্ধের মত নেমে এল সিঁড়ি ধরে। দুই কিশোর-কিশোরীর কথা ভুলেই গেছে।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল টিটো। 'সোনা, লুসিয়ো! সোনা!'

'হ্যাঁ,' খুশি খুশি গলায় বলল লুসিয়ো। 'নিশ্চয়ই পুরনো আমলের কোনও রাজা-বাদশার সোনা! মূর্তি আর কফিনটা দেখেছ? বড়লোক হয়ে গেছি আমরা!'

ভুরু কোঁচকাল টিটো। 'সরকার আমাদেরকে এসব ভোগ করতে দেবে? আর্কিয়োলজিকাল ফাইণ্ডের ব্যাপারে কী সব যেন নিয়ম কানুন আছে বলে শুনেছি।'

'কে রিপোর্ট করতে যাচ্ছে? চুপচাপ সব বের করে নিয়ে যাব আমরা। কাউকে কিছু জানতে দেব না। কাউকে না!' লোভে চকচক করে উঠল লুসিয়োর চোখ।

'কীভাবে বের করবে? কী-ই বা বের করবে? মূর্তি আর কফিন ছাড়া তো আলগা সোনা কিছুই দেখছি না। দেয়াল, মেঝে আর ছাত ভাঙতে হবে। দু'জনের পক্ষে কি সেটা সম্ভব?'

'কথাটা ভুল বলোনি,' একমত হলো লুসিয়ো। 'চলো, কফিনটা খুলে দেখি। ওর ভিতর সোনার মোহর-টোহর বা গয়না পাওয়া যেতে পারে। আপাতত ওগুলোই নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল টিটো। সে দু'কদম এগিয়ে যেতেই আচমকা নড়ে উঠল লুসিয়ো, হাতের শাবল ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত হানল সঙ্গীর মাথার পিছনে। হাড় ভাঙার মড়মড় আওয়াজ হলো, ছিটকে উঠল রক্ত। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল টিটো। সোনালি মেঝে ভিজে যেতে শুরু করল তার রক্তে। কয়েক দফা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'দুঃখিত, বন্ধু,' ক্রূর হাসি হেসে বলল লুসিয়ো, 'সোনা-দানায় ভাগীদার পছন্দ নয় আমার। তা ছাড়া আগেই তো বলেছি, গোপন খবর যত কম লোক জানে, ততই মঙ্গল।'

আঁতকে উঠল কিশোর-কিশোরী—চিৎকার করতে যাচ্ছিল,

কোনোমতে সামলাল নিজেদের। ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে দুজনেরই, এক্ষুণি ওদেরকে খুঁজতে আসবে লুসিয়ো। কিন্তু দেখা গেল সোনার নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে সে, অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। চেম্বারের ভিতরে তল্লাশি চালানোর বদলে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে। সিঁড়ি ধরে উঠে গেল উপরে। লোভে চকচক করছে দু'চোখ।

ঠেলে কফিনের ডালাটা সরাতে শুরু করল সে। বেশ ভারী ওটা, পুরোপুরি সরাবার ধৈর্য হলো না বোধহয়, কিছুটা ফাঁকা হতেই হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। হাতড়াতে শুরু করল সোনার খোঁজে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। এক ঝটকায় বের করে আনল হাত। বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

লাল হয়ে গেছে লুসিয়োর ডান হাতের উন্মুক্ত চামড়া... এমনকী তালুও! অসহ্য জ্বলুনি সেখানটায়। চুলকাতে গেল... কিন্তু জায়গাটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের আঙুলের ডগাতেও শুরু হলো জ্বলুনি। আঙুলগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্ক ফুটল তার চোখে। ইনফেকশনের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে রঙটা—অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। দুই হাত গ্রাস করল চোখের পলকে। এবার কাপড়ের তলায় বুকে-পিঠেও শুরু হয়েছে জ্বলুনি।

কাতরাতে কাতরাতে পিছাতে থাকল লুসিয়ো, খেয়াল করল না সিঁড়ির কাছে চলে গেছে। তাল হারাল আচমকা, পড়ে গেল সিঁড়িতে। গড়াতে গড়াতে চলে এল মেঝেতে, সেখান থেকে সোজা আছড়ে পড়ল গরম পানিতে ভরা পুলে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে। ডুবে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই অক্ষত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ভেসে উঠল, তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য।

হতভম্ব চোখে তার দিকে তাকাল দুই কিশোর-কিশোরী। ফোস্কা পড়া অবস্থায় তাকে দেখবে বলে ভেবেছিল ওরা, কিন্তু

বাস্তবে তা হয়নি। দৃশ্যটা অকল্পনীয়—পানির উপরে উঠে থাকা হাতদুটো সোনায় পরিণত হয়েছে! গলার কাছ দিয়েও দ্রুত উঠে আসছে সোনালি রঙ... রক্তমাংসের শরীরটা সোনা হয়ে যাচ্ছে! লুসিয়োর আতঙ্কিত চেহারাটা আচমকা স্থির হয়ে গেল, যেন ক্যামেরায় তোলা ছবি। ওই অবস্থাতে ভারী পাথরের মত ফুটন্ত পানিতে ডুবে গেল সে। আর উঠল না।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়ির তলা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল দুই কিশোর-কিশোরী। বাকশক্তি হারিয়েছে ওরা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল। কীভাবে বাড়ি ফিরবে জানে না। বাতাসে ভেসে বেড়ানো বাষ্প জমতে শুরু করল সোনায় গড়া কিশোরীর মূর্তিটার মুখে, ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে গাল বেয়ে। যেন কাঁদছে ওটা ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে!

দুই

আলতোভাবে ডিটোনেটরের বাটন স্পর্শ করল অ্যান্থনি গ্যারেট, তার পায়ের কাছে পড়ে আছে দু'জন মৃত সিকিউরিটি গার্ড। শেষবারের মত দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল—সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল তারা। সন্তুষ্ট হয়ে বাটনে চাপ দিল গ্যারেট, সঙ্গে সঙ্গে তিন মাইল দূরে পিকাডিলি সার্কাসে পার্ক করা একটা মার্সিডিজ গাড়ি বিস্ফোরিত হলো।

কতজন আহত বা নিহত হয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। রাত তিনটায় খুব বেশি ক্যাজুয়ালটির সম্ভাবনা নেই। সে শুধু

চায়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে টেরোরিস্ট অ্যাটাক বলে ভাবুক। এ-ধরনের ঘটনায় লণ্ডন পুলিশের রেসপন্স সম্পর্কে জানা আছে তার, তল্লাটের সবগুলো ইউনিট পড়িমরি করে ছুটবে বিস্ফোরণের অকুস্থলে। ফলে অকশন হাউসের বিশাল স্টোরেজ ভল্ট খালি করতে পারবে সে নির্বিঘ্নে।

স্কি-মাস্কে মুখ ঢাকল গ্যারেট। পিন্টো আর মাযিনিও একই কাজ করল ওর দেখাদেখি। ভল্টের ভিতরের ক্যামেরা অকেজো করবার মত বাড়তি সময় নেই ওদের হাতে। দরজা খোলামাত্র বেজে উঠবে সাইলেন্ট অ্যালার্ম। পুলিশ আসতে হয়তো দেরি হবে, তবে খুব বেশি নয়।

নিরেট স্টিলে তৈরি দরজাটা খুলতে অ্যাক্সেস কার্ড এবং পাস কোড দরকার। কার্ডটা এ-মুহূর্তে গ্যারেটের হাতে—মৃত এক গার্ডের কাছ থেকে পেয়েছে। ইলেকট্রনিক লকের স্লটে ঢুকিয়ে দিল ওটা। কি-প্যাডের উপরে ছ'ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, কোড চাইছে। সেটাও গ্যারেটের জানা। গতকাল কেউকেটা এক ক্লায়েন্ট সেজে অকশন হাউসে এসেছিল সে, ভল্টের ভিতরটা তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছে ম্যানেজার। ভিতরে ঢোকার সময় লোকটা যখন কোড টাইপ করছিল, কোটের বোতামে লুকানো অত্যাধুনিক একটা ক্যামেরার সাহায্যে ভিডিও করে নিয়েছে গ্যারেট। পরে সেটা জুম করে দেখে রপ্ত করে নিয়েছে কোড।

দ্রুত আটটা ডিজিট টাইপ করল সে। সবুজ একটা বাতি জ্বলে উঠল কি-প্যাডের উপরে। স্ক্রিনে লেখা উঠল: *অ্যাক্সেস গ্র্যান্টেড।* নেতার ইশারা পেয়ে হাতল ধরে টানল মাযিনি, ভোঁতা আওয়াজ তুলে খুলে গেল ভল্টের দরজা। দেরি করল না গ্যারেট, সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল দরজা গলে। সিকিউরিটি ফার্মের হেডকোয়ার্টারে নিঃসন্দেহে বেজে উঠেছে সাইলেন্ট অ্যালার্ম।

যতবার ভল্টের দরজা খোলা হয়, ততবারই সঙ্কেত পায় ওরা—হোক তা বৈধ বা অবৈধ উপায়ে। আর এ-মুহূর্তে ওরা যে সন্দিহান হয়ে উঠবে, তা নিশ্চিত। রাত তিনটায় তো ভল্ট খোলার কথা নয় কারও!

এরপর কী ঘটবে, আন্দাজ করল গ্যারেট। সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইবে ওরা। তাতে ব্যর্থ হলে খবর দেবে পুলিশে। কিন্তু ওদের সমস্যাটা হবে লো-প্রায়োরিটি। টেরোরিস্ট অ্যাটাকের সময় অন্য কোনও অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায় না পুলিশ। মুচকি হাসল গ্যারেট—সেটাই তো চাই!

ভল্টটা বেশি বড় নয়—পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট আকারের। স্থায়ীভাবে কিছু রাখা হয় না ভিতরে; শুধুমাত্র পরের দিনের নিলামে যে-জিনিসগুলো উঠবে, সেগুলোই এক রাতের জন্য ঠাঁই পায় এখানে। খোঁজখবর নিয়ে ভাল একটা দিন বেছেছে গ্যারেট—আজ ভল্টে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের অ্যান্টিক জুয়েলারি, দুর্লভ বইপত্র, প্রাচীন মুদ্রা ও ছোটবড় বিভিন্ন আকারের কয়েকটা ভাস্কর্য আর অয়েল পেইন্টিং। কাঁচের ডিসপ্লে কেইসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সব। বহু বছর ধরে ইংরেজ এক লর্ডের ম্যানরে পড়ে ছিল এগুলো; তিনি মারা যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা সবকিছু বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিলামে ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড দাম উঠবে লর্ডের কালেকশনের। সেই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

কালেকশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইটেমটা শোভা পাচ্ছে ভল্টের কোনায়। নিখুঁত একটা হাত—কবজির দু'ইঞ্চি উপর থেকে আঙুলের নখ পর্যন্ত খাঁটি সোনায় গড়া। ভল্টের ভিতর জ্বলে ওঠা আলোয় ঝলমল করছে হাতটা। মুগ্ধ চোখে ওটার দিকে তাকাল গ্যারেট।

গায়ে-গতরে ছোটখাট হলেও প্রচণ্ড শক্তি ধরে মাযিনি, বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো স্লেজহ্যামারটা তুলে নিল হাতে। 'শুরু করা যাক,' বলেই সজোরে আঘাত হানল ডিসপ্লে কেইসের গায়ে। এক বাড়িতেই চুরমার হয়ে গেল পুরু কাঁচের আবরণ। স্ট্যাণ্ডে সাজানো সোনার হাতটা বের করে নিল সে। বাবল র‍্যাপে পেঁচিয়ে ভরে ফেলল নিজের ব্যাগে।

পিন্টো একেবারে শুকনো-পটকা। হ্যামারের বদলে তাই সে নিয়ে এসেছে একটা ক্রো-বার। সেটার সাহায্যে আরেকটা ডিসপ্লে কেইস ভেঙে নিজের ব্যাগে অ্যান্টিক জুয়েলারি ভরতে শুরু করল সে। মাযিনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য ভাস্কর্য আর পেইন্টিং সরাবার কাজে।

ভল্টের পিছনদিকে চলে গেল গ্যারেট। ডিসপ্লে কেইস ভেঙে বের করে আনল প্রাচীন তিনটা পাণ্ডুলিপি, ঝটপট ঢুকিয়ে ফেলল নিজের ডাফল ব্যাগে। এরপর খালি করল পুরনো মুদ্রার কেইস।

মাত্র পাঁচ মিনিটে ভল্টের সমস্ত কালেকশন চলে এল তিন দুর্বৃত্তের ব্যাগে। এরপর পকেট থেকে সেলফোন বের করে নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে ডায়াল করল গ্যারেট। একবার রিং হতেই রিসিভ করা হলো কলটা।

'বলো।'

'আমরা বেরুচ্ছি,' সংক্ষেপে জানাল গ্যারেট। তারপর কেটে দিল লাইন।

ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। গার্ডদের লাশ টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল এন্ট্রান্সের দিকে. পেভমেন্টে পা রাখল ত্রিশ সেকেণ্ড পর। দূরে সাইরেনের আওয়াজ শুনল ওরা, তবে অকশন হাউসের দিকে আসছে না. পিকাডিলি-র দিকে যাচ্ছে পুলিশের গাড়িগুলো । দূর থেকে হেডলাইটের আলো পড়ল ওদের গায়ে. কয়েক সেকেণ্ড পর ব্রেক কষে একটা ট্যাক্সি ক্যাব এসে থামল

ওদের পাশে। ড্রাইভারের নাম জেরি—মাথায় সাদা টুপি পরেছে, মুখে নকল গোঁফ-দাড়ি।

দরজা খুলে দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল তিন দুর্বৃত্ত। জেরি জিজ্ঞেস করল, 'আনতে পেরেছ সব?'

'অবশ্যই!' খুশি খুশি গলায় বলল পিন্টো। 'পুরো ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ডের মাল।'

'ব্ল্যাক মার্কেটে ওয়ান-থার্ড দাম পাব,' মনে করিয়ে দিল মাযিনি। 'গ্যারেটের কাস্টোমার মাত্র দশ মিলিয়ন দেবে বলেছে।'

'তারপরেও... কমঁ টাকা না,' বলল জেরি।

'ফালতু কথা বাড়িয়ো না,' অধৈর্য গলায় বলল গ্যারেট। 'বিপদ এখনও কাটেনি। মুভ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল জেরি। টায়ার পুড়িয়ে সবেগে সামনে বাড়ল ট্যাক্সি। লণ্ডন শহরের রাস্তাঘাটে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার অভাব নেই, তাই স্কি-মাস্ক খুলল না কেউ। লুটের ঘটনার তদন্ত যখন শুরু হবে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তখন সমস্ত ভিডিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। ক্যামেরায় ওদের চেহারা ধরা পড়লে বড় ধরনের ঝামেলা দেখা দেবে।

আগে থেকেই এস্কেপ প্ল্যানের মহড়া দেয়া ছিল, তাই পাঁচ মিনিটের মাথায় টেমস নদীর নৌকাঘাটে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। কার পার্কে গাড়িটা ফেলে রেখে দ্রুত ডকে চলে গেল চারজনে, ভুয়া নামে ভাড়া করা একটা কেবিন ক্রুজারে চড়ে বসল। সারেং হিসেবে দক্ষ জেরি, ইঞ্জিন চালু করে কয়েক মিনিটের ভিতর সরে এল ডকের পাশ থেকে। টেমস নদীর মোহনার উদ্দেশে উদ্দাম বেগে ছুটল কেবিন ক্রুজার। ডোভার স্ট্রেইটে পৌঁছুনোর আগে আর থামবে না। জলপথে কেন্ট পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা করেছে ওরা। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করবে, তারপর ফেরিতে চেপে পাড়ি দেবে ইংলিশ চ্যানেল। চলে যাবে ফ্রান্সের ক্যালে-তে।

ক্রুজারের নেভিগেশনে রইল জেরি, বাকিরা চলে এল ফরোয়ার্ড কেবিনে। সবগুলো ব্যাগ খালি করে পরীক্ষা করতে বসল লুটের মাল। পিন্টো আর মাযিনি আনন্দে আটখানা হয়ে আছে, ক্রমাগত কথা বলে চলেছে ইটালিয়ান ভাষায়। ভাষাটায় ভাল দখল নেই গ্যারেটের, জাতে সে আমেরিকান; ওদের কথাবার্তার মধ্য থেকে শুধু *নাপোলি...* মানে নেপলস্ শহরের নামটা ধরতে পারল। তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, ওখান থেকেই এসেছে ওর দুই ইটালিয়ান সহচর।

ওদেরকে অগ্রাহ্য করে ডাফল ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো বের করল গ্যারেট। এর মধ্যে একটা ওর কাজে লাগবে, অন্যদুটো ফাও। দরকারিটা কোলের উপর খুলে বসল। মনোযোগ দিয়ে উল্টাতে থাকল একের পর এক পাতা।

ক্রুজার ইংলিশ চ্যানেলে পৌঁছুনোর পর উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। কেন্ট এখনও অনেক দূর, তবে তার নিজস্ব প্ল্যানের পরবর্তী অংশ কাজে পরিণত করবার সময় হয়ে গেছে। সবগুলো পাণ্ডুলিপি ব্যাগে ভরে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে। সাবধানে, দুই সঙ্গীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বের করে আনল নিজের পিস্তল—ওটার গুলিতেই অকশন হাউসের দুই গার্ডকে খুন করেছে।

'অ্যাই, গ্যারেট!' ডাকল পিন্টো। 'তোমার কন্ট্যাক্টের সঙ্গে কখন দেখা করব আমরা? আমার যে আর তর সইছে না! টাকাটা তাড়াতাড়ি হাতে পেতে চাই। বুঝেছ?'

'অবশ্যই!' হাসিমুখে বলল গ্যারেট। 'তোমাদের পাওনা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। পিস্তল তুলেই নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল সে—প্রথমে পিন্টো... তারপর মাযিনিকে। হুড়মুড় করে কেবিনের মেঝেতে পড়ে গেল দু'জনের লাশ। লুটের মালের পাশে।

একটু অপেক্ষা করল গ্যারেট, কান পাতল জেরির তরফ থেকে প্রতিক্রিয়ার আশায়। কিন্তু শুনতে পেল না কিছু। বাতাস, ঢেউ আর ইঞ্জিনের গর্জনের তলায় চাপা পড়ে গেছে পিস্তলের আওয়াজ। ব্রিটিশ সারেং কিছুই টের পায়নি।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে হুইলহাউসে উঠে এল গ্যারেট। ওর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল জেরি। বলল, 'হুইলটা একটু ধরবে? আমার ভাগটা একটু দেখে আসতে চাইছিলাম।'

'কোনও অসুবিধে নেই, যাও।' এক হাতে হুইল ধরে বলল গ্যারেট। জেরির পিঠ ওর দিকে ঘুরে যেতেই পিস্তল তুলে নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল। পিঠে রক্তাক্ত দুটো ক্ষত নিয়ে হোঁচট খেলো জেরি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিঁড়ির ফাঁক গলে। ধুমধাম আওয়াজ তুলে নীচের ডেকে গিয়ে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ।

ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে জিপিএস চেক করল গ্যারেট, তারপর হুইল ঘুরিয়ে হেডিং পাল্টাল। লেইসডন নামে উপকূলীয় একটা ছোট্ট শহরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কেবিন ক্রুজারকে। ওখানে ওর নিজের ভাড়া করা একটা গাড়ি লুকানো আছে। জেরি, পিন্টো বা মাযিনি জানত না ওটার কথা। কেন্ট হয়ে ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছে আসলে কখনোই ছিল না গ্যারেটের, সঙ্গীদেরকে স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে ভুয়া ওই পরিকল্পনার কথা বলে। তিনজনের কাউকেই বিশ্বাস করেনি সে।

তীরের মাইলতিনেক দূরে পৌঁছুনোর পর ইঞ্জিন বন্ধ করল গ্যারেট। পানি এখানে বেশ গভীর, ওর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট। হুইলহাউস থেকে বিলো ডেকে নেমে এল ও। ওয়াটারলাইনের তলায় বসাল দুটো মাঝারি আকারের এক্সপ্লোসিভ চার্জ। ট্রিগার চাপলেই ক্রুজারের খোলে বিশাল দুটো ফুটো তৈরি হবে, চোখের পলকে জলযানটা ডুবে যাবে সাগরে।

খানিক পরে ফরোয়ার্ড কেবিনে ফিরল গ্যারেট। দুই ইটালিয়ানের লাশ সরিয়ে রাখল, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল লুটের মাল নিয়ে। ভাস্কর্য বা পেইন্টিঙে হাত দিল না, ওগুলো বেনামে বিক্রি করা কঠিন। নিজের ডাফল ব্যাগে ভরল শুধু অ্যান্টিক জুয়েলারি আর প্রাচীন মুদ্রাগুলো—ওগুলো গলিয়ে নিখাদ সোনা হিসেবে বেচতে পারবে সহজে। অলঙ্কারের গায়ে বসানো দামি পাথরগুলোও আলাদাভাবে বিক্রি করা যাবে। সব মিলিয়ে দু'মিলিয়ন পাউণ্ড আয় হবে বলে ধারণা ওর। ধার-দেনা মিটিয়েও তার সত্যিকার লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট টাকা থাকবে হাতে।

দুটো জিনিস শুধু বিক্রি করবে না গ্যারেট—সোনার হাত আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটা। ওর সঙ্গীরা জানত না, কালেকশনের সবচেয়ে মূল্যবান আইটেম আসলে এ-দুটোই। ব্যাপারটা পরলোকগত লর্ডের পরিবারও নিঃসন্দেহে জানে না; জানলে কিছুতেই জিনিসদুটো নিলামে তুলবার চেষ্টা করত না।

এ-মুহূর্তে একমাত্র গ্যারেটই জানে সোনার হাত আর পাণ্ডুলিপির সত্যিকার তাৎপর্য। পাণ্ডুলিপিটা আসলে পুরনো আমলের একটা কোডেক্স... অর্থাৎ ডায়েরি। ওটা লেখা হয়েছে যিশুখ্রিস্টের জন্মের অন্তত দুই শ' বছর আগে; লিখেছেন সে-আমলের এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত। গ্রিসের সাইরাকিউজে তাঁর জন্ম, নাম আর্কিমিডিস!

প্রাচীন দুর্বোধ্য গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছে কোডেক্সটা, কেবিনে বসে তখন পড়তে গিয়ে টের পেয়েছে গ্যারেট—ওটার অর্থ উদ্ধার করা তার পক্ষে অসম্ভব। তবে প্রথম পাতায় লেখা একটা বাক্য পড়তে পেরেছ সে—লেখাটা আগেও কয়েক জায়গায় দেখেছে কিনা! আর ওই বাক্যটাই তার মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, সঠিক জিনিস হাতে পেয়েছে সে। আর্কিমিডিসের এই কোডেক্স তাকে সন্ধান দেবে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্যের।

ডাফল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আপার ডেকে চলে এল গ্যারেট। পানিতে নামাল ক্রুজারের ইনফ্লেটেবল লাইফ র‍্যাফট। বৈঠা চালিয়ে দ্রুত সরে গেল দূরে। তারপর, সে-রাতে দ্বিতীয়বারের মত ডিটোনেটরের বাটন চাপল সে। কান-ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে আকাশের পটভূমিতে উঠে এল দুটো আগুনের গোলা। কয়েক মিনিট পরেই কাত হয়ে ডুবে যেতে থাকল ফেলে আসা কেবিন ক্রুজার।

তীরের দিকে বৈঠা চালাতে চালাতে আশ্চর্য এক পুলক অনুভব করল গ্যারেট। পরিকল্পনার সূচনা-পর্ব চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবার মূল কাজে হাত দেবার পালা। ব্যর্থতার কোনও আশঙ্কা করছে না সে, কারণ তার হাতে রয়েছে গুপ্তধন উদ্ধারের চাবিকাঠি—আর্কিমিডিসের কোডেক্স।

প্রথম পাতায় সে-কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিকে লেখা বাক্যটার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: *যার হাতে এই নকশা থাকবে, সে-ই পাবে মাইডাসের ঐশ্বর্য!*

তিন

রোজ সকালে টানা ছ'মাইল দৌড়ায় র‍্যাচেল হ্যাডলি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দৌড় শেষে একটা এনার্জি ড্রিঙ্কের বোতল কিনে ফিরে আসছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ঘামে চপচপ করছে পুরো শরীর। গ্রীষ্মকালের বিচ্ছিরি আর্দ্রতার জন্য ওয়াশিংটনের কুখ্যাতি আছে, তবে র‍্যাচেলের জন্য এই অভিজ্ঞতা নতুন।

এ-বছরই জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হয়েছে ও, এর আগে কখনও ওয়াশিংটনে আসেনি।

ডায়েট করে র‍্যাচেল, সকালে নাশতা খায় না। এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে দিতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে এসি চালু করল, টিভি অন করে সকালের খবর শুনল... তার ফাঁকে সেরে নিল স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ। ব্যায়াম শেষে নগ্ন দেহে ঢুকে পড়ল শাওয়ারে, হিমশীতল পানিতে ধুয়ে ফেলল সমস্ত অবসাদ। ঝরঝরে শরীর নিয়ে খানিক পর বেরিয়ে এল, ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস পরে বসে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। হেয়ার ড্রায়ারে শুকাতে শুরু করল চুল। ক্লাসে যাবার জন্য বেরুতে হবে।

জামাকাপড় পরে পায়ে জুতো গলাচ্ছে, এমন সময় টোকা পড়ল সদর দরজায়। ঘড়ি দেখল র‍্যাচেল, ভুরু কোঁচকাল। সকাল সাড়ে সাতটা... এ-সময়ে কারও তো আসার কথা নয়। জুতো পরে দরজায় চলে গেল ও, চোখ রাখল পিপহোলে।

সুট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। বয়স চল্লিশের মত, একটু মোটাসোটা, লম্বায় র‍্যাচেলের চেয়ে দু'ইঞ্চির বেশি হবে না।

দরজা খুলল না র‍্যাচেল। গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'কী চাই?'

'মিস হ্যাডলি, আমি ডিটেকটিভ কাটনার... আর্লিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট,' জানাল লোকটা। 'জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার আইডেন্টিফিকেশন দেখতে পারি?' সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল র‍্যাচেল।

'নিশ্চয়ই।' কোটের ভিতর থেকে ওয়ালেট বের করল লোকটা। ভাঁজ খুলে পিপহোলের সামনে ধরল।

আর্লিংটন পিডি-র ব্যাজ আর আই.ডি. দেখতে পেল

র‍্যাচেল—ভুয়া বলে মনে হচ্ছে না। দরজা খুলল ও। চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, অফিসার? কোনও সমস্যা?' সাতসকালে পুলিশ ওর কাছে কী চায়, ভেবে পাচ্ছে না। অন্যায় করা দূরের কথা, আজ পর্যন্ত একটা পার্কিং টিকেটও পায়নি ও।

'আপনার বোন... ড. রেমি হ্যাডলির ব্যাপারে এসেছি,' বলল কাটনার। 'ভিতরে আসি?'

'হ্যাঁ, প্লিজ। কী হয়েছে রেমির?' উৎকণ্ঠা অনুভব করছে র‍্যাচেল। কাল বিকেলেও কথা হয়েছে বোনের সঙ্গে, তখন পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। পরে কি কিছু ঘটেছে?

দরজা পেরিয়ে র‍্যাচেলের দিকে ফিরল কাটনার। বলল, 'একটা দুঃসংবাদ আছে আপনার জন্য। বসুন একটু...'

'বসতে হবে না,' মুখ ঝামটা দিল র‍্যাচেল। 'কী হয়েছে জলদি বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল কাটনার। 'আজ সকালে সিয়াটল থেকে ওয়াশিংটনে আসছিলেন ড. হ্যাডলি। পথে রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন।'

দম আটকে এল র‍্যাচেলের। 'মাই গড! রেমি! ও কি...'

'বেঁচে আছেন, তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেলভিউ হসপিটালে অস্ত্রোপচার হচ্ছে তাঁর। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আ... আমার পার্সটা নিয়ে আসি।'

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরল র‍্যাচেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাটনারের সঙ্গে। এলিভেটরে চেপে দু'জনে নেমে এল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে। জায়গাটা নির্জন, এখনও অফিসে যাবার জন্য ঘর থেকে বের হয়নি লোকজন। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাটনার, হাত তুলে বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়ল।

'দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?' অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল। 'আপনার গাড়ি কোথায়?'

'আমার পার্টনার এক্ষুণি নিয়ে আসবে,' আশ্বাস দিল কাটনার।

ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ শোনা গেল, সাদা রঙের একটা ভ্যান এগিয়ে এল ওদের দিকে। বিস্ময় ফুটল র‍্যাচেলের চোখে—পুলিশ ডিটেকটিভ ভ্যান নিয়ে আসবে কেন! তবে কি লোকটা আসলে পুলিশ নয়? কথাটা মুখ ফুটে বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই হাতের পেশিতে সুচ ফোটার মত ব্যথা অনুভব করল। ঝট্ করে কাটনারের দিকে তাকাল ও, হাইপোডারমিক একটা সিরিঞ্জ শোভা পাচ্ছে তার হাতে।

'হোয়াট দ্য...'

মাথা ঘুরে উঠল র‍্যাচেলের, পায়ে কোনও শক্তি পাচ্ছে না, পড়ে যেতে শুরু করল। চট করে ওকে ধরে ফেলল কাটনার। ভ্যানটা পাশে এসে থামতেই সাইডডোর খুলে র‍্যাচেলকে তুলে ফেলল পিছনে। লাল ক্যাপ পরা এক যুবক বসে আছে ড্রাইভারের সিটে। তার উদ্দেশে বলল, 'কাজ হয়ে গেছে, বেনসন। চলো, যাওয়া যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রেক রিলিজ করল বেনসন নামের যুবকটি। ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে এল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজ থেকে। রাস্তায় উঠে স্পিড বাড়িয়ে দিল।

পুরোপুরি অজ্ঞান হয়নি র‍্যাচেল, কিন্তু অবশ হয়ে গেছে শরীরটা। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'কয়েকদিনের জন্য আমাদের অতিথি হবে তুমি, ডিয়ার,' মুচকি হেসে বলল কাটনার। 'রিল্যাক্স। এনজয় দ্য ট্রিপ। রোহিপ্‌নল ইনজেক্ট করেছি তোমাকে—ওতে নেশা হবার কথা।'

রোহিপ্‌নল সম্পর্কে জানে র‍্যাচেল—ডেট-রেপ ড্রাগ। ডেটের

সময় অনিচ্ছুক মেয়েদেরকে অবশ বানিয়ে ধর্ষণ করবার জন্য এই ড্রাগ ব্যবহার করে মন্দ ছেলেরা। আতঙ্ক ফুটল র‍্যাচেলের চোখে, ওকে কি ধর্ষণ করতে চাইছে এরা?

ওর মনের কথা বোধহয় পড়তে পারল কাটনার। হাসিমুখে বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই। আগ্রহটা স্রেফ তোমার বোনের ব্যাপারে।'

'রেমি? কী করবে তোমরা ওকে নিয়ে?'

'নাথিং। ওকেই বরং একটা কাজ করে দিতে হবে আমাদের হয়ে। কাজটা যেন ঠিকমত করে, সেজন্যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। ইউ সি... বোনকে সুস্থ দেহে উদ্ধার করাটাই হবে ওর জন্য সবচেয়ে বড় প্রেরণা। প্ল্যানটা ভাল না?'

জবাব দিতে পারল না র‍্যাচেল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে ওর। তলিয়ে গেল অতল আঁধারে।

চার

ফোন ধরুন, মি. রানা... নইলে পস্তাবেন।

সেলফোনের ডিসপ্লে-তে ভেসে ওঠা এসএমএস-টার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা, বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা ঠাট্টা, নাকি সিরিয়াস কিছু। নতুন কোনও মার্কেটিং টেকনিকও হতে পারে—ইদানীং এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচারণা চালাবার নানা রকম অভিনব কায়দা বের হয়েছে। এটাও হয়তো তেমনই কিছু। দশ মিনিট হলো সিয়াটল থেকে ব্রেমারটন-গামী

ফেরিতে উঠেছে ও, গাড়ি পার্ক করে উপরের ডেকে উঠে এসেছে পিউজেট প্রণালীর তাজা হাওয়া উপভোগ করবার জন্য... এরই মধ্যে তিনবার এসেছে ফোন। অচেনা নাম্বারের কল রিসিভ করে না রানা, আজও করেনি। খানিক পরেই এসেছে মেসেজটা। মানে কী?

নানা দিক ভেবে বার্তাটা অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিল ও। ছুটি কাটাতে এসেছে আমেরিকায়, সিয়াটলে রানা এজেন্সির গেস্ট-হাউসে উঠেছে ওখানকার শাখার বাৎসরিক পরিদর্শন সেরে নেবে বলে। এ ছাড়া হাতে এমন কোনও কাজ নেই যেটায় জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। অপ্রত্যাশিত কোনও কারণে যদি ওর ডাক পড়েও, সেটা জানাবার জন্য পরিচিত লোকেরা ফোন করবে—ওদের নম্বর সেভ করা আছে ফোনবুকে। রিং দিলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে নাম। এই লোক তাদের কেউ নয়। এ-মুহূর্তে রানা সিয়াটল থেকে ব্রেমারটনে যাচ্ছে নুমার একটা নতুন বিল্ডিঙের কনস্ট্রাকশন দেখবার জন্য। বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড প্রজেক্টটার দেখাশোনা করছে, ওখানেই রানার অপেক্ষায় রয়েছে সে। কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখবার পর দু'জনে একসঙ্গে লাঞ্চ করবে বলে ঠিক করেছে। ওখানকার কোনও ব্যাপার হলে মুরল্যাণ্ডই ফোন করত।

পকেটে সেলফোনটা ঢোকাতে গেল রানা, আর তখুনি মৃদু ভাইব্রেশনের সঙ্গে চতুর্থবারের মত বাজল ওটা। আবার সেই অচেনা নাম্বার। বিরক্ত ভঙ্গিতে কলটা রিজেক্ট করল ও। ভারি যন্ত্রণা তো! কে এভাবে জ্বালাতন করছে বার বার? মুরল্যাণ্ড নাকি? প্র্যাকটিকাল জোক করবার অভ্যেস আছে তার, হয়তো অচেনা কোনও নাম্বার জোগাড় করে খোঁচাচ্ছে ওকে।

নিশ্চিত হবার জন্য মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনল বন্ধুর কৌতুক-মাখা গলা।

'কী হে, দোস্ত... রওনা কি দিয়েছ, নাকি এখনও বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছ কোনও সুন্দরীকে কোলবালিশ বানিয়ে?'

'কোলবালিশ ব্যবহার করি না আমি,' কাঠখোট্টা গলায় বলল রানা। 'ঘুমাচ্ছিও না। ফেরিতে উঠেছি। এ-খবর জানার জন্যই বুঝি ফোন করছ বার বার?'

'আমি আবার কখন ফোন করলাম? সকাল থেকে তো সাইটের নকশায় নাক ডুবিয়ে বসে আছি! ফোরম্যানটা একটা গাড়ল... যেখানে কাঁচের পার্টিশান হবার কথা, সেখানে ইঁটের দেয়াল তুলে ফেলেছে। নকশার দিকে একবারও যদি তাকাত...'

'সত্যি বলছ? তুমি ফোন করোনি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কীসের ফোন? ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করিনি! তাড়াতাড়ি এসো তো। খিদেয় পেটের ভিতর ছুঁচো নাচছে। তুমি এলেই লাঞ্চে যাব।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি।'

লাইন কেটে দিয়ে সিয়াটলের বিলীয়মান স্কাইলাইনের দিকে তাকাল রানা। জুন মাসের মাঝামাঝি, ঘড়িতে বেলা এগারোটা, অথচ এখনও সূর্যের দেখা নেই। কালো মেঘ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে বিষণ্ন রূপ নিয়েছে প্রকৃতি। এটাই সিয়াটলের স্বাভাবিক আবহাওয়া। জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত নিয়মিত ঝড়বাদল হবে, সূর্য মুখ দেখাতে পারবে না ঠিকমত।

অচেনা নাম্বারটার কথা ভাবল রানা। মুরল্যাণ্ড নয়, তা হলে কে? এসএমএস-এ ওকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মানে লোকটা জেনেশুনেই কল করছে ওকে। উল্টোপাল্টা নাম্বারে ডায়াল করে বসেনি। সবচেয়ে বড় কথা, রানার ব্যক্তিগত নাম্বার খুব বেশি লোকে জানে না। নিঃসন্দেহে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওটা জোগাড় করেছে লোকটা। কেন? পাল্টা রিং দেবে কি না

ভাবতে ভাবতেই টুং টাং জলতরঙ্গের আওয়াজ হলো ফোনে। নতুন এসএমএস।

মি. রানা, এক্ষুণি যদি আমার কল রিসিভ না করেন, আটাশ মিনিটের ভিতর আপনি-সহ ফেরির প্রতিটা মানুষ মারা পড়বে!

স্থির হয়ে গেল রানা। ও যে ফেরিতে উঠেছে, তা এই লোকটা জানে! কীভাবে? দেখতে পাচ্ছে ওকে? তা হলে কি লোকটাও এই ফেরিতেই উঠেছে? রেলিঙের পাশ থেকে সরে এসে উল্টো ঘুরল ও। চোখ বোলাল আশপাশের সমস্ত প্যাসেঞ্জারের উপর। কিন্তু কাউকে ওর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হলো না।

আবার বাজল ফোন। একই নাম্বার।

অ্যান্সার বাটন টিপে সেটটা কানে ঠেকাল রানা। রুক্ষ গলায় বলল, 'কে তুমি? কেন বিরক্ত করছ আমাকে?'

'আমার পরিচয় নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, মি. রানা,' কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিন্তু জেনে রাখুন, আপনি যদি আমার কথামত কাজ না করেন, ওই ফেরি থেকে জীবন নিয়ে নামতে পারবে না কেউ।'

আঞ্চলিক কোনও টান নেই লোকটার গলায়। শুদ্ধ ইংরেজিতে পরিষ্কার ভাবে কথা বলছে। খারাপ লক্ষণ। তাও একটু বাজিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল রানা। হালকা গলায় বলল, 'হুমকিটা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো পুলিশে খবর দেয়া দরকার। ওদের লাঠির বাড়ি খেয়েছ কখনও? মাথা থেকে পাগলামি দূর করবার মহৌষধ ওটা!'

হাসল লোকটা। 'স্বীকার করছি, আপনি রসিক লোক।'

'রসিকতা না, সত্যি সত্যি পুলিশে রিপোর্ট করব বলে ভাবছি।'

'কী রিপোর্ট করবেন? আমার নাম্বার? এটা একটা প্রি-পেইড ডিসপোজেবল ফোন, মি. রানা। কিনেছি নগদ টাকা দিয়ে,

কোনও পেপার ট্রেইল নেই। এই নাম্বার দিয়ে আমাকে ট্র্যাক করা অসম্ভব, বিলিভ মি!'

বোঝা গেল, লোকটা অ্যামেচার নয়। অগত্যা শ্রাগ করে রানা বলল, 'বেশ, শোনা যাক, কী চাও তুমি?'

'আপনাকে, মি. রানা! আপনাকেই চাই আমার। বাই দ্য ওয়ে, বার বার *মিস্টার* বলতে ভাল লাগছে না। তোমাকে নাম ধরে ডাকলে অসুবিধে আছে?'

'যা খুশি ডাকো। পাগলামিটা বন্ধ হলেই আমি খুশি।'

'পাগলামি করছি না, রানা। আ'য়্যাম ড্যাম সিরিয়াস। এক্ষুণি সেটা টের পাবে।'

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'কী টের পাব?'

'তোমার ই-মেইল চেক করো। আমি দুটো ছবি পাঠিয়েছি। তারপর আবার কথা হবে।'

সেলফোনের ইন্টারনেট ব্রাউজার অন করল রানা। লগ অন করল নিজের ই-মেইল অ্যাকাউন্টে। অচেনা এক অ্যাড্রেস থেকে এসেছে দুটো ছবি। ওপেন করল ওগুলো।

প্রথমটায় পার্ক করা একটা নীল রঙের ট্রাক দেখা গেল—আকারে বেশি বড় নয়... মাঝারি সাইজের একটা কাভার্ড ভ্যান ওটা... গায়ে *সিলভারলেক ট্রান্সপোর্ট* লেখা। পরের ছবিটা তোলা হয়েছে ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে। ডালা খোলা অবস্থায় একটা রিফ্রিজারেটর দেখা যাচ্ছে—তাতে রয়েছে পিপের আকৃতির স্বচ্ছ এক প্লাস্টিক কন্টেইনার, ভিতরটা ধূসর রঙের পাউডারে ভরা। কন্টেইনারের গায়ে লাগানো আছে একটা ডিজিটাল টাইমার, আর উপরে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কী যেন।

প্রণালীর শান্ত পানি কেটে তরতর করে এগোচ্ছে ফেরি, কোনও দুলুনি নেই; তারপরেও পেটের ভিতরটা পাক দিয়ে উঠল

রানার—যেন সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

ফোন আসার অপেক্ষায় আর থাকল না ও, নিজেই কল করল অচেনা লোকটাকে। শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'এসবের মানে কী?'

'মানেটা নিশ্চয়ই তুমি ধরতে পেরেছ, রানা,' বলল লোকটা। 'সেজন্যেই নিজে কল করেছ আমাকে। তারপরেও যদি সন্দেহ থাকে তো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি—হ্যাঁ, ওটা একটা বোমা। বোমাসহ ট্রাকটা রাখা হয়েছে ফেরির ভেহিক্‌ল ডেকে। খবরদার, কাউকে সতর্ক করতে যেয়ো না। কিছু করতে গেলেই আমি টের পাব।'

দমে গেল রানা। কণ্ঠ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'আমার ধারণা, বেহুদা ধাপ্পা দিচ্ছ তুমি। ফেরিতে অত বড় বোমা তোলা সম্ভব নয় কারও পক্ষে, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে।'

'তা-ই? বাইনারি এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে কিছু জানো না তুমি, রানা?'

'জানলে কী?'

'অর্থাৎ, জানো। যথেষ্ট যাচাই-বাছাইয়ের পরই তোমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেছি আমি। মাসুদ রানা... বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন মেজর, বর্তমানে স্বনামধন্য একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট ও ট্রেজার হান্টার... সেইসঙ্গে বোমা বিশেষজ্ঞ তো বটেই! বুঝতেই পারছ, তোমার সম্পর্কে সবই জানা আছে আমার। কথা বাড়িয়ো না। বাইনারি এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে জানো তুমি, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বাইনারি এক্সপ্লোসিভ হলো নির্দোষ দুটো কেমিক্যালের মিশ্রণ। এমনিতে কেমিক্যালদুটো নিরাপদ, কিন্তু মেশানো হলে অতিমাত্রায় বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। সাধারণত শুটিং ক্লাবের টার্গেট প্র্যাকটিসে এ-ধরনের এক্সপ্লোসিভ

ব্যবহার করা হয়। হাই পাওয়ারের রাইফেল রাউণ্ড বা ডিটোনেটরের সাহায্যে ফাটাতে হয় জিনিসটা। কেমিক্যালগুলো সহজেই কিনতে পাওয়া যায়।

'দেখলে?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল লোকটা, 'সবই জানো তুমি। এখন শোনো, ফ্রিজের ভিতরে একশো পাউণ্ড বাইনারি এক্সপ্লোসিভ রেখেছি আমি। ফেরির খোলে ত্রিশ ফুট ডায়ামিটারের একটা গর্ত তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট। ওটা ফাটিয়ে দিলে আগুন ধরে যাবে পুরো কাঠামোয়। মনে হয় না খুব বেশি সার্ভাইভার পাওয়া যাবে।'

'সিয়াটল ডকে পুলিশের ট্রেইণ্ড কুকুর ছিল। ওরা তোমার এক্সপ্লোসিভের গন্ধ পায়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ আমি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, রানা। কণ্টেইনারটা এয়ারটাইট—গন্ধ বেরুবার উপায় নেই। তা ছাড়া বেকার এক ছোকরাকে তিনশো ডলার দিয়েছি ট্রাকটা ড্রাইভ করে ফেরিতে ওঠানোর জন্য। অর্থনৈতিক মন্দার সময় অতগুলো টাকা পেয়ে বেশ উপকারই হয়েছে ওর, ছোকরা কোনও প্রশ্ন করেনি। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

'বোমা ফাটিয়ে ফেরিটা যদি উড়িয়েই দিতে চাও, আমাকে ফোন করেছ কেন?'

'খানিক পরেই জানতে পারবে সব। আর কথা নয়। ট্রাকের কাছে চলে যাও তুমি। দরজায় তালা দেয়া আছে, তবে চাবিটা পিছনের বাম চাকার ভিতরদিকে টেপ দিয়ে আটকানো অবস্থায় পাবে। তাড়াতাড়ি যাও! নইলে ওই ফেরি কোনোদিন ব্রেমারটনে পৌঁছুবে না।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়—কী করাতে চাইছে লোকটা ওকে দিয়ে? হঠাৎ মনে পড়ল, ব্রেমারটনে মার্কিন নৌবাহিনীর একটা ঘাঁটি আছে। তবে কি ট্রাকটা ওখানে পাঠাতে

চাইছে? ওকে বাছাই করা হয়েছে গাড়ি-বোমার চালক হিসেবে?

'আমাকে যদি সুইসাইড বম্বার বানাবার প্ল্যান করে থাকো, তা হলে মস্ত ভুল করছ,' শান্ত গলায় বলল ও।

'সুইসাইড বম্বার?' হাসল লোকটা। 'উঁহুঁ, ভুল ভাবছ তুমি।'

'তা হলে?'

'আমি তোমাকে হিরো বনবার সুযোগ দিচ্ছি, রানা। চব্বিশ মিনিট পর ফাটবে বোমাটা। আমি চাই... তার আগেই তুমি ওটাকে ডিজআর্ম করো।'

পাঁচ

কেউকেটা বললে কম বলা হয়, আসলে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মত চেহারা তাঁর। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, ক্লিনশেভড্, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরায় ঋজু ভঙ্গি, গম্ভীর, তীক্ষ্ণ এক ব্যক্তিত্ব। ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে নুমা একটি আধা-সরকারি সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চিফ। সবাই জানে, সিসমোলজিকাল এক্সপেরিমেণ্ট আর ওশনোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু সংস্থাটি যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারও

জানার কথাও নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে। এ-কারণে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অ্যাডমিরালকে দেখে এমন ক্ষমতাবান মানুষ বলে মনে হয় না। সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছুনোর পরেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন। ক্ষমতা জাহির করবার বিন্দুমাত্র প্রবণতা নেই তাঁর মাঝে। প্রাণখোলা স্বভাবের মানুষ, সহজেই যে-কাউকে আপন করে নিতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনে যথেষ্ট নির্মমও হতে জানেন তিনি। এমন কাউকে টার্গেট বানাবার চিন্তা শুধু পাগল বা জিনিয়াসের মাথায় আসতে পারে। ওদের বস যে কোন্‌টা, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি ডেরিক বেনসন।

এ-মুহূর্তে ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে... টাইসনস্ কর্নার, ভার্জিনিয়ায়... হোটেল শেরাটন প্রিমিয়ারের লবিতে এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে। পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক একটা সেমিনার শুরু হয়েছে হোটেলে, তবে সে-উপলক্ষে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়নি দেখে স্বস্তি অনুভব করল। বোধহয় কেউ ভাবতেই পারছে না, সামরিক লোকজনে ভরা এমন একটা পরিবেশে কোনও ধরনের অপরাধ ঘটতে পারে। তাতে সুবিধাই বেনসনের। কাজের প্রস্তুতি হিসেবে গত সপ্তাহে একবার জায়গাটা রেকি করে গেছে সে, সেই অনুসারে সাজিয়েছে গোটা পরিকল্পনা। এখন তাতে বড় ধরনের রদবদল করতে হলে ঝামেলা হয়ে যেত।

সেলফোন তুলে কাটনারের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। প্ল্যান মোতাবেক এগোনো যাবে।'

'গুড,' সংক্ষেপে বলল কাটনার। তারপর লাইন কেটে দিল।

আর্মির দু'জন মেজরকে এগিয়ে আসতে দেখল বেনসন, ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মৃদু মাথা ঝোঁকাল সে। ওরাও একই ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দিল। হোটেলের ভিতরে টুপি খোলা অবস্থায় রয়েছে সবাই, কাজেই হাত তুলে স্যালিউট না দিলেও চলে। পুরোদস্তুর আর্মি ইউনিফর্ম পরে আছে বেনসন, কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক, নেমট্যাগে ভুয়া নাম—স্কট। ইউনিফর্ম, ব্যাজ আর বুকের রিবনগুলো আর্মি সারপ্লাস স্টোর থেকে কেনা হয়েছে। কোনোটাই নকল নয়।

কুশল বিনিময়ের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলো বেনসন। গল্প সাজানোই আছে—উইভার সলিউশন্স নামের একটা বেসরকারি কোম্পানির মিলিটারি লিয়াজোঁ সে; এমন একটা কোম্পানি সত্যি সত্যিই আছে, ইউ.এস. আর্মির বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করে ওরা। সেমিনারে এসেছে ওদেরকে মিলিটারির নিত্যনতুন চাহিদার সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য। বলা বাহুল্য, গল্পটায় খুঁত নেই কোনও। ওয়াশিংটনে এ-ধরনের সেমিনার প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হচ্ছে, তাতে সিভিল কন্ট্রাক্টররা নিয়মিত অংশ নেয়। ব্যাপারটা এমনই ডাল-ভাত হয়ে গেছে যে, সিকিউরিটি নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। আমন্ত্রণপত্র বা ক্লিয়ারেন্সেরও বালাই নেই।

দুই মেজর অবশ্য বেনসনের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না। নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত তারা, এলিভেটরের দরজা খুলে গেলে কথা বলতে বলতেই উঠল তাতে। ওদের পিছু নিয়ে বেনসনও চড়ল এলিভেটরে। প্রথম স্টপেজে দরজা খুলতেই দেখা গেল মানুষের ভিড়। এগারোটা বেজে গেছে, তারমানে শেষ হয়েছে সেমিনারের মর্নিং সেশন... সেইসঙ্গে তার টার্গেটের কি-নোট স্পিচ। হলরুম থেকে সবাই এখন বেরিয়ে এসেছে

লাঞ্চে যাবার জন্য।

দুই মেজর নেমে গেল, তাদের জায়গায় উঠল দু'জন সিভিলিয়ান। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন নিগ্রো। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক মাঝবয়েসী, পরনে টিপটপ সুট। বুকের ভিজিটরস্ আই.ডি.-তে নাম লেখা—জর্জ রেডক্লিফ। নিগ্রো যুবকের চেহারা-সুরত ঠিক তাঁর বিপরীত। সুট পরার ঝামেলায় যায়নি, জিন্স আর টি-শার্ট পরে এসেছে, পায়ে পুরনো কেডস্। গলায় ঝোলানো পাস বলছে, তার নাম ল্যারি কিং। নামদুটো চেনা চেনা লাগল বেনসনের। দু'জনে আলাপ জুড়তেই মনে পড়ে গেল—রেডক্লিফ হচ্ছেন নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর, আর ল্যারি কিং ওখানকার আই.টি. ডিপার্টমেন্টের হেড।

'অ্যাডমিরালের বক্তৃতা কিন্তু চমৎকার হয়েছে, কী বলো?' ল্যারিকে বললেন রেডক্লিফ। 'খুবই জ্ঞানগর্ভ।'

'তা তো বটেই,' একমত হলো ল্যারি। 'বক্তৃতা শোনার লোভেই তো অফিসের জরুরি কাজ ফেলে চলে এসেছি।'

'রানা মিস করল,' আফসোসের সুরে বললেন রেডক্লিফ। 'সময় আর পেল না, আজই ব্রেমারটনের প্রজেক্ট দেখতে গেছে।'

'ও আসলে কিছুই মিস করেনি,' হাসল ল্যারি। 'অ্যাডমিরালের স্পিচের মূল অংশ তো ও-ই ডিকটেশন দিয়েছে, জানেন না? আফটার অল, ইম্প্রোভাইযড্ ওয়েপন আর টেরোরিস্ট থ্রেট সম্পর্কে ওর চাইতে ভাল আর কে জানে? সেমিনারে অন্যদের কাছ থেকেও জানার মত বিশেষ কিছু ছিল না ওর। এসব হচ্ছে আপনার-আমার মত লেম্যানদের জন্যে।'

দশতলায় পৌঁছে থামল এলিভেটর। এই ফ্লোরেই হোটেলের ক্লাব-রেস্টুরেন্ট, গেমিং রুম আর ব্যাঙ্কোয়েট হলগুলোর অবস্থান।

'ক্যাপিটাল ক্লাবটা কোন্‌দিকে?' এলিভেটর থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'যদ্দূর মনে পড়ছে, বাঁয়ে,' বলল ল্যারি।

'চলো, একটা টেবিল রিজার্ভ করে ফেলি। নইলে পরে জায়গা পাওয়া যাবে না। অ্যাডমিরালের জন্যও একটা সিট রাখব।'

ওদের পিছু পিছু রেস্টুরেন্টের দরজা পর্যন্ত গেল বেনসন, তবে ভিতরে ঢুকল না। বাইরেই ঘুর ঘুর করতে থাকল। হাতে একটা ব্রোশিয়ার ধরে রেখেছে, ভাব করছে মনোযোগ দিয়ে ওটা পড়বার। তার ফাঁকে চোখ রাখছে রেস্টুরেন্টের প্রবেশপথের দিকে। খানিক পরেই এলিভেটর আর সিঁড়ি ধরে দলে দলে হাজির হলো সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সামরিক ও বেসামরিক লোকজন। তাদের ভিড়ে মিশে যেতে কষ্ট হলো না বেনসনের।

ক্যাপিটাল ক্লাবের কাঁচের দরজার সামনে দিয়ে কয়েকবার ঘুরে এল সে। তবে দেখা পেল না টার্গেটের। জর্জ রেডক্লিফ আর ল্যারি কিং একটা গোলটেবিলে বসে গল্পে মগ্ন। মাঝে একটা খালি চেয়ার দেখল—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এখনও আসেননি। এলিভেটরের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে দাঁড়িয়ে পড়ল বেনসন। দেয়ালে হেলান দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সংযত করল নিজেকে। মনে পড়ে গেছে—শৃঙ্খলাপরায়ণ কোনও আর্মি অফিসার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় না। ওটা সামরিক শিষ্টাচার-বহির্ভূত একটা কাজ।

পকেটে সেলফোনের গুঞ্জন অনুভব করল বেনসন। বের করে কানে ঠেকাল। বলল, 'ইয়েস?'

'আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে,' ভূমিকা না করে ওপাশ থেকে বলল লিডার। 'তোমার কী খবর?'

বেনসন বলল, 'পজিশন নিয়ে ফেলেছি।'

'টার্গেট?'

'এখনও দেখিনি তাকে। তবে হোটেলেই আছে সে। লাঞ্চে আসবে বলে কনফার্মড খবর পেয়েছি। দু'জন স্টাফ টেবিল

রিজার্ভ করে অপেক্ষা করছে তার জন্য।'

'খুব ভাল। তুমিও অপেক্ষা করো। কাজটা করবে কি করবে না, সেটা বিশ মিনিটের মধ্যে জানতে পারবে।'

'ওকে, বস্।'

সেলফোন আবার পকেটে ভরে ব্রোশিয়ারে চোখ নামাল বেনসন। হাসি পেয়ে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু দেখে। *'দ্য ডেঞ্জার অভ অ্যাসিমেট্রিক থ্রেট অ্যাণ্ড রেসপন্স: হাউ টু কমব্যাট ইম্প্রোভাইযড্ ওয়েপনস্ অভ মাস ডেস্ট্রাকশন।'* লোকটা তো জানে না, খুব শীঘ্রি থিয়োরির বাস্তব চেহারা দেখবে সে!

তিন দফা খুলল আর বন্ধ হলো এলিভেটরের দরজা। চতুর্থবারে কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে দেখতে পেল বেনসন। গটমট করে বেরিয়ে এসেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ঋজু ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছেন মাথা। মনের অজান্তেই সবার চোখ আটকে গেল তাঁর দিকে—এমনই ভদ্রলোকের আকর্ষণী ক্ষমতা!

সঙ্গে আসা একজন আর্মি কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লেন তিনি। সেলফোন বের করে লিডারের কাছে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিল বেনসন—টার্গেট অ্যাকোয়্যার্ড। লিডার নির্দেশ দিলেই কাজ শুরু করবে সে।

ছয়

মেজাজ খিঁচড়ে আছে রানার। কষ্টার্জিত ছুটিটা এবারও পণ্ড হতে

চলেছে। নিজেকে অপয়া বলে মনে হচ্ছে। ছুটিছাটায় যখনই কোথাও যায়, তখনই একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। কোনও মানে হয়? দুনিয়ার সমস্ত পাগল-ছাগল আর ক্রিমিনাল কেন যে ওকেই টার্গেট করে সবসময়!

রিং হলে হাঁটতে হাঁটতেই কানে ফোন ঠেকাল ও। ইচ্ছে থাকলেও দৌড়াতে পারছে না। চায় না ওকে দেখে কোনও কারণে কৌতূহলী হয়ে উঠুক বাকি যাত্রীরা। বোমার খবর ফাঁস হলে প্যানিক দেখা দেবে। তখন সামলানো যাবে না পরিস্থিতি।

'আ'য়্যাম ব্যাক,' বলল ওপাশের লোকটা। 'দুঃখিত, জরুরি আরেকটা কল করতে হয়েছিল। এনিওয়ে... জায়গামত পৌঁছেছ?'

'দু'মিনিটের মধ্যে পৌঁছাব।' সিঁড়ি ধরে ভেহিকল ডেকে নামতে শুরু করেছে রানা। 'একটা প্রশ্ন করব? নিজে বোমা পেতে সেটা আবার আমাকে দিয়ে ডিজআর্ম করাতে চাইছ কেন?'

'ভিন্ন একটা কাজ করাতে চাই তোমাকে দিয়ে। কিন্তু কাজটা দেবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই, ওটা সামলাবার মত যোগ্যতা সত্যিই তোমার আছে কি না।'

'যোগ্যতা যাচাইয়ের আর কোনও রাস্তা ছিল না? সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তো পারতে!'

'চেষ্টা করিনি ভেবেছ?' তিক্ত গলায় বলল লোকটা। 'আকাশের চাঁদ তুমি, মাসুদ রানা। নাগাল পাওয়াই যায় না। কাজ গছাব কীভাবে? তার ওপর যদি বলতাম তোমার যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে চাই... রাজি হতে?'

'বোধহয় না।'

'সত্য কথা বলায় ধন্যবাদ। বুঝতেই পারছ, তোমার যোগ্যতা যাচাই করে দেখবার জন্য এই অভিনব কায়দা ব্যবহার না করে উপায় ছিল না আমার। বাই দ্য ওয়ে, ট্রাকের কাছে যাবার আগে নিজের গাড়ির কাছে যাও। চাবিটা গাড়ির গ্লাভবক্সে রেখে দেবে...

দরজাও যেন খোলা থাকে।'

'কেন?'

'কারণ এটাই আমার নির্দেশ... এবং আমার হাতে বোমার রিমোট আছে,' কড়া গলায় বলল অপরপক্ষ। 'কথা বাড়িয়ো না। যা বলছি করো।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি।' ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে রানা। গলাটা চেনা চেনা ঠেকছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে। কে এই লোক? একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একসঙ্গে কাজ করতে হলে তোমার নামটা জানা থাকা দরকার না আমার?'

'ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু বেশিই ভাবছ তুমি,' বাঁকা সুরে বলল লোকটা। 'তোমার-আমার পার্টনারশিপ বাইশ মিনিট পরেই খতম হয়ে যেতে পারে। মানে... তুমি যদি বোমাটা অকেজো করতে না পারো আর কী।'

ঘড়ির টাইমারে সময়টা সেট করে নিল রানা। 'আমি আশাবাদী মানুষ, আশা করি পারব।' হালকা গলায় বলল ও। 'তবে যদি মরেই যাই... কার কারণে মরছি, সেটা জেনে যাওয়া খুবই দরকার... নইলে ওপারে কেউ প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেব?' কথা বলে যতটা সম্ভব প্রতিপক্ষের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করতে চাইছে।

'এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ট্রাকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচয় জেনে যাবে তুমি।' হেঁয়ালি করল লোকটা।

কীভাবে? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রানা। বেশি আগ্রহ দেখাবার দরকার নেই। তারচেয়ে হাতের সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাক। লোকটা আর যা-ই হোক, বোকা নয়। বোমার ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছে, ওটা যথেষ্ট জটিল। যার-তার পক্ষে অমন বোমা তৈরি করা সম্ভব নয়। কী করে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করবে, সেটাই বুঝতে পারছে না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বা পরিবেশ...

কোনোটাই নেই।

ভেহিকল ডেকে পৌঁছে গেছে রানা। রেন্টাল এজেন্সি থেকে একটা লাল রঙের ডজ ভাইপার স্পোর্টস কার নিয়ে এসেছে ও, প্রতিপক্ষের কথামত ওটার গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে চাবি রেখে চোখ বোলাল সার বেঁধে পার্ক করা ভেহিকল ডেকের অন্যান্য গাড়িগুলোর উপর। মালবাহী গাড়ি আছে মাত্র তিনটে, তার মধ্য থেকে সিলভারলেক ট্রান্সপোর্টের নীল রঙা ট্রাকটাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। ওটার দিকে দ্রুত এগোল ও।

ফোনে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'ফ্রিজের গায়ে সমস্ত ইন্সট্রাকশন পাবে। তোমার জন্যেই লিখে রেখেছি সব। ইয়ে... ঠিক তোমার জন্যে না... দেখলেই বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, পুলিশে খবর দিতে যেয়ো না। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছি আমি। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই রিমোট কন্ট্রোল টিপে ফাটিয়ে দেব বোমা। কাজেই ফেরির দিকে যেন বম্ব স্কোয়াডকে যেতে না দেখি। লাইফবোটও নামানো চলবে না। ক্লিয়ার? বেস্ট অভ লাক।'

'এক মিনিট। যদি ডিজআর্ম করতে পারি, তারপর কী ঘটবে?'

'সেটা সময় হলেই দেখবে। অপেক্ষায় থেকো আমার ফোন পাবার। আর যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তো ফোন-টোনের ঝামেলাই থাকে না। তাই না?'

নীরব হয়ে গেল সেলফোন। ওটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। ট্রাকের পাশে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, নিচু হয়ে বাম চাকার পিছনটা হাতড়াল। মিথ্যে বলেনি লোকটা, সত্যিই টেপ দিয়ে একটা চাবি আটকে রাখা হয়েছে চাকার পিছন দিকে। ওটা বের করে আনল।

চারপাশে তাকাল ও। বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কাউকে দেখল না। গাড়ি থেকে কিছু বোধহয় নিতে এসেছিলেন, সিঁড়ি ধরে উঠে গেলেন উপরে। নিশ্চিন্ত হয়ে তালায় চাবি ঢোকাল রানা।

মোচড় দিতেই ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা। হাতল ধরে টান দেবার আগে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, দরজার সব জয়েন্টে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল। কোনও বুবি ট্র্যাপ বসানো থাকলে বুঝতে পারবে। কিন্তু ট্রিপ-ওয়ায়্যারের স্পর্শ পেল না আঙুলে। ভিতরে ঢোকা যেতে পারে।

দরজা প্রয়োজনমত ফাঁক করল রানা, ফাঁক গলে ঝটপট উঠে পড়ল ট্রাকের পিছনে। তারপর আবার টেনে দিল দরজা, লক করে দিল ভিতর থেকে। চায় না কাজ করবার সময় বাইরের কেউ বোমাটা দেখে ফেলে চেঁচামেচি জুড়ুক।

দরজা বন্ধ করে দেয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ভিতরটা, তবে বাল্কহেডের সঙ্গে ঝোলানো দুটো ইলেকট্রিকের লণ্ঠন পাওয়া গেল—ব্যাটারি লাগানো আছে। সুইচ টিপে দুটোই জ্বালল রানা, তারপর নজর বোলাল ট্রাকের অভ্যন্তরে। খুব বেশি কিছু নেই—পুরনো আমলের দাগপড়া একটা কাউচ, কয়েকটা ভাঙাচোরা চেয়ার, আর মাঝারি আকারের একটা রিডিং টেবিল। এ ছাড়া রয়েছে কিছু খালি কাগজের কার্টন আর পুরনো পেপারের স্তূপ। স্রেফ জঞ্জাল। বোধহয় জাঙ্কইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবার জন্যই তোলা হয়েছে ট্রাকে।

সবকিছু ছাড়িয়ে টেবিলটার দিকে নজর চলে গেল রানার। ওটার উপরেই রয়েছে ফ্রিজটা। বহু আগের মডেল, ল্যাচের সাহায্যে দরজা আটকাতে হয়। এ-মুহূর্তে আটকানোই আছে... দরজার উপরে টেপমারা অবস্থায় ঝুলছে একটা ম্যানিলা খাম, সাবধানে ওটা খুলে নিল রানা।

খামের ভিতর থেকে এক পাতার একটা কাগজ বেরুল, ইংরেজি হরফে হাবিজাবি অনেক কিছু লেখা... কিন্তু তার একবর্ণও বুঝতে পারল না ও। ভাল করে দেখতেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ইংরেজি নয়... ওগুলো আসলে গ্রিক হরফ। পুরো পাতাটাই গ্রিক ভাষায় লেখা!

বিড় বিড় করে অচেনা লোকটাকে গালি দিল রানা। ইন্সট্রাকশনের নামে গ্রিক ভাষায় লেখা একটা ধাঁধা তুলে দেয়া হয়েছে ওর হাতে। ইচ্ছাকৃত? নাকি কোনও ভুল করেছে প্রতিপক্ষ? স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর আরবি-সহ বেশ কয়েকটা ভাষায় দখল আছে রানার, লোকটা হয়তো ভেবেছে ও গ্রিক-ও জানে।

নাহ্, ব্যাটা এত বড় ভুল করবে বলে মনে হয় না। অন্তত তার মত প্রফেশনালের কাছ থেকে সেটা আশা করা যায় না। রানার ব্যাপারে ভালমত খোঁজখবর নিয়ে মাঠে নেমেছে সে; ও যে গ্রিক ভাষা পড়তে পারে না, তা না-জানার কোনও কারণ নেই। তা হলে?

হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা। পড়তে না পারলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল কাগজটা। বাক্যগুলো বুঝতে না পারুক, কোনও ধরনের ডিজিট বা সমীকরণ বের করতে পারলেও হয়—বোমার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু পণ্ডশ্রমই করল কেবল, কাজে লাগাবার মত কিচ্ছু পেল না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোকটা বলছিল, ইন্সট্রাকশন লেখা কাগজটা রানার জন্য নয়... তা হলে কার জন্য?

ঘড়ি দেখল রানা। বিশ মিনিট বাকি বিস্ফোরণের। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করল সেলফোন। লেখার মর্মোদ্ধারের জন্য কাকে ফোন করা যায় ভাবছে, এমন সময় ধুমধাম শব্দে ট্রাকের পিছনের দরজায় থাবড়া দিল কেউ। জমে গেল রানা।

'ভিতরে কেউ আছেন?' শোনা গেল নারীকণ্ঠ। সম্ভবত ফেরির কোনও স্টাফ, ওকে চোরের মত ট্রাকে উঠতে দেখে খোঁজ নিতে এসেছে।

'হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি এই ট্রাকেরই লোক। ঝাঁকুনিতে মালসামানের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে... ঠিক করতে এসেছি।'

'প্লিজ, দরজা খুলুন।'

একবার ভাবল মানা করে দেবে, কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টাল রানা। মেয়েটার সন্দেহ বেড়ে যাবে তাতে। লোক ডেকে এনে অযাচিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। তারচেয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করাই ভাল।

ট্রাকের দরজা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করল রানা। বিস্মিত হলো। ফেরির কোনও কর্মচারী নয়; বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো জ্যাকেট, জিন্স আর দামি বুট পরা অপূর্বসুন্দরী এক যুবতী। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দারুণ, মেয়েলি সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে। শরীরের কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব বা অসামঞ্জস্য নেই। একহারা লম্বা সে, রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া তামাটে-সোনালি রঙ পেয়েছে। দীঘল সোনালি চুল, খোঁপা করে বাঁধা। চোখ জোড়া নীল, মুখে কোনও দাগ নেই, চিকবোন সামান্য উঁচু। বয়েস যাই হোক, কেউ তাকে পঁচিশের বেশি বলবে না। পুরুষেরা যে-ধরনের মেয়ে দেখে আকর্ষণ বোধ করে, তাদের দলেই পড়ে সে।

তবে রূপ দেখে বিস্মিত হয়নি রানা, হয়েছে মেয়েটিকে চিনতে পেরে। ড. রেমি হ্যাডলি... মার্কিন টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর উপস্থাপিকা। পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত ওরা, তবে সখ্যতা নেই। কয়েক মাস আগে নিজের অনুষ্ঠানে রানাকে হাজির করাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল রেমি,

চেয়েছিল টিভিতে ওর সাক্ষাৎকার নিতে। আগ্রহটা অযৌক্তিক বলা চলে না—রানার আর্কিয়োলজিকাল অ্যাচিভমেণ্ট এক হিসেবে তাক লাগিয়ে দেবার মত; *চেজিং দ্য পাস্ট*-ও আর্কিয়োলজি এবং ইতিহাস বিষয়ক অনুষ্ঠান। কিন্তু পেশাগত গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে ভদ্রভাবে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয় রানা। রেমি তবু হাল ছাড়েনি, প্রায় মাসখানেক ঘুরঘুর করেছে ওর পিছনে; বিরক্ত করে মেরেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে কয়েকটা কটু কথা শোনাতে বাধ্য হয় রানা। অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা, রেগে-মেগে রানার অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে আর যোগাযোগ হয়নি দু'জনের।

এমন একটা পরিস্থিতিতে রেমিকে আবার দেখবে বলে আশা করেনি ও। বিস্ময়ের ধাক্কায় সাধারণ ভদ্রতা ভুলে গেল, হাই-হ্যালো করবার বদলে ট্রাক থেকে নেমে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

রেমিও রানাকে দেখে চমকে গেছে। হতভম্ব গলায় বলল, 'একই প্রশ্ন তো আমারও!'

'প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন না করলে হয় না?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'আপনি কি আবারও আমার পিছু নিয়েছেন?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রেমি। 'আমাকে এক লোক ফোন করে এখানে আসতে বলেছে। ট্রাকের ভিতরে কে নাকি আমার অপেক্ষায় বসে আছে। সেই লোক যে আপনি হতে পারেন, মি. রানা, তা আমি কল্পনাও করিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটার মুখভঙ্গি লক্ষ করল রানা, তবে তাতে কোন ছল-চাতুরী দেখল না। সত্যি কথাই বলছে বোধহয়। ও জিজ্ঞেস করল, 'ফোনটা কে করেছিল? তাকে চেনেন?'

মাথা নাড়ল রেমি। 'নাহ্।'

'গলাটা কি ভারী? একটু খসখসে?'

'হ্যাঁ। আপনাকেও করেছিল?'

'হুঁ,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আপনাকে পাঠাল কেন?' দৃষ্টি হঠাৎ উজ্জ্বল হলো ওর। 'আপনি গ্রিক পড়তে পারেন?'

এমনভাবে মুখ বাঁকাল রেমি, যেন প্রশ্নটা বোকার মত করে ফেলেছে রানা। একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, 'প্রাচীন ইয়োরোপিয়ান সভ্যতার উপর থিসিস করেছি আমি। গ্রিক জানব না কেন?'

'তা হলে এটা আপনার জন্য,' বলে কাগজটা রেমির হাতে তুলে দিল রানা।

পড়তে পড়তে মেয়েটার মুখ থেকে রক্ত সরে যেতে দেখল ও। শঙ্কিত হয়ে পড়ল, ভয় পেয়ে রেমি এখন চেঁচামেচি জুড়ে দিলে সর্বনাশ হবে! কিন্তু রানাকে অবাক করে দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় নিজেকে সামলাল মেয়েটা। পড়া শেষ করে যখন মাথা তুলল, তখন চেহারা থমথমে হয়ে গেছে।

'বোমাটা কোথায়?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

সাত

ঝটপট ট্রাকের পিছনে উঠে পড়ল দু'জনে। রানা যখন দরজা বন্ধ করছে, কাগজে লেখা প্রথম তিন লাইন আবার পড়ল রেমি। আধুনিক গ্রিকে টাইপ করা হয়েছে লাইনগুলো, তবে ব্যাকরণের অবস্থা যাচ্ছেতাই। মনে হলো ইন্টারনেটের কোনও ফ্রি ট্রান্সলেটর সফটওয়্যারের সাহায্যে ইংরেজি থেকে গ্রিকে ভাষান্তর করা

হয়েছে। তবে লেখার মান খারাপ হলেও অর্থ বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

ট্রাকে একটা বোমা রাখা আছে। সামনের লোকটিকে ওটা নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করো। যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তুমি আর তোমার বোন... দু'জনেই মারা যাবে।

দুঃস্বপ্নটার সূচনা হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরবার জন্য সিয়াটলের হোটেল-কক্ষে ব্যাগ গোছাচ্ছিল রেমি, এমন সময় অচেনা এক লোক ফোন করে জানাল—সে নাকি ওর ছোট বোন র‍্যাচেলকে কিডন্যাপ করেছে। প্রমাণস্বরূপ ই-মেইলে একটা ভিডিও পাঠায় লোকটা, তাতে বোনকে হাত-পা বাঁধা ও অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ও। আতঙ্ক আর বোনের অমঙ্গল আশঙ্কায় হাত-পা হিম হয়ে এসেছিল রেমির, বাধ্য হয়েছিল চুপচাপ অপহরণকারীর নির্দেশ মেনে নিতে।

প্রথম নির্দেশটা গতানুগতিক—পুলিশে খবর দেয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় নির্দেশটা ছিল, ব্রেমারটনগামী বেলা পৌনে এগারোটার ফেরিতে চড়তে হবে ওকে। অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্দেশ পাবার জন্য।

ফোন রাখার পরে বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসে ছিল রেমি। কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু কাঁদতে পারেনি। বাস্তববাদী মেয়ে ও; বুঝতে পারছিল, ভেঙে পড়লে লাভ হবে না... বাঁচাতে পারবে না প্রিয় বোনকে। আইওয়া-র এক খামারে কঠিন পরিবেশে বড় হয়েছে ও আর র‍্যাচেল, বাবা-মা'কে হারিয়েছে বয়স পনেরো হবার আগেই। তারপর থেকে জীবন কেটেছে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নিজের যোগ্যতা আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে ও। নারীসুলভ কুসুম-কোমল-পেলব ভাব এখন আর নেই ওর মাঝে। তাই মন শক্ত করে বেরিয়ে পড়েছে হোটেল থেকে।

দৃঢ় স্বভাবের মেয়ে হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে সচেতন রেমি। বুঝতে পারছিল কতটা নাজুক অবস্থায় আছে ও, অপহরণকারীর নির্দেশ মেনে নিলেও বোনকে সুস্থ দেহে ফিরে পাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু হঠাৎ করে মাসুদ রানার দেখা পেয়ে বুকে সাহস ফিরে পেয়েছে অনেকখানি। নিজেকে আর একা বলে মনে হচ্ছে না। লোকটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক বা না-ই থাকুক।

ন'মাস আগে রানার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। *চেজিং দ্য পাস্ট*-এ তাকে ইন্টারভিউ করবার প্রস্তাব দেবার সময়। অদ্ভুত এক মানুষ... অন্যেরা যেখানে টিভিতে চেহারা দেখাবার জন্য, নিজের ঢাক পিটাবার জন্য মুখিয়ে থাকে... সেখানে রানা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল ওকে। প্রথমে মনে হচ্ছিল এটা লোকটার নিজের দাম বাড়াবার কৌশল; কিন্তু মাসখানেক ওর পিছনে লেগে থাকার পর টের পেয়েছিল, মাসুদ রানা এক কথার মানুষ। টাকা বা খ্যাতির লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করা সম্ভব নয়। জোরাজুরি করতে গিয়ে বরং কড়া কিছু কথা শুনতে হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে বেশ রেগে গিয়েছিল রেমি। *চেজিং দ্য পাস্ট* অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান, সেই সুবাদে মিডিয়া-জগতের খ্যাতিমান বড়-সড় সিলেব্রিটিও ওর অনুষ্ঠানে সুযোগ পাবার জন্য লাইন ধরে... আর রানা কিনা ওকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিল! নিজেকে কী ভাবে লোকটা? ওকে এক হাত দেখে নেবার ইচ্ছে হয়েছিল খুব।

কিন্তু সময় গড়াবার সঙ্গে ফিকে হয়ে এসেছে রাগ। তার বদলে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে একটা সমীহের ভাব। যে-মানুষ বড় বড় অবদান রাখার পরেও নিভৃতে থাকতে চায়, নীরবে সেবা করতে চায় মানুষের... তার উপরে রাগ করে থাকা যায় না। জোরাজুরি করে ও-ই বরং অন্যায় করেছিল। লোকটা কি এখনও ওর উপর অসন্তুষ্ট?

আড়চোখে রানার দিকে তাকাল রেমি। এমন সুপুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। যেমন লম্বা, তেমনি সুঠামদেহী। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া, মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ আছে... দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে লোকটা, অথচ চেহারা হাসিখুশি। বিশেষ করে চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, সেদিকে একবার তাকিয়েই অনুভব করল রেমি—এই লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। প্রাণ দিয়ে হলেও মানুষটা যে-কোনও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে ওকে।

সঙ্গিনীর ভাবালুতার দিকে খেয়াল নেই রানার। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'পড়েছেন কাগজটা? কী লিখেছে ওতে? আমাদের হাতে আর মাত্র আঠারো মিনিট সময় আছে!'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে কাগজের দিকে চোখ ফেরাল রেমি। প্রথম অংশটা আধুনিক গ্রিকে লেখা। বাকিটা লেখা হয়েছে প্রাচীন গদ্যরীতিতে। ঠিকমত অর্থ বোঝাই মুশকিল। আধুনিক অংশটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল, 'ফ্রিজের দরজায় একটা বুবি ট্র্যাপ বসানো আছে। ওটাকে ডিজেবল করতে হলে দরজার নীচে লাগানো একটা তার খুলে নিতে হবে।'

নিচু হয়ে ফ্রিজের তলায় ডান হাতের চার আঙুল ঢুকিয়ে দিল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খুলে আনল তারটা।

'এবার কী?'

'দরজা এবার খুলতে পারবেন।'

সতর্কতায় ঢিল দিল না রানা। ল্যাচ সরিয়ে মাত্র ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল ফ্রিজের দরজা। উঁকি দিল ভিতরে। দেখতে চাইছে আরও কোনও ফাঁদ আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে মেলে ধরল পুরো দরজা।

সবগুলো তাক সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফ্রিজটার ভিতর থেকে।

খালি জায়গার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিক কন্টেইনার—ঠিক ই-মেইলে দেখা ছবির মত। কন্টেইনারে রয়েছে ধূসর পাউডার। বাইরে টাইমার সময় দেখাচ্ছে—সতেরো মিনিট আটত্রিশ সেকেণ্ড। কন্টেইনারের ভিতর থেকে একগোছা তার এসে মিলেছে টাইমারের সঙ্গে। আরেক গোছা তার অদৃশ্য হয়ে গেছে উপরের কাপড়ে-ঢাকা জিনিসটার মাঝে। ছোট একটা পাউচও আছে ফ্রিজের ভিতরে। হুক আর সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।

'অদ্ভুত,' মন্তব্য করল রেমি। বুক ধড়ফড় করছে ওর, চেষ্টা করল গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে। 'বোমার চেহারা এমন হয় জানতাম না।'

'এটা আন-কনভেনশনাল বোমা,' বলল রানা। 'পাউডারটা এক ধরনের বাইনারি এক্সপ্লোসিভ। তার সঙ্গে ফিট করা হয়েছে ডিটোনেটর।'

অবাক হতে গিয়েও হলো না রেমি। মনে পড়ে গেছে, রানা একজন বোমা বিশেষজ্ঞও। ইণ্টারভিউ-র উদ্দেশ্যে ওর ব্যাপারে বেশ খোঁজখবর নিয়েছিল সে।

'জিনিসটা নকল হবার সম্ভাবনা কতখানি? অযথাই অস্থির হচ্ছি না তো?'

'নকল বলে মনে হচ্ছে না,' রানা মাথা নাড়ল। 'নকল জিনিস এত নিখুঁত হয় না। শুধু আসল নয়, শক্তিশালীও বটে।'

'কতটা শক্তিশালী? সত্যি করে বলুন। আমাকে অভয় দেবার জন্য কমিয়ে বলার দরকার নেই।'

'এটা ফাটলে আমরা কেউই বাঁচব না। ফেরিটা চোখের পলকে ডুবে যাবে পানিতে।'

'এতই খারাপ?' আঁতকে উঠল রেমি।

'ঘাবড়ে গেলেন?'

'ঘাবড়াবার সময় পাচ্ছি কোথায়? এখান থেকে রক্ষা পেলে পরে না হয় ঘাবড়াব।' হালকা সুরে বলল রেমি।

'তখন আমিও হয়তো আপনার সঙ্গী হব,' বলল রানা। 'এখন কাগজ দেখুন। এরপর কী?'

'সাবধানে কাপড়ের ঢাকনা সরান,' পরের নির্দেশটা পড়ল রেমি।

সুতো দিয়ে কন্টেইনারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কাপড়টা। সাবধানে বাঁধন খুলে ওটা সরিয়ে নিল রানা। এক ফুট উঁচু আর ছ'ইঞ্চি চওড়া একটা চারকোনা আকৃতি উদয় হলো চোখের সামনে—ব্রোঞ্জের তৈরি, চকচক করছে।

ভালমত দেখার জন্য একটু এগিয়ে গেল রেমি। ঘড়ির মত দুটো ডায়াল দেখা যাচ্ছে জিনিসটার গায়ে, একটা করে কাঁটাও আছে ডায়ালদুটোয়; কিন্তু ওটা ঘড়ি নয়। নড়ছে না কাঁটাগুলো। যেখানে সংখ্যা লেখা থাকার কথা, সেখানে দেখা যাচ্ছে নানা রকম গ্রিক বর্ণ। তৃতীয় একটা কাঁটাও আছে পিছনে। যন্ত্রটার সামনের দিকের ডায়ালদুটো ক্লক ফেসের মত বারো ভাগে ভাগ করা, সেখানে খোদাই করা গ্রিক লেখাগুলো আসলে একটা করে শব্দ... মনে হচ্ছে, রাশিচক্রের বারোটা রাশির নাম। আকৃতিটার বাম পাশে দুটো কন্ট্রোল নব দেখা গেল। অদ্ভুত এক ডিজাইন... নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। তবে চকচকে দেহ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সম্প্রতি বানানো হয়েছে যন্ত্রটা।

কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে আসা তারগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে এই আজব জিনিসটার গায়ে। কিন্তু বোমার সঙ্গে ওটার কী সম্পর্ক থাকতে পারে, তা বুঝে পেল না রেমি।

'কী এটা?' বিড়বিড় করল ও। রানার কাছ থেকে জবাব পাবে বলে আশা করছে না।

কিন্তু ওকে বিস্মিত করে দিয়ে কথা বলল বাঙালি যুবক।

'আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা একটা ডিভাইসের রেপ্লিকা এটা। নাম, জিয়োলেব।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রেমি। 'জিয়ো... কী?'

'জিয়োলেব। প্রাচীন আমলের নেভিগেশনাল ডিভাইস। এটার সাহায্যে স্থলভূমির বিভিন্ন ল্যাণ্ডমার্কের রেফারেন্স নিয়ে নিজের অবস্থান এবং দিক-নির্ণয় করত সেই যুগের পর্যটক আর সওদাগরেরা। অচেনা জায়গায় পথ খুঁজে নিত। এমন আরেকটা ডিভাইস আছে—অ্যাস্ট্রোলেব। ওটা আকাশের তারার রেফারেন্স ব্যবহার করে সাগরে পথ চেনাত জাহাজকে।'

গলার সুরেই বোঝা যাচ্ছে, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলছে না রানা। ডিভাইসটা দেখামাত্র চিনতে পেরেছে ও। রেমি হতভম্ব গলায় জানতে চাইল, 'এটা যে সেই ডিভাইস, তা আপনি বুঝলেন কী করে?'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'কারণ এই জিয়োলেবটা আমি কদিন আগেই দেখেছি।'

আট

পশ্চিম সিয়াটলের সি-বিচ সংলগ্ন পার্কিং লট থেকে পিউজেট প্রণালীর বিশাল একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। সে-কারণে ভাড়া করা একটা এস.ইউ.ভি নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করছে অ্যান্থনি গ্যারেট। বেইনব্রিজ আইল্যাণ্ডের পাশ ঘুরে ব্রেমারটনের দিকে মুখ করবার আগ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে ফেরিটাকে। যা ঘটবার,

তা ঘটে যাবে এর ভিতরেই। মাসুদ রানা যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে বেইনব্রিজে পৌঁছুবার অনেক আগেই বিস্ফোরিত হবে বোমা।

এস.ইউ.ভি-র প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে গ্যারেটের নতুন সহচর অগাস্ট রেনফিল্ড। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে ফেরির দিকে—এইমাত্র ওয়েস্ট সিয়াটল পেরিয়ে এল ওটা।

'দূরবীনটা একটু নামাবে?' বলল গ্যারেট। 'বোমা ফেটেছে কি ফাটেনি, সেটা বোঝার জন্য দুটো কানই যথেষ্ট। মানে... তুমি যদি কালা না হয়ে থাকো আর কী!'

'ডেকের উপর নজর রাখছি আমি,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল রেনফিল্ড, গ্যারেটের মশকরা সহজভাবে নিতে পারেনি। 'কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করছে কি না বোঝা দরকার। রানা গোপনে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারে।'

'করেনি... নিশ্চিত থাকতে পারো,' বলল গ্যারেট। চোখ বোলাল কবজিতে বাঁধা হাতঘড়িতে। 'এতক্ষণে ও বুঝে গেছে, আমি কতটা সিরিয়াস।'

সানগ্লাস পরা একটা মেয়েকে পার্কিং লটের পাশ দিয়ে জগিং করতে দেখল সে। এদিকে তাকাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। চাপা গলায় সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'দূরবীনটা সরাও তো! লোকে সন্দেহ করে বসতে পারে। তোমাকে মোটেই বার্ড-ওয়াচারের মত দেখাচ্ছে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিনকিউলার নামিয়ে ফেলল রেনফিল্ড। মনোযোগ দিল কোলের উপর রাখা ল্যাপটপ কম্পিউটারে। স্ক্রিনে দুটো ভিডিও ফিড ভেসে উঠেছে। প্রথমটা আসছে ফেরিতে রাখা ট্রাকের ভাইজরে লুকানো ক্যামেরা থেকে। দ্বিতীয় ক্যামেরাটা বসানো হয়েছে ট্রাকের কার্গো হোল্ডে।

ড. রেমি হ্যাডলিকে ইন্সট্রাকশনের কাগজ পড়তে দেখল সে। জিয়োলেবের উপর থেকে কাপড়ের ঢাকনা ইতিমধ্যে সরিয়ে

নিয়েছে রানা, এবার দেয়ালের হুক থেকে নামাল পাউচটা। মুখ খুলে ভিতরের সবকিছু ঢালল টেবিলের উপর—ছোট-বড় চোদ্দটা আইটেম... সবগুলোই দু'হাজার বছর আগে তৈরি একটা পায্‌লের অংশ।

'কী মনে হয়েছে ওর কথাবার্তা শুনে?' গ্যারেটের দিকে ঘাড় ফেরাল রেনফিল্ড। 'ধাঁধাটা সমাধান করতে পারবে?'

'ওর উপর আস্থা আছে আমার,' বলল গ্যারেট নিরাসক্ত গলায়। 'এ-সব ব্যাপারে মাসুদ রানা একটা প্রতিভা। যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে।'

'আর যদি না পারে?'

'তা হলে আর কী?' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'নতুন একটা ফেরি দরকার হবে ওয়াশিংটনের।'

জিপিএস ট্র্যাকার চেক করল সে। ঠিকমতই কাজ করছে। পিউজেট প্রণালীর মাঝখানে দেখাচ্ছে ট্রাকের অবস্থান... ওখানেই দেখানোর কথা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল গ্যারেট, রেনফিল্ডের শরীর থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। বোমা তৈরিতে প্রতিভাবান হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে লোকটা স্রেফ একটা খবিসের হদ্দ। নোংরা চেহারা-সুরত... যেভাবে গন্ধ ছড়াচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয় গত দশ-পনেরো দিনে একবারও গোসল করেনি ব্যাটা। পারলে লাথ মেরে নামিয়ে দিত গাড়ি থেকে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। দলে একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট রাখতেই হবে তাকে, গায়ে তার যত দুর্গন্ধই থাকুক না কেন।

টাকা ছড়ালে লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যাকে-তাকে ভাড়া করলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। গ্যারেটের দরকার এমন লোক, যে তার সমস্ত আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নেবে, কখনও বেঈমানী করবে না। রেনফিল্ড ঠিক সেই ধরনের লোক। অনেক

খুঁজে পেতে তাকে বের করেছে সে।

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি রেনফিল্ড, তবে বোমা তৈরির ব্যাপারে সহজাত প্রতিভা রয়েছে তার। কলেজে পড়ার সময় কয়েকটা পাইপ-বম্ব ফাটিয়ে গোটা ক্যাম্পাসে আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি ফেলে দিয়েছিল। ফলাফল, কলেজ থেকে বহিষ্কার। জীবনে আর ও-মুখো হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ মামলাও ঠুকেছিল ওর বিরুদ্ধে, কিন্তু ছোট্ট একটা টেকনিক্যালিটির জোরে ছাড়া পেয়ে যায় সে। তবে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে ওতে, ছড়িয়ে পড়েছে রেনফিল্ডের দুর্নাম। ভাল কোনও কাজ আর জোটাতে পারেনি সে। সহজাত দক্ষতা যা ছিল, তাতে একটাই কাজ করতে পেরেছে—দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন খনিতে ডিনামাইট ফাটানোর কাজ। তাতে ধীরে ধীরে বিস্ফোরক সংক্রান্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বেড়েছে তার, কিন্তু টাকা বাড়েনি। গ্যারেটের সঙ্গে পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের এক বস্তিতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল সে।

ইন্টারনেটের সরকার-বিরোধী চ্যাট রুমের মাধ্যমে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে গ্যারেট। জানতে পারে—নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমেরিকার সরকার আর সমাজ-ব্যবস্থাকে দায়ী মনে করে রেনফিল্ড। ওটাই ছিল তাকে রিক্রুট করবার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ধীরে ধীরে রেনফিল্ডের আস্থা অর্জন করে নেয় গ্যারেট। নিউ ইয়র্ক থেকে নিজ খরচায় তাকে নিয়ে আসে সিয়াটলে। কী করতে চলেছে, সেটা শোনার পর গ্যারেটের দলে ভিড়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি রেনফিল্ড। সারা জীবনের বঞ্চনা-গঞ্জনার প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে, তার সঙ্গে উপরি জুটছে দুই মিলিয়ন ডলার! কাজ শেষ হলে ওই পরিমাণ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি করেছে গ্যারেট। তবে তার জানা নেই, প্রতিশ্রুতিটা পূরণ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট গ্যারেটও যথেষ্ট সয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে এতিম হয়েছে সে। তার আগ পর্যন্ত প্রাচুর্যের মাঝে বড় হচ্ছিল—বখে গিয়েছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে বাড়াবাড়ি রকমের আদর পেয়ে। কী ছিল না ওর? প্রাসাদতুল্য বাড়ি, দামি পোশাক-আশাক, চাকর-বাকর, হাজারো খেলনা... চাইলেই পেয়েছে সবকিছু। পড়ত প্রাইভেট স্কুলে, ছুটি কাটাতে যেত ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা ক্যারিবিয়ানে। কিন্তু ভয়াল এক রাতে বদলে গেল সব—গাড়িসহ এক ব্রিজ থেকে পড়ে গেল ওর বাবা। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করল ওর মা। ফলে এক রাতের মধ্যে অনাথ হয়ে গেল গ্যারেট।

ওর বাবার মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট তদন্ত করল পুলিশ, কিন্তু তাতে দুর্ঘটনার কোনও আলামত খুঁজে পেল না। বরং গাড়ির অ্যাকসেলারেটরের উপর গ্যারেটের পিতার আড়ষ্ট হয়ে থাকা পা দেখে মনে হলো, ইচ্ছাকৃতভাবেই গাড়ি নিয়ে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছিলেন তিনি। ব্যস, আত্মহত্যা বলে রায় দেয়া হলো ঘটনাটার। শুরুতে সেটা গ্যারেট বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু কয়েক বছর পর বুঝতে পেরেছিল—ভুল করেনি পুলিশ।

পেশায় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার ছিলেন গ্যারেটের পিতা। যে-ফার্মে কাজ করতেন, ঘটনার দু'মাস আগে ওরা তাঁকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করেছিল। এতই বদনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি, ওয়াল স্ট্রিটের আর কোনও প্রতিষ্ঠান চাকরি দিতে রাজি হয়নি তাঁকে। তার ওপর আদালতে মামলাও ঠুকেছিল পুরনো ফার্মটা, ফলে যে-কোনও মুহূর্তে গ্রেফতার... এমনকী জেল-জরিমানা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সন্দেহ নেই, সে-লজ্জা এড়াবার জন্যই আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি।

ভদ্রলোক তো মরে বাঁচলেন, কিন্তু অথৈ সাগরে ফেলে দিয়ে গেলেন ছেলেকে। কয়েক মাস পরেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত

হলো, ফলে তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পদ ক্রোক করল আদালত। পথের ফকির হয়ে গেল গ্যারেট, ঠাঁই পেল ফস্টার হোমে। সেখানেই আজে-বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে অপরাধীতে পরিণত হলো সে। শুরুটা হয়েছিল ছোটখাট চুরি-চামারি দিয়ে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর হতে থাকল। একবার মাত্র ধরা পড়েছিল সে, জুয়েলারি চুরির সময় আচমকা ফিরে এসেছিল বাড়ির মালিক। ফলাফল, ছয় মাসের কারাদণ্ড। সেই অভিজ্ঞতা তাকে করে তুলেছে বহুগুণ সতর্ক। আর কোনোদিন ভুল করেনি সে।

আস্তে আস্তে নিজের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে গ্যারেট। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে কিডন্যাপিং, মানুষ খুন... সবই আয়ত্ত করে নিয়েছে। নিজস্ব কোনও দল নেই তার, প্রতিটা কাজের সময় নিত্য-নতুন টিম গঠন করে নেয়। বাছাই করে এমন সব সদস্য, যাদেরকে ইচ্ছেমত নাচানো যাবে... কাজ শেষে প্রয়োজনে খতম করে দেয়া যাবে। সোজা কথায় এমন লোক, যার কাছ থেকে তার পরিচয় কিছুতেই ফাঁস হবে না। অনবদ্য এই কৌশল খাটানোর ফলে আজও সে আইনের নাগালের বাইরে। পুলিশ, এফবিআই, বা ইন্টারপোলের কাছে ওর নামে কোনও ফাইলই নেই! দুর্ধর্ষ এক ক্রিমিনাল হবার পরেও আণ্ডারওয়ার্ল্ডে অ্যান্থনি গ্যারেট স্রেফ একটা ভূত। তার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না কেউ।

নিখুঁত অপরাধ সংঘটনের পিছনে গ্যারেট একটা প্রতিভা হলেও ছোট্ট এক দুর্বলতা রয়েছে তার। বড্ড খরুচে স্বভাবের লোক সে, বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শখ আর নেশার পিছনে উড়িয়ে দেয় সমস্ত টাকা। ফলে প্রচুর আয় হওয়া সত্ত্বেও জমে না কিছুই। বেশ কয়েকবার রিটায়ার করবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু টাকা-পয়সার চিন্তায় করতে পারেনি। যতদিন না এমন কোনও

দাঁও মারতে পারছে, যার আয় দেদারসে খরচ করবার পরেও শেষ করা সম্ভব নয়, ততদিন রিটায়ার করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। আর তার একটাই অর্থ, রাজার ভাণ্ডার লুঠ করতে হবে তাকে।

অমন কোনও ঐশ্বর্য দুনিয়ায় আছে বলে ভাবেনি গ্যারেট, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—বছরখানেক আগে সত্যি সত্যি অমন এক ভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে সে... পেয়েছে সেই ঐশ্বর্য হাতে পাবার সূত্র। লণ্ডনের অকশন হাউস থেকে চুরি করা সেই কোডেক্সে রয়েছে সূত্রটা। যদি সফল হতে পারে, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষে পরিণত হবে সে। আর কোনোদিন ভাল-মন্দ কোনও কাজ করতে হবে না। সমস্যা হলো, কোডেক্সের পাঠোদ্ধার করবার ক্ষমতা নেই তার। তার জন্য দরকার সম্পূর্ণ আলাদা টাইপের মানুষ। ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে থাকা মাসুদ রানা আর রেমি হ্যাডলির দিকে তাকাল গ্যারেট। ওরাই কি সেই মানুষ? খুব শীঘ্রি জানা যাবে সেটা।

কোলের উপর রাখা ব্যাকপ্যাকের উপর হাত বোলাল গ্যারেট, ভিতরে রয়েছে আর্কিমিডিসের কোডেক্স। জিনিসটা কক্ষনো হাতছাড়া করে না সে। রেনফিল্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর এগোল ওরা?'

'বেশি না,' ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা ডোনাটের বাক্স থেকে একটা ডোনাট তুলে নিল রেনফিল্ড। কামড় বসাল ওটায়। 'স্টামাচিয়োনটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বোধহয়।'

'স্টামাচিয়োন না, উচ্চারণটা হবে স্টোমাকিয়োন,' বিরক্ত গলায় বলল গ্যারেট। 'এনিওয়ে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখনও সময় আছে ওদের হাতে।'

'বারো মিনিট,' ঘড়ি দেখে বলল রেনফিল্ড। 'তাড়াতাড়ি হাত না চালালে বিপদে পড়বে।'

'দেখাই যাক।'

স্ক্রিনে পায্‌লের টুকরো আর ইন্সট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত দেখাচ্ছে রানা আর রেমিকে। আঁকাবাঁকা এবং ছোটবড় আকারের মোট চোদ্দটা টুকরো রয়েছে ওদের সামনে—এগারোটা ত্রিভুজ, একটা চতুর্ভুজ আর দুটো পঞ্চভুজ আকৃতির। ঠিকমত সাজানো হলে ওগুলো দিয়ে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র বানানো সম্ভব। এই পায্‌লকেই স্টোমাকিয়োন বলে। গ্যারেটের রিসার্চ বলছে, পায্‌লটার আবিষ্কর্তা স্বয়ং আর্কিমিডিস। কী যেন এক ম্যাথমেটিকাল নিয়ম প্রমাণ করা সম্ভব ওটা দিয়ে। কোডেক্সের ভিতরে ওই স্টোমাকিয়োনের ছবি আছে, সেই অনুসারেই বানানো হয়েছে টুকরোগুলো। আসলে স্টোমাকিয়োনটা একটা কোড। প্রতিটি টুকরো গ্রিক লেখায় ভরা।

সমস্যা হলো, প্রাচীন ধাঁধাটা সমাধান করতে পারেনি গ্যারেট। কোডেক্স থেকে এটুকু বুঝেছে—স্টোমাকিয়োনের লেখাগুলোর সঙ্গে জিয়োলেবের কাঁটায় খোদাই করা রাশিচক্রের সম্পর্ক আছে। ঠিকমত যদি ধাঁধার সমাধান করা যায়, তা হলে জিয়োলেবটা ব্যবহারের উপায় জানা যাবে। ওটাই রাজা মাইডাসের গুপ্তধন উদ্ধারের চাবিকাঠি। আর সেটা করবার জন্য মাত্র পাঁচদিন সময় গ্যারেটের হাতে। এ-কাজে মাসুদ রানা ও রেমি হ্যাডলিই তার একমাত্র ভরসা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে টোকা দিয়ে গ্যারেটের মনোযোগ আকর্ষণ করল রেনফিল্ড। নয় মিনিটে নেমে এসেছে কাউন্টডাউন।

'ওরা বোধহয় পারবে না,' বলল সে।

'না পারাটাই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল গ্যারেট। 'আর্কিমিডিস অত্যন্ত ধূর্ত লোক ছিল। ধাঁধাটার সমাধান তো আর একটা নয়... অনেকগুলো।'

অবাক চোখে তার দিকে তাকাল রেনফিল্ড। 'ক'টা?'

হাসল গ্যারেট। 'সতেরো হাজারেরও বেশি!'

নয়

তীক্ষ্ণ চোখে আর্কিমিডিসের পায্‌লের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বোঝার চেষ্টা করছে এর ভিতর কোনও প্যাটার্ন আছে কি না। কিন্তু পাচ্ছে না। ও জানে, সতেরো হাজারের বেশি সমাধান আছে এর; কিন্তু ওদের জিয়োলেবের বেলায় প্রযোজ্য হবে মাত্র একটা। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

স্টোমাকিয়োনের চোদ্দটা পিসের প্রতিটা কোনায় একটা করে গ্রিক সংখ্যা খোদাই করা আছে। যে-পাশে সংখ্যা, তার অন্যপিঠে রয়েছে একটা করে গ্রিক শব্দ। পায্‌লটা সমাধান করা গেলে জানা যাবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জিয়োলেবটা। কিন্তু ঠিকমত সাজানো না হলে অর্থহীন হয়ে পড়বে ধাঁধার জবাব।

লিখিত ইন্সট্রাকশন বলছে, জিয়োলেবের সামনে-পিছনের সবগুলো কাঁটা যদি ক্লক ফেসের বারোটার পজিশনে আনা হয়, বন্ধ হয়ে যাবে বোমার টাইমার। সমস্যা হলো, নবের সাহায্যে ঘোরাতে হয় কাঁটাগুলো... আর সেটার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কৌশল। নব ঘোরালে একসঙ্গে ঘোরে কাঁটা-তিনটে—ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে। ঠিক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সবগুলোকে বারোটার পজিশনে আনা যাবে, তা অনুমান করা সম্ভব নয়। ডিভাইসটার ভিতরে মোট সাতচল্লিশটা গিয়ার... অর্থাৎ, খাঁজকাটা চাকা আছে, তারমানে সম্ভাব্য কম্বিনেশনের সংখ্যা কোটির কাছাকাছি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই, ধাঁধার সমাধান করতেই হবে

ওদেরকে।

'আট মিনিট,' টাইমারের দিকে তাকিয়ে বলল রেমি। গলা কাঁপছে ওর।

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রানার মাঝে। আগের মতই এক দৃষ্টিতে স্টোমাকিয়োনের পিসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'কী হলো? জমে গেলেন নাকি?' বলল রেমি।

'না। মাথা ঘামাচ্ছি,' রানা জানাল। 'আপনি কিছু পেলেন?'

'পুরো জিনিসটা পানিতে ফেলে দিলে কেমন হয়?'

'সম্ভব নয়। আমাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে।'

'কীভাবে? আমরা ছাড়া আর তো কেউ নেই এখানে। বোমা ফাটার সম্ভাবনা আছে... এ-অবস্থায় ওরা ফেরিতে চড়েছে বলেও মনে হয় না।'

'খুঁজে দেখার সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমার ধারণা লুকানো ক্যামেরা আছে ট্রাকের ভিতর। আমাদেরকে যে-লোক নাচাচ্ছে, সে মোটেই কাঁচা নয়।'

'কে সে? কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'ওর নাম অ্যান্থনি গ্যারেট।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির। 'আপনি চেনেন তাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জিয়োলেবটা ও-ই আমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল।'

'দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আপনার কাছে এল কেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনি। বেঁচে থাকলে নাহয় শোনাব আপনাকে কোনওদিন।'

'না, এখুনি শুনতে চাই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। মাত্র সাত মিনিট বাকি। অথচ

রেমি নাছোড়বান্দা। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'গ্যারেট ভেবেছিল জিয়োলেবটা কীভাবে অপারেট করতে হয়, ভিতরের কলকব্জা খুলে সেটা বের করতে পারব আমি।'

'পারেননি?'

'নাহ্। পারলে কি আর দাঁড়িয়ে আছি খামোকা? যন্ত্রটা পুরোপুরি খুলে ফেলেছিলাম আমি। সমস্ত পার্টস্ আলাদা করে দেখেছি। কিন্তু কৌশলটা ধরতে পারিনি। জিনিসটাকে এক ধরনের রুবিকস্ কিউব বলতে পারেন। সঠিক কৌশল জানা না থাকলে যতই ঘোরান, কিছুতেই মেলাতে পারবেন না।'

'জাস্ট আ মিনিট। এই পায্লটা তখন কোথায় ছিল? তখনই এটা সমাধান করবার চেষ্টা করেননি কেন?'

'আমাকে পায্লটা দেখায়নি গ্যারেট। দেখাবার সময়ই পায়নি আসলে। আমি ব্যস্ত মানুষ, জিয়োলেবের পিছনে নষ্ট করবার মত সময় ছিল না হাতে। গ্যারেটকে সে-কথা বলে বিদায় করে দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী... লোকটাকে আমার একদমই পছন্দ হচ্ছিল না।'

আঁতকে উঠল রেমি। 'হায় যিশু! তা হলে তো আপনিই এ-সবের জন্য দায়ী! সোজা পথে আপনাকে রাজি করাতে পারেনি গ্যারেট, তাই প্যাঁচের ভিতর ফেলে বাধ্য করছে জিয়োলেবের রহস্য ভেদ করতে!'

'এখন আর সে-কথা ভেবে কপাল চাপড়ে লাভ কী?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'মোদ্দা কথা হলো, রহস্যটা ভেদ করতে হবে; আর সেটা...' টাইমারের দিকে তাকাল ও, '...আগামী ছ'মিনিটের মধ্যে।'

'এ কি আদৌ সম্ভব?' হতাশ গলায় বলল রেমি।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কেন গ্যারেট? নিশ্চয়ই ভেবেছে আপনার সাহায্য

প্রয়োজন হবে আমার। কিছু একটা করুন!'

'কীভাবে কী করব? জীবনে এই প্রথম জিয়োলেব দেখছি।'

'কিন্তু প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার উপরে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ। ওদের পায্‌ল সম্পর্কে কী জানেন?'

'এটুকুই যে, ওরা স্টেগানোগ্রাফির আবিষ্কর্তা।'

স্টেগানোগ্রাফি সম্পর্কে শুনেছে রানা—প্লেইন সাইট... অর্থাৎ চোখের সামনে মেসেজ লুকিয়ে রাখার কৌশল... ঠিক যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিঠির স্ট্যাম্পের পিছনে মাইক্রোডট সেঁটে জরুরি তথ্য আদান-প্রদান করা হতো। আজও ব্যবহার করা হয় এই কৌশল—খবরের কাগজের নির্দোষ বিজ্ঞাপন, কিংবা ইন্টারনেটে পোস্ট করা ছবি বা ভিডিও-র মাধ্যমে। মেসেজ জায়গামতই থাকে; কিন্তু ওটা কোথায় আছে বা কীভাবে পড়তে হবে, তা না জানলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

'প্লিজ, আরেকটু ক্লিয়ার করুন,' বলল ও। 'পুরনো আমলে স্টেগানোগ্রাফির মেথড কেমন ছিল?'

'আড়াই হাজার বছর আগে স্টেগানোগ্রাফি আবিষ্কার করে গ্রিকরা,' বলল রেমি। 'সহজ একটা উপায় ছিল উল্কি। মেসেঞ্জারের মাথা কামিয়ে উল্কির মাধ্যমে লিখে দেয়া হতো মেসেজ। চুল বড় করে সেই উল্কি ঢেকে ফেলত মেসেঞ্জার। গন্তব্যে পৌঁছুনোর পর আবার কামাত মাথা। ওয়াক্স ট্যাবলেট... মানে, মোমের ফলকেও মেসেজ লুকানো হতো।'

'কীভাবে?'

'দুই পরত মোম ব্যবহার করা হতো ট্যাবলেটে। তলার পরতে গোপন মেসেজ লিখে ঢেকে দেয়া হতো দ্বিতীয় পরত দিয়ে। সেটায় লেখা হতো গুরুত্বহীন তথ্য। জায়গামত পৌঁছুনোর পর উপরের লেয়ারটা চেঁছে নিলেই হলো।'

'তারমানে কোনও কোড ব্যবহার করত না ওরা? শুধু কী

খুঁজতে হবে, তা জানা থাকলেই হয়?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'তা হলে ধরে নিতে হয়, এখানেও সব চোখের সামনেই আছে,' স্টোমাকিয়োনের পিসগুলোর উপর দৃষ্টি ফেরাল রানা। 'কিন্তু কী খুঁজতে হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'পায্‌লের পুরোটা হয়তো দেখছি না আমরা,' বলল রেমি। 'জিয়োলেবটাও তো এর একটা অংশ... মানে ওটার ভিতর-বাইরের সব পার্টস। ডিভাইসটা তো খুলেছিলেন আপনি। ভিতরে কী দেখেছেন মনে করার চেষ্টা করুন।'

'খুব বেশি কিছু না। সাতচল্লিশটা গিয়ার দেখেছি জিয়োলেবের ভিতরে।'

মনে মনে কী যেন হিসেব করল রেমি। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'পিসগুলোর কোনা! এগারোটা ত্রিভুজ, একটা চতুর্ভুজ, আর দুটো পঞ্চভুজ... সব মিলিয়ে সাতচল্লিশটা কোনা আছে পিসগুলোয়!'

চমকে উঠল রানা। তাই তো! আরও আগে খেয়াল করেনি কেন ব্যাপারটা? তাড়াতাড়ি বলল, 'কোনায় লেখা নম্বরগুলো পড়ুন। ওগুলোই আমাদের ক্লু।'

দুটো পিস হাতে তুলে নিল রেমি। 'চব্বিশ, সাতান্ন, চার, বত্রিশ, সতেরো...'

'দাঁড়ান। কত কত বললেন? চব্বিশ, সাতান্ন আর বত্রিশ?'

'চার আর সতেরোও আছে। কিছু বুঝতে পারলেন?'

চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল রানা। হঠাৎ মাথার ভিতরে যেন জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের বাতি! ঝট্ করে রেমির দিকে ফিরল ও। 'জলদি! কোনোটার কোনায় সাঁইত্রিশ লেখা আছে কি না দেখুন!'

পাগলের মত স্টোমাকিয়োনের পিসগুলো ঘাঁটল রেমি।

কয়েক সেকেণ্ড পর তুলে ধরল একটা ত্রিভুজ। 'পেয়েছি!'

'দিন ওটা। যেটায় চব্বিশ লেখা আছে, ওটাও লাগবে।'

পাশাপাশি পিসদুটো বসাল রানা। এক লাইনে চলে এল সংখ্যাদুটো।

'কী হলো?' উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল রেমি। 'মিলিয়ে ফেলেছেন?'

'আমার অনুমানে যদি ভুল না হয়ে থাকে... হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জিয়োলেবের গিয়ারগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট স্মরণ করছিলাম। সাঁইত্রিশ দাঁতের একটা গিয়ার ছিল ওতে, সেটার গায়ে মিশেছিল চব্বিশ দাঁতের আরেকটা। এভাবেই মেলাতে হবে ধাঁধাটা। গিয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে হবে স্টোমাকিয়োনের পিসগুলো।'

'আর বাড়তি সংখ্যাগুলো?'

'ওগুলো লেখা হয়েছে মানুষকে বোকা বানাবার জন্য। দেরি করবেন না, আমি সংখ্যা বলছি... আপনি পিসগুলো দিন। হাতে কিন্তু মাত্র চার মিনিট সময়।'

দ্রুত সংখ্যা বলে গেল রানা, সেই অনুযায়ী একে একে বাকি তেরোটা পিস এগিয়ে দিল রেমি। ও যখন ওগুলো সাজাচ্ছে, রেমি জানতে চাইল, 'কোন্ চাকায় ক'টা দাঁত... ওগুলো কীভাবে সাজানো ছিল... এসব আপনি মনে রেখেছেন কীভাবে?'

'জিয়োলেবটা খুলে আবার রি-অ্যাসেম্বল করতে হয়েছিল আমাকে,' বলল রানা। 'তাই সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কপাল ভাল, ভুলে যাইনি এখনও।'

এক মিনিটও লাগল না, চোদ্দটা পিস জোড়া দিয়ে নিখুঁত বর্গক্ষেত্র বানিয়ে ফেলল ও। পুরো জিনিসটা উল্টে ফেলল এরপর, যাতে পিছনের সাইডের লেখাগুলো পড়া যায়।

'পড়ুন তাড়াতাড়ি!' তাড়া দিল রানা। খেয়াল করল,

লেখাগুলো ঘড়ির ডায়ালের মত একটা বৃত্তের আকৃতি পেয়েছে। টাইমারে সময় তখন তিন মিনিট।

'ঠিক আছে, পড়ছি। কিন্তু এসবের কোনও অর্থ তো বুঝতে পারছি না!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রেমি। 'বারোটা এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছি এখানে। এই দেখুন... আলফা লিও, বিটা লিব্রা, আলফা পিসেস, বিটা স্করপিও... মানে কী এসবের?'

'নিশ্চয়ই জিয়োলেবের ডায়ালের রাশিগুলোকে রেফার করছে,' অনুমান করল রানা।

'আলফা আর বিটা বলতে কী বুঝিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'এগুলো,' ডিভাইসের গায়ের নবদুটো দেখাল রানা। 'উপরেরটা আলফা, নীচেরটা বিটা। গায়ে মার্কিং করা আছে।' ওগুলোর গায়ে হাত রাখল ও। 'ডায়াল মেলাবার জন্য সিকোয়েন্স অনুসারে নব ঘোরাতে হবে আমাকে।' ইশারায় বারোটার পজিশনে যে-লেখাটা আছে, সেটা দেখাল। 'এখানে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। তারমানে এটা আমাদের লাস্ট মুভ। পরেরটাকে এক নম্বর ধরে শুরু করুন।'

'আলফা লিও,' বলল রেমি।

'লিও কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল রেমি।

প্রথম নবটা ঘোরাল রানা। একসঙ্গে নড়তে শুরু করল সবগুলো কাঁটা। উপরের কাঁটা লিও-তে পৌঁছুলে থামল ও।

'এবার?'

'বিটা লিব্রা।' বলে লিব্রা দেখিয়ে দিল রেমি।

একই পদ্ধতিতে পরের সাতটা চিহ্ন পেরিয়ে এল ওরা। তবে সময় লেগে গেল অনেক। দশ নম্বর যখন শুরু করছে, তখন মিনিটের ঘর শূন্য হয়ে শুধু সেকেণ্ডে পৌঁছে গেছে টাইমারের

কাউন্টডাউন।

'তাড়াতাড়ি হাত চালান! বিটা ক্যানসার,' বলল রেমি।

'আর ক'টা বাকি?' পাগলের মত নব ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুটো। আলফা স্যাজিটারিয়াস।'

উপরের নবে হাত চলে গেল রানার। দ্রুত কাঁটা নিয়ে গেল রেমির দেখানো পজিশনে।

'এটাই শেষ, বিটা অ্যাকোয়ারিয়াস।'

টাইমারের দিকে তাকাল রানা। বুক খামচে ধরল কী যেন। পনেরো সেকেণ্ড!

আঙুলের টনটনানির পরোয়া করল না আর, ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে নীচের নবটা ঘোরাল ও। যেন জাদুমন্ত্রবলে একত্র হলো কাঁটা তিনটে... চলে গেল বারোটার পজিশনে। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো... সঙ্গে সঙ্গে বিপ বিপ আওয়াজ করল বোমা। ফুলকি দেখা দিল জিয়োলেবের সঙ্গে ওয়ায়্যারের সংযোগস্থলে।

রেমিকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিল রানা। গড়ান দিয়ে চলে গেল ট্রাকের দরজার কাছে। দু'জনে চোখ বন্ধ করে ফেলল বিস্ফোরণের আশঙ্কায়।

মিনিটখানেক কেটে যাবার পরেও যখন কিছু ঘটল না, চোখ খুলল ওরা। ধীরে ধীরে উঠে বসল। দেখল, চার সেকেণ্ড বাকি থাকতে থেমে গেছে টাইমার।

রানার দিকে চোখ বড় করে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রেমি 'ইটস্ আনবিলিভেবল, মি. রানা! বোমাটাকে সত্যিই থামিয়ে দিয়েছেন আপনি!'

'হ্যাঁ, থেমেছে; তবে কৃতিত্ব আমার একার নয়,' বলল রানা 'আপনিও এ কৃতিত্বের সমান ভাগীদার, ড. হ্যাডলি।'

হাসি ফুটল রেমির ঠোঁটে। 'এবার বোধহয় ফর্মালিটি ত্যাগ করা যায়। আমাকে শুধু রেমি বলে ডাকলে খুশি হব।'

রানাও হাসল। 'আমাকে শুধু রানা।'

বেরসিকের মত এ-সময় বেজে উঠল ওর সেলফোন। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে চেহারায় মেঘ জমল ওর। গ্যারেটের নাম্বার। কল রিসিভ করে স্পিকার অন করে দিল, যাতে রেমিও শুনতে পায় লোকটার কথা।

'কংগ্রাচুলেশন্স... মি. রানা অ্যাণ্ড ড. হ্যাডলি!' ভেসে এল গ্যারেটের উল্লসিত কণ্ঠস্বর। 'দারুণ দেখিয়েছ তোমরা...'

'ছেঁদো প্রশংসার প্রয়োজন নেই, গ্যারেট,' কাঠখোট্টা গলায় তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'তোমার কথামত কাজ করেছি আমরা। এবার যেতে পারি?'

এমনভাবে হেসে উঠল গ্যারেট, যেন খুব মজার কোনও রসিকতা করেছে রানা। হাসতে হাসতে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাবে, বন্ধু? খেলা তো কেবল শুরু!'

দশ

খাবারের টেবিলে উঠেছে প্রাণবন্ত আলোচনার ঝড়। আসরের মধ্যমণি হয়ে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তাঁর সঙ্গে জর্জ রেডক্লিফ আর ল্যারি কিং ছাড়াও পেন্টাগনের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও একজন কর্নেল যোগ দিয়েছেন লাঞ্চের জন্য। কথা হচ্ছে নুমার স্টেট অভ দ্য আর্ট টেকনোলজি নিয়ে।

'যা-ই বলুন, অ্যাডমিরাল,' ওয়েইটার খালি প্লেট নিয়ে গেলে বললেন ব্রিগেডিয়ার কলসন, 'নুমার হাতে যে-ধরনের টেকনোলজি আছে, তা আমাদের সঙ্গে শেয়ার না করে রীতিমত অন্যায় করছেন আপনারা।'

'সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে তোমরা কী করবে?' হালকা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওগুলো শুধু গবেষণার কাজে লাগে। মিলিটারির হয়ে গবেষণার কাজ তো ডারপা আর নুমাই করে দিচ্ছে।'

'আমি সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছি না... বলছি মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশনের কথা। আপনাদের অনেককিছুই আমরা যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করতে পারব।'

'যেমন?'

'আপনাদের ওই সুপার-কম্পিউটারের কথাই ধরুন...'

'ভিনাস?' ব্রিগেডিয়ারকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ল্যারি কিং। 'দুঃখিত, স্যর। পুরো নুমাকে চালাচ্ছে ও। পেন্টাগনের হাতে ওকে তুলে দিলে আমরা খোঁড়া হয়ে যাব। আর যদি অমন আরেকটা কম্পিউটার বানিয়ে দিতে বলেন, সেটাও সম্ভব নয়। শি ইজ ওয়ান অভ আ কাইণ্ড। দশ বছরের বেশি লেগেছে আমার ওকে বর্তমান অবস্থায় আনতে। চট করে তার রেপ্লিকেশন সম্ভব নয়।'

'দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু নেই,' বিরক্ত গলায় বললেন কলসন। 'আসল কথা আপনাদের সদিচ্ছার অভাব।'

'এটা ভুল কথা,' বললেন হ্যামিলটন। 'নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবছ তোমরা। কিন্তু আমরা তো জানি, যার-তার হাতে ভিনাসকে তুলে দেয়া হলে ওটার অপব্যবহার হবে। শত্রুদের উপর তো বটেই... খোদ আমেরিকানদের উপরও স্পাইং করবে তোমরা ভিনাসের সাহায্যে। এমনিতেই করছ। এ-নিয়ে জনসাধারণ যথেষ্ট খেপা।'

'বেশ, কম্পিউটারের কথা তা হলে বাদই দিলাম,' গোমড়ামুখে বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'আণ্ডার-সি টেকনোলজির দিক থেকেও তো অনেক এগিয়ে আছেন আপনারা। ডিপ ডাইভিং সাবমারসিবল, গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেইডার, লং রেঞ্জ সোনার... এসব কি নেভির সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন না?'

'ওগুলোর কোনোটাই নুমার একার সম্পত্তি নয়,' বললেন হ্যামিলটন। 'তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের বেশিরভাগ টেকনোলজিই দেশ-বিদেশের হাজারো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে তৈরি হয়েছে। ওঁদের আবিষ্কার সামরিক কাজে ব্যবহার করা হবে না, এমন শর্তের ভিত্তিতেই ওঁরা নুমাকে সাহায্য করেছেন। জেনে-শুনে তো আমরা কথার বরখেলাপ করতে পারি না।'

'ওসব নীতিকথা আজকের জামানায় অচল, অ্যাডমিরাল। তা ছাড়া নুমার সবকিছু আমেরিকান সরকারের সম্পত্তি। আমরা যদি জোর খাটাই, আইনগতভাবে আপনি বাধা দিতে পারবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' মৃদু হেসে বললেন হ্যামিলটন। 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

'প্রেসিডেন্টের সাপোর্ট আছে বলে এমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারছেন,' মুখ বাঁকা করলেন কলসন। 'কিন্তু অ্যাডমিরাল, যে-দিন আপনার মতাদর্শে বিশ্বাস করেন না, এমন প্রেসিডেন্ট বসবেন ওভাল অফিসে, কী করতে পারবেন আপনি?'

'হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত নিজের নীতিতে অবিচল থাকব আমি।' শান্ত গলায় জানিয়ে দিলেন হ্যামিলটন।

পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠল। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল সবাই। যেন তা থেকে ওঁদেরকে মুক্তি দেবার জন্যই উদয় হলো একজন ওয়েইটার। নুমা চিফের দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে

চান। ব্যাপারটা নাকি জরুরি।'

রেস্টুরেন্টের ডোরওয়ের দিকে ইশারা করল সে। ঘাড় ফেরাতে নিভাঁজ ইউনিফর্ম পরা একজন আর্মি অফিসারকে দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল।

'আমাকে একটু উঠতে হয়, কলসন।'

'প্লিজ, অ্যাডমিরাল।'

লম্বা লম্বা কদম ফেলে দরজার কাছে চলে গেলেন হ্যামিলটন। তাকালেন অপেক্ষমাণ অফিসারের দিকে। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স, রুক্ষ চেহারা। কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক। বুকের বামপাশে নানা রঙের রিবন, আর ডানপাশে নেমপ্লেট... তাতে লেখা: পারকার। আগে কখনও এই অফিসারকে দেখেননি তিনি।

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন? কী ব্যাপার?'

অ্যাডমিরালকে স্যালিউট ঠুকল ক্যাপ্টেন। বলল, 'মাফ করবেন, অ্যাডমিরাল। তবে আমার উপর নির্দেশ আছে, আপনাকে এখুনি জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে। কী যেন একটা সিচুয়েশন দেখা দিয়েছে... আপনার পরামর্শ দরকার।'

'এখুনি?' ভুরু কোঁচকালেন হ্যামিলটন।

'ইট'স্ আর্জেন্ট, স্যর।'

'কী হয়েছে, বলো তো!'

'আমাকে বিস্তারিত জানানো হয়নি, স্যর। শুধু আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

'এত জরুরি হলে সরাসরি আমাকেই ফোন করল না কেন?' বিড় বিড় করলেন হ্যামিলটন। 'কে আছে ওখানে?'

'জেনারেল হোগান, স্যর।'

জেনারেল রবার্ট হোগানকে চেনেন অ্যাডমিরাল। ভুরু কোঁচকালেন, 'বব হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন?'

'নো আইডিয়া, স্যর। কিন্তু আমাদের এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। এক মিনিট সময় দাও আমাকে।'

ব্রিফকেস আনার জন্য টেবিলে ফিরে গেলেন তিনি। সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, 'সরি, জেন্টলমেন। জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে আমাকে। পরে আবার নাহয় কথা হবে, কেমন?'

'শিয়োর, অ্যাডমিরাল।'

সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরে এলেন হ্যামিলটন। 'চলো, যাওয়া যাক।'

অ্যাডমিরালকে নিয়ে এলিভেটরে উঠল ক্যাপ্টেন। হোটেলের একজন স্টাফও উঠল তাঁদের সঙ্গে, গায়ে শেরাটনের আকাশি রঙের ব্লেজার। তার উদ্দেশে ক্যাপ্টেন বলল, 'পার্কিং লেভেল, প্লিজ।'

বাটন টিপল হোটেলের লোকটা। দরজা বন্ধ হয়ে ধীর গতিতে নীচে নামতে শুরু করল এলিভেটর। দরজাটা পালিশ করা চকচকে পিতলের... আয়নার মত কাজ করছে। ওটায় ক্যাপ্টেনের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। লোকটাকে দেখামাত্র মন খুঁত খুঁত করছিল। এখন বুঝতে পারছেন তার কারণ।

ক্যাপ্টেনের বুকে সাঁটা রিবনগুলোই সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে তাঁর মনে। সার্ভিসের দৈর্ঘ্য কম নয় তাঁর, প্রচলিত সমস্ত মেডেল চেনেন। কোন্ মেডেলের সঙ্গে কোন্ রিবন থাকে, সেটাও খুব ভাল করে জানেন। এ-মুহূর্তে মস্ত বড় এক খুঁত দেখতে পাচ্ছেন তিনি সঙ্গীর বুকে।

বড় করে শ্বাস নিলেন অ্যাডমিরাল, তারপর ধীরে ধীরে

ঘুরলেন ক্যাপ্টেনের দিকে। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

'এক্সকিউজ মি, স্যর?' থতমত খেয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

'আর্মি অফিসার নও তুমি, হতে পারো না। কারণ তুমি জানো না, এই রিবন পরার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ বছর আগে জন্ম নেয়া দরকার ছিল তোমার।' লোকটার বুকে সাঁটা একটা রিবন স্পর্শ করলেন হ্যামিলটন।

'আ... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, অ্যাডমিরাল।'

'এটা ভিয়েতনাম সার্ভিস মেডেলের রিবন, গাধা! সত্তরের দশকের পরে এই মেডেল পায়নি কেউ।' গমগম করে উঠল হ্যামিলটনের গলা। 'ইউনিফর্মটা কোত্থেকে জোগাড় করেছ?'

নার্ভাস হয়ে যাবার কথা, কিন্তু হলো না ভুয়া ক্যাপ্টেনরূপী বেনসন। তার বদলে হাসল। 'আপনার নজর বড়ই চোখা, অ্যাডমিরাল। কিন্তু ধাপ্পাটা ধরতে একটু দেরি করে ফেলেছেন।' এলিভেটরের তৃতীয় আরোহীর দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝোঁকাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল ধরতে পারলেন হ্যামিলটন। লোকটাকে সত্যি সত্যি হোটেলের স্টাফ ভেবেছিলেন তিনি, সেজন্যেই সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন ভুয়া ক্যাপ্টেনকে। ভেবেছিলেন সাক্ষীর সামনে কিছু করবার সাহস পাবে না প্রতিপক্ষ। কিন্তু আসলে তা নয়। দ্বিতীয় লোকটাও একই দলের! ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক—দেরি করে ফেলেছেন তিনি।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন অ্যাডমিরাল। শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল ত্রিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ। যন্ত্রটার নাম টেযার। সরাসরি তাঁর ঘাড়ে ঠেকিয়ে বোতাম চেপেছে কাটনার। দুনিয়া দুলে উঠল অ্যাডমিরালের চোখের সামনে। হাঁটু মুড়ে এলিভেটরের মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি।

এগারো

ব্রেমারটনের ডকে এসে ভিড়েছে ফেরি। ভেহিকল র‍্যাম্প নামছে ধীরে ধীরে, তবে তার আগেই পিয়ার স্পর্শ করল গ্যাঙওয়ে। যে-সব যাত্রীর গাড়ি নেই, তারা পিল পিল করে নামতে শুরু করল সেই গ্যাঙওয়ে ধরে।

ভিড় ঠেলে ফেরিতে উঠবার চেষ্টা করছে ববি মুরল্যাণ্ড। হাতে সময় কম, ভেহিকল র‍্যাম্প বেশিক্ষণ নামানো থাকে না, তার মাঝেই রানার গাড়িতে পৌঁছুতে হবে ওকে। ড্রাইভ করে নামিয়ে আনতে হবে ফেরি থেকে। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে বের করতে হবে *সিলভারলেক ট্রান্সপোর্ট* লেখা একটা ট্রাক। অপরিচিত এক লোকের কাছ থেকে অদ্ভুত এই নির্দেশ পেয়েছে ও কিছুক্ষণ আগে... কথা না শুনলে বন্ধু মাসুদ রানার মাথার উপর মহা বিপদ নেমে আসবে বলে থ্রেট দিয়েছে লোকটা। কোন্ রঙের কী গাড়ি, ইগনিশনের চাবি কোথায় পাওয়া যাবে, সব এমন নির্ভুল ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে যে বুঝে নিয়েছে ববি, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই কোনোরকম প্রশ্ন তোলেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছে ডকে।

ছোটখাট মানুষ মুরল্যাণ্ড, বেঁটেই বলা যায়, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে সেটাকে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ

সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু রানা, আর বন্ধুর জন্য পারে না এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই।

নামতে থাকা যাত্রীদের ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে এবং দিয়ে এগিয়ে চলল মুরল্যাণ্ড, স্রোতের উল্টোদিকে গেলে যা হয়। কানে ভেসে এল বিরক্তিসূচক নানা রকম মন্তব্য। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না ও। বরং আরও সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করল ভিড়ের ভিতর। সঙ্গে টিকেট নেই, ফেরির স্টাফদের সামনে পড়লে ঝামেলা হতে পারে।

সতর্কতায় কাজ হলো না, ডেকে পা রেখে দশ ফুট এগোতে না এগোতে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল ইউনিফর্ম-পরা এক গার্ড।

'অ্যাই, অ্যাই! করছেন কী! বোর্ডিং এখনও শুরু হয়নি।'

নিচুস্বরে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়ে তার দিকে ফিরল মুরল্যাণ্ড। অবশ্য অবাক হয়নি, অমন গাঁট্টাগোট্টা শরীর নিয়ে কারও চোখ ফাঁকি দেয়া মুশকিল।

'হাই!' পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ভুবনভোলানো হাসি হাসল সে। 'সিয়াটলে যাচ্ছি না আমি। ওখান থেকেই এলাম এইমাত্র। ভুলে আমার ব্যাগটা সিটের উপর ফেলে গেছি।'

হাসিতে কাজ হলো না। ভুরু কোঁচকাল গার্ড। বলল, 'কই, আপনাকে নামতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'বোধহয় ব্যস্ত ছিলে...'

'ডকে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঙওয়েতে এসেছি আমি,' কড়া গলায় বলল লোকটা।

'আরে বাবা, এত লোকের ভিড়ে নির্দিষ্ট কারও কথা কি মনে

রাখা যায়? তর্ক ছাড়ো তো! যেতে দাও আমাকে।'

সন্দেহ বাড়ল গার্ডের চোখে। 'আপনার ব্যাগের বর্ণনা দিন। কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'খামোকা খোঁজাখুজি করবে... তাতে সময় নষ্ট হবে। কোথায় রেখেছি, তা তো জানিই। এক দৌড়ে নিয়ে আসব।'

'তা হলে আপনার টিকেট দেখান,' গার্ড নাছোড়বান্দা।

পকেট হাতড়াবার ভান করল মুরল্যাণ্ড। 'এই রে! টিকেট বোধহয় ব্যাগের ভিতরেই ফেলে এসেছি।'

'দুঃখিত, টিকেট না-দেখে আপনাকে ছাড়তে পারব না আমি,' বলল গার্ড। 'নিয়ম-কানুন আজকাল খুব কড়া।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। একটাই উপায় এখন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠোর মধ্যে একশো ডলারের একটা নোট ভরল। তারপর মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে এনে হ্যাণ্ডশেক করল গার্ডের সঙ্গে। 'একটু দেখো না কী করা যায়!'

বলা বাহুল্য, নোটটা পাচার হয়ে গেছে গার্ডের হাতে। চোরা চোখে টাকার অঙ্ক দেখে নিল সে। একশো ডলার দেখে হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'আরে... আপনাদের সেবার জন্যই তো আছি আমরা। যান, যান... কোনও অসুবিধে নেই, আপনার ব্যাগ নিয়ে আসুন।'

মনে মনে ব্যাটাকে গাল দিতে দিতে পা বাড়াল মুরল্যাণ্ড। ঘুষখোর বাঁদর কোথাকার, সুযোগ পেয়েই একশো ডলার খসিয়ে নিল ওর পকেট থেকে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার হাসল ও। রানাকে বলবে দুই শ' ডলার দিতে হয়েছে।

দ্রুত ভেহিকল ডেকে পৌঁছুল মুরল্যাণ্ড। সব গাড়ি নেমে গেছে, রয়েছে শুধু রানারটা। লাল রঙের ডজ ভাইপার। কভারঅল-পরা ফেরির এক ক্রু দাঁড়িয়ে আছে ওটার পাশে।

হাতের ক্লিপপ্যাডে কী যেন টুকছে। তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল ও।

'এটা আপনার?' মুরল্যাণ্ডকে দেখে বলে উঠল লোকটা। 'এত দেরি কেন? আরেকটু হলেই আমি টো-ট্রাক ডাকতাম।'

'সরি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কী করব, অসময়ে প্রকৃতি মা-মণি ডেকে বসলেন।'

'যান, যান, তাড়াতাড়ি নামান গাড়ি।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল মুরল্যাণ্ড। গ্লাভ-বক্স খুলে বের করে নিল চাবি। ইঞ্জিন চালু করে মিনিটখানেকের মধ্যে নেমে এল ফেরি থেকে।

ডক থেকে বেরিয়ে রাস্তার দু'পাশে চোখ বোলাতে শুরু করল ও। দু-দুটো ইন্টারসেকশন পেরুনোর পর চোখে পড়ল সিলভারলেক ট্রান্সপোর্টের ট্রাকটা। দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। ড্রাইভারের জানালার পাশে গিয়ে ব্রেক কষল মুরল্যাণ্ড। পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

কাঁচ নেমে গেল ট্রাকের, মাথা বের করল রানা। 'তোমাকেও ফাঁসিয়েছে লোকটা!' ওকে দেখে অবাক হয়েছে রানাও। 'নিশ্চয়ই বলেছে আমার ভয়ানক বিপদ? যাই হোক, এসেছ সেজন্য ধন্যবাদ, ববি,' বলল ও। 'খুব ঝামেলা হয়নি তো?'

'না, না,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'ঝামেলা আর কী... দুই শ' ডলার ঘুষ দিতে হয়েছে আমার। ওটা দিয়ে দিলেই...' রানার পাশে নড়াচড়া লক্ষ করে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গে কে?'

রানার পাশ থেকে উঁকি দিল রেমি। 'হাই! আপনি নিশ্চয়ই মি. ববি মুরল্যাণ্ড? আমি রেমি হ্যাডলি।'

'নাইস টু মিট ইউ,' বলে অভিযোগের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'সঙ্গে ডেট নিয়ে আসছ... এ-কথা বলেনি তো লোকটা? তাও আবার ট্রাকে? আগে জানলে একটা এক্কাগাড়ি

ম্যানেজ করে দিতাম—ট্রাকের চেয়ে ওটা অনেক-অনেক বেশি রোমান্টিক।'

'এক্কাগাড়ি যে লাগবে, তা তো জানতাম না,' হাসিমুখে বলল রানা। 'ফেরিতে ওঠার পর রেমির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

মুখ বাঁকা করল মুরল্যাণ্ড। 'পিউজেট প্রণালীর মাঝখান থেকে বান্ধবী জোগাড় করা একমাত্র তোমাকে দিয়েই সম্ভব!'

'ফাজলামি এবার বন্ধ করো তো, ববি।' সিরিয়াস হলো রানা। 'জরুরি কাজ আছে। ট্রাক থেকে নামতে পারছি না আমি বা রেমি। নতুন নির্দেশ এসেছে, গাড়িটা নিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসতে হবে তোমাকে। ঠিক আছে?'

'কী হয়েছে বলো তো!'

'পরে।' ইশারায় বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল রানা—ট্রাকে লুকানো ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন আছে।

মুরল্যাণ্ডের কপালের ভাঁজ গভীর হলো। মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, আমি পিছনে থাকছি।'

গিয়ার দিয়ে ট্রাককে আগে বাড়াল রানা। বিশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। বৃষ্টির তোড় বেড়েছে, সংকুচিত হয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা।

ফোনে ভেসে আসা নির্দেশ অনুসারে পরের আধঘণ্টা গোটা ব্রেমারটন-এর এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াল ওরা। এরপর শহরের বাইরে ওদেরকে যেতে বলল গ্যারেট। হাইওয়ে ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর হাতের বাঁয়ে একটা কাঁচা রাস্তা পড়ল, রাস্তার মুখে ভাঙাচোরা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—*স্টিভেনসন স্টোনওয়ার্কস্।* ওখানে মোড় নিল রানা। কাঁচা রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগিয়ে একটা বিশাল গর্তের কিনারে গিয়ে থামল—বৃষ্টির পানি জমে গর্তটা পুকুরে পরিণত হয়েছে।

একটু দূরত্ব বজায় রেখে থামল মুরল্যাণ্ডও। রানা আর

রেমিকে ট্রাক থেকে নামতে দেখল। জ্যাকেটের হুড মাথার উপর তুলে দিয়ে সে-ও নেমে পড়ল ভাইপার থেকে। এগোল বন্ধুর দিকে।

রানা আবার ট্রাকের পিছনে উঠে গেছে। ক্যানভাসে মোড়ানো কী যেন একটা নিয়ে নেমে এল কয়েক মুহূর্ত পর। কাছে গিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে এসব, এবার জানতে পারি?'

'যেতে যেতে বলব। চলো।' ভাইপারের দিকে পা বাড়াল রানা। ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড।

ভাইপারের ট্রাঙ্ক খুলে ক্যানভাসে মোড়ানো জিনিসটা রাখল রানা। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'কী ওটা?'

ক্যানভাসের একটা কোনা সরাল রানা। চকচক করে উঠল ব্রোঞ্জের তৈরি জিয়োলেব। সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা চিনতে পারল ববি। গ্যারেটের কাছ থেকে পাবার পর ওটা রানা এক রাতের জন্য নিজের কাছে রেখেছিল, তখন দেখেছে ও।

'এটা সেই জিয়োলেবটা না?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আধ-পাগল এক লোক যেটার রহস্য জানার জন্য তোমার পিছনে লেগেছিল?'

'এখনও পিছু ছাড়েনি, ব্যাটা পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছে,' রানা বলল। 'চলো, গাড়িতে উঠে সব খুলে বলব।'

'ড্রাইভ কে করবে? তুমি, না আমি?' ভুরু নাচাল মুরল্যাণ্ড। ভাইপারে মাত্র দুটো সিট, রেমিকে ওদের একজনের কোলে বসতে হবে।

'তুমিই চালাও,' বলল রানা। 'এত অল্প পরিচয়ে কোনও ভদ্রমহিলা তোমার কোলে বসতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আবার গাঢ় হলো কখন?' বাঁকা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। জবাবের প্রতীক্ষা না করে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে।

'চলো,' রেমির দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত, আমার কোলে

বসতে হবে তোমাকে।'

'কিংবা তোমাকে বসতে হবে আমার কোলে,' বলল রেমি। 'তাতেও আমার আপত্তি নেই... বোমাটার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারলে বাঁচি।'

প্যাসেঞ্জার সিটে গাদাগাদি করে বসল দু'জনে। মুরল্যাণ্ড সন্দিহান গলায় বলল, 'মিস হ্যাডলি কি বোমার কথা বললেন?'

'মিস নয়... ডক্টর,' শুধরে দিল রানা। 'আর হ্যাঁ... ট্রাকটায় বোমা আছে। পুরো একটা কন্টেইনার ভর্তি বাইনারি এক্সপ্লোসিভ। ছোটখাট একটা পাহাড় ধসিয়ে দেয়া যাবে ওটা দিয়ে।'

'সর্বনাশ! আগে বলবে তো!'

গিয়ার দিয়ে ভাইপারের মুখ ঘোরাল মুরল্যাণ্ড। কাঁচা রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মেইন রোডের দিকে।

সেলফোন বেজে উঠল এ-সময়। গ্যারেটের নাম্বার। স্পিকার অন করল রানা। 'এবার কী?'

'ববি মুরল্যাণ্ড আছে তো তোমাদের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।'

'গুড। এখন থেকে আমাদের এই ছোট্ট খেলার ও-ও একজন প্লেয়ার।'

'কেন, আমাকে আর ড. হ্যাডলিকে দিয়ে চলছে না?'

'ব্যাপারটা স্রেফ হিসেবি চাল বলতে পারো। আমি না চাইলেও ববি মুরল্যাণ্ড ঠিকই নাক গলাবে খেলাটার মাঝে। আমার চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে যেভাবেই হোক সাহায্য করবার চেষ্টা করবে তোমাকে। এমন নাছোড়বান্দা এবং বিপজ্জনক লোককে ঠেকানোর চেষ্টা করার চাইতে ওকে এখুনি তোমাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া ভাল মনে হয়েছে। সেজন্যে ওকে টেনে এনেছি এর মধ্যে।

তা ছাড়া মুরল্যাণ্ডকে সঙ্গে পেলে তোমার সফল হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে অনেকখানি। টিম হিসেবে তোমাদের সাকসেস রেট ঈর্ষণীয়।'

'পাম দিয়ে তো ফুলিয়ে ফেললে হে!' টিটকারির সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। রানার দিকে তাকাল। 'কে এই তোষামোদকারী? রামছাগল টাইপের যে-লোকটা জিয়োলেব নিয়ে এসেছিল... সে? কী যেন নাম... প্যারট? তোতা পাখি?'

'টিটকিরি না মারলেই ভাল করবে, মি. মুরল্যাণ্ড,' স্পিকারে ভেসে এল রুক্ষ গলা। ঠাট্টা-মশকরায় খেপে গেছে। 'আমার নাম অ্যান্থনি গ্যারেট... এবং আমি খুবই সিরিয়াস লোক।'

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ তুমি, গ্যারেট,' বলল রানা। 'কী চাও জলদি বলে ফেলো। বোমার কাছ থেকে সরে এসেছি আমরা, অন্য কারও ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই। কাজেই তোমার কথা শুনব কি শুনব না, সেটা এখন সম্পূর্ণ আমাদের মর্জির উপর নির্ভর করছে।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না,' বলল গ্যারেট। 'ড. হ্যাডলি কি বলেনি, ওর বোন যে আমার কবজায়? কথা না শুনলে বোনটাকে আর জ্যান্ত দেখতে পাবে না।'

'সত্যি?' রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল রেমি। 'আমি তোমাকে বলার সময় পাইনি।'

'কিচ্ছু ভেবো না, ওকে উদ্ধার করব আমরা।' কথা দিল রানা।

'কাজের কথায় আসা যাক,' সুর বদলাল গ্যারেট। 'জিয়োলেবটা নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। যেভাবে বলেছিলে, সেভাবেই বোমা থেকে ডিসকানেক্ট করে নিয়েছি,' জানাল রানা। 'কিন্তু ট্রাকটা তো রয়ে গেল ওখানে।

কী হবে ওটার?'

'ট্রাক নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দাও। তোমাদেরকে আবার ওই ফেরিতে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন? আরেকটা বোমা রেখেছ নাকি ওখানে?'

'উঁহুঁ। একটাই ছিল।'

'তা হলে কেন আবার...'

রানার কথা শেষ হলো না, বজ্রপাতের মত শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওদের। পিছন থেকে ছুটে এল শকওয়েভ, তার ধাক্কায় দুলে উঠল ডজ ভাইপারের পুরো কাঠামো। আরেকটু হলেই ছিটকে রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা, দক্ষ হাতে সামলে নিল মুরল্যাণ্ড।

ধাক্কাটা একটু সয়ে এলে রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল রানা। পুকুরপাড়ে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া। বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে আসছে ট্রাকের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ। রিমোটের সাহায্যে বাইনারি এক্সপ্লোসিভ ফাটিয়ে দিয়েছে গ্যারেট। বুদ্ধিমান লোক... শহরের অনেক বাইরে, নির্জন এলাকায় ফাটিয়েছে বোমা... তা-ও আবার ঝড়-বাদলের মধ্যে। কেউ যদি শুনেও থাকে, বাজ পড়ার শব্দ বলে ভাববে।

রেমি অবশ্য সেটা বুঝতে পারেনি। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'হোয়াট দ্য হেল! এভাবে বোমা ফাটায় কেউ? আমাদের যদি কিছু হয়ে যেত?'

'রিল্যাক্স, ড. হ্যাডলি,' নির্বিকার গলায় বলল গ্যারেট। 'তোমাদেরকে খতম করতে চাইলে আরও আগেই ফাটাতাম বোমাটা।'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'বলছি। তার আগে বলো—এক্সপ্লোশনটা কি যথেষ্ট জোরালো ছিল? পুরো ফেরি কি ডুবিয়ে দেয়া যেত ওটার সাহায্যে?'

'তুমি কি সার্টিফিকেট চাইছ আমাদের?' বিরক্ত গলায় বলল রানা।

'প্রশ্নের জবাব দাও, প্লিজ।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট জোরালো ছিল ওটা। চাইলেই ফেরিটা ধ্বংস করে দিতে পারতে। খুশি?'

'তা হলে বুঝতেই পারছ, আমার হুমকিকে হালকাভাবে নেবার কোনও সুযোগ নেই। কয়েক শ' নিরীহ যাত্রীর জীবনের পরোয়া যদি না করে থাকি, তা হলে ভেবে দেখো, তোমাদের গুরু... অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের জীবনেরও পরোয়া করি না আমি।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন!' চমকে উঠল রানা। 'তার মানে?'

'ওফ্-ফো, তোমাদেরকে তো বলাই হয়নি...' হাসল গ্যারেট, 'নুমা চিফ এখন আমার হাতের মুঠোয়... বুঝলে, বন্দি।'

বারো

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা ও মুরল্যাণ্ড। দু'জনেরই চোখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। এ কী করে হয়? গতকালই অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের। তা হলে কখন তাঁকে আটক করল গ্যারেট? যদি করেও থাকে, এখন পর্যন্ত ওরা খবর পায়নি কেন?

ওদের মনের অবস্থা বোধহয় বুঝতে পারল গ্যারেট। আরও জোরে হেসে উঠল সে। 'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হলে খোঁজ নিয়ে দেখো!'

লাইন কেটে দিল সে।

'কার কথা বলছে ও?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

জবাব না দিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নাম্বারে দ্রুত ডায়াল করল রানা। একবার মাত্র রিং হলো, তারপরেই শোনা গেল গ্যারেটের অতি-পরিচিত কণ্ঠ।

'দুঃখিত, রানা। অ্যাডমিরাল এ-মুহূর্তে ফোন ধরতে পারছেন না। জরুরি কোনও মেসেজ থাকলে আমাকে দিতে পারো।' কথা শেষ করে হেসে উঠল নিজের রসিকতায়। 'আশা করি এবার বুঝতে পারছ, কেন মুরল্যাণ্ডকে তুমিও ঠেকাতে পারতে না? হ্যামিলটনের জন্যই ও নাক গলাত আমাদের কাজের মাঝে। এতই যখন দরদ, ওকে আর মাঠের বাইরে রাখি কী করে, বলো?'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অ্যাডমিরালের গায়ে যদি ফুলের টোকাও পড়ে, নিজের কবর খুঁড়ে রেখো, গ্যারেট। আমরা সেখানে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

'জানি, তুমি আপসেট হয়ে পড়েছ। কিন্তু অনুরোধ করব মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখতে। এখুনি অ্যাডমিরালের কোনও ক্ষতি করবার ইচ্ছে আমার নেই। মানে... যতক্ষণ তুমি আর তোমার বন্ধুরা আমার কথামত কাজ করছ, কোনও ক্ষতি হবে না তাঁর।'

'বাকোয়াষ বন্ধ করো। খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছ তুমি, গ্যারেট! কোনও আইডিয়া আছে কাকে কিডন্যাপ করে বসেছ? পুলিশ, এফবিআই, এনএসএ, সিআইএ... এমনকী পুরো আমেরিকান মিলিটারি তোমার পিছনে পাগলা কুকুরের মত লেগে যাবে।'

'সবই জানি আমি, বাপু। বোকা নই, ভালমত খোঁজখবর নিয়েই কাজে নেমেছি। হতে পারেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কেউকেটা লোক, প্রেসিডেন্টের খাস বন্ধু... কিন্তু এখন সেসব স্ট্যাটাস কোনও কাজে আসবে না তাঁর। আমার হাতের মুঠোয়

আটকা পড়েছেন তিনি, ভেবো না খুব সহজে তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবে। এ-সব কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আমার। কীভাবে মানুষ গায়েব করে রাখতে হয়, কীভাবে আইনের চোখে ধুলো দিতে হয়—তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। তারপরেও যদি কপালজোরে অ্যাডমিরালের খোঁজ পেয়ে যাও, শিয়োর থাকো, তাঁকে জ্যান্ত উদ্ধার করতে পারবে না। বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র তাঁকে খুন করব আমি! যারা অ্যাডমিরালের খোঁজে বের হবে, তাদেরকে কথাটা জানিয়ে দিতে পারো।'

নিষ্ফল আক্রোশে ড্যাশবোর্ডের উপর ঘুসি বসাল রানা। এতক্ষণে টের পেয়েছে, কতবড় ধুরন্ধর ও বিপজ্জনক এক লোকের পাল্লায় পড়েছে ওরা। সেই সঙ্গে হিসেবি এবং বেপরোয়াও বটে। এমন এক চাল দিয়েছে, যার ফলে এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন শুধু নুমার ডিরেক্টর, বা উর্ধ্বতন ব্যক্তি নন; রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছে তিনি পিতৃসম ব্যক্তিত্ব। যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা করে ওরা, তেমনি ভালবাসে। তাঁর জীবনের উপর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে পারবে না ওরা।

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

'দুঃখিত, এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়,' জানাল গ্যারেট। 'তাঁকে গোপন এবং সুরক্ষিত একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে পৌঁছুনোর পর নাহয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে বুঝতে পারো অ্যাডমিরাল সুস্থ আছেন।'

'তোমার মতলবটা কী, গ্যারেট? কেন এসব বিপজ্জনক খেলা খেলছ?'

'বলছি। তার আগে ফোনের স্পিকার অন করো। তোমাদের সবারই কথাগুলো শোনা দরকার।'

সেলফোনের বাটন চাপল রানা। 'অন করেছি।'

'বেশ, তা হলে শোনো... এতক্ষণ যা করেছ তোমরা, সেটা ছিল স্রেফ একটা পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাস করেছ, কাজেই এবার আসছে আসল কাজের পালা।'

'কী ধরনের কাজ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'সিম্পল। আমি চাই, তোমরা আমাকে মাইডাস টাচের সন্ধান এনে দেবে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মাইডাস টাচ? কীসের কোড ওটা?'

'কোড নয়, রানা। মেটাফোর নয়... নয় কোনও ব্র্যাণ্ড নেম। আমি সত্যিকার মাইডাস টাচের কথা বলছি, যার সাহায্যে যে-কোনও জিনিসকে সোনায় পরিণত করা যায়।'

একটা আঙুল কপালের পাশে তুলে শূন্যে মোচড় দেবার ভঙ্গি করল মুরল্যাণ্ড, বোঝাতে চাইছে—গ্যারেটের মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির। রানাও বিমূঢ়; এই ধরনের একটা অবাস্তব কথা বলবে লোকটা, আশা করেনি। ভেবেছিল অ্যাডমিরালের জন্য বড় অঙ্কের মুক্তিপণ চেয়ে বসবে, অথবা সরকারি কোনও গোপন তথ্য-টথ্য চুরি করে আনতে বলবে ওদেরকে।

কিন্তু মাইডাস টাচ! একে পাগলামি বললেও কম বলা হয়। সবাই জানে, ওটা কল্প-কাহিনি বৈ আর কিছু নয়। লোভের ফলে মানুষের কত বড় সর্বনাশ হতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে রচনা করা হয়েছিল চরিত্রটার। মাইডাস ছিলেন অত্যন্ত লোভী এক রাজা, স্বর্ণের প্রতি অতিশয় আসক্তি ছিল তাঁর। রাজার তরফ থেকে অবিরাম প্রার্থনা আর নৈবেদ্যর চাপে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা অদ্ভুত এক বর দেন তাঁকে—শুধু স্পর্শ দিয়েই যে-কোনও বস্তুকে সোনায় পরিণত করতে পারবেন তিনি! ওটাই মাইডাস টাচ নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে ওটা বর ছিল না, ছিল নির্মম এক অভিশাপ। মাইডাস টাচের কারণে

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় রাজার, তাঁর স্পর্শ পাওয়ামাত্র খাবারগুলো নিরেট সোনা হয়ে যেত। এক পর্যায়ে মনের ভুলে আদর করতে গিয়ে নিজের একমাত্র মেয়েকেও সোনার মূর্তি বানিয়ে ফেলেন তিনি। এরপর দুঃখ, ক্ষোভ আর অনুতাপে ভরে যায় রাজার হৃদয়। দেবতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে মাইডাস টাচের ক্ষমতা বিসর্জন দেন তিনি।

'আমার বোধহয় বোঝার ভুল হচ্ছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তুমি কি গ্রিক মিথোলজির সেই মাইডাস টাচের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, রানা। বুঝতে মোটেই ভুল হয়নি তোমার।' বলল গ্যারেট। 'মাইডাস টাচের সন্ধান চাই আমি... এবং তোমরা সেটা এনে দেবে। যদি না পারো, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি মারা যাবে। ইট ইজ দ্যাট সিম্পল।'

'কিছু মনে কোরো না,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড। 'শেষ কবে নিজের মাথা পরীক্ষা করিয়েছ তুমি, জানতে পারি?'

'আমি পাগল নই,' শীতল কণ্ঠে বলল গ্যারেট। 'জানি, কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে; কিন্তু গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি, মাইডাস টাচের অস্তিত্ব সত্যিই আছে।'

'বেশ,' বলল রানা। এরই মধ্যে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে—কীভাবে লোকটাকে না খেপিয়ে অ্যাডমিরালকে উদ্ধার করা যায়।

'নিজ চোখে দেখেছি আমি ওটা,' বলে চলল গ্যারেট, 'আর তা প্রমাণও করে দিতে পারি।'

'দেখেই যদি থাকো, তা হলে ওটার খোঁজও তুমি জানো। এত ঝামেলা করে আমাদেরকে রাজি করাবার দরকার পড়ছে কেন?'

'সাক্ষাতে সব বলব। সে-কারণেই ফেরিতে উঠতে বলছি। সিয়াটলে দেখা করব আমরা। ঠিক দুপুর আড়াইটায়, সাফেকো

ফিল্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। শুধু তোমরা তিনজন, আর কেউ না। পুলিশ-টুলিশের ছায়াও যদি দেখি, তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে শেষ করে দিয়ে সরে পড়ব আমি। আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে?'

ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে একটা বাজে। আড়াইটার মধ্যে সিয়াটলে ফেরা একটু কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। এখুনি গিয়ে ফেরি ধরতে হবে।

'ঠিক আছে, জায়গামত হাজির থাকব আমরা,' জানাল ও।

নীরব হয়ে গেল সেলফোন। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে থম মেরে গেল রানা। মুরল্যাণ্ড আর রেমিও চুপ। অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছু ঘটে গেছে, এতক্ষণ দম ফেলারই ফুরসত পাওয়া যায়নি, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতিটা।

উদ্দাম বেগে ব্রেমারটনের ডকের দিকে ছুটে চলেছে ভাইপার। নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় খানিক পর মুরল্যাণ্ড বলল, 'পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে জানা দরকার আমার। কেউ কি বলতে পারো, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ওই মেণ্টাল পেশেণ্টটা আমাদেরকে টার্গেট করল কেন?'

'জানি না,' বলল রেমি। 'দু'দিন আগে আমি সিয়াটলে এসেছি *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর সামনের পর্বের জন্য রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করতে। আজই আবার নিউ ইয়র্কে যাবার কথা ছিল...'

'তাই তো বলি, আপনাকে চেনা চেনা লাগে কেন!' ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি ওই অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা না? টিভিতে দেখেছি আপনাকে। রানার পিছনেও তো বোধহয় কিছুদিন ইণ্টারভিউয়ের জন্য ঘুরেছেন, তাই না?'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, ববি,' বলল রানা। 'বলো রেমি, তোমার সঙ্গে গ্যারেটের যোগাযোগ হলো কীভাবে?'

'সরি, ড. হ্যাডলি,' ববি সুর মেলাল। 'প্লিজ, কণ্টিনিউ।'

'শুধু রেমি বলে ডাকলে খুশি হব,' বলে একটু হাসল রেমি। 'এনিওয়ে, গ্যারেটের সঙ্গে আজ সকালের আগে কোনোদিন কথা হয়নি আমার। ওকে চিনিই না আমি, দেখিনি কোনোদিন। নামটাও তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম, রানা। র‍্যাচেলের নাম্বার থেকে আমাকে ফোন করেছিল ও, কিডন্যাপিঙের খবর দিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে ই-মেইলে পাঠিয়েছে একটা ভিডিও। তারপর বেলা পৌনে এগারোটার ফেরিতে উঠতে বলেছে। ফেরি ছাড়ার পর দ্বিতীয়বার ফোন পেয়েছি ওর—ভেহিকল ডেকে ওই ট্রাকটার কাছে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি তখন। বাকিটা তো তুমি জানো।'

'হুম, মনে হচ্ছে টিভি দেখেই তোমাকে টার্গেট করেছে গ্যারেট,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই ভেবেছে, মাইডাস টাচ খোঁজার কাজে গ্রিক সভ্যতার উপর একজন বিশেষজ্ঞ পেলে সুবিধে হবে ওর।'

'আর আমরা কীসের বিশেষজ্ঞ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'পাগল-ছাগলকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করবার?'

হেসে ফেলল রেমি। 'আমার ধারণা, খ্যাতির বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন আপনারা। আপনি আর রানা অতীতে বহু ট্রেজার সফলভাবে উদ্ধার করে এনেছেন। জানেন কি না জানি না, আর্কিয়োলজিকাল সার্কেলে কিন্তু বেশ নাম-ডাক হয়ে গেছে আপনাদের। বিশেষ করে রানা কোনও কাজে হাত দিলে সেটা ব্যর্থ হয় না, এমন একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে সবার মাঝে।'

'তাই বলে মাইডাস টাচ? ওই জিনিসের তো ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তিই নেই!'

'এই গ্যারেট লোকটাকে ভিত্তিহীন একটা মরীচিকার পিছনে ঘুরবার মত মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে সে—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মত একজন প্রভাবশালী মানুষকে কিডন্যাপ করে বিরাট বিপদ ডেকে

এনেছে নিজের মাথার উপর। এর বিনিময়ে নিশ্চয়ই বিশাল কিছু পাবে বলে বিশ্বাস আছে ওর।'

'সোনা বানাবার ক্ষমতা?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এসব আকাশকুসুম স্বপ্নেরও একটা লিমিট থাকা উচিত বলে মনে করি। আলকেমিস্টরা কয়েক শ' বছর সাধনা করেও সফল হয়নি ও-কাজ করতে। আর গ্যারেট চাইছে জাদুর স্পর্শে সোনা হয়ে যাক সব!'

'নিশ্চয়ই ওর হাতে বিশেষ কোনও তথ্য আছে। যদ্দূর বুঝতে পারছি, আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা ওই জিয়োলেব সেটার একটা অংশ। ডিভাইসটা কীভাবে অপারেট করতে হয়, সেটা শেখার জন্য আমার কাছে এসেছিল ও। হয়তো ভেবেছিল, অপারেশন জানলে নিজেই খুঁজে নিতে পারবে মাইডাস টাচ। কিন্তু সে-সময় জিয়োলেবের রহস্য ধরতে পারিনি আমি—এক রাতের বেশি সময় ছিল না আমার হাতে... তা ছাড়া পরেও ইচ্ছে হয়নি গ্যারেটকে সাহায্য করবার; ওর হাবভাব ভাল লাগেনি আমার। অন্যত্র চেষ্টা করেও সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে ও। তাই মরিয়া হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে—যেভাবেই হোক আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে চাইছে। গ্রিক ভাষা আর সভ্যতার ব্যাপারে আমার জ্ঞান না থাকার মতই। সম্ভবত সেজন্যেই রেমিকেও রিক্রুট করেছে। অনেকটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশনের টিম গঠন করবার মত একটা ব্যাপার আর কী—তবে প্যাঁচে ফেলে, মোচড় দিয়ে।'

'জিয়োলেবের ব্যাপারে একটা খটকা আছে আমার,' বলল রেমি। 'ওটা তো আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা জিনিস, তা হলে এত চকচক করছে কেন? দেখে তো একেবারে নতুন বলে মনে হলো।'

'ডিজাইনটা আর্কিমিডিসের, কিন্তু জিনিসটা সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে,' বলল রানা। 'আমাকে আর্কিমিডিসের একটা কোডেক্সের কয়েক পাতার ফটোকপি দেখিয়েছিল

গ্যারেট—ছবিসহ ওতে বিস্তারিত লেখা ছিল জিয়োলেব বানাবার নিয়ম। সেই ইন্সট্রাকশন ফলো করে ও নিজেই ডিভাইসটা বানিয়েছে বলে জানিয়েছিল।'

'নিজেই যদি বানিয়ে থাকে, তা হলে অপারেট করতে পারছে না কেন?'

'ওই যে, তখন রুবিকস্ কিউবের উদাহরণ দিলাম না? ম্যানুয়েল দেখে কিউবের সমস্ত পার্টস্ বানাতে পারবে তুমি, জোড়া দিয়ে গোটা কিউবটাও দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কিউবটা সমাধানের কৌশল শিখে ফেললে। যদি তা-ই হতো, তা হলে খেলনা কোম্পানিতে এমন কোনও শ্রমিক থাকত না, যে রুবিক'স্ কিউব মেলাতে না পারে।'

'হুম, বুঝলাম। কিন্তু আর্কিমিডিসের কোডেক্স গ্যারেট পেল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই চুরি করেছে কোথাও থেকে,' অনুমান করল রানা। 'কিনেও নিতে পারে। আমি শিয়োর না, ওকে জিজ্ঞেসও করিনি। মন খুঁতখুঁত করায় আমার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে দিয়ে ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করিয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও কোনও খারাপ রিপোর্ট পাইনি। অন্তত পুলিশ, এফবিআই বা ইন্টারপোলে ওর নামে কোনও ফাইল নেই।'

'তা কী করে হয়?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এমন ডেঞ্জারাস একটা লোক... অথচ ওর ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না! এই লাইনে ওকে তো অ্যামেচার বলে মনে হলো না।'

'এ-কারণেই সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'অত্যন্ত ধুরন্ধর এক লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা। প্রফেশনাল ক্রিমিনাল, অথচ আইনের চোখে অস্তিত্ব নেই ওর। তারমানে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও ভুল করেনি।'

'কিন্তু এবার তো ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে,' বলল

মুরল্যাণ্ড। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কিডন্যাপ করেছে, এরপর তো আর আইনের চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।'

'ববি, ও যদি সত্যিই মাইডাস টাচ পায়, তা হলে এসবের কোনও গুরুত্ব থাকবে বলে মনে করো? পুরো দুনিয়াকে কিনতে-বেচতে পারবে গ্যারেট, কেউ ওর নখের ডগাও স্পর্শ করতে পারবে না। ঝুঁকি নেবার জন্য মোটিভেশনটা মন্দ নয়, কী বলো?'

'এ স্রেফ পাগলামি!' বলে উঠল রেমি। 'মাইডাস টাচের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কীভাবে ওটা খুঁজে বের করব আমরা? র‍্যাচেল বা তোমাদের ওই অ্যাডমিরালকে বাঁচাবার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি।' গলা ধরে এল ওর।

ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেল না রানা বা মুরল্যাণ্ড।

তেরো

গতি কমে গেছে ভ্যানের; তবে চোখ বাঁধা থাকায় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বুঝতে পারলেন না, গাড়িটা মোড় ঘুরছে, নাকি গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

ঘণ্টাখানেক ধরে ছুটছে ভ্যান। উদ্দাম বেগে। সাধারণত হাইওয়েতে এ-রকম স্পিডে গাড়ি চালায় লোকে। কতদূর এসেছেন, মনে মনে হিসেব করলেন। ডিসি, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া বা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া... যে-কোনও

জায়গাই হতে পারে; নির্ভর করছে কোন্‌দিকে ছুটছে গাড়ি, তার উপর। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চেতনা ফেরার পর টের পেয়েছেন, চলন্ত এই প্যানেল-ভ্যানের মেঝেতে পড়ে আছেন। মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে কাপড়; দুই হাতের কবজি হাতকড়া দিয়ে আটকানো। আর দুই গোড়ালি বেঁধে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের স্ট্রিপ দিয়ে। তল্লাশি চালিয়ে এর আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে তাঁর পকেটের সমস্ত জিনিস। মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে তাঁর ফোনটা বাইরের কারও হাতে তুলে দিয়েছে অপহরণকারীরা। ওদের কথাবার্তা শুনে সেটা টের পেয়েছেন অ্যাডমিরাল।

ভ্যান চালাচ্ছে ভুয়া হোটেল-স্টাফ। আর্মি ছদ্মবেশধারী যুবকটি বসেছে ভ্যানের পিছনে। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিরালের চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছে সে। তবে তার আগেই পাশে একটি মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখেছেন তিনি। বয়স বেশি না, বিশ-বাইশ হতে পারে। হাত-পা বাঁধা হয়নি মেয়েটির। এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে। মেয়েটি বেশ সুন্দরী; ছিপছিপে, অ্যাথলিটের মত দেহ। ওকে আগে কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না হ্যামিলটনের। ভেবে পাচ্ছেন না, তাঁকে এবং এই অচেনা মেয়েটিকে একই সঙ্গে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে।

মুখের গোঁজটার জন্য বেশ অসুবিধে হচ্ছিল অ্যাডমিরালের, খানিক আগে দয়াপরবশ হয়ে ওটা সরিয়ে নিয়েছে ভুয়া ক্যাপ্টেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আলাপ জুড়বার চেষ্টা করেছেন তিনি, ভেবেছিলেন কথা বলাতে পারলে কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সে-আশার গুড়ে বালি। মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে যুবক। অ্যাডমিরালকে বক বক করতে দেখে ধমক দিয়েছে—চুপচাপ শুয়ে না থাকলে আবার ইলেকট্রিক শক দিয়ে বেহুঁশ করে

ফেলবে।

ভয় পাচ্ছেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তবে নিজের উপর ক্ষুব্ধ হচ্ছেন বেশ। বিপদ-আপদ তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়, সামরিক বাহিনীতে চাকরির সুবাদে বহুবার বহু জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন; আজকের ঘটনা সে-তুলনায় কিছুই না। ভুলটা তাঁরই—জেনারেল হোগানের নাম শুনেই অমন অস্থির হওয়া ঠিক হয়নি। জয়েন্ট ফোর্সেস হেড-কোয়ার্টারে যাবার জন্য ফোন যেহেতু পাননি, নিজেরই ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নেয়া উচিত ছিল। তা হলে তাঁকে বাগে পেত না এই লোকগুলো। বরং নিজেরাই ফাঁদে পড়ে যেত।

এখন আর কপাল চাপড়ে লাভ নেই। কী করা যায়, সেটাই ভাবতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। কোর্স অভ অ্যাকশন নির্ভর করছে কেন তাঁদের দুজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সেটার উপর। সাধারণ মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না, তার জন্য নুমার ডিরেক্টরের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ এবং ধনী টার্গেট রয়েছে। তা হলে? গোপন কোনও তথ্য জানতে চায় প্রতিপক্ষ? মেয়েটির বয়স কম, তবে পেন্টাগন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে এরচেয়েও কমবয়েসী স্টাফ আছে। ওভাবে চিন্তা করলে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হয়তো টর্চার করে অ্যাডমিরাল এবং মেয়েটির কাছ থেকে কিছু জেনে নেবার পাঁয়তারা কষছে এরা। সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। লোকদুটো অ্যামেচার নয়, নিখুঁত পদ্ধতিতে একটা মিলিটারি সেমিনারের মাঝ থেকে তুলে এনেছে তাঁকে। এ-কাজ যাকে-তাকে দিয়ে সম্ভব নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে চেহারা দেখিয়েছে কাজটা সারার আগে... ধরে নিতে হয় ওরা বেপরোয়া, কিংবা নিজেদেরকে রক্ষা করবার মত যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে ওদের। দ্বিতীয়টাই সত্যি বলে মনে হলো অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে।

ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল ভ্যান। গ্যারাজ ডোর খুলে যাওয়ার ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ পেলেন হ্যামিলটন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডোর... রেসিডেনশিয়াল হলে এত জোরে আওয়াজ করত না।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে ধীরগতিতে সামনে বাড়ল গাড়িটা, সামান্য এগিয়ে থামল আবার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। গ্যারাজ ডোর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে অ্যাডমিরালের চোখের বাঁধন খুলে দিল ভুয়া ক্যাপ্টেন। ছুরি বের করে গোড়ালিতে আটকানো প্লাস্টিকের স্ট্রিপও কাটল। হাতকড়া দুটো রইল যেমন ছিল।

মুখের কাছে তাক করে রাখা টেযার গান দেখতে পেলেন হ্যামিলটন। ডুয়াল-অপারেশন মডেল। সরাসরি গায়ে লাগিয়ে শক দেয়া যায়, আবার সিঙ্গল-ইউজ কার্ট্রিজ ছুঁড়ে ত্রিশ ফুট দূরের শিকারকেও ঘায়েল করা যায় অনায়াসে। এই মুহূর্তে ডাইরেক্ট কণ্ট্যাক্ট মোডে রাখা হয়েছে ওটাকে। পিস্তল-বন্দুকের বদলে টেযারের উপস্থিতি একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছে—এখুনি অ্যাডমিরালকে খুন করতে চায় না এরা।

ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে গেল। টেযার নেড়ে হ্যামিলটনকে নামতে ইশারা করল ভুয়া ক্যাপ্টেন। হাতের বাঁধন খোলা হয়নি, আছড়ে-পিছড়ে নামতে হলো তাঁকে। কংক্রিটের মেঝেতে পা রাখতেই প্রতিধ্বনি উঠল চারপাশে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে চোখ বোলালেন অ্যাডমিরাল।

বিশাল এক ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে ভ্যান—একসঙ্গে বিশটা ট্র্যাক্টর-ট্রেইলারের জায়গা হয়ে যাবে, এমনই ওটার আকার-আয়তন। দেয়ালে কোনও জানালা নেই, ভিতরটা আলোকিত করছে মাথার উপর জ্বলতে থাকা ফ্লুরেসেন্ট বাতির সারি। গুদামঘরটা পরিত্যক্ত নয়; মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেয়ালে নতুন রঙের আস্তর। সম্ভবত ওয়্যারহাউস ডিস্ট্রিক্টের কোনও বিল্ডিং এটা। আশাবাদী হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল,

কোনোমতে এখান থেকে বেরুতে পারলে সাহায্য খুঁজে নেয়া যাবে সহজে। নির্জন কোনও এলাকা হলে সেটা সম্ভব হতো না।

এই মুহূর্তে ওয়্যারহাউসের ভিতরটা সম্পূর্ণ খালি—খোলা ময়দানের মত দেখাচ্ছে জায়গাটা। গুদামজাত মালামাল নেই... এমনকী মালামাল সাজিয়ে রাখার একটা র‍্যাকও দেখা যাচ্ছে না। আছে স্রেফ ক'টা ফার্নিচার—ভ্যান যেখানে থেমেছে, তার একটু দূরে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে স্টিলের চারটে কট, তিনটা টেবিল, চারটা চেয়ার, এবং উপচে পড়া একটা ট্র্যাশ ক্যান। কটগুলোর চারপাশে পড়ে আছে খালি পিৎজা-বক্স, চাইনিজ খাবারের প্যাকেট; সেইসঙ্গে বিয়ার আর পানির বোতল। টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছে চোদ্দ-ইঞ্চি স্ক্রিনের একটা কালার টিভি, দুটো ল্যাপটপ আর একটা ওয়্যারলেস রাউটার। অস্থায়ী আবাসের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

ছোটখাট কাজকর্মও বোধহয় সারা হয় এখানে, কারণ থাকার জায়গার কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট—ড্রিল মেশিন, সোল্ডারিং আয়রন, আর্ক ওয়েল্ডার, হাতুড়ি, ইত্যাদি। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ধাতুর গুঁড়ো আর বাতিল লোহার টুকরো। সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা বারোটা স্টিলের ব্যারেল দেখতে পেলেন হ্যামিলটন কটগুলোর পিছনে। ওগুলোর সঙ্গে রাখা হয়েছে কয়েকটা কাঠের ক্রেট, তবে ক্রেটের গায়ের লেখাগুলো কালো রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে... ফলে বোঝা যাচ্ছে না ওগুলো কীসের আধার।

ওয়্যারহাউসের দক্ষিণ প্রান্তে, সিণ্ডার-ব্লকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চারটে কামরা। দুটোর দরজা ওয়্যারহাউসের সামনের দিকে, আর অন্যদুটো পিছন দিকে মুখ করা। প্রতিটা দরজার চোখ বরাবর উচ্চতায় রয়েছে ছ'ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি সাইজের একটা করে ফোকর। ফোকরগুলো লোহার জাল দিয়ে

ঢাকা। উপরে কাঁচের আবরণও ছিল, তবে এখন তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার বদলে কবজা-সহ লোহার ঢাকনা লাগানো হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে ফোকরটা বন্ধ করা বা খুলে রাখা যায়—জেলখানার দরজার মত। কামরাগুলো মূলত ওয়্যারহাউসের সুরক্ষিত অংশ—দামি জিনিসপত্র আলাদাভাবে রাখার জন্য বানানো হয়েছিল। তবে আপাতত ওখানে দুই বন্দিকে রাখবার প্ল্যান করেছে কিডন্যাপাররা।

ঘাড় ফিরিয়ে টেযারধারী যুবকের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'এবার কী, *ক্যাপ্টেন?*'

'আমি ক্যাপ্টেন নই,' চাঁছাছোলা গলায় বলল যুবক। 'আমাকে বেনসন বলে ডাকতে পারেন। আসুন, কামরা দেখানোর আগে ছোট্ট একটা কাজ সেরে নেয়া যাক।'

দেয়ালের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে গেল সে। নির্দেশ দিল, 'বসুন।'

'কেন?'

'কথা বাড়াবেন না। যা বলব, চুপচাপ তা-ই করতে হবে। নইলে আবার শক দেওয়া হবে। মনে হয় না সেটা খুব উপভোগ্য হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'ইন্টারোগেট করবে? যদি ভেবে থাকো আমার মুখ থেকে...'

'ইন্টারোগেশন?' হেসে উঠল বেনসন। 'না, অ্যাডমিরাল, ভুল ভাবছেন আপনি। এখানে আপনাকে আনা হয়েছে স্রেফ লিভারেজ হিসেবে।'

'কীসের লিভারেজ?'

'আপনার প্রিয় মাসুদ রানা যেন আমাদের ছোট্ট একটা কাজ করে দেয়,' বলল বেনসন। 'শান্ত হয়ে বসুন, ভিডিও করা হবে আপনার। বেঁচে আছেন, সংবাদটা রানার কাছে পাঠাবার জন্য।'

এই-ই তা হলে ব্যাপার? রানাকে বাগে পেতে চাইছে এরা? নিশ্চয়ই কঠিন, বিপজ্জনক কোনও কাজের জন্য? কৌশলটা মন্দ নয়, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যাডমিরাল। তাঁকে বাঁচাবার জন্য রানা প্রয়োজনে প্রাণের ঝুঁকি নেবে। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিলেন তিনি: ভীমরতি ধরেছে বুড়ো-হাবড়ার! তাঁর অসতর্কতার জন্যই এখন বিপদের মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে ছেলেটাকে!

ভ্যান থেকে একটা ডাফল ব্যাগ নিয়ে এসেছে বেনসন। টেবিলের উপর রেখে ওটার ভিতর থেকে বের করে আনল স্কি-মাস্ক, দৈনিক পত্রিকা আর একটা ভিডিও ক্যামেরা। আর্মি ইউনিফর্মের টিউনিক খুলে পরল একটা কালো সোয়েটার। এরপর স্কি-মাস্ক দিয়ে ঢেকে ফেলল মুখ। প্রস্তুতি শেষ হলে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল সঙ্গীকে, 'কাটনার, তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ,' বলে ভ্যানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। সে-ও বেনসনের মত কালো পোশাক আর স্কি-মাস্ক পরে নিয়েছে।

'শুরু করা যাক,' বলল বেনসন।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কাটনার, এক হাতে দৈনিক পত্রিকাটা ধরল তাঁর বুকের উপর; ওটার তারিখ দেখে নিশ্চিত হতে পারবে রানা—ভিডিওটা আজই করা হয়েছে। অন্য হাতে তৈরি রেখেছে টেযার।

'অযাচিত কোনও মুভমেন্ট দেখতে চাই না আপনার মধ্যে,' বেনসন বলল। 'কোনও রকম আকার বা ইঙ্গিত... কিচ্ছু না। কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি, আপনি ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যাবেন। বাড়তি একটা কথাও যেন বের না হয় মুখ দিয়ে। ক্লিয়ার?'

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না হ্যামিলটন। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বেনসন বলল, 'শুরু করলাম তা হলে।'

ভিডিও ক্যামেরার রেকর্ড বাটন চাপল সে। প্রথমে লেন্স জুম করল অ্যাডমিরালের বুকের উপর রাখা পেপারের উপর, তারিখটা যেন স্পষ্ট দেখা যায়। এরপর জুম আউট করে অ্যাডমিরালের পুরো অবয়ব ধরল স্ক্রিনে।

'আপনার নাম বলুন।'

'কাকে জিজ্ঞেস করছ?' বাঁকা সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমাকে, নাকি কাটনারকে?'

দাঁত কিড়মিড় করল বেনসন। 'আপনি দেখছি মহা ত্যাঁদোড় লোক! কাটনার, ওঁকে একটু ঝাঁকি দেবার ব্যবস্থা করো।'

অ্যাডমিরালের কাঁধের উন্মুক্ত চামড়ায় টেযার চেপে ধরল কাটনার। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তাঁর দেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর ধ্বনি। তবে এবার ভোল্টেজ কমিয়ে রাখা হয়েছে... জ্ঞান হারালেন না হ্যামিলটন, শুধু প্রচণ্ড ব্যথায় নেতিয়ে পড়লেন।

'ওতেই হবে,' সন্তুষ্ট গলায় বলল বেনসন। 'ঘাড়ত্যাড়ামির সাহস পাবে না আর। একটু সুস্থ হয়ে নিক, তারপর আবার শুরু করা যাবে।'

'ভিডিওতে আমার নাম উচ্চারণ করে ফেলল তো ব্যাটা!' শঙ্কিত গলায় বলল কাটনার।

'ভয়ের কিছু নেই। নতুন করে পুরোটা আবার রেকর্ড করব।'

একটু পরেই গুঙিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। কাটনার বলল, 'এই তো, উঠেছে। লেটস্ কন্টিনিউ।'

'টেক টু, অ্যাডমিরাল,' বলল বেনসন। 'এবার আর কোনও ভুল যেন না হয়।' পত্রিকার ভিডিও করে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল সে। 'আপনার নাম?'

'জর্জ হ্যামিলটন,' দাঁতে দাঁত পিষে বললেন অ্যাডমিরাল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! পেশা?'

'চাকরি।'

'কী চাকরি... কী পদ?'

'ডিরেক্টর, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি।'

'গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কোনও?'

'হ্যাঁ। বুকের বামপাশে একটা কালো তিল।'

কাটনারকে ইশারা করল বেনসন। অ্যাডমিরালের শার্টের বোতাম খুলে তিলটা ক্যামেরার সামনে উন্মুক্ত করল সে।

'গুড,' খুশি খুশি গলায় বলল বেনসন। 'আপনি সুস্থ তো, স্যর?'

'এ-অবস্থায় যতটা থাকা যায়।'

'ব্যস, এতেই চলবে।' ক্যামেরা অফ করে দিল বেনসন।

টান দিয়ে অ্যাডমিরালকে দাঁড় করালো কাটনার। টেযার তাক করে বন্দিশালার দিকে এগোতে বাধ্য করল। একটা কামরার দরজা খুলে ধরল বেনসন, ওখানে ধাক্কা দিয়ে ঢোকানো হলো তাঁকে। হুমড়ি খেয়ে মেঝের উপর পড়লেন হ্যামিলটন, ককিয়ে উঠলেন ব্যথা পেয়ে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বাইরে থেকে হ্যাস্পবোল্ট লাগানোর আওয়াজ হলো।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসলেন অ্যাডমিরাল। হাতকড়া না খুলেই প্রকোষ্ঠের মত কামরাটায় ঢোকানো হয়েছে তাঁকে। এখানকার ছাত আর দেয়াল্ সিণ্ডার-ব্লকে তৈরি। দরজাটা লোহার। এপাশে ঝালাই করা একটা হাতল আছে, তবে চাবির ফুটো নেই। দরজার পাল্লাতে বিল্ট-ইন কোনও তালাও নেই বোধহয়। বাইরে থেকে হ্যাস্পবোল্ট লাগিয়ে তালা ঝোলাতে হয়। ফার্নিচার বলতে স্রেফ একটা চারপায়া। বাথরুম সারার জন্য ঘরের কোনায় রাখা আছে জং ধরা একটা বালতি। মাথার উপর জ্বলছে নিঃসঙ্গ একটা বালব। নিম্নমানের জেলখানার সঙ্গে তেমন কোনও তফাৎ নেই জায়গাটার।

'থাকার জায়গা পছন্দ হয়েছে?' দরজার ফোকরে উদয় হলো

বেনসনের মুখ। 'না হলেও কিছু করার নেই। আগামী কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে আপনাকে।'

'কতদিন?' জানতে চাইলেন হ্যামিলটন।

'সেটা নির্ভর করছে আপনার প্রিয়পাত্রটির উপর।'

'ততদিন কি হাতকড়া পরেই থাকতে হবে আমাকে?'

ফোকর দিয়ে ছোট্ট একটা চাবি ছুঁড়ে দিল বেনসন। 'হ্যাণ্ডকাফ খুলে ফেলুন। তারপর চাবি আর হ্যাণ্ডকাফ, দুটোই ফেরত দিন আমাকে।'

নির্দেশ পালন করলেন অ্যাডমিরাল।

'এখানকার নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিই আপনাকে,' বলল বেনসন। 'যদি ঝামেলা না বাধান, তা হলে আরামে থাকবেন। তেড়িবেড়ি করতে গেলেই কঠিন শাস্তি পেতে হবে। যখন আমরা খাব, তখন আপনিও খাবার পাবেন। অসময়ে কোনও আবদার জুড়তে পারবেন না। বাথরুম নিজের কামরাতেই সারবেন, বালতি ভরে গেলে জানাবেন আমাদের; ওটা খালি করবার ব্যবস্থা করা যাবে। গোসল-টোসলের কথা কয়েকদিনের জন্য ভুলে থাকতে হবে। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—পালাবার কোনও চেষ্টা করবেন না। বেঘোরে মারা পড়বেন সেক্ষেত্রে। চেঁচামেচি করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও লাভ নেই। ভিতর থেকে ওয়্যারহাউসের আওয়াজ বাইরে যায় না। গেলেও লাভ হতো না। এটারই মত আশপাশের বিল্ডিংগুলোও খালি। কোনও প্রশ্ন আছে? নেই? গুড।'

বন্ধ হয়ে গেল ফোকরের ঢাকনা। কাটনারের গলা শুনতে পেলেন অ্যাডমিরাল, 'চলো, ছুকরিটার ঘুম ভাঙানো যাক। এবার ওর পালা।'

ক্লান্ত পায়ে চারপায়ার কাছে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু মাথার ভিতরে ঝড়ের বেগে কাজ করছে

মগজ। কিডন্যাপারদের হুমকি আমলে নেননি, ভাবছেন কীভাবে পালাবেন এখান থেকে। সন্দেহ নেই, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হবে পুলিশ এবং এফবিআই-এর তরফ থেকে; কিন্তু ওদের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নন তিনি। যত বেশি সময় তিনি আটকে থাকবেন এখানে, ততই কোণঠাসা হয়ে পড়বে রানা। বাধ্য হবে কঠিন কোনও ঝুঁকি নিতে। তা তিনি হতে দেবেন না কিছুতেই।

তবে হাজার চিন্তার ভিতর একটা চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে। তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা ওই মেয়েটি কে? পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ও কীভাবে জড়িত?

চোদ্দ

ব্রেমারটন ডকের এন্ট্রান্সের বাইরে, বোর্ডিঙের অপেক্ষায় গাড়িতে বসে আছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। আসার পথে নুমার নির্মাণাধীন বিল্ডিঙের সাইট থেকে বাহন বদলে নিয়েছে ওরা—রানার ভাইপার রেখে চড়ে বসেছে মুরল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত টয়োটা সেডানে... যাতে আসন-সঙ্কটে ভুগতে না হয়। ওখান থেকে একটানে চলে এসেছে ডকে, অন্যান্য গাড়ির পিছনে লাইন ধরেছে ফেরিতে ওঠার জন্য।

ড্রাইভারের আসনে বসে আছে মুরল্যাণ্ড। তার পাশে বসে নিচু গলায় সেলফোনে কথা বলছিল রানা। ওর আলাপ শেষ হলে পিছনের সিট থেকে রেমি জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে কথা

বললে?'

'ঢাকায়... আমার বসের সঙ্গে,' সংক্ষেপে জানাল রানা। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান?'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা।

'কাম অন, রানা,' একটু হাসল রেমি। 'তোমার ব্যাপারে ডিটেইলড্ রিসার্চ করেছি আমি। তুমি যে বিসিআই-এর সঙ্গে জড়িত, সেটাও এমন কোনও গোপন খবর নয়। রাহাত খান কী বললেন, তা-ই বলো। নুমার কাউকে ফোন না করে তুমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেন?'

শ্রাগ করল রানা। 'বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য। তা ছাড়া অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খবরটা সবার আগে তাঁকেই জানানো দরকার বলে মনে করেছি।'

'কোনও লাভ হয়েছে তাতে?'

'হ্যাঁ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছেন বস—অ্যাডমিরাল সত্যিই গ্যারেটের হাতে বন্দি হয়েছেন কি না, তার কোনও অকাট্য প্রমাণ পাইনি আমরা।'

'পাইনি?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'তা হলে অ্যাডমিরালের সেলফোন গ্যারেটের হাতে গেল কী করে?'

'ওটা স্রেফ একটা ফোন কল, ববি,' বলল রানা। 'সিগনালটা ইন্টারসেপ্ট করেও ধোঁকা দেয়া যায়। মনে হবে ফোনটা গ্যারেটের হাতে... আসলে তা নয়।'

'তুমি সত্যি তা-ই মনে করো? গ্যারেট মিথ্যে ভয় দেখিয়ে কাজে নামাতে চাইছে আমাদেরকে?'

'উঁহুঁ। ওটা স্রেফ একটা সম্ভাবনা। অ্যাডমিরাল যে আটকা পড়েছেন ওর হাতে, তাতে আমার যদিও কোনও সন্দেহ নেই। তারপরেও নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল না?'

'তা হলে নুমা হেডকোয়ার্টারে ফোন করছ না কেন? জিজ্ঞেস করো অ্যাডমিরালের লোকেশন ওরা জানে কি না।'

'এখুনি ফোন করলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। হুলস্থুল পড়ে যাবে গোটা দেশে। কিছুতেই একাকী গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করতে পারব না আমরা। ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলো আঠার মত লেগে যাবে আমাদের পিছনে—যাতে মিটিঙের জন্য হাজির হলেই অ্যারেস্ট করতে পারে গ্যারেটকে। অমন কিছু করতে গেলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কী করবে ও, তা তো জানোই।'

'তা হলে আমাদের ট্যাকটিক্স কী হবে?'

'আগে গ্যারেটের সঙ্গে মিটিং, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। দরকার হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে চাউর করে দেব অ্যাডমিরালের নিখোঁজ-সংবাদ। অথবা গোপনে উদ্ধার অভিযান চালাবার জন্য রাজি করাব এফবিআই-কে। ইউ সি, যতক্ষণ গ্যারেটের সঙ্গে কথা না হচ্ছে, ততক্ষণ ইন ফ্যাক্ট কিছুই করার নেই আমাদের।'

'আর ও যদি বলে, এখুনি মাইডাস টাচের খোঁজে বের হতে হবে আমাদেরকে? যদি কোনও সময় না দেয় র‍্যাচেল বা অ্যাডমিরালকে উদ্ধার করবার?'

'যদি-টদি না, আমার তো মনে হয় তা-ই ঘটতে চলেছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'একটা ব্যাপার মেনে নেয়া ভাল—গ্যারেটের হাত থেকে ওঁদেরকে চট করে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। প্রচুর সময় এবং শ্রম দিতে হবে তার জন্য, ভাগ্যেরও সহায়তা দরকার। এক্ষুণি যদি আমাদেরকে কাজে না-ও নামায় গ্যারেট, অত বেশি সময় দেবে বলে মনে হয় না। এ-অবস্থায় একটাই কাজ করা যেতে পারে—ওর কথামত এক্সপিডিশনে যাব আমরা... তার ফলে নিরাপদ থাকবেন অ্যাডমিরাল... র‍্যাচেলও: পুলিশ আর এফবিআই-ও সময় পাবে গোপনে তদন্ত করবার... ওঁদেরকে উদ্ধার করবার!'

'তোমার বস কি এই পরামর্শই দিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'হ্যাঁ। অ্যাডমিরালের ব্যাপারে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবে না আমেরিকান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা সফল করবার জন্য সময় চাই ওদের। গ্যারেটের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেই সময়টুকুই আদায় করে নেব আমরা।'

'আমার ভয় করছে, রানা।'

'সাহস রাখো। এত সহজে গ্যারেটকে জিততে দেব না আমরা। যেভাবেই হোক, উদ্ধার করব র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।'

রানার সেলফোন গুঞ্জন করে উঠল। একটা মেসেজ এসেছে, সঙ্গে দুটো ভিডিও অ্যাটাচমেন্ট। সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটল এর ফলে। বন্দি অবস্থায় র‍্যাচেল হ্যাডলি আর নুমা চিফকে দেখল ওরা। ভিডিও শেষ হলে গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখন কী?' খানিক পরে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'ফেরিতে ওঠো,' সামনের দিকে ইশারা করল রানা। বোর্ডিঙের সঙ্কেত দিচ্ছে ডক ওয়ার্কাররা। 'তারপর নাহয় কথা বলব মি. রেডক্লিফের সঙ্গে।'

'গ্যারেটের সঙ্গে মিটিঙের আগেই?' ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিল মুরল্যাণ্ড।

'মি. রেডক্লিফকে ব্যাপারটার আভাস দিয়ে রাখা দরকার। বলে দেব যাতে খবরটা কয়েক ঘণ্টা চেপে রাখেন।'

র‍্যাম্প ধরে দু'মিনিটের মাথায় ভেহিকল ডেকে উঠে এল টয়োটা। তার পাঁচ মিনিট পর ডকের পাশ থেকে সরে এল ফেরি। রওনা হয়ে গেল সিয়াটলের উদ্দেশে।

গাড়ি পার্ক করে আপার ডেকে উঠে গেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। রেমি গেল বাথরুমে। বৃষ্টিতে ভিজে মেকাপের যাচ্ছেতাই অবস্থা.

চেহারা একটু ভদ্রস্থ করে নেয়া দরকার।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল ও। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে—দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে মুখ। রানা আর মুরল্যাণ্ড যতই সাহস জোগাক, নির্ভয় হতে পারছে না ও। মাইডাস টাচ তো নয়, আসলে আলেয়ার পিছে ছুটতে বলা হয়েছে ওদেরকে। যে কাজে কিছুতেই সফল হওয়া সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে র‍্যাচেলের আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।

ভাবনাটা চাবুকের মত আঘাত করল ওকে। নিজের অজান্তে ঝটকা দিয়ে সিধে হলো। কী ভাবছে এসব? বিনা লড়াইয়ে হার মানার পাত্রী তো ছিল না ও কোনোদিন! তা হলে এখন হাল ছাড়ছে কেন? সবচেয়ে বড় কথা, রানার মত যোগ্য একজন সহযোদ্ধা আছে ওর পাশে—তার পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

মুখ-হাত ধুয়ে চুল আঁচড়াল রেমি। মুখে নতুন করে লাগাল প্রসাধন। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে খুঁজে বের করল। জিজ্ঞেস করল, 'কোনও খবর আছে?'

'নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর... মি. জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলেছি,' জানাল রানা। 'ওয়াশিংটনের শেরাটন প্রিমিয়ারে ঘণ্টাদুই আগে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে লাঞ্চ করেছেন উনি।'

'সে কী! তা হলে তাঁকে কিডন্যাপ করা হলো কখন?'

'সম্ভবত লাঞ্চের পর পরই। রেডক্লিফ বললেন, খাওয়া শেষ হবার পর একজন আর্মি অফিসার এসেছিল অ্যাডমিরালের কাছে। জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে নিয়ে গেছে তাঁকে। কিন্তু ওখানে পৌঁছায়নি ওরা। আর্মি অফিসারকে ঠিকমত দেখেননি রেডক্লিফ। হোটেলের স্টাফদের কাছ থেকে খোঁজ নেবেন বলে জানিয়েছেন। এখনও উনি ওখানেই আছেন।'

'ব্যাটাদের ডেয়ারিং বললেও কম বলা হয়,' সখেদে বলল

মুরল্যাণ্ড। 'মিলিটারি সেমিনার চলছে শেরাটনে, সবখানে সামরিক লোক... তার মাঝ থেকে একজন অ্যাডমিরালকে তুলে নিয়ে গেল? বুকের পাটা আছে বলতে হবে!'

'বুঝতেই পারছ, কঠিন পাত্রের পাল্লায় পড়েছি আমরা।'

'তা হলে কীভাবে বুঝ দেবে গ্যারেটকে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'মাইডাস টাচ একটা মিথ ছাড়া আর কিছু না। ওটাকে সত্য ভাবলে বোকামি করবে।'

'সব মিথের পিছনেই সত্যের সামান্য হলেও লেশ থাকে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'তা অবশ্য ঠিক,' একমত হলো রেমি। 'কিছু পণ্ডিত মনে করেন, মাইডাস নামে সত্যিই একজন মানুষ ছিল। তাঁদের ধারণা, প্রাচীন ফ্রিজিয়া... মানে এখন যেটাকে তুরস্ক বলি... তার রাজা ছিল লোকটা। তবে ওখানে জন্ম নেয়নি সে।'

'কোথায় জন্ম নিয়েছিল?'

'কিছু কাহিনিতে বলে ম্যাসেডোনিয়া। অন্য কোথাও হওয়াটাও বিচিত্র নয়। আসলে... এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তবে বাপের সঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে ফ্রিজিয়ায় এসেছিল সে। কাকতালীয়ভাবে যেদিন ওরা এল, সেদিনই নাকি রাজ্যের পরবর্তী রাজা ষাঁড়ে টানা ওয়্যাগনে চেপে রাজধানীতে ঢুকবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এক ওরাকল। মাইডাসের বাবাকে তৎক্ষণাৎ রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় লোকজন।'

'একেই বলে কপাল!' সকৌতুকে বলল মুরল্যাণ্ড।

হাসল রেমি। 'তা তো বটেই। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গল্প। গর্ডিয়াস... মানে মাইডাসের বাবা ওয়্যাগনটাকেই নিজের সৌভাগ্যের উৎস বলে ভেবেছিলেন, ওটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন দেবতা জিউসের নামে... কৃতজ্ঞতা হিসেবে। কোনোদিন যাতে ওটা হারিয়ে না যায়, সেজন্যে অত্যন্ত জটিল

এক গিঁঠের সাহায্যে ওয়্যাগনটাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল ফ্রিজিয়ার শহর-কেন্দ্রে। লোকে বলত—ওই গিঁঠ যে খুলতে পারবে, সে-ই পরবর্তীতে রাজা হবে গোটা এশিয়ার।'

'গর্ডিয়ান নটের গল্প বলছ তুমি,' রানা বলল। 'আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট শেষ পর্যন্ত ওটা খুলতে সক্ষম হন। তবে চাতুরি করেছিলেন তিনি, প্যাঁচ খোলার আগে তলোয়ারের খোঁচায় গিঁঠের কিছুটা অংশ কেটে নিয়েছিলেন।'

'রাইট। এ-কারণেই জটিল যে-কোনও সমস্যাকে আজও গর্ডিয়ান নট বলা হয়।'

'কী শুরু করলে তোমরা?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার মাথার ভিতরেই গিঁঠ লাগিয়ে দিচ্ছ! মাইডাসের কপালে কী ঘটেছিল, সেটা বলছ না কেন?'

'গর্ডিয়াসের পরে সিংহাসনে বসেছিল সে,' বলল রেমি। 'তবে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, তা জানা নেই কারও। অনেক ধরনের থিয়োরি প্রচলিত আছে—কেউ কেউ ভাবে, তুরস্কে কবর দেয়া হয়েছে তাকে। আবার কারও ধারণা, আগ্রাসী পার্শিয়ানরা তাকে বিতাড়িত করেছিল। মিথ বলে, দেবতাদের বিরাগভাজন হয়েছিল সে; শাস্তি হিসেবে মানুষের কান বদলে গিয়ে গাধার কান গজায় তার মাথার দু'পাশে। লজ্জায় ফ্রিজিয়া থেকে পালিয়ে যায় মাইডাস, আর কখনও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'গল্প হিসেবে মন্দ নয়,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তবে মাইডাস টাচের ব্যাপারে আপনার ধারণাই বোধহয় সত্যি। আলকেমিস্টরা তো বহু চেষ্টা চালিয়েছে সীসাকে সোনা বানাবার। কিন্তু সফল হয়নি। কারণ ওটা সায়েন্টিফিক্যালি অসম্ভব।'

'হাই স্কুলের পর থেকে সায়েন্সের সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার,' রেমি বলল। 'কেন ওটা অসম্ভব, একটু বুঝিয়ে বলবেন? মাইডাসের কাছে হয়তো গোপন কোনও ফর্মুলা ছিল, আমরা যেটা

জানি না?'

হাসল মুরল্যাণ্ড। 'কয়েক হাজার বছরের পুরনো ওই ফর্মুলায় তা হলে ফিশন রিঅ্যাকশনের উল্লেখ থাকতে হবে।'

'ফিশন মানে কি নিউক্লিয়ার?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'ইউ সি... সীসার আণবিক ওজন স্বর্ণের চেয়ে বেশি। তারমানে স্বর্ণের চেয়ে বেশি প্রোটন আছে ওতে। তাই সীসাকে স্বর্ণ বানাবার একমাত্র উপায়—বাড়তি প্রোটন ঝরিয়ে ফেলা। আর যে-কোনও অ্যাটমের নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন সরানোকেই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলে। স্বীকার করছি, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর ব্যবহার করে সীসাকে সোনা বানানো থিয়োরিটিক্যালি সম্ভব; কিন্তু ওতে খরচ এত বেশি পড়বে যে, উৎপাদিত সোনা বেচে লাভ হবে না কোনও। কষ্টটা সম্পূর্ণ মাঠে মারা যাবে।'

'তারমানে অলীক স্বপ্ন দেখছে গ্যারেট?'

'তা তো বটেই। বদ্ধ পাগল বললেও ভুল হবে না। কারণ ও যে-পদ্ধতিতে সোনা বানাতে পারবে বলে ভাবছে, সেটা জাদু ছাড়া আর কিছু না। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক জাদুতে বিশ্বাস করে না।'

'বাহ্,' হালকা গলায় বলল রেমি, 'পাগল-ছাগলকে আকৃষ্ট করা ছাড়াও আপনার দেখছি আরও এক্সপার্টিজ আছে, ববি। রীতিমত সায়েন্টিস্ট!'

'উঁহুঁ, আমি সামান্য এক ইঞ্জিনিয়ার। আপনার মত পিএইচডি ডিগ্রি নেই আমার, রেমি। ভাল কথা, আপনি কি গ্রিক সভ্যতার উপরেই থিসিস করেছেন?'

'গ্রিক আর রোমান... দুটোই,' বলল রেমি। 'সাবজেক্টটাকে বলা হয় ক্লাসিকস্। আমি একজন ক্লাসিসিস্ট।'

'এত কিছু থাকতে ওই সাবজেক্ট কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দে ময়ন-এর এক খামারে বড় হয়েছি আমি,' বলল রেমি। 'বাবা-মা ধনী ছিলেন না, আইওয়া-র বাইরে কখনোই যাওয়া হয়নি আমার ছোটবেলায়। কিন্তু ইয়োরোপ দেখার খুব শখ ছিল আমার, ভেবেছিলাম ক্লাসিকসের উপর পড়াশোনা করলে শখটা পূরণ করা সহজ হবে। সেজন্যেই...'

'ক্লাসিসিস্ট থেকে টিভি সিলেব্রিটি হলে কী করে?'

'সে আর এক গল্প। ইয়োরোপ ভ্রমণের শখ পূরণের জন্য ক্লাসিকসে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু ভার্সিটিতে বছরদুই কাটাবার পরেই টের পেলাম—অ্যাকাডেমিক কাজ-কারবার আমাকে দিয়ে হবে না। ওই অবস্থায় নতুন করে কোনও সাবজেক্ট নেবার সুযোগ ছিল না, বাধ্য হই পিএইচডি শেষ করতে। ততদিনে বিশাল অঙ্কের স্টুডেন্ট লোনের তলায় চাপা পড়ে গেছি। রেজাল্ট বেশি ভাল ছিল না, কাজেই ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারছিলাম না। এমন সময় *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর জন্য অডিশনের বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করি তাতে। কপাল ভাল, কম্পিটিটরদের কারও কোনও ডিগ্রি ছিল না; প্রডিউসাররাও চাইছিল অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড-সহ কাউকে হায়ার করতে। দর্শকের সামনে এক ধরনের অথেনটিকেশন সৃষ্টির প্রয়াস আর কী। ফলে সহজেই কাজটা পেয়ে যাই আমি। বাকিটা ইতিহাস। বছর ঘোরার আগেই সমস্ত লোন শোধ করে ফেলি আমি। অনুষ্ঠান হিট হওয়ায় মোটামুটি নামডাকও ছড়িয়ে পড়ে।'

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পেয়েছে রানা আর মুরল্যাণ্ড। ফেরিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন যাত্রী ঘিরে ফেলেছিল ওদেরকে—রেমির অটোগ্রাফ নিয়ে তারপর ছেড়েছে। ভক্তদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সামান্য ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছে ও। বড় সানগ্লাসে চোখ ঢেকে মাথায় বেঁধেছে স্কার্ফ।

'তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই খুব গর্ব করেন তোমাকে নিয়ে,'

বলল রানা। 'এখনও কি আইওয়াতেই আছেন ওঁরা?'

'না। আমার বয়স পনেরো হবার আগেই মারা গেছেন, দুজনেই।'

'দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই। খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই আমি বা র‍্যাচেল। আমারটা তো জানো, র‍্যাচেলও জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে পড়ছে।'

'আশা করি নামকরা লইয়ার হবে ও,' বলল রানা।

বিষাদ দানা বাঁধল রেমির চোখে। সত্যি কি সেটা সম্ভব? লেখাপড়া শেষ করা তো পরের কথা, আদৌ কি বাঁচানো যাবে র‍্যাচেলকে?

চোখ ছলছল করে উঠল ওর।

রেমির হাতে হাত রাখল রানা। দৃঢ় গলায় বলল, 'ওকে উদ্ধার করব আমরা। কথা দিচ্ছি!'

পনেরো

পয়লা দর্শনেই বুঝল রানা—দেখা করবার জন্য সাফেকো ফিল্ডের পাশটা কেন বেছে নিয়েছে গ্যারেট। আমেরিকার জাতীয় সেনসেশন বেসবলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচ শুরু হতে চলেছে তিনটায়। স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য সাউথ-ইস্ট এন্ট্রান্সের সামনে ভিড় করছে খেলা-পাগল দর্শকরা... প্রতি মুহূর্তে সেই ভিড় বড় হচ্ছে আরও। বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক আগে, ফলে মানুষের

অভাব নেই। রাস্তায় সুভ্যেনিয়ার বিক্রি করছে ভেণ্ডাররা, ভক্তদের গালে প্রিয় টিমের প্রতীক এঁকে দিচ্ছে শিল্পীর দল। বাতাসে ভাসছে পপকর্ন আর নানা ধরনের ফাস্ট ফুডের গন্ধ। গাড়ির হর্নে কান ঝালাপালা, শেষ মুহূর্তে পার্কিং স্পেস নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। টিকেট বুথের সামনে ক্রীড়ামোদী মানুষের ঢল... চলছে হৈচৈ আর হল্লা। রীতিমত বিশৃঙ্খল পরিবেশ। এমন জায়গায় ঠিকমত নজরদারি করা অসম্ভব। মানুষের ভিড়ে চোখের পলকে মিশে যেতে পারবে গ্যারেট, উদয়ও হতে পারবে চোখের পলকে। ভেরি স্মার্ট, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

খেলা না থাকলে পাঁচ মিনিটেই ডক থেকে পৌঁছুনো সম্ভব সাফেকোয়। কিন্তু আজ ট্রাফিক জ্যাম আর মানুষের অরণ্য পেরুতে পাক্কা বিশ মিনিট লেগে গেছে ওদের। স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় পৌঁছেই ঘড়ি দেখল রানা। নির্ধারিত সময়ের মাত্র তিন মিনিট বাকি। একেবারে কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে। আরেকটু হলেই মিস করত গ্যারেটের টাইমটেবল।

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ বোলাচ্ছে রেমি। রানার কাছে জানতে চাইল, 'গ্যারেট দেখতে কেমন?'

'ক্লিন শেভড্, রোদে পোড়া চামড়া,' বর্ণনা করল রানা। 'আমার চেয়ে সামান্য খাটো। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। চোখদুটো বাদামি। নাকটা একটু ভাঙা। ঠিক সুদর্শন বলা যাবে না ওকে।'

'কোথায় সেই নাকভাঙা শয়তান?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'সময় তো হয়ে গেছে, ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'নিশ্চয়ই আশপাশে আছে,' অনুমান করল রানা। 'অপেক্ষা করা যাক।'

'সেই সঙ্গে পেটপুজো করলে ও আপত্তি করবে না আশা করি?' হাত তুলে কাছে দাঁড়ানো এক ফাস্ট ফুডের ভেণ্ডারকে

ডাকল মুরল্যাণ্ড, 'অ্যাই মিয়া, এখানে পাঁচটা হট ডগ দাও। যত তাড়াতাড়ি দেবে, তত বেশি বখশিশ পাবে।'

হট ডগ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

'এই অবস্থায় আপনি খেতে পারবেন?' চোখ কপালে তুলল রেমি।

'পারব না মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'সকাল থেকে না খেয়ে আছি। পেটের ভিতর ছুঁচো না, রীতিমত হাতি দৌড়াচ্ছে। পাঁচটা চেয়েছি সে-জন্যেই। তিনটে আমার, বাকি দুটো আপনাদের।'

'আমি খাব না।' মাথা নাড়ল রেমি।

'আপনি উপোস থাকলে কোনও লাভ হবে না র‍্যাচেলের। তারচেয়ে খাওয়াদাওয়া করুন। না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে বোনকে উদ্ধার করবেন কীভাবে?'

'ভুল বলেনি ও,' রানা একমত হলো। 'যুদ্ধে নামার আগে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে নেয়া ভাল।'

হটডগ নিয়ে এসেছে ভেণ্ডার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটায় কামড় বসাল রেমি। দাম মিটিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, সঙ্গে বিশ ডলার বখশিশ। দাঁত বের হয়ে গেল ভেণ্ডারের।

খেতে খেতে চারদিকে চোখ বোলাল ওরা। আকার-আকৃতিতে মেলে এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু গ্যারেটের সঙ্গে চেহারা মিলছে না কারও। সে ছদ্মবেশ নিয়েছে কি না কে জানে, চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না।

খাওয়া শেষে পানির বোতলে চুমুক দিচ্ছে তিনজনে, এমন সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

'হাউডি, ফ্রেণ্ডস!'

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল তিনজনে। মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেট। জিন্সের প্যান্ট, আর সিয়াটল মেরিনার্স টিমের

ছাপ্পড়-মারা একটা ঢোলা জ্যাকেট পরে আছে সে—মাথায় জকি ক্যাপ। কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাকপ্যাক। আশপাশ দিয়ে ছুটতে থাকা আর দশটা বেসবল-দর্শকের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

হাসিমুখে এগিয়ে এল সে। থামল রানাদের ঠিক সামনে এসে। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত দৃষ্টি-বিনিময় হলো। গ্যারেটের টুঁটি চেপে ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমাতে হলো রানাকে।

'একাই এসেছি আমরা,' শান্ত গলায় বলল ও।

'জানি,' বলল গ্যারেট। 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি তোমাদের। বলতে বাধ্য হচ্ছি, মি. মুরল্যাণ্ড, রাক্ষসের মত খাও তুমি। দৃশ্যটা শোভন নয়।'

'দেরি করে ফেলেছ,' নিরাসক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আগে এলে তোমাকেও একটা হট ডগ অফার করতাম। ঘেয়ো কুকুর কীভাবে গরম কুকুর খায়... সেটা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা।'

'এখনও খোঁচা মারছ?' ঝাঁঝালো গলায় বলল গ্যারেট। 'কোন্‌টা সৌভাগ্য, আর কোন্‌টা দুর্ভাগ্য তা টের পাবে খুব শীঘ্রি।'

'প্লিজ, আমার তর সইছে না।'

কথায় না পেরে রেমির দিকে ফিরল গ্যারেট। 'ওর অভব্যতার জন্য আমিই ক্ষমা চাইছি, ড. হ্যাডলি। বাই দ্য ওয়ে, সামনাসামনি তোমাকে টিভির চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'জাহান্নামে যাও!' রাগী গলায় বলল রেমি।

'সবাই দেখি একসঙ্গে অভদ্রতা দেখাতে শুরু করেছ,' আহত গলায় বলল গ্যারেট। 'এভাবে চললে তো কথা বলা মুশকিল।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নই আমরা,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'তবে একটা প্রস্তাব দিতে পারি—এখুনি যদি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি দাও, তা হলে আমরা তোমাকে বিনা-প্যাঁদানিতে ছেড়ে দেব।'

হাসল গ্যারেট। 'চমৎকার এই অফার ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।'

স্টেডিয়ামের এন্ট্রান্সে ভিড় সামলানোয় ব্যস্ত পুলিশদের দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'আমরা ডাক দিলেই ওরা এসে আটক করবে এই ছ্যালটাকে। তারপর বন্দি-বিনিময় করা যেতে পারে, রানা। ওর বদলে অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেল। প্ল্যানটা কেমন?'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল গ্যারেট। 'ভুলেও ও-কাজ করতে যেয়ো না। অমন সমস্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েই আমি এসেছি। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই? দশ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ আমার জ্যাকেটের লাইনিঙে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, পকেটে রেখেছি ট্রিগার। তোমরা কোনও চালাকি করতে গেলেই এখানে বোমা ফাটবে... নিরীহ মানুষ মরবে!'

বিস্ফারিত চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রেমি। নারী-পুরুষ-শিশু... সব ধরনের মানুষ এসেছে খেলা দেখতে। বোমা ফাটলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। 'না! আমি বিশ্বাস করি না তুমি এ-কাজ করবে!' বলে উঠল ও।

ঠোঁট বেঁকে গেল গ্যারেটের। 'ডারলিং, আমি কী করতে পারি আর না-পারি, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই তোমার।'

'আমি ওর সঙ্গে একমত,' বলল রানা। 'তোমাকে দেখে আত্মঘাতী টেরোরিস্ট বলে মনে হয় না। যা-ই ঘটুক, বোমা ফাটিয়ে সাধের পরিকল্পনার দফা-রফা করবে না তুমি।'

'আমাকে তুমি চেনো না, মাসুদ রানা,' থমথমে গলায় বলল গ্যারেট। 'তবে তোমার দুর্বলতা আমি ধরতে পেরেছি।'

'তা-ই? বললে খুশি হই।'

'তুমি সবাইকেই নিজের মত বাস্তববাদী আর যুক্তিশীল ভাবো।'

'তা তুমি নও?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসল গ্যারেট। 'তোমার-আমার পেশায় তিন ধরনের মানুষ আছে—সাহসী, মরিয়া এবং জিনিয়াস। লক্ষ্য পূরণের জন্য সাহসীরা সাধ্যমত চেষ্টা চালায়; মরিয়া লোক সাধ্যের চেয়েও বেশি কিছু করে। আর জিনিয়াস নেয় অচিন্তনীয় পদক্ষেপ। আমাকে তুমি কোন্ ক্যাটাগরির লোক ভাবছ?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। গ্যারেট অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কথাবার্তাও পরিষ্কার। পাগল বলে মনে হচ্ছে না মোটেই... অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছে মাইডাস টাচের মত একটা অবাস্তব, কল্পিত জিনিস! জিনিয়াস, না পাগল? কে জানে। কিন্তু তার হুমকিটাকে অগ্রাহ্য করবার কোনও উপায় নেই। সত্যি সত্যি যদি বোমা ফাটায়, নিরীহ প্রাণ ঝরবে। অযথা ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না।

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তোমার কথা শোনা যাক। মাইডাস টাচের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রমাণ আছে বলেছিলে... কী সেটা?'

'চলো, কোথাও বসি,' বলল গ্যারেট। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে না।'

স্টেডিয়ামের সামনের পার্কে বেঞ্চি পাতা আছে, ওখানে বসল চারজনে।

'প্রথমেই তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাতে চাই,' আলোচনা শুরুর ভঙ্গিতে বলল গ্যারেট। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গল্প...'

'মাইডাস টাচের গল্প আমরা জানি।'

'ওই গল্প নয়।'

'হোয়াটএভার, গ্যারেট। আমি বলতে চাইছি যে, তুমি আমাদেরকে মরীচিকার পিছনে ছোটাতে চাইছ। মাইডাস টাচ বলে কিছু নেই।'

'এখানে আমি দ্বিমত পোষণ করছি,' বলল গ্যারেট। 'কেন করছি, তাও শোনো। নিজ চোখে আমি মাইডাস টাচের কীর্তি দেখেছি।'

বিস্ময়ের ধ্বনিটা নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। 'নিজ চোখে? তারমানে তুমি রাজা মাইডাসের দেখা পেয়েছিলে?'

'এক অর্থে... হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'ওই গল্পই তো শোনাতে চাইছি।' কাঁধ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রাখল গ্যারেট। বেশ ভারী ওটা, ভিতরে কী আছে বুঝতে পারল না রানা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ল গ্যারেট। বলল, 'বারো বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে গিয়েছিলাম আমি—ইটালির নেপলসে। ও হ্যাঁ, আমার মা ইটালিয়ান ছিলেন... এ-কথা সম্ভবত জানো না তোমরা। এনিওয়ে, ওখানে মায়া নামে আমার এক খালাতো বোনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। দু'জনে একসঙ্গে পুরো নেপলসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতাম। ওর সঙ্গে শহরের তলার টানেলে ঢুকে মাইডাস টাচের দেখা পাই আমি।'

'কীসের টানেল?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ভলক্যানিক টাফের উপর গড়ে উঠেছে নেপলস নগরী,' লেকচারের ভঙ্গিতে বলল গ্যারেট। 'ওই টাফ সহজেই খোঁড়া যায়। গ্রিকরা... মানে যারা ওই নগরের গোড়াপত্তন করেছিল... বেশ বুদ্ধিমান ছিল। ভলক্যানিক টাফ খুঁড়ে ঘর-বাড়ি বানাবার মাটি-পাথর সংগ্রহ করত ওরা। পরে ওরা সেই টাফের ভিতর দিয়ে অ্যাকোয়া-ডাক্ট, মানে পানিবাহী সুড়ঙ্গও তৈরি করে। অ্যাকোয়া-ডাক্টের সাহায্যে আশপাশের বিভিন্ন হ্রদ আর নদী থেকে সুপেয় পানির জোগান দেয়া হতো নগরবাসীকে। সেই সব সুড়ঙ্গের বিশাল এক জাল আজও টিকে আছে নেপলসের তলায়। এই নেটওয়ার্ক এতই বিস্তৃত এবং জটিল যে, এমন বহু জায়গা

আছে, যেখানে গত কয়েক হাজার বছরে কারও পা পড়েনি।'

'ওখানেই মাইডাসের দেখা পেয়েছিলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রেমি। কণ্ঠে অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ। 'ওই স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। সোনায় মোড়া একটা চেম্বারে ঢুকেছিলাম আমরা। অনেকটা পুরনো আমলের সমাধির মত। সোনায় গড়া একটা কফিন দেখেছিলাম ওখানে। আর দেখেছিলাম সুন্দরী এক মেয়ের নিরেট সোনার মূর্তি—চেম্বারের ঠিক মাঝখানে, ছয় ফুট বাই ছয় ফুট সাইজের সোনার একটা ব্লকের উপরে দাঁড় করানো ছিল ওটা। সবদিক থেকে একেবারে নিখুঁত—যেন সত্যিকার একজন মানুষের গায়ে সোনালি রঙ মেখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একমাত্র খুঁতটা ছিল শুধু ডান হাতে—অসম্পূর্ণ ছিল ওটা। মনে হচ্ছিল কবজির নীচ থেকে হাতটা কেউ কেটে নিয়েছে। আমার ধারণা: ওটা আসলে সেই রাজকন্যা, যাকে আদর করতে গিয়ে মূর্তি বানিয়ে ফেলেছিলেন রাজা মাইডাস। সমাধিটাও তাঁরই।'

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল রানা। বানানো গল্প শোনাচ্ছে না তো গ্যারেট? অমন কোনও আবিষ্কার যদি নেপলসের শহরের তলায় করে থাকে ও, তার খবর কাউকে বলেনি কেন? মাত্র বারো বছর বয়স ছিল গ্যারেটের, ওই বয়সের বাচ্চারা নিজের কৃতিত্ব ফলাও করে জানায় সবাইকে; সমাধি বা সোনার মূর্তির খবর গোপন রাখে না।

'যা বলছ, তার কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'ছবি-টবি তুলে রেখেছিলে?'

'উঁহুঁ, ক্যামেরা ছিল না আমাদের সঙ্গে,' মাথা নাড়ল গ্যারেট। 'তবে ছবির চেয়েও ভাল প্রমাণ আছে আমার কাছে। ওটা দেখাবার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করছি।' ব্যাকপ্যাকটা রানার

দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি দাও ভিতরে। সাবধান, জিনিসটা বের কোরো না!'

কৌতূহলী হয়ে ভারী ব্যাগটা হাতে নিল রানা। কোলের উপর রেখে চেইন খুলল। রেমি আর মুরল্যাণ্ডও কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকল ওর দিকে।

প্রথমে কিছু দেখা গেল না, ব্যাগের ভিতরটা অন্ধকার। মুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে আবার উঁকি দিল রানা। স্টাইরোফোমে প্যাঁচানো এক টা আকৃতি চোখে পড়ল এবার। হাত ঢুকিয়ে আবরণ খুলে ফেলল ও, সঙ্গে সঙ্গে রোদের আভায় সোনালি ঝিলিক দিয়ে উঠল জিনিসটা।

হাত বের করে ভালমত তাকাল রানা। থমকে গেল। পাশ থেকে আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রেমি।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'যা ভাবছি, এটা কি তা-ই?'

কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাগের তলায় শুয়ে আছে সোনায় গড়া নিখুঁত একটা হাত!

ষোলো

হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। ব্যাগের ভিতরের জিনিসটা সোনার হাত বলে নয়, হাতটা আশ্চর্য রকম নিখুঁত বলে। চামড়ার সমস্ত ভাঁজ, এমনকী রোমকূপগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হাতের তালুতে হাজারো আঁকাবাঁকা রেখা, ঠিক যেমনটা রক্তমাংসের তালুতে থাকে।

কবজি পর্যন্ত হাতটার দৈর্ঘ্য। আরেকটু ভাল করে পরখ করবার জন্য ব্যাগের মুখের কাছে ওটাকে তুলে আনল রানা। যেখানে শেষ হয়েছে হাত, সেই কাটা জায়গাটায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিরা-উপশিরা, লিগামেন্ট, পেশি আর হাড়ের সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনকী জটিল নকশার ডিজাইনে সত্যিকার অস্থিমজ্জা যেভাবে হাড়ের ভিতর সাজানো থাকে, তা-ও আছে এই হাতে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ভাস্কর্য নয়, অ্যাটানমি বইয়ে মানব-হস্তের ক্রস-সেকশনের ছবি ওটা।

মুখের ভাষা হারাল রানা, রেমি ও মুরল্যাণ্ড।

ওদেরকে চমকে দিতে পেরে বিজয়ীর হাসি হাসল গ্যারেট। বলল, 'এটা মাইডাসের মেয়ের সেই হারানো হাত। মাসছয়েক আগে জোগাড় করেছি। ছোটবেলায় দেখা মূর্তিটার সঙ্গে এটা পুরোপুরি মিলে যায়।'

'কোথায় পেয়েছ এই জিনিস?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'সেটা ইম্পরট্যান্ট নয়।'

'আমি জানি,' বলল রেমি। শ্বাস নিল বড় করে। 'কারণ এই হাতটা আমি আগেও দেখেছি।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কোথায়?'

'টিভিতে,' বলল রেমি। 'ছ'মাস আগে বেশ মাতামাতি হয়েছিল এ-নিয়ে। প্রয়াত এক ইংরেজ লর্ডের ব্যক্তিগত কালেকশনে পাওয়া যায় হাতটা। প্রাথমিকভাবে যারা এটা দেখেছে, তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। কিছুতেই বুঝতে পারেনি কীভাবে এমন নিখুঁত একটা ভাস্কর্য তৈরি করা সম্ভব। তবে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ পায়নি কেউ। হাতটা নিলামে তোলার কথা ছিল... কিন্তু তার আগেই লণ্ডনের এক অকশন হাউসের ভল্ট থেকে চুরি হয়ে যায় জিনিসটা।'

'বুঝতেই পারছ, আমি তোমাদেরকে অবাস্তব কোনও জিনিস খুঁজতে বলছি না,' বলল গ্যারেট।

রাগী চোখে তার দিকে ফিরল রেমি। 'অকশন হাউসের ভল্টে তা হলে তুমিই হানা দিয়েছিলে? ওখানে দু'জন গার্ডকেও খুন করেছ।' পরিষ্কার অভিযোগ ওর কণ্ঠে।

'ওরা আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল,' সংক্ষেপে বলল গ্যারেট। ব্যাখ্যাটা এত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দিল যে, মনে হলো মানুষ নয়, মশা মেরেছে সে। শীতল প্রতিক্রিয়াটাই বুঝিয়ে দিল, সে আসলে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

পার্ক-বেঞ্চের উপরে সিধে হয়ে বসল মুরল্যাণ্ড। বলল, 'ওটা সত্যিকার হতে পারে না। ভাস্কর্য হতে দোষ কোথায়? দক্ষ শিল্পীর হাতে যে-কোনও শিল্পই জীবন্ত হয়ে ওঠে।'

'তাই বলে এতটা নয়,' বলল গ্যারেট। 'মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখলে দেখতে পাবে, সূক্ষ্মতম জায়গাতেও কারুকাজ আছে ওটার। এত সূক্ষ্ম কাজ হাতে তো দূরের কথা, মেশিনেও করা কঠিন।'

ব্যাগটা রানার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল রেমি। ভালমত দেখল হাতটা। গ্যারেটের কথাই ঠিক। পেশি, শিরা, চামড়া আর হাড়ের প্রতিটা ডিটেইলস্ যেভাবে ফুটে উঠেছে হাতটার ক্রস-সেকশনে, তা কৃত্রিমভাবে বানানো সত্যিই কঠিন। দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ শিল্পীও মানুষের হাতের এত নিখুঁত রেপ্লিকা তৈরি করতে পারবে না।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল ও। 'এর দাম কত হতে পারে?'

'বর্তমান বাজার দরে শুধু সোনার দামই আশি হাজার ডলার,' বলল গ্যারেট। 'সেই সঙ্গে যদি অ্যান্টিক মূল্য যোগ করা হয়... আমার ধারণা... তিন-চার মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যদি ক্রেতা জোগাড় করতে পারো আর কী। এ-ধরনের চোরাই মাল বিক্রি

করা কঠিন। হাতে-গোনা দু'তিনজন ছাড়া আর কেউ কিনবে না এ-জিনিস।'

'আমাদেরকে এটা দেখাতে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করানো দরকার—যেটার খোঁজে বেরুচ্ছ, সেটার অস্তিত্ব সত্যি সত্যি আছে। নইলে তোমরা ভাববে আমি একটা উন্মাদ, মরীচিকার পিছে তোমাদের সময় নষ্ট করছি। অভিযানে সফল হবার জন্য যতটা দরকার ঠিকমত ততটা চেষ্টা চালাবে না। বরং আমার অগোচরে ফন্দিফিকির করবে—কীভাবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে উদ্ধার করা যায়। বাই দ্য ওয়ে, আবার জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা সম্ভব নয়। কাজেই আমার নির্দেশমত না চললে ওদেরকে ফিরে পাবার কথা ভুলে যেতে পারো।'

'তুমি তো দেখি সবজান্তা!' টিটকিরি মারল মুরল্যাণ্ড।

নির্বিকার রইল গ্যারেট। বলল, 'সবজান্তা হলে তোমাদেরকে প্রয়োজন হতো না আমার। সে-সব কথা থাক, তোমরা কী ঠিক করলে, সেটাই বলো।'

দুই সঙ্গীর সঙ্গে চোখাচোখি করল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে। আর কোনও উপায় নেই যখন, তুমি যা চাও, তা-ই করব আমরা।'

'গুড,' হাত বাড়িয়ে দিল গ্যারেট। 'ব্যাগটা তা হলে ফেরত দাও।'

চেইন আটকে ব্যাকপ্যাকটা ফিরিয়ে দিল রানা। বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়নি। ধরে নিলাম তোমার সব কথা সত্যি। মানে, মাইডাস টাচের অস্তিত্ব আছে... এবং নেপলস্ শহরের তলায় লুকিয়ে আছে সেই টাচের রহস্য আর বিপুল গুপ্তধন। তুমি তো ওটা দেখেছ... কোথায় আছে, তাও জানো।

তা হলে নিজেই গিয়ে উদ্ধার করে আনছ না কেন? কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছ আমাদেরকে?'

'আগে একবার দেখেছি বলেই ওই গোল্ডেন চেম্বার আবার খুঁজে বের করতে পারব, এমন কোনও কথা নেই,' তিক্ত গলায় বলল গ্যারেট।

'হেঁয়ালি করছ?' বিরক্ত হলো রানা।

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগবে। শুধু এটুকু বলি—চেম্বারে যাবার দুটো রাস্তা আছে। প্রথমবার যে-রাস্তায় গিয়েছিলাম, সেখান দিয়ে এখন আর যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কেন, সেটা তোমাদের না জানলেও চলবে। তা ছাড়া... ওখান দিয়ে ঢুকলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তা-ও নয়। সুড়ঙ্গগুলো স্রেফ একটা গোলকধাঁধা। পথ হারিয়ে ওই চেম্বারের খোঁজ পেয়েছিলাম আমরা। ফিরেছি বহু কষ্টে। পথে চিহ্ন-টিহ্ন দেবার, বা রাস্তা চিনে রাখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।'

'দ্বিতীয় রাস্তাটা কোথায়?'

'ওটা খুঁজে বের করাই তোমাদের দায়িত্ব। আর সেজন্যে গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের বানানো একটা ম্যাপ দরকার হবে তোমাদের। সেই ম্যাপের ভিতর আছে মাইডাসের সমাধি... মানে ওই গোল্ডেন চেম্বারে পৌঁছুনোর পথনির্দেশ।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলে উঠল রেমি। 'আর্কিমিডিস কমপক্ষে দু'হাজার বছর আগেকার মানুষ। এত পুরনো ম্যাপ এখনও টিকে আছে, তা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? ম্যাপ টিকে থাকলেও... ওটা যে কাজে লাগানো যাবে, তা-ই বা ভাবছ কেন? দু'হাজার বছরে গ্রিক, সাইরাকিউজান, রোমান আর ইটালিয়ানদের হাতে বহুবার ভাঙাগড়ার শিকার হয়েছে শহরটা। মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংসও হয়েছে কয়েকবার। এখন আর আদি শহরের

সঙ্গে কোনও মিলই নেই ওটার।'

'তুমি সারফেসের কথা বলছ। কিন্তু মাটির তলার টানেলগুলো এখনও আগের মতই আছে,' পাল্টা যুক্তি দেখাল গ্যারেট। 'আমি আর মায়া যখন ওখানে ঢুকেছিলাম, বেশ কয়েক জায়গার ছাতে কুয়োর ফুটো দেখেছি। পুরনো আমলে ওইসব কুয়োই ছিল অ্যাকোয়াডাক্টে ঢোকার আসল এন্ট্রান্স। পুরো নেপলসে ওই ধরনের কয়েক হাজার কুয়োমুখ আজও আছে। বেশিরভাগই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে কিছু কিছু এখনও খোলা পাওয়া যাবে। আমার জানা প্রয়োজন, আর্কিমিডিসের ম্যাপ অনুসারে কোন্‌টা দিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের... এবং টানেলে ঢোকার পর কীভাবে পৌঁছুনো যাবে গোল্ডেন চেম্বারে। পুরোটাই আসলে এক ধরনের ধাঁধা। আর সেই ধাঁধার সমাধান করতে হবে জিয়োলেবের সাহায্যে।'

'সে-কারণেই ফেরিতে পরীক্ষা নিয়েছ আমাদের?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'আর্কিমিডিসের পায্‌ল তোমরা ভাঙতে পারো কি না, জানা প্রয়োজন ছিল। কারণ পায্‌লটা না ভাঙলে জিয়োলেব ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আর জিয়োলেব ব্যবহার করা না গেলে গোল্ডেন চেম্বারের লোকেশন বের করা অসম্ভব।'

'পায্‌লটা আগেই আমাকে দেখাওনি কেন... যখন জিয়োলেব দেখাতে এসেছিলে?'

'তখনও আর্কিমিডিসের কোডেক্সের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারিনি আমি। যতটুকু করেছিলাম, তাতে জিয়োলেব বানাবার নিয়ম-কানুন লেখা ছিল। তা দেখে ডিভাইস তো বানিয়ে ফেললাম, কিন্তু ব্যবহার করতে পারছিলাম না। তাই তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম। পরে যখন পুরো কোডেক্সের অনুবাদ শেষ

হলো, দেখলাম স্টোমাকিয়োনের ধাঁধার মাধ্যমে জিয়োলেবের অপারেশন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওটা ভেদ করবার ক্ষমতা ছিল না আমার। তুমিও আমাকে এড়িয়ে চলছিলে। অগত্যা চরম ব্যবস্থা নিতে হলো।'

'হুম। এখন তা হলে আমাদেরকে আর্কিমিডিসের ওই ম্যাপ খুঁজে বের করতে হবে?'

'কারেক্ট। এবং সেটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে।'

'খুব তাড়া দেখছি! কবে নাগাদ চাও?'

'সামনের রোববার রাতের মধ্যে ম্যাপটা আমাকে এনে দেবে তোমরা। নেপলসে!'

'ঠাট্টা করছ?' কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। 'আজ বুধবার। তুমি চাও আগামী চারদিনের ভিতরে আমরা দু'হাজার বছরের পুরনো একটা রহস্য ভেদ করব? সেটা কোনোদিন সম্ভব?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করবার ব্যাপারে সুনাম আছে তোমার, রানা। তা ছাড়া আমিও নাচার। চারদিনের মধ্যে যদি মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে না পারি... আর কোনোদিনই পারব না। ওটা আরেকজনের হাতে চলে যাবে।'

'কার হাতে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'আমার কাজিন এবং ছোটবেলার সেই বান্ধবী মায়ার হাতে।'

'মানে যার সঙ্গে গোল্ডেন চেম্বারে ঢুকেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। তবে এখন আর বন্ধুত্ব নেই আমাদের মাঝে, বরং সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতা—মাইডাসের ওই সমাধিতে ফিরে যাবার প্রতিযোগিতা। ওর ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। বড়ই ডেনজারাস স্বভাবের মেয়ে। যদি জানতে পারে তোমাদের হাতে আর্কিমিডিসের সূত্র আছে, নির্ঘাত কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। খুনখারাপিও হতে পারে। কাজেই সাবধান!'

'আমাদের কাছে তো আর্কিমিডিসের সূত্র নেই!'

'থাকবে। লণ্ডনের ওই অকশন হাউস থেকে সোনার হাত ছাড়াও আর্কিমিডিসের একটা কোডেক্স চুরি করেছি আমি। ওটার ভিতরেই আছে সমস্ত সূত্র—কীভাবে পৌঁছুনো যাবে মাইডাসের সমাধিতে।'

'জিয়োলেব আর স্টোমাকিয়োন বানাবার নির্দেশনা কি ওটা থেকেই পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল গ্যারেট। 'কোডেক্সের কয়েকটা পাতার ফটোকপি আমি আগেই দেখিয়েছি তোমাকে। এবার পুরোটাই দেখবে। ক্লাসিকসের এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের মাধ্যমে কোডেক্সের অনুবাদ করিয়েছি আমি, জিয়োলেব আর স্টোমাকিয়োন তৈরিতেও লোকটা সাহায্য করেছে আমাকে। পারলে ওকেই ফিল্ডে পাঠাতাম, কিন্তু একেবারেই হাড় জিরজিরে বুড়ো সে... এ-ধরনের কঠিন কাজ সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে।'

'কে এই প্রফেসর?'

'ওর পরিচয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এখন আর সে বেঁচে নেই।'

গ্যারেটের দৃষ্টি দেখে সন্দেহ হলো রানার—প্রফেসর সম্ভবত বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যাননি।

'ট্রান্সলেশন, আর মূল কোডেক্সের ফটোগ্রাফ... দুটোই আমি ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে,' বলে চলল গ্যারেট। 'আশা করি খোঁজাখুঁজির কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবে তাতে। তবে আমার ধারণা, কিছু একটা মিস করে গেছে প্রফেসর। তোমাদের দায়িত্ব হবে সেটা খুঁজে বের করা। জিয়োলেবটাও থাকছে তোমাদের কাছে। কদ্দূর কী অগ্রগতি হলো, তার ডেইলি রিপোর্ট চাই। যদি ব্যর্থ হও, কিংবা আমার মনে হয় যে, কিছু গোপন করছ তোমরা... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের একটা করে আঙুল কেটে নেব। বুঝতে পেরেছ?'

হুমকি শুনে ভয় ফুটল রেমির চোখে।

'তার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। নিয়মিত রিপোর্ট পাবে আমাদের।' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার কাছ থেকেও পাল্টা রিপোর্ট চাই আমরা। বন্দিরা যে অক্ষত আছে, তার প্রমাণ দেখাতে হবে তোমাকে।'

'অলরেডি দুটো ভিডিও দেখেছ,' মনে করিয়ে দিল গ্যারেট।

'সেটা তো আজকের জন্য। প্রতিদিনই একটা করে ভিডিও চাই আমরা, যাতে বুঝতে পারি—অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেল কোনও আঙুল খোয়ায়নি। যদি তা না করো, আমাদের বোঝাপড়া ওখানেই খতম। তোমাকে শিকার করতে বেরুব তখন আমি। বুঝতে পেরেছ?' গ্যারেটের সুর নকল করল রানা।

'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'আমি রাজি। প্রতিদিন নতুন ভিডিও পাবে।' স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে, দর্শকরা ঢুকে পড়েছে মাঠে। 'আমাকে এবার উঠতে হয়।' বলে বেঞ্চ ছাড়ল সে, কাঁধে ঝোলাল ব্যাকপ্যাক। 'যোগাযোগ রেখো।'

'কখন পাঠাচ্ছ কোডেক্সের কপি?' পিছন থেকে জানতে চাইল রেমি।

'খুব শীঘ্রি।' বলে উল্টো ঘুরল গ্যারেট। 'শেষ একটা কথা। পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব একটু ভালভাবে ভেবে দেখো। আমার সারাজীবনের স্বপ্ন এটা... জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। কাজেই কোনও ধরনের ভুল বা ব্যর্থতা সহ্য করা কঠিন আমার জন্য। রোববারে নেপলসে হাজির থাকব, তখন যদি আমাকে দেখাবার মত কোনও রেযাল্ট না থাকে, তোমাদের ওখানে যাবারই দরকার নেই। ধরে নিয়ো সব চুকেবুকে গেছে।'

আকাশে চাপা গর্জন করে উঠল মেঘ। নামল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। মাথায় জ্যাকেটের হুড তুলে দিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে গেল

গ্যারেট। যতক্ষণ দেখা গেল, লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রেমি।

'ওকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল ও। 'কথার কথা না, সত্যি সত্যি!'

'ওর চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম,' যোগ করল মুরল্যাণ্ড।

'তাতে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলের কোনও উপকার হতো না,' বলল রানা। 'তারচেয়ে ও যা চাইছে, সেটা সম্ভব কি না, ভেবে দেখা যাক।'

'সত্যি সত্যি মাইডাসের সমাধি খোঁজার কথা ভাবছ তুমি?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'অন্তত মাইডাস টাচ খোঁজার চেয়ে সমাধি খোঁজা তো সহজ! তা ছাড়া... অস্বীকার করব না... আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে গ্যারেট। আর্কিমিডিস আর কিং মাইডাস—এই কম্বিনেশনটাই খুব ইন্টারেস্টিং। অভিযানে না গিয়ে উপায় নেই আমাদের... আর যাবই যখন, ভালমত খুঁজতে অসুবিধে কী?'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি,' হাসল মুরল্যাণ্ড। 'সফল হতে পারলে গ্যারেটকে ল্যাঙ মেরে গোল্ডেন চেম্বারের সমস্ত গুপ্তধন কেড়ে নেয়া যাবে। আমাদের তরফ থেকে ওটাই হবে ওর শাস্তি।'

সতেরো

আধঘণ্টা পরেই চলে এল গ্যারেটের ই-মেইল। অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে সঙ্গে রয়েছে আর্কিমিডিসের কোডেক্সের সবগুলো পাতার ফটোগ্রাফ, এবং তার অনুবাদ। রানা তখন গেস্ট হাউসে ফিরে এসেছে, রেমিকে পাঠিয়ে দিয়েছে হোটেলে—জামা-কাপড় বদলে নেবার জন্য। মুরল্যাণ্ডও নুমা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কো-অর্ডিনেশন সেরে নেবে বলে চলে গেছে। রানার গেস্ট হাউসেই পরে আবার মিলিত হবে তিনজনে।

কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। সময় নিয়ে শাওয়ার সারল, ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলল শরীরের সমস্ত ক্লান্তি। বেরুল একদম ঝরঝরে, তরতাজা হয়ে। ক্লজিট খুলল ও। কিছু শার্ট ও ট্রাউজার ঝুলছে, নীচে রয়েছে চকচকে কয়েক জোড়া জুতো। জিন্সের প্যান্ট আর একটা নীল সুতি শার্ট পছন্দ করল, আর নিল একজোড়া শু। বেডরুমে গিয়ে পরে ফেলল ওগুলো।

এরপর কম্পিউটারে বসল ও। দুটো অ্যাটাচমেন্ট-ই প্রিন্ট করে নিল তিন সেট। ওগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে স্ট্যাপলার করতে করতেই বেল বাজল সদর দরজায়। রেমি।

দরজা খুলতেই ওর হাতে বড়-সড় একটা সুটকেস দেখতে পেল রানা। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'আমার লাগেজ,' বলল রেমি। 'একসঙ্গে কতটা সময় থাকতে হবে, তার তো কোনও ঠিক নেই। হোটেল থেকে ছোটাছুটি

করতে পারব না। তাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এলাম। সরো একটু, ভিতরে ঢুকতে দাও আমাকে।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে সুটকেস নিল রানা। ঘরে ঢোকাল।

'আমাকে অবাঞ্ছিত অতিথি ভেবো না,' গা থেকে ওভারকোট খুলতে খুলতে বলল রেমি। 'স্রেফ কাজের সুবিধের কথা ভেবে চলে এসেছি। যদি আপত্তি করো তো এখুনি চলে যাব।'

'আমার আপত্তি কীসের?' ড্রয়িংরুমের টেবিলে সুটকেস নামিয়ে রাখল রানা। 'এসব ব্যাপারে মেয়েরাই বরং আপত্তি করে। ভাবে একটা ছেলের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকলে বদনাম হয়ে যাবে।'

'বদনামের ভয় আমি করি না,' বলল রেমি। 'তা ছাড়া কিছু ঘটলেই বা কী এসে যায়? তুমি তো আর বিবাহিত নও।'

বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী করে জানছ আমার গার্লফ্রেণ্ড নেই?'

'ওফ্‌ফো,' বিব্রত হলো রেমি। 'আমার মাথায় তো এ চিন্তা আসেইনি! যেমন কাঠখোট্টা লোক! ...অমন কেউ আছে নাকি?'

'না, নেই। কিন্তু থাকতে তো পারত! ভাবলে না কেন?'

'কী জানি! বোধহয় তোমাকে আমি নিজের মতই ভেবেছি। আত্মকেন্দ্রিক, কাজ-পাগল... রোমান্সের সময় নেই।'

'মোটামুটি মিলেছে,' হাসল রানা। 'বসো। কিছু খাবে?'

'উঁহুঁ। হট ডগটা বেশি সুবিধের ছিল না। পেটের ভিতর থেকে এখনও কুকুরটা ডাক ছাড়ছে।'

'তা হলে ফ্রেশ হয়ে নাও—স্পেয়ার বেডরুমটায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাকে। তারপর নাহয় কাজ শুরু করা যাবে।'

সুটকেসটা ড্রয়িংরুম সংলগ্ন একটা কামরায় পৌঁছে দিল রানা। এরপর নিজের কামরায় গিয়ে নিয়ে এল কোডেক্সের

প্রিন্টআউট আর জিয়োলেবটা। ড্রয়িংরুমের টেবিলে ওগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতেই ফিরে এল রেমি।

'এগুলোই পাঠিয়েছে গ্যারেট?' একতাড়া কাগজ হাতে তুলে জিজ্ঞেস করল ও।

'হুঁ। তিন সেট প্রিন্ট করেছি। অবশ্য গ্রিক কোডেক্সটা তুমি ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না।'

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জানালার কাছে চলে গেল রেমি। বলে উঠল, 'ওয়াও! দারুণ দৃশ্য তো!'

গেস্ট-হাউসটা ছোট একটা ক্লিফের উপর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পিউজেট প্রণালী। কিনার ঢাকা পড়ে আছে সবুজ গাছপালায়। জানালা দিয়ে দেখতে সত্যিই চমৎকার লাগে।

'এর জন্য ক্রেডিট নিতে পারছি না বলে দুঃখিত,' রেমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'বাসাটা ভাড়া করা। তাও আমি করিনি। আমার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির লোকাল ইনচার্জ জোগাড় করে দিয়েছে।'

'ভদ্রলোকের পছন্দ আছে বলতে হবে।'

'ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা। ওর নাম অনন্যা হায়দার। বয়সও বেশি না, মাত্র পঁচিশ।'

বিস্মিত হলো রেমি। 'এত অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ইনচার্জ বানিয়েছ?'

'বয়স বা সেক্স নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। যোগ্যতাবলেই পদটা পেয়েছে অনন্যা।'

'আ'য়্যাম ইমপ্রেসড, রানা!'

'এতে ইমপ্রেস হবার কী আছে?' বিব্রত গলায় বলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আমরা কি বসব এখন?'

'ববির জন্য অপেক্ষা করবে না?'

'ওর আসতে দেরি হবে। আপাতত আমরাই শুরু করি।'

'বেশ, তবে একটু কফি পেলে ভাল হয়।'

'এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

ধূমায়িত কফি নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। প্রথমেই জিয়োলেবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। উপরের ডায়ালে দুটো কাঁটা, পিঠটা বারো ভাগে ভাগ করা—সময়ের বদলে সেখানে লেখা হয়েছে বারোটা রাশির নাম... এসব আগেই দেখেছে। এবার মনোযোগ দিল পিছনের ডায়ালের দিকে, ওটার সঙ্গে বোমার কানেকশন থাকায় ইতিপূর্বে উল্টে দেখতে পারেনি। ওপাশটায় একটামাত্র কাঁটা। ডায়ালের চারপাশে রয়েছে তিন শ' ষাটটা খুদে দাগ—প্রত্যেক দাগ এক ডিগ্রি করে মাপ নির্দেশ করছে। ত্রিশ ডিগ্রি পর পর সংখ্যায় লেখা আছে ডিগ্রির হিসাব। হঠাৎ দেখায় ডায়ালটা কম্পাসের মত লাগে। কাঁটা ঘোরানোর নিয়ম শিখে গেছে ওরা, কিন্তু তিনটে ডায়ালের সাহায্য নিয়ে কীভাবে কী করতে হবে, তার কিছুই জানে না। তাই খুলে বসল কোডেক্স। ওর ভিতরে জিয়োলেবের গোমর লুকানো থাকতে পারে।

কোডেক্সের ইংরেজি অনুবাদ পড়ল রানা, রেমি পড়ল মূল গ্রিকটা। নানারকম ড্রয়িং আর গাণিতিক সূত্র পেল ওরা পাণ্ডুলিপিতে। আড়াই শ' পৃষ্ঠার কোডেক্স, প্রতিটা পাতাই এক-একটা অমূল্য ধন। কিংবদন্তির পণ্ডিত আর্কিমিডিস যে কত বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ ফুটে উঠেছে এই হারানো কোডেক্সে। পুরোটা ভালমত স্টাডি করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তার জন্য প্রচুর সময় চাই। আপাতত জিয়োলেব এবং মাইডাস সংক্রান্ত অংশটায় মন দিল ওরা—আলাদা হেডিং দিয়ে ওটুকু চিহ্নিত করা আছে, তাও তার দৈর্ঘ্য কম নয়... প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে পরিষ্কার হয়ে গেল, মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন

আর্কিমিডিস। সোনার হাতটা তিনি নিজেও দেখেছিলেন।

মূল কোডেক্সটা এক দফা রিডিং দেবার পর রেমি জানাল, পাণ্ডুলিপিটা অসম্পূর্ণ। কিছু পাতা হারিয়ে গেছে, আবার এমনও হতে পারে, আর্কিমিডিস হয়তো লিখে শেষ করতে পারেননি। সবচেয়ে বড় কথা, জিয়োলেব ব্যবহারের বিস্তারিত নিয়মকানুন ওতে পাওয়া গেল না। গ্যারেটের পিঠ কেন দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, তা বোঝা গেল এবার। আলোচনায় বসল রানা আর রেমি। কোডেক্স থেকে কয়েকটা সূত্র পাওয়া গেছে, তা নিয়ে যুক্তি-তর্ক হলো ওদের মাঝে। পরিচিত কয়েক জায়গায় ফোন করল রেমি, ফলে খুব শীঘ্রি পরিষ্কার হয়ে গেল—পরবর্তী পদক্ষেপ কী নিতে হবে।

সন্ধ্যা সাতটায় হাজির হলো মুরল্যাণ্ড। একাই ফিরেছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'মি. রেডক্লিফ কোথায়? তোমার সঙ্গে আসেননি।'

'উনি এফবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিং করছেন,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।'

'এখুনি ঢাকঢোল না পেটাবার কথা বলে দিয়েছ তো? কেউ কোনও আভাস পেলে মুশকিল। বিশেষ করে রেমির বোন কিডন্যাপ হয়েছে শুনলে মিডিয়াতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। আফটার অল, রেমি একজন বড়-সড় সিলেব্রিটি।'

'কিচ্ছু ভেবো না, মি. রেডক্লিফকে সব বুঝিয়ে বলেছি আমি। উনিও এফবিআই ডিরেক্টরকে তা-ই বলবেন। আমার দিকটাও কাভার দেয়া হয়েছে। নুমার প্রজেক্ট থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, যাতে ওখানকার লোকজন আমাকে না খোঁজে। রেমি, এখন শুধু আপনার খোঁজ না পড়লেই হয়।'

'তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই,' আশ্বস্ত করল রেমি। 'গ্রীষ্মকালীন ব্রেক চলছে আমার অনুষ্ঠানের। মাসখানেকের মধ্যে শুটিঙের কোনও শিডিউল নেই। আমিও একরকম ছুটিতেই

আছি।'

'গুড। তা হলে তো আর চিন্তা নেই।' বলল রানা। 'এসো, ববি। আমরা এতক্ষণ কী করেছি তোমাকে দেখাই।'

'আগে ডিনার। সকাল থেকে হট ডগ ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি।'

'ঘরে খাবার নেই,' জানাল রানা। 'একটু অপেক্ষা করতে পারবে? অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।'

'কপালটাই মন্দ। কী আর করা। আনাও কী আনাবে। মুরগির রোস্ট যেন থাকে।'

'ক'টা?' হেসে জানতে চাইল রানা।

'মিনিমাম দুটো।'

বিশ মিনিটের মধ্যে চলে এল খাবার। ডিনার করতে করতে মুরল্যাণ্ডকে কোডেক্স আর জিয়োলেব সম্পর্কে যতটা জানতে পেরেছে, খুলে বলল রানা আর রেমি। খাওয়া শেষ হলে আবারও ডোরবেল বেজে উঠল। ঘরে ঢুকলেন মি. রেডক্লিফ, সঙ্গে ল্যারি কিং। রেমির সঙ্গে ওঁদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

কুশল বিনিময় শেষে রানা জানতে চাইল, 'কিডন্যাপারদের ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?'

'না,' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'পাক্কা প্রফেশনাল, হোটেলের সিকিউরিটি ক্যামেরায় কিছুই রেকর্ড হতে দেয়নি। সব কাজ সেরেছে আড়ালে। দু'একবার যা-ও বা ক্যামেরার সামনে এসেছিল, মুখ নামিয়ে রেখেছে। চেহারা দেখা যায়নি। তবে এফবিআই সমস্ত ফুটেজ ভাল করে পরীক্ষা করছে। দেখা যাক কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।'

'ওদের ট্রান্সপোর্টেশন সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি?'

'সম্ভবত ভ্যান নিয়ে এসেছিল। লাঞ্চ টাইমের পর পর অচেনা যানবাহন বলতে ওই একটা ভ্যানই বেরিয়ে গেছে হোটেলের

আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং লট থেকে। গেটে লাইসেন্স নাম্বার নোট করা ছিল, তবে ডিএমভি ডেটাবেজে সার্চ করে ওই নাম্বারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভুয়া নাম্বার প্লেট ব্যবহার করেছে, নিশ্চয়ই ভ্যানটাও বিশেষত্বহীন। খুঁজলে গোটা ওয়াশিংটনে ওরকম কয়েক হাজার ভ্যান পাওয়া যাবে।'

'তারমানে এ-মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে?'

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'তা তো বটেই। কিডন্যাপারের নাম জেনেও সুবিধে হচ্ছে না। অ্যান্থনি গ্যারেট নামে কোনও ক্রিমিনালের রেকর্ড নেই এফবিআই-এর ডেটাবেজে। এমন দুর্ধর্ষ লোক কোত্থেকে উদয় হলো, তা-ই ভেবে পাচ্ছে না ওরা।'

'এর অর্থ সে অত্যন্ত স্মার্ট... কখনও ধরা পড়ে না। কোনও সূত্রও ফেলে যায় না পিছনে,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'দুঃসংবাদ।'

'চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বাস দিল ল্যারি। 'এফবিআই চেষ্টার ত্রুটি করবে না। অসুবিধা বলতে... ওদেরকে গোপনে কাজ করতে হবে, এ-ই আর কী। সময় একটু বেশি লাগবে।'

'ইয়ে... রানা...' ইতস্তত করে বললেন রেডক্লিফ। 'এফবিআই ডিরেক্টর এ-মুহূর্তে কিডন্যাপারদের দাবি মেনে নিতে বলেছেন। তার মানে...'

'মাইডাসের সমাধি খুঁজতে যেতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'জানি। আপনি বিব্রত হচ্ছেন কেন কথাটা বলতে?'

'না... মানে... এখানে তোমার তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আমরাও অনর্থক ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না তোমাকে...'

'এসব বলে আমাকে আপনি অপমান করছেন, মি. রেডক্লিফ,' আহত গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কিডন্যাপ হয়েছেন, আর তাঁকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে আমার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই? তা ছাড়া... আমার কারণেই এই বিপদে পড়েছেন তিনি। যদি তা না-ও হতো, অ্যাডমিরাল আমার বসের

বন্ধু... আমার কাছে পিতৃতুল্য... তাঁকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমি মনে করি আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে!'

'দুঃখিত, রানা,' লজ্জিত গলায় বললেন রেডক্লিফ। 'আমি আসলে তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য বলিনি কথাটা। প্লিজ, যেভাবে হোক, ফিরিয়ে আনো অ্যাডমিরালকে। তার জন্য পুরো নুমা তোমার পিছনে আছে।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব,' কথা দিল রানা।

'তোমাদের মেলোড্রামা শেষ হয়েছে?' বেরসিকের মত বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। সোফায় বসে জিয়োলেবটা নেড়েচেড়ে দেখছে সে। 'তা হলে একটা কাজের কথা বলতে পারি।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল সবাই। 'কী কথা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডিভাইসটা থেকে ইলেকট্রনিক এমিশন ডিটেক্ট করছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে এতক্ষণ জিয়োলেবটা পরীক্ষা করছিল ও, ইলেকট্রনিক একটা মিটার ধরল ওটার পাশে। 'এই দেখো। কিছু ট্রান্সমিট করছে এটা।'

বিস্ময় ফুটল সবার চোখে। রেমি জানতে চাইল, 'কী ট্রান্সমিট করছে?'

'লো এমিশন। অডিও বা ভিডিও সিগনাল হতে পারে না।' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার ধারণা, জিপিএস ট্র্যাকার।'

'ওটার ভিতরে জিপিএস ট্র্যাকার আসবে কোত্থেকে?'

'নিশ্চয়ই গ্যারেট বসিয়েছে,' বলল রানা। 'অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে এখন। মনে আছে, আমরা ট্রাক থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার পর বোমাটা ফাটিয়ে দিয়েছিল গ্যারেট? কী করে জানল আমরা তখনও ট্রাকে নেই? কাছাকাছি কোথাও ছিল না সে, থাকলে আমাদের সঙ্গেই লাইন ধরে ফেরিতে উঠতে হতো ওকে সিয়াটলে ফেরার জন্য। ওকে দেখতে পেতাম

আমরা। কিন্তু দেখিনি। তারমানে ব্রেমারটনে যায়নি সে, সিয়াটলে বসেই আমাদের লোকেশন দেখতে পাচ্ছিল জিপিএস ট্র্যাকার থেকে। ভবিষ্যতেও আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, তাও জানতে পারবে ও একই পদ্ধতিতে।'

'বের করে নেবে ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'না-না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তারচেয়ে ওটাকে আমাদের কাজে লাগানো যাক। ল্যারি, ব্যাকওয়ার্ড সার্চ করতে পারবে তুমি? সিগনালটা কোথায় রিসিভ হচ্ছে, সেটা বের করা যাবে না?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল ল্যারি। 'কিন্তু সিগনালটা ডিকোড করতে হবে তার জন্যে।'

'কাজে লেগে পড়ো।'

'ডিভাইসটা নুমা হেডকোয়ার্টারে নেয়া যাবে না বোধহয়?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'উঁহুঁ। যা করার এখানেই করতে হবে। এবং খুব শীঘ্রি। আমরা বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে পারব না, বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'অসুবিধে নেই, সিগনালটার অংশবিশেষ রেকর্ড করে নিয়ে কাজ করতে পারব আমি। কিন্তু তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'কোডেক্সের ব্যাপারে একটা থিয়োরি খাড়া করেছে রেমি,' বলল রানা। 'অকশন হাউসে পাঠাবার আগে একটা মোমের ট্যাবলেট, মানে ফলকে মোড়ানো ছিল ওটা। আলাদা আইটেম হিসেবে বিক্রি করবার জন্য মোমফলকটা সরিয়ে নেয়া হয়। ওর ধারণা, জিয়োলেবের রহস্য ভেদ করবার সূত্র ওই ট্যাবলেটের গায়ে লেখা আছে।'

'ট্যাবলেটটা এখন কোথায়?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'ওটা নাহয় বিমানে ওঠার পরই জানাব।'

'বিমান! কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

মি. রেডক্লিফের দিকে ফিরল রানা। 'আপনাদের তরফ থেকে সব ধরনের সাহায্য দেবেন বলছিলেন না? গুড। নুমার একটা প্রাইভেট জেট নেব আমরা। ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে আমাদেরকে।'

আঠারো

হাই তুলল গ্যারেট, থার্মোসের মুখ খুলে কফিতে চুমুক দিল, তারপর বিরক্ত চোখে তাকাল পাশের সিটে এলিয়ে পড়ে থাকা রেনফিল্ডের দিকে। বাল্টিমোর হারবারের কাছাকাছি এক নির্জন পার্কিং লটে গাড়িতে বসে আছে ওরা। বিমান ধরে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পৌঁছেছে দু'জনে। যাত্রার পুরো পথটাই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে রেনফিল্ড। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ভাড়া করা গাড়িতে ওঠার পরেও ঘুম দূর হচ্ছে না তার। অথচ গতকাল থেকে সব মিলিয়ে আধঘণ্টাও বিশ্রাম পায়নি গ্যারেট। মেজাজ খিঁচড়ে আছে ওর।

'অ্যাই!' রেনফিল্ডের গায়ে একটা বক্সিং মারল গ্যারেট। 'আর কত ঘুমাবে? ওঠো বলছি!'

আড়মোড়া ভেঙে সিটের উপর সিধে হলো রেনফিল্ড। হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে?'

'আড়াইটা,' ঘড়ি দেখে বলল গ্যারেট।

'গভীর রাতের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগামীকাল রাখা যেত না?' বিরক্ত গলায় বলল রেনফিল্ড। 'একদিনে ধকল একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে।'

'ঘুমাচ্ছ তো নাক ডাকিয়ে, তোমার আবার ধকল কীসের? ঘুমের আবার ধকল?' ধাতানি দিল গ্যারেট। 'আমাদের অপারেশনের এই পর্বটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছিয়ে দিলে নিজেরাই সমস্যায় পড়ে যাব।'

'হুম।'

একটু পরেই অন্ধকার পার্কিং লট আলোকিত করে তুলল এক জোড়া হেডলাইট। মাঝারি আকারের একটা ট্রাক এসে ঢুকল লটে। গ্যারেটের ভ্যান থেকে সামান্য দূরে পার্ক করল ওটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল থলথলে শরীরের এক নিগ্রো ড্রাইভার। সস্তা দরের সিগার ফুঁকছে। হাত নাড়ল গ্যারেটের উদ্দেশে।

'ইটস্ টাইম,' রেনফিল্ডকে বলল গ্যারেট। দু'জনে নেমে পড়ল ভ্যান থেকে।

নীল রঙের কভারঅল পরে আছে নিগ্রো লোকটা—গ্যারেটের পূর্ব-পরিচিত... নাম, টেরি জ্যাকসন। তিন বছর হলো স্থানীয় এক শিপিং ওয়্যারহাউস থেকে গ্যারেটের হয়ে স্মাগলিং করা মালামাল বের করে আনছে সে। মোটা অঙ্কের বখরাও পাচ্ছে প্রতি চালান থেকে। তবে তার জানা নেই, আজকের পর শেষ হতে চলেছে ওদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক।

গ্যারেটের সঙ্গে রেনফিল্ডকে দেখতে পেয়ে চোখ সরু করে ফেলল জ্যাকসন। জিজ্ঞেস করল, 'এটা আবার কে?'

'আমার বন্ধু,' সংক্ষেপে বলল গ্যারেট।

'এর আগে তো কোনোদিন বন্ধুবান্ধব আনোনি তুমি?'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকসন। 'বেশ, তুমি যদি তা-ই মনে করো!'

'মাল কি রেডি?' কাজের কথা পাড়ল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।' রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত মুখ মুছল জ্যাকসন। 'ঠিক যেভাবে চেয়েছিলে। তবে জান বেরিয়ে গেছে জিনিসগুলো

আলাদা করতে। পুরো দু'ঘণ্টা লেগেছে আমার। বাড়তি দু'হাজার ডলার দিতে হবে এর জন্য।'

'পাবে। কিন্তু কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্। হিট রেজিস্ট্যাণ্ট গ্লাভ ব্যবহার করবার কথা বলে ভাল করেছ। ক্যাপসুলগুলো ভীষণ গরম।'

'কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য অমন হয়। সাবধান না থাকলে এই ব্যাটারিগুলো সহজেই ওভারহিটেড হয়ে যেতে পারে। তোমাকে তো থারমাল-ইনসুলেশন কণ্টেইনার পাঠিয়েছিলাম, ওর ভিতরে ভরে সিল করেছ তো?'

'অবশ্যই!'

'চলো দেখি।'

ট্রাকের ঝাঁপ তুলে ফেলল জ্যাকসন। দেখা গেল তার পরিশ্রমের ফসল। ট্রেলারের পিছনদিকে শোভা পাচ্ছে কালো রঙের একটা বাক্স—ওটাই থারমাল ইনসুলেশন কণ্টেইনার। ডালার জোড়াগুলো সিলগালা করে দিয়েছে সে। কণ্টেইনারের পিছনে দুই টুকরো হয়ে রয়েছে জলপাই রঙের একটা সিলিণ্ডার সদৃশ বস্তু, গায়ে হাঙরের পাখনার মত কয়েকটা ফিন—গ্যারেটের দরকারি ক্যাপসুলগুলো ওটার ভিতর থেকেই বের করে এনেছে জ্যাকসন। সিলিণ্ডারটা চার ফুট উঁচু, গোড়ায় রাশান অক্ষরে গুটি গুটি করে অনেক কিছু লেখা। এ-ছাড়া পুরো অবয়বটার গায়ে বেশ কিছু ঝাঁঝরি আছে, পিছনে কুলিং ফ্যান—জিনিসটাকে ঠাণ্ডা রাখে ওগুলো।

রেনফিল্ডের কাঁধে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ঝুলছে। সেটা থেকে মাইক্রোফোনের মত একটা জিনিস উঁচু করল সে। ধরল ট্রেইলারের দরজার সামনে।

'কী ওটা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জ্যাকসন।

'ইয়ে... টেম্পারেচার গজ,' মিথ্যে বলল রেনফিল্ড। 'নিশ্চিত

হয়ে নিচ্ছি, জিনিসটা ওভারহিটেড নয়।'

'কী বুঝছ? কোথাও ভুল করেছি আমি?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল জ্যাকসন। কেউ তার কাজে খুঁত খুঁজে বের করুক, তা পছন্দ করে না।

তার প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না রেনফিল্ড। হাতের গজটা কয়েক বার নাড়াচড়া করল মনোযোগের সঙ্গে। মৃদু আওয়াজ হলো যন্ত্রটায়। ডিসপ্লে দেখে গ্যারেটের দিকে ফিরল, 'সেফটি লিমিটের মধ্যে আছি আমরা।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। জ্যাকসনকে বলল, 'আমাদেরকে একটু সাহায্য করো, ফ্রেণ্ড। ভ্যানে তুলে দাও সবকিছু।'

'নিশ্চয়ই!' সানন্দে রাজি হলো নিগ্রো।

ট্রাক থেকে প্রথমে কালো রঙের কন্টেইনারটা নামাল ওরা। ওটা ভীষণ ভারী, তিনজনে ধরবার পরেও রীতিমত যুঝতে হলো ভ্যান পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য।

'বাপরে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যাকসন। 'কীসের তৈরি এটা? সীসা?'

মৃদু হাসল গ্যারেট। নিগ্রো ড্রাইভারের অনুমান একদম ঠিক। তিন-ইঞ্চি পুরু সীসার আস্তরণ রয়েছে কন্টেইনারের দেয়ালে। খানিক বিশ্রামের পর সিলিণ্ডারটা নিয়ে আসা হলো। সবকিছু ভ্যানে তুলবার পর দরজা আটকে দিল রেনফিল্ড।

জ্যাকসন তখন রুমাল দিয়ে আবারও ঘাম মুছছে। বলল, 'ওফ্, জান খারাপ করে দিল! কী ওটা, গ্যারেট? কোনও ধরনের ইঞ্জিন?'

হাসল গ্যারেট। এখন আর গোমরটা জ্যাকসনকে জানাতে সমস্যা নেই। বলল, 'ইঞ্জিন না। ওটা আসলে একটা রেডিও-আইসোটোপ থার্মো-ইলেকট্রিক জেনারেটর।'

'খাইছে! নাম তো দেখি জবরদস্ত। কী কাজে লাগে?'

'রিমোট লাইটহাউসগুলোয় পাওয়ার সাপ্লাই দেয় এই জেনারেটর। সম্পূর্ণ অটোমেটেড। মেইনটেন্যান্স ছাড়া একটানা চলতে পারে বিশ বছর।' জ্যাকসনকে জ্ঞান দিতে পেরে ভাল লাগছে গ্যারেটের। 'আর্কটিক মহাসাগরের এক পেনিনসুলা থেকে জিনিসটা আনিয়েছি আমি। বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওটা জোগাড় করতে।' সোভিয়েত আমলের এসব টেকনোলজি এখন প্রায় বাতিলের খাতায় চলে গেছে, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে রাশার উত্তর উপকূলের বহু লাইটহাউস। মোটামুটি কানেকশন থাকলেই জেনারেটরগুলো খুব সহজে কিনতে পারে যে-কেউ।

'দেখে তো বেশ পুরনো মনে হয়েছে,' মন্তব্য করল জ্যাকসন।

'কমপক্ষে ত্রিশ বছর। আরও বেশিও হতে পারে।'

হেসে উঠল জ্যাকসন। 'ত্রিশ বছরের পুরনো জেনারেটরের ব্যাটারি দিয়ে কী করবে তুমি? এ তো অচল মাল! যাক গে, তাড়াতাড়ি আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।' পেটে হাত বোলাল সে। 'বদহজম হয়েছে বোধহয়, বাড়ি গিয়ে ওষুধ খেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই,' বলে পকেটে হাত দিল গ্যারেট। টাকা নয়, বের করে আনল একটা পিস্তল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল জ্যাকসনের। 'হোয়াট দ্য...'

'এই তো, তোমার পেমেন্ট।'

ছ'ফুট দূর থেকে নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি চালাল গ্যারেট। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তালগোল পাকিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল নিগ্রো চোরাকারবারি। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আছাড় খাবার আগেই।

রেনফিল্ডও চমকে গেছে। হতভম্ব গলায় বলল, 'যিসাস! ওকে গুলি করবে, এ-কথা আগে বলোনি তো?'

'আগে বললে কী লাভ হতো?' বিরক্তি ফুটল গ্যারেটের চোখে। নিজের জ্যাকেটের তলা থেকে কোকেন-ভরা একটা প্যাকেট বের করে গুঁজে দিল জ্যাকসনের কভারঅলের পকেটে। পুলিশ ভাববে ড্রাগ কেনা-বেচা করতে গিয়ে খুন হয়েছে লোকটা।

'এর আগে আমি কাউকে গুলি খেতে দেখিনি,' ভয়ার্ত চোখে লাশের দিকে তাকিয়ে আছে রেনফিল্ড।

'এবার তো অভিজ্ঞতা হলো। কনগ্রাচুলেশন্স!'

দ্রুত ট্রাকের পিছন থেকে ছুটোছাটা সমস্ত জিনিস সরিয়ে নিল দু'জনে। মুছে ফেলল নিজেদের উপস্থিতির সব চিহ্ন।

ভ্যানে চড়ার আগে ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা আরেকবার অন করল রেনফিল্ড। ওটা আসলে গাইগার কাউন্টার—তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র।

'রিডিং কত?' জানতে চাইল গ্যারেট। গাড়ি নিয়ে বহুদূর যেতে হবে ওদেরকে। রেডিয়েশনে অতটা সময় এক্সপোজড্ থাকা বিপজ্জনক কি না, শিয়োর হয়ে নিতে চাইছে।

'বেশি না, দুই মিলিরাড পার আওয়ার,' বলল রেনফিল্ড। 'আস্তানায় যখন ফিরব, ততক্ষণে একটা এক্স-রের চেয়েও কম রেডিয়েশন সইবে আমাদের শরীর।'

গাড়িতে উঠে বসল দু'জনে। ঘাড় ফিরিয়ে কালো কন্টেইনারটার দিকে তাকাল গ্যারেট। ভিতরে চারশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে টগবগ করছে স্ট্রনটিয়াম-৯০ এর প্যালেট। 'ডালা খুললে রিডিং কত হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দু'হাজার র‍্যাডের কম নয়,' বলল রেনফিল্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইগনিশন ঘোরাল গ্যারেট। জ্যাকসনের ট্রাককে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। ত্রিসীমানায় কোনও জনমনিষ্যি নেই। ফাঁকা রাস্তা ধরে হু হু করে গাড়ি ছোটাল সে। নিহত লোকটার জন্য বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না। রেডিয়েশন

পয়েজনিঙের মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টের এক মৃত্যু। ঘাম আর পেটের গড়বড় ছিল প্রাথমিক উপসর্গ। এরপর দেখা দিত বমি, ডায়রিয়া, চুল পড়া, এবং নিয়ন্ত্রণহীন রক্তপাত।

এক হিসেবে পুরনো বন্ধুটির উপকারই করেছে গ্যারেট। দু-দুটো ঘণ্টা রেডিও-অ্যাকটিভ ম্যাটেরিয়ালের সংস্পর্শে থাকার পর বাঁচার কোনও উপায় ছিল না জ্যাকসনের। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়ে মারা যেত। সেই কষ্ট সইতে হলো না তাকে।

উনিশ

ইংল্যাণ্ডে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার গেছে রেমি, কিন্তু সে-সব যাত্রার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। এয়ারপোর্টের হাজারটা ঝক্কি সামলে আট ঘণ্টার ফ্লাইটে হিথ্রো পৌঁছুতে হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশে টিকেট পাওয়া তো আরও বড় ঝামেলা। কিন্তু এবার সেসবের কিছুই সইতে হলো না। জর্জ রেডক্লিফের কাছে নিজেদের চাহিদা জানাবার নব্বুই মিনিটের ভিতর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা প্রাইভেট জেটের গদি আঁটা আরামদায়ক সিটে বসে আছে ও এখন। এয়ারপোর্টের কোনও ফর্মালিটির ভিতর দিয়েই যেতে হয়নি ওকে—জবাব দিতে হয়নি ইমিগ্রেশনের হাজারটা প্রশ্নবাণের, বুকিং করতে হয়নি লাগেজ, লাইন ধরতে হয়নি বিমানে ওঠার জন্য, কিংবা মুখ লুকাতে হয়নি ভক্তরা কেউ ওকে চিনতে পেরে বিরক্ত করবে ভেবে।

এসব সম্ভব হয়েছে নুমা হেডকোয়ার্টারের সুবাদে। ওখান থেকে এয়ারপোর্টের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ফোন করে দিয়েছিলেন মি. রেডক্লিফ; ফলে ভিআইপি লাউঞ্জে মাত্র দশ মিনিট বসতে হয়েছে ওদেরকে। এর মাঝে এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালরা নিজেরাই এসে সিল-ছাপ্পড় মেরে দিয়েছে পাসপোর্টে, তারপর এসকর্ট করে তুলে দিয়েছে নুমার এগজিকিউটিভ জেটে।

সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মুগ্ধ চোখে বিমানের অভ্যন্তরে চোখ বোলাল রেমি। আয়েশী ভ্রমণের জন্য কোনও কিছুর অভাব নেই। একেকটা সিট লেদারে মোড়া, নরম; এত চওড়া যে ওর মত দু'জন বসতে পারবে অনায়াসে। প্রয়োজনে বিছানাও বানিয়ে ফেলা যায়। অটোমেটিক ম্যাসাজের ব্যবস্থাও আছে সিটে। পায়ের তলায় ঘাসের গালিচার মত পুরু কার্পেট, পোর্টহোল ঢেকে রেখেছে দামি পর্দা। বাল্কহেডের গায়ে ছাপান্ন ইঞ্চি পর্দার একটা এলইডি টিভি শোভা পাচ্ছে, সেই সঙ্গে আছে সাউণ্ড সিস্টেম। ছোট একটা বারও আছে বিমানের ভিতর। এতসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে শুধু ওরা তিনজন—রেমি, রানা আর মুরল্যাণ্ড।

'ওয়াও!' সবিস্ময়ে বলে উঠল রেমি। 'তোমরা কি সবসময় এভাবেই ট্র্যাভেল করো?'

'যখন নুমার অফিশিয়াল কাজে যাই,' বলল রানা। 'তবে কেবিনের চেয়ে আমি ককপিটেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

'তুমি বিমানও ওড়াতে পারো? জানতাম না তো!'

'তা হলে বলব রিসার্চে গলদ আছে তোমার। গাড়ি, বিমান আর জাহাজ... সবই চালাতে জানি আমি।'

'ওরে বাবা! এত কিছু?'

'আরও অনেক গুণ আছে ওর,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড। 'বাইরে থেকে যতই শক্ত দেখাক, মনটা ওর কাদার মত নরম।

রোমান্টিকও বটে। চুপি চুপি কবিতা পড়ে।'

'ববি!' কড়া গলায় ডাকল রানা।

হেসে ফেলল রেমি। 'আর আপনি? শুনেছি আপনি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, এককালে নাকি রেঞ্জারও ছিলেন...'

'রেঞ্জার না, নেভি সিল,' শুধরে দিল মুরল্যাণ্ড। 'আর্মির কমাণ্ডোকে রেঞ্জার বলে। ওদের সঙ্গে আমাদের আদায় কাচকলায় সম্পর্ক। নেভি সিলকে রেঞ্জার বলে ডাকলে অপমান করা হয়।'

'সরি। কিন্তু আপনিও রানার মত সকল কাজের কাজী নাকি?'

'উঁহুঁ। ওর মত চিজ দুনিয়ায় দুটো পাবেন না।'

'থ্যাঙ্ক গড। আমি তো ভাবলাম ওভার-অ্যাচিভারদের ক্লাবে পৌঁছে গেছি।'

'ববির কথায় কান দিয়ো না,' রানা বলল। 'বিনয় করছে ও। ওর নিজের অ্যাচিভমেণ্ট কারও চেয়ে কোনও দিক দিয়ে কম নয়। দুনিয়ার সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের একজন বলা যেতে পারে ওকে। ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বেশ কিছু আবিষ্কারও আছে ওর, কিন্তু সেগুলোর কথা আগ বাড়িয়ে কাউকে বলতে যায় না।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রেমি। 'এবার তো মনে হচ্ছে আপনারই ইণ্টারভিউ নিতে হবে আমার অনুষ্ঠানে।'

'ভুলেও ও-কাজ করতে যাবেন না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে সামনাসামনি দেখতে যতই সুন্দর লাগুক, আমার ক্যামেরা ফেস খুবই খারাপ। পর্দায় আমার চেহারা ভেসে ওঠামাত্র দর্শকরা টিভি সেটের সামনে থেকে পালাবে।'

'মিথ্যে কথা বলছ কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা। রেমির দিকে তাকাল। 'আসল ঘটনা ভিন্ন। ভুয়া নামে ফেসবুকে অন্তত দশটা অ্যাকাউণ্ট খুলেছে ও—মেয়েদেরকে পটাবার জন্য। টিভিতে সাক্ষাৎকার দিতে গেলে সত্যিকার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

'কী-ই-ই!' রেগে গেল মুরল্যাণ্ড। 'আমি ভুয়া নামে মেয়ে পটিয়ে বেড়াচ্ছি?'

'চাইলে এখুনি হাতেনাতে প্রমাণ দেখাতে পারি,' বলল রানা। 'কিন্তু সময় নেই। আপাতত লণ্ডনে পৌঁছুবার পরে আমরা কী করব না করব, সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'বেশ, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া নাহয় পরেই হবে।'

'কখন পৌঁছুব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'আশা করছি দুপুর দুটোয়—লোকাল টাইম,' বলল রানা। 'বিকেল আর সন্ধ্যাটা কাজে লাগানো যাবে।'

'বিশ্রাম পাব না?' গোমড়ামুখে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'সরি, বিশ্রাম যা নেবার বিমানেই নিয়ে নাও। আমাদের হাতে সময় কম। ইন ফ্যাক্ট... সময় বাঁচাবার জন্য লণ্ডনে নেমে দু'ভাগ হয়ে কাজ করবার কথা ভাবছি আমি।'

'ওখানে ছাই কীসের জন্য যাচ্ছি, তা-ই কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয় আমার কাছে! একটু খুলে বলবে?'

'সংক্ষেপে শুনবে, নাকি বিস্তারিত?'

'এমনভাবে বলো, যাতে এখুনি ঘুমিয়ে না পড়ি। তুমি তো আবার সুযোগ পেলেই লেকচার দিতে শুরু করো।'

'আর তুমি বুঝি সুযোগ পেলেই ঘুমাও না?'

'ঝগড়া বন্ধ!' রানা আর ববির মাঝখানে নাক গলাল রেমি। 'আমিই ব্যাখ্যা করছি। ববি, আপনি অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের নাম শুনেছেন?'

'ওটা আবার কী?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড।

নিজের ল্যাপটপ কম্পিউটার অন করল রেমি। রওনা হবার আগেই ইণ্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডেটা ডাউনলোড করে এনেছে; সেখান থেকে একটা ছবি ওপেন করল। স্ক্রিনে ভেসে

উঠল ব্রোঞ্জে তৈরি একটা ক্ষয়ে-যাওয়া প্রাচীন ডিভাইস—তিন টুকরো হয়ে আছে। ভাঙা টুকরোগুলোর ভিতরে দেখা যাচ্ছে খাঁজকাটা ছোট-বড় বেশ কিছু গিয়ার।

'মনে তো হচ্ছে এটা পুরনো কোনও ঘড়ি,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড। 'কয়েক শ' বছর ধরে পড়ে ছিল মাটি-কাদার ভিতরে।'

'কয়েক শ' নয়... আসলে পড়ে ছিল দু'হাজার বছর,' বলল রানা। অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজম নামের এই বস্তুটির সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে আর্কিমিডিসের জিয়োলেবের। এই সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ায় ইন্টারনেট থেকে ছবি আর তথ্য নামিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে ও আর রেমি।

'গ্রিক আইল্যাণ্ড অ্যান্টিকাইথেরার উপকূলে একটা শিপরেক থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে উদ্ধার করা হয় এই টুকরোগুলো,' বলল রেমি। 'শুরুতে বহু বছর কেউ গুরুত্ব দেয়নি এর; কিন্তু পরে এক আর্কিয়োলজিস্ট প্রমাণ করেন—যন্ত্রটা যে-আমলের, সে-আমলে খাঁজকাটা গিয়ারের অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের জানামতে এই প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে মাত্র পাঁচ শ' বছর আগে! অথচ দু'হাজার বছরের পুরনো এই মেকানিজমে দেখা যাচ্ছে চাকাগুলো... ব্যাপারটা অনেকটা মধ্যযুগের ডানজনের ভিতর আইবিএম কম্পিউটার পাবার মত! আসলেও তাই। অনেকে মনে করেন, এটাই পৃথিবীর প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটার।'

'কী কম্পিউট করে এটা?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুরল্যাণ্ড।

'এ-নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বেশিরভাগ এক্সপার্টের ধারণা, অ্যাস্ট্রোনমিকাল প্রেডিকশনের জন্য ব্যবহার হতো এই ডিভাইস। মানে, গ্রহ-নক্ষত্রের মুভমেণ্ট, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ইত্যাদি। প্রাচীনকালের চাষাবাদ আর ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সৌর-ক্যালেণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সম্ভবত ওসবই ক্যালকুলেট করা হতো জিনিসটার সাহায্যে।'

বাটন টিপে ল্যাপটপের স্ক্রিনে আরেকটা ছবি তুলে আনল ও। কাঁচের কেইসে সাজানো চকচকে একটা ব্রোঞ্জের ডিভাইস দেখা যাচ্ছে ওতে। ঘড়ির মত দুটো ডায়াল আছে ওটার গায়ে, একপাশে একটা নব। ডায়ালে রয়েছে গ্রিক মার্কিং। কিনারগুলো স্বচ্ছ হওয়ায় চোখে পড়ছে কেসিঙের ভিতরের ছোট-বড় নানা আকারের গিয়ার।

'অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামে রাখা অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা এটা,' বলল রানা। 'শিপরেক থেকে পাওয়া টুকরোগুলোর আদলে রিপ্রোডাকশন করা হয়েছে।'

'দেখতে তো আমাদের জিয়োলেবের মতই লাগছে,' ভ্রূকুটি করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ, যথেষ্ট মিল আছে। তবে এটা অসম্পূর্ণ... নবও মাত্র একটা। কারণ গ্রিকরা এটা বানিয়েছে ভাঙাচোরা আর্টিফ্যাক্ট দেখে। কিন্তু আমাদেরটা বানাবার সময় ডিটেইলড্ ড্রয়িং ছিল গ্যারেটের হাতে। আমার তো মনে হয়, জিনিসটা অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমেরই একটা ভার্শান।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, কোডেক্সটা আসলে ওই জিনিস বানাবার ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল?'

'অনেকটা সেরকমই,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, আর্কিমিডিস যে এই মেকানিজমের ডিজাইনার, সেটার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই কোডেক্স থেকে।'

'আর্কিমিডিস?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'মানে যে-ভদ্রলোক ন্যাংটো অবস্থায় *ইউরেকা, ইউরেকা* বলে ছুট লাগিয়েছিলেন?'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে একসঙ্গে হেসে উঠল রানা আর রেমি। আর্কিমিডিস সম্পর্কে প্রচলিত এক গল্প ওটা। সাইরাকিউজের রাজা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটা সোনার মুকুটে কোনও খাদ

আছে কি না সেটা বের করবার। শর্ত ছিল, মুকুট না ভেঙে সে-কাজ করতে হবে। সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে অকূল পাথারে পড়ে যান আর্কিমিডিস। পরে একদিন বাথটাবে গোসল করতে নেমে আচমকা তিনি আবিষ্কার করে বসেন পানির প্রতিস্থাপন তত্ত্ব—পানিতে ডোবানো হলে যে-কোনও বস্তু তার ওজনের সম-পরিমাণ পানি প্রতিস্থাপিত করে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত মুকুট-রহস্যের সমাধান করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে, কৌশলটা আবিষ্কার করতে পেরে আর্কিমিডিস এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, বাথরুম থেকে দিগম্বর অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন... রাস্তায় দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার জুড়েছিলেন *ইউরেকা*, অর্থাৎ *পেয়েছি* বলে।

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বলল রেমি। 'তিনিই।'

'ওই লোক তো বোধহয় ডেথ রে-ও আবিষ্কার করেছিল?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'তার কোনও সত্যিকার ভিত্তি নেই,' বলল রেমি। 'বলা হয়ে থাকে, দুই শ' চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমান-রা হামলা চালিয়েছিল গ্রিসে। আর্কিমিডিস তখন রাজার নির্দেশে ওদেরকে ঠেকাবার জন্য ডেথ রে, বা মরণরশ্মি নামের ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র তৈরি করেন। লেন্সের সাহায্যে সূর্যের আলোকে ফোকাস করত ওই অস্ত্র। চোখের নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারত যে-কোনও কিছুতে। তীরে ভেড়ার আগেই রোমানদের পুরো নৌ-বহর নাকি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল মরণরশ্মির সাহায্যে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেও আর্কিমিডিসের ওই রশ্মি তৈরি করতে পারেননি। তাই ধরে নেয়া হয়, ওটা স্রেফ গল্প... সত্যি নয়। তাই বলে আর্কিমিডিসের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও। অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক ছিলেন তিনি—এ-কথা এক বাক্যে স্বীকার করে সবাই।'

'এই কোডেক্স দেখলেই সেটা বোঝা যায়,' যোগ করল রানা 'শুধু জিয়োলেব নয়, এর ভিতরে আরও অনেক যন্ত্র বানাবারই কৌশল লেখা আছে।'

'সন্দেহ নেই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু আর্কিমিডিসের সঙ্গে রাজা মাইডাসের কী সম্পর্ক?'

'জিয়োলেবের সাহায্যে মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছুবার ম্যাপ বা নকশা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছি আমরা।' কোডেক্সের প্রিন্টআউটের একটা পাতা খুলল রেমি। 'এই যে, এখানে লেখা আছে: যার হাতে নকশা থাকবে, সে-ই পাবে মাইডাসের ঐশ্বর্য।'

'ঐশ্বর্য?' হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কাজের কথা শুনলাম। কীভাবে পাওয়া যাবে ওই নকশা?'

হতাশা ফুটল রেমির চেহারায়। 'জানি না। কোডেক্সটা অসম্পূর্ণ। জিয়োলেব সংক্রান্ত দুটি দরকারী ইন্সট্রাকশন নেই ওতে।'

'তোমার কেনা ওই সুইডিশ এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার জোড়া দিতে গিয়ে কী সমস্যা হয়েছিল, মনে আছে?' বলল রানা। 'ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়েলের কয়েকটা পাতা ছেঁড়া ছিল।'

'আরেকটু হলেই পুরো জিনিসটা উল্টো করে জোড়া লাগাচ্ছিলাম আমরা... সে-কথা কি ভোলা যায়?' মুখ কালো করে বলল মুরল্যাণ্ড।

'এখানেও অনেকটা একই সমস্যা।'

'কী রকম?'

'জিয়োলেবটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেটা লেখা থাকার কথা ওই পাতাগুলোয়,' ব্যাখ্যা করল রেমি। 'কোডেক্স বলছে, ডিভাইসটার রহস্য ভেদ করতে হলে তিনটে সূত্র অনুসরণ করতে হবে। প্রথম সূত্র হলো, ক্যালিব্রেশন—জিয়োলেবের সবগুলো কাঁটা বারোটার পজিশনে আনতে হবে। তা আমরা

করেছি। কিন্তু এরপর কী করতে হবে, সেটা আর জানি না। পুরোটাই আসলে এক ধরনের সিকিউরিটি সিস্টেম, যাতে কোডেক্সের মালিক ছাড়া আর কেউ জিয়োলেব ব্যবহার করতে না পারে।'

'আজকাল পাসওয়ার্ড আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দিয়ে যেভাবে যন্ত্রপাতির অবৈধ ব্যবহার ঠেকানো হয়, অনেকটা সে-রকম,' বলল রানা।

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে নিই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এই কোডেক্স তা হলে শুধু জিয়োলেব তৈরির নিয়ম এবং ওটার ক্যালিব্রেশন শেখাচ্ছে আমাদেরকে?'

'বানাবার নিয়মটাই শুধু লেখা আছে পরিষ্কারভাবে,' রেমি বলল। 'ক্যালিব্রেশনের জন্য স্টোমাকিয়োনের ধাঁধা দেয়া হয়েছে। সেটা আমরা ভেদ করেছি। কিন্তু ডিভাইসটা অপারেট করবার জন্য বাকি দুটো সূত্র একান্তই জরুরি।'

'সূত্রদুটো কী কী?'

প্রিন্টআউটের আরেকটা পাতা উল্টাল রেমি। 'এই যে, এখানে লুকানো মেসেজের কথা লেখা আছে।' কাগজের এক জায়গায় আঙুল ঠেকাল ও। 'এই শব্দটা হলো *স্টেগানোস...* মানে লুক্কায়িত। আর এটা হচ্ছে *গ্রাফেইন...* মানে, লেখা।'

'স্টেগানোগ্রাফি?'

'সরাসরি মানে করলে দাঁড়ায়, লুকানো বার্তা। মেসেজটা যা-ই হোক না কেন, লুকানো অবস্থাতে আছে। আর আমি অনুমান করতে পারছি সেটা কোথায়।'

'কোডেক্সের সঙ্গে পাওয়া মোমফলক,' বলল রানা। 'ওটাই আমাদের দ্বিতীয় সূত্র।'

'এবার বুঝতে পারছি তোমাদের মতলব,' বড় করে শ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'ট্যাবলেটটা নিশ্চয় এখনও ইংল্যাণ্ডেই আছে,

তাই না?'

'হ্যাঁ। অকশন হাউস থেকে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজ নামে এক কোম্পানি কিনেছে ওই মোমফলক। কেন্টে ওদের একটা প্রাইভেট এস্টেট আছে।'

'ফলকটা ওরা আমাদেরকে দেখতে দেবে?'

'চেষ্টা করে দেখব। আজ বিকেলেই রেমিকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি আমি।'

'আর আমি তখন কী করব? লণ্ডনের পাবগুলোয় ঢুঁ মেরে বেড়াব? মন্দ হয় না তা হলে।'

'উঁহুঁ। তুমি যাবে তৃতীয় সূত্রের খোঁজে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।'

'মিউজিয়াম?' এমনভাবে মুখ বাঁকাল মুরল্যাণ্ড, যেন ময়লা ঘাঁটতে বলা হয়েছে তাকে। 'কেন?'

'গ্যারেট বলছিল মাইডাসের সমাধি আছে নেপলস্ শহরের তলায়,' বলল রেমি। 'আর আর্কিমিডিসের কোডেক্স বলছে, সেটার সূত্র পাওয়া যাবে নিয়াপোলিসের পূর্বসূরিদের কামরায়। নেপলস্-এর গ্রিক নাম নিয়াপোলিস।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নেপলস্-এর পূর্বসূরিদের কামরা থাকে কী করে?' ঠাট্টা করল মুরল্যাণ্ড, 'মিউজিয়ামটা পুরনো... তাই বলে এত পুরনো, তা তো জানতাম না!'

'কামরা-টামরা না,' হাসি চেপে বলল রেমি। 'আপনি ওখানে যাবেন এলজিন মার্বলস-এর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।'

'এলজিন মার্বলস্?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফুটল মুরল্যাণ্ডের খোঁজে।

'আঠারো শতকের শুরুর দিকে গ্রিসের পার্থেনন থেকে লর্ড এলজিন বেশ কিছু মার্বেলের মূর্তি এবং খোদাই করা প্রস্তরখণ্ড উদ্ধার করে এনেছিলেন। ওগুলোকেই এলজিন মার্বলস্ বলে। ব্রিট্রিশ মিউজিয়ামের ডিসপ্লে-তে আছে ওগুলো।'

'তো?'

'আমার ধারণা, এটাও এক ধরনের ধাঁধা। নিয়াপোলিসের আদি-নাম ছিল পার্থেনোপ... তারমানে পার্থেনোপ-ই নিয়াপোলিসের পূর্বসূরি। তার অর্থ দাঁড়ায়, পার্থেনোপের কামরার কথা বলেছেন আর্কিমিডিস। পার্থেনোপের অর্থ হচ্ছে, কুমারী নগরী। কাজেই কুমারী নগরীর কামরাকে কুমারীর কামরাও বলা যেতে পারে অনায়াসে।'

'এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না,' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি কিন্তু আমার মাথার ভিতরে জট লাগিয়ে দিচ্ছেন।'

'কুমারীর কামরাকে গ্রিক ভাষায় কী বলে, জানেন?' একটু হাসল রেমি। 'পার্থেনন!'

'পার্থেনন?' কপালে ভাঁজ পড়ল মুরল্যাণ্ডের। 'মানে অ্যাথেন্সের অ্যাক্রোপোলিসের ডগায় যে প্রাচীন মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটার কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। হাতের প্রিন্টআউটের দিকে ইশারা করে বলল, 'এখানকার ধাঁধার সহজ-সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়—জিয়োলেব নিয়ে পার্থেননে যাও... তা হলে হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা তোমাকে পথ দেখাবে।'

'এটা সহজ-সরল অর্থ হয় কী করে? কী বোঝাতে চাইছেন আর্কিমিডিস?'

হতাশায় মাথা নাড়ল রেমি। 'জানি না। আমি ক্লাসিকাল লিটারেচারের বিশেষজ্ঞ, আর্কিটেকচারের নই। এ-জন্যই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে একজন এক্সপার্ট খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে। কারণ... বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন... আর্কিমিডিসের ম্যাপের তৃতীয় সূত্রটা লুকিয়ে আছে পার্থেননে!'

বিশ

গ্যারাজ ডোর খুলে যাওয়ার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। হাতঘড়ি কেড়ে নিয়েছে কিডন্যাপাররা, কাজেই বুঝতে পারলেন না ক'টা বাজে। তবে প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার; ডিনার হিসেবে স্যাণ্ডউইচ খেয়েছিলেন, তা হজম হয়ে গিয়ে আবার খিদে পেতে শুরু করেছে; কাজেই আন্দাজ করলেন ভোর হতে বেশি দেরি নেই। বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ফোকরের ঢাকনা লাগানো, কিন্তু ওটা জং-ধরা। আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতেই ছোট্ট একটা ফাটল দেখা দিল। সেখান দিয়ে বাইরে তাকালেন অ্যাডমিরাল।

ঢাকনাটার আসলে যে কী প্রয়োজন, তা এখনও বুঝতে পারছেন না তিনি। বন্দিদের দৃষ্টি থেকে কী লুকাতে চাইছে এরা? চেহারা নয়... কারণ অপহরণের সময় দুই কিডন্যাপারের চেহারা খুব ভালভাবেই দেখতে পেয়েছেন হ্যামিলটন। সেটাও একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। চেহারা এবং নাম... দুটোই ফাঁস করেছে ওরা; তারমানে দুই ভিকটিমকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবার কোনও প্ল্যান নেই ওদের।

পালানোটা তাই অতি জরুরি হয়ে উঠেছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং বন্দি মেয়েটির জন্য। ওর নামও ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন তিনি—র‍্যাচেল বলে ওকে ডাকছিল কিডন্যাপাররা। মেয়েটার কান্নার শব্দ পেয়েছেন অ্যাডমিরাল, তবে

সে-শব্দ জোরালো নয়। পাশের কামরায় নয়, একেবারে শেষ মাথার কামরায় রাখা হয়েছে ওকে, যাতে দুই বন্দি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। দেয়ালে টোকা দিয়ে কয়েক দফা মেয়েটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন হ্যামিলটন, কিন্তু জবাব পাননি। কথা বলতে চাইলে গলা চড়িয়ে চেঁচাতে হবে, সেটা সম্ভব নয়। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

ঢাকনার ফাটলে চোখ রাখতেই দ্বিতীয় একটা ভ্যানকে ব্যাক করে ওয়্যারহাউসে ঢুকতে দেখলেন অ্যাডমিরাল। প্রথম ভ্যানটার পাশে এসে থামল ওটা। ইঞ্জিন বন্ধ হলো, ক্যাব থেকে নেমে এল নতুন দু'জন মানুষ। শ্বেতাঙ্গ। একজন খানিকটা মোটাসোটা, গায়ে নোংরা পোশাক। দ্বিতীয়জন ছিপছিপে গড়নের, চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কেন যেন মনে হলো, এই লোকই এসব কর্মকাণ্ডের হোতা।

চোখ কচলাতে কচলাতে দুই নবাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেল কাটনার আর বেনসন। ভ্যানের পিছনে মিলিত হলো সবাই। নিচু গলায় কুশল বিনিময়ের পর ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে ধরল নোংরা পোশাক পরা লোকটা, বাকিরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকাল ভ্যানের ভিতরদিকে। কী আছে ওখানে কে জানে।

'জিনিসটা ধরা নিরাপদ তো, গ্যারেট?' জিজ্ঞেস করল কাটনার। আবছাভাবে তার গলা শুনতে পেলেন অ্যাডমিরাল।

'রেনফিল্ড,' নোংরা পোশাকধারীর দিকে ঘাড় ফেরাল গ্যারেট নামের লোকটা, 'ওদেরকে রিডিং দেখাও।'

এদিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে রেনফিল্ড, কাজেই অ্যাডমিরাল দেখতে পেলেন না, তার হাতে কী আছে। কয়েক দফা হাত নাড়ল সে, তারপর ভোল্টেজ মিটারের মত একটা জিনিস দেখাল সঙ্গীদেরকে।

'দেখলে?' বলল রেনফিল্ড। 'কোনও সমস্যা নেই।'

'তাও ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল কাটনার।

'তা হলে কী পছন্দ তোমার? দুই মিলিয়ন ডলার?' বিরক্ত গলায় বলল গ্যারেট।

'সেটা কার না পছন্দ বলো?'

'এমনি এমনি পাচ্ছ না টাকাটা... বিপজ্জনক কাজের বিনিময়ে পাচ্ছ। কথা কম। জিনিসটা নামিয়ে আনো ভ্যান থেকে, টেবিলের উপর রাখো।'

একজনকেই দুই মিলিয়ন ডলার! ভ্রূকুটি দেখা দিল অ্যাডমিরালের কপালে। মুক্তিপণ হিসেবে কত টাকা পাবে বলে ভাবছে ওরা?

ভ্যানে উঠে গেল চার দুর্বৃত্ত। একটু পরেই ধরাধরি করে একটা কালো বাক্স নামিয়ে আনল। আকারে খুব বড় নয় ওটা, কিন্তু লোকগুলোকে বাঁকা হয়ে যেতে দেখে বোঝা গেল, জিনিসটা অত্যন্ত ভারী। কী আছে ভিতরে?

টেবিলের উপর বাক্সটা রেখে ঘিরে দাঁড়াল চারজনে। ফলে ওটার খুঁটিনাটি দেখতে পেলেন না অ্যাডমিরাল।

'আমাদের অতিথিদের খবর কী?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'ভাল,' বলল বেনসন। 'অ্যাডমিরাল শুরুতে একটু তেড়িবেড়ি করতে চাইছিল, কিন্তু ওকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি আমরা। আর মেয়েটা এখনও ড্রাগের প্রভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে। পুরোপুরি জেগে ওঠেনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দরজার দিকে তাকাল গ্যারেট। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি, ফাটলটা দেখতে পাচ্ছে নাকি? কিন্তু এত সরু ফাটল তো অত দূর থেকে দেখা যাবার কথা নয়! তাঁর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সামনে তাকাল গ্যারেট। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'হ্যামিলটনের

ব্যাপারে খুব সাবধান। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। বুড়ো হলে কী হবে, খুবই চালু মাল।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' তাকে আশ্বস্ত করল বেনসন। 'আমরাও কম চালু নই।' ভ্যানের দিকে ইশারা করল। 'বাকি জিনিসগুলোর কী হবে?'

'ওয়্যারহাউসের ওই মাথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো,' বলল গ্যারেট। 'বাইরে ফেলা ঠিক হবে না। কেউ খুঁজে পেলে সমস্যা হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল কাটনার আর বেনসন। ইঞ্জিন চালু করে ওটাকে নিয়ে গেল ওয়্যারহাউসের এক প্রান্তে। ওখানে পৌঁছুনোর পর পিছন থেকে নানা রকম লোহার টুকরো, নাট-বল্টু, ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল মেঝের উপরে।

গ্যারেটের দিকে মনোযোগ দিলেন অ্যাডমিরাল, রেনফিল্ডের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে সে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে দলনেতা, অল্প কয়েকটা শব্দ শুধু উদ্ধার করা গেল।

'ট্রাক... সোমবারের মধ্যে... যথেষ্ট ডাস্ট... ব্যাঙ্ক... ত্রিশ বছর...'

এইসময়ে আবার স্টার্ট নিল দ্বিতীয় ভ্যানের ইঞ্জিন—ওটাকে আগের জায়গায় নিয়ে আসছে কাটনার আর বেনসন। গ্যারেটের কণ্ঠ পুরোপুরি চাপা পড়ে গেল। ভ্যানটা সরে আসায় ওয়্যারহাউসের কোনায় ডাম্প করা জিনিসগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলেন হ্যামিলটন।

দৃষ্টিশক্তি খুবই ভাল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। বয়সের কারণে রিডিং গ্লাস ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু দূরের জিনিস আজও স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। দুর্বৃত্তদের ফেলে রাখা জিনিসগুলোর মাঝে সিলিণ্ডারের মত একটা আকৃতি ধরা পড়ল তাঁর চোখে। পুরোপুরি সিলিণ্ডার বলা চলে না, ওটার গায়ে ফিন-ও

দেখতে পাচ্ছেন।

সবুজ রঙের অদ্ভুত জিনিসটা চেনা চেনা লাগছে অ্যাডমিরালের কাছে। একবার ভাবলেন অচেনা ডিজাইনের কোনও কম্প্রেশার হতে পারে, কিন্তু একটু পরেই বদলে গেল ধারণাটা। সিলিণ্ডারের গোড়ায় রাশান হরফ ফুটে আছে... আর তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ে গেল সব। এই জিনিসের ছবি তিনি আগেও দেখেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির অন্যতম সদস্য অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। শত্রু দেশের হাতে কী কী ধরনের মারণাস্ত্র থাকতে পারে, এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে কীভাবে ঠেকানো যাবে... সে-সব নিয়েই কাজ করে এই কমিটি। নিউক্লিয়ার, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ওয়েপন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানও রাখেন তিনি। বছরদুই আগে কমিটি-সদস্য হিসেবে একটা সরকারি প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে রাশায় যেতে হয়েছিল তাঁকে—রুশ সরকারের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের একটা মিটিং করবার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি বলে আর কিছুই নেই রাশা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোয়। সোভিয়েত আমলের বহু অস্ত্র-শস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল গায়েব হয়ে গেছে। টেরোরিস্টদের জন্য সে-সব জিনিস অত্যন্ত সহজলভ্য। যে-কোনও সময় চোরাই ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে আণবিক বোমা বানাতে পারে ওরা, আমেরিকার মাটিতে পাচার করতে পারে। এ-ধরনের ঘটনা ঠেকানোর জন্য রুশ সরকারের সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

আলোচনার এক পর্যায়ে উঠে আসে ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের বাইরে অন্যান্য নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালের প্রসঙ্গ। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা রয়েছে রেডিও-আইসোটোপ

থারমাল জেনারেটর, সংক্ষেপে আরটিজি থেকে।

আর্কটিক সাগরে চলাচলকারী হাজারো জাহাজের নেভিগেশনে সাহায্য করবার জন্য রাশার বিশাল উপকূল এলাকায় রয়েছে কয়েক শ' লাইট হাউস ও সিগনাল স্টেশন। দুর্গম এলাকায় স্থাপিত এতসব স্টেশনে লোক নিয়োগ করা কঠিন... আরও কঠিন নিয়মিত ওসব জায়গায় ফিউয়েল পৌঁছানো কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করা। সোভিয়েত আমলে সে-কারণে অটোমেটেড করে ফেলা হয়েছিল এসব লাইটহাউস এবং সিগনাল স্টেশনকে। প্রায় সবগুলোতেই স্থাপন করা হয়েছিল আরটিজি, কারণ ওগুলো বছরের পর বছর কোনও ধরনের মেইনটেন্যান্স ছাড়াই চলতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, এবং পরবর্তী সময়ে মিলিটারি বাজেটে কাটছাঁট করবার কারণে এ-সব স্থাপনা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হয়ে পড়ে অচল। ফলে স্থানীয় তস্করদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে লাইটহাউস এবং সিগনাল স্টেশনগুলো। প্রায়ই লোহা বা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট চুরির জন্য হানা দেয় ওরা, কখনও কখনও নিজের অজান্তেই খোলস ভেঙে বের করে আনে জেনারেটরের অভ্যন্তরের পাওয়ার সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত স্ট্রনটিয়াম-৯০ ভরা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল। এ-ধরনের একটা ঘটনার উদাহরণও দেয়া হয় মিটিঙে।

বছর তিন আগে, জর্জিয়ার এক গ্রামের তিনজন শিকারি পরিত্যক্ত এক লাইটহাউস থেকে চুরি করে আনে কয়েকটা ক্যাপসুল, ভেবেছিল ক্যাম্পফায়ার না জ্বেলে ওগুলোর তাপেই শরীর গরম রাখবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভয়াবহ রেডিয়েশন পয়েজনিঙে আক্রান্ত হয় ওরা। একজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে, বাকি দু'জনকে হাসপাতালে নেয়া হলেও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার পর ওরাও মারা

যায়। এ-রকম আরও ঘটনা আছে।

ওয়্যারহাউসের এককোণে পড়ে থাকা সবুজ সিলিণ্ডারটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রুশ অথরিটির দেখানো আরটিজি-র ছবির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে ওটা। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, ওটা স্রেফ খোলস। ভিতরের জিনিস বের করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, কেন কালো বাক্সটা এত ভারী। নিশ্চয়ই সীসার আবরণ রয়েছে ওর ভিতরে। আবরণের আড়ালে রাখা হয়েছে জেনারেটর থেকে বের করে নেয়া স্ট্রনটিয়াম-৯০।

পরিষ্কার বুঝতে পারছেন অ্যাডমিরাল, নিছক কিডন্যাপিঙের কবলে পড়েননি তিনি বা র‍্যাচেল নামের অচেনা মেয়েটি। আরও অনেক বড়... অনেক ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা রয়েছে লোকগুলোর। যেভাবেই হোক, এ-খবর নুমা পর্যন্ত পৌঁছুতেই হবে তাঁকে। কিন্তু কীভাবে?

মাথা ঘামাতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। পালাবার চিন্তা করছেন না আর।

একুশ

জোরালো টেইলউইণ্ডের আনুকূল্য পাওয়ায় দুপুর দুটো বাজার বিশ মিনিট আগেই লণ্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল নুমার গালফস্ট্রিম জেট। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের ফর্মালিটি সারতে সময় লাগল আধঘণ্টা, এরপরেই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল

রানা, মুরল্যাণ্ড আর রেমি। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা থেকে একটা গাড়ি পাঠানো হয়েছে, সেটা নিয়ে রাজধানীর পশ্চিমে... কেন্টে যাবে রানা আর রেমি, ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রাইভেট এস্টেটে। বিমান থেকেই ওদেরকে ফোন করেছিল রানা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল এস্টেটের মালিকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কাঠখোট্টা স্বভাবের এক অ্যাসিসটেন্ট রিসিভ করেছিল সেই ফোন, বলে দিয়েছিল—তার বস অত্যন্ত ব্যস্ত; কারও সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই তাঁর! এ-অবস্থায় রানার হাত থেকে ফোনের রিসিভার চেয়ে নেয় রেমি, নিজের সিলেব্রিটি ক্রিডেনশিয়াল ব্যবহার করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আদায় করে নিয়েছে সে। *চেজিং দ্য পাস্ট* ইংল্যাণ্ডেও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান; সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা বিশেষ কাজে এস্টেটে আসতে চাইছে শুনে আর গাঁইগুঁই করেনি অ্যাসিসটেন্ট। বসের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে বলে দিয়েছে—ওরা যদি তিনটে থেকে চারটার মধ্যে আসতে পারে, তা হলে দেখা করবেন তিনি।

মুরল্যাণ্ডের গন্তব্য উল্টো দিকে—একেবারে লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্রে যেতে হবে ওকে, রাশ আওয়ারের ট্রাফিক ঠেলে। যানজট এড়াবার জন্য ট্যাক্সি নেবে না বলে ঠিক করেছে ও। বাস ধরে প্যাডিংটন স্টেশনে যাবে, সেখান থেকে পাতাল-রেলে চেপে হোলবর্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম পর্যন্ত বাকি পথটুকু হেঁটেই চলে যেতে পারবে। রানা আর রেমির চেয়ে সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে ও। কোডেক্সের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি... সেইসঙ্গে একটা পাতার ছবি ই-মেইল করতেই ড. টেরেন্স ফিলবি নামে জনৈক আর্কিয়োলজিস্ট সাগ্রহে রাজি হয়েছেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পার্থেনন বিষয়ক রেসিডেন্ট এক্সপার্ট।

এজেন্সি থেকে পাঠানো রেঞ্জ রোভারের পিছনে জিয়োলেবটা

তুলল রানা, মোমফলক দেখবার সময় ওটা কাজে লাগতে পারে। মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এরপর গাড়িতে উঠে বসল ও আর রেমি। রওনা হয়ে গেল কেন্টের উদ্দেশে।

গাড়ি থেকেই ল্যারি কিং-কে ফোন করল রানা, গ্যারেটের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে কি না জানবার জন্য।

'হ্যালো?' দু'বার রিং হবার পর শোনা গেল ল্যারির ক্লান্ত গলা। ওয়াশিংটনে এখন ভোর ছ'টা।

স্পিকার অন করল রানা। 'ল্যারি, আমি রানা। কী ব্যাপার, রাতে ঘুমাওনি?' ততক্ষণে মোড় নিয়ে বেসিংস্টোক-অভিমুখী এম-থ্রি মোটরওয়েতে উঠে এসেছে রেঞ্জ রোভার।

'কাজের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য জিরিয়ে নিয়েছি,' বলল ল্যারি। 'পরে ঘুমাব।'

'থ্যাঙ্কস, ল্যারি। কোনও খবর আছে?'

'উঁহুঁ। আমেরিকার সমস্ত ডেটাবেজ খুঁজে দেখেছে ভিনাস, কিন্তু তোমার অ্যান্থনি গ্যারেটের কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। লোকটাকে ভূত বললে কম বলা হয় না। ফিঙ্গারপ্রিন্টও নেই আমাদের কাছে, পিঠ তাই দেয়ালে ঠেকে গেছে বলতে পারো।'

সিয়াটল থেকে রওনা হবার আগেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের খোঁজে ডাস্টিং করা হয়েছিল জিয়োলেবের গায়ে। কিন্তু তাতে কিছুই পাওয়া যায়নি। গ্যারেট অত্যন্ত সতর্ক, নিশ্চয়ই গ্লাভ ব্যবহার করেছে ডিভাইসটা নাড়াচাড়া করবার সময়।

'অকশন হাউসের ডাকাতি সম্পর্কে কী জানতে পারলেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ওই রহস্যেরও কিনারা করতে পারেনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড,' ল্যারি বলল। 'ডাকাতদের তো ধরতে পারেইনি, খোয়া যাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলোও এখন পর্যন্ত উদয় হয়নি কোথাও।'

'ওগুলো কি তা হলে বিক্রি করেনি? হাতটা নাহয় রেখে দিল,

কিন্তু বাকি জিনিস বেচেই তো ক্যারিবিয়ানে রিটায়ারমেন্টে যেতে পারত গ্যারেট।'

'হয়তো টাকার পরিমাণটা যথেষ্ট মনে হয়নি তার কাছে। মাইডাস চেম্বার খুঁজে পেলে আরও অনেক বেশি ধনী হতে পারবে গ্যারেট। আমি এরই মধ্যে কিছুটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি। ও বলেছে, সোনার মূর্তিটা ছ'ফুট বাই ছ'ফুট সাইজের একটা ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই না?'

'চেম্বারের দেয়ালগুলোও সোনার তৈরি,' যোগ করল রানা।

'দেয়ালের পুরুত্ব জানি না আমরা, কাজেই আপাতত ওগুলোর কথা থাক। শুধু মূর্তির ভিত-টা নিয়েই হিসেব করি। সোনার আনবিক ঘনত্ব খুবই বেশি, এ-কারণে ছ'ফুটের একটা নিরেট কিউবের ওজন হবে... যদি চব্বিশ ক্যারাটের সোনা ধরি... এক লক্ষ আঠারো হাজার কিলোগ্রাম। মানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ আউন্স। বর্তমান রেটে খোলা বাজারে এই সোনার দাম দাঁড়াচ্ছে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির। 'বিলিয়ন?'

'হ্যাঁ। রেটের তারতম্যের কারণে সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে বিলিয়নের হিসাবের নীচে কিছুতেই নামবে না।'

আর্কিমিডিসের ধাঁধা আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চিন্তায় এতই ব্যস্ত ছিল রানা, সোনার হিসেব করবার কথা মাথাতেই আসেনি। এখন ল্যারির মুখে টাকার অঙ্কটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ছয় বিলিয়ন ডলার! তাও কি না শুধু মূর্তির পা'দানি-র দাম! সব মিলিয়ে তা হলে কত টাকার সোনা পাওয়া যাবে মাইডাস চেম্বারে? এর এক শ' ভাগের এক ভাগ টাকার জন্য আপন মা-বাপকে খুন করতে পারে অপরাধীরা... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের অপহরণ তো সে তুলনায় কিছুই না! গ্যারেটকে আর পাগল বলে মনে হচ্ছে না ওর। কেন লোকটা মারাত্মক ঝুঁকি

নিয়েছে ওকে আর রেমিকে রিক্রুট করবার জন্য, তা বোঝা যাচ্ছে এবার। মাইডাস টাচ যদি না-ও পায়, চেম্বারের সোনাগুলোই গ্যারেটের সব ধরনের চাহিদা মেটাতে পারবে। বৈধ পথে কেন চেষ্টা করছে না, তা-ও পরিষ্কার। ওই সোনার পুরোটাই নিজের জন্য চায় গ্যারেট। ইটালিয়ান সরকারকে জানিয়ে যদি বৈধ এক্সপিডিশন চালায়, তা হলে উদ্ধারকারী হিসেবে নামমাত্র ট্রেজার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে।

'জিপিএস ট্র্যাকারটার কী খবর?' ল্যারির উদ্দেশে রানার পরের জিজ্ঞাসা।

'এখনও ওটা নিয়ে কাজ করছি আমরা। সিগনালটা এনক্রিপ্টেড... অন্তত আট-দশটা গ্লোবাল সার্ভার ঘুরে পৌঁছুচ্ছে রিসিভারে। একটু সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে। যখনি কিছু জানতে পার, আমাকে খবর দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ল্যারি।

'ভদ্রলোককে খুব একটা আশাবাদী মনে হলো না,' মন্তব্য করল রেমি।

'ঠিক তার উল্টো,' বলল রানা। 'ল্যারি কখনও হতাশ হয় না। কোথাও কোনও সূত্র যদি থাকে, তা হলে সেটা ও বের করেই ছাড়বে।'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না—গ্যারেট যদি মাইডাস চেম্বারের স্বর্ণের পিছনেই লেগে থাকে, আমাদেরকে তা হলে মাইডাস টাচের আজগুবি গল্প শোনাতে গেল কেন?'

'গল্পটা আজগুবি না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্স এ-ব্যাপারে কী বলছে?'

'হাতের কথা আছে,' স্বীকার করল রেমি। 'আর্কিমিডিস নিজ চোখে দেখেছেন ওটা। তারমানে হাত আর মূর্তি... দুটোই

কমপক্ষে দু'হাজার দুই শ' বছরের পুরনো।'

'তারমানে গ্যারেট একেবারে মিথ্যে বলেনি আমাদেরকে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'আমি সায়েন্টিস্ট নই, তারপরেও হাতটা যথেষ্ট কনভিন্সিং বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।'

'কিন্তু একটা রক্তমাংসের হাত সোনায় পরিণত হতে পারে না। জাদু ছাড়া সম্ভব নয় ওটা!'

'জাদুতে আমিও বিশ্বাস করি না। তবে ভাবতে দোষ নেই, আলকেমির এমন কোনও কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন মাইডাস, যা আজ পর্যন্ত আর কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।'

'সেই কৌশল তা হলে আমরা খুঁজে বের করব কীভাবে?'

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে গেল রানা। এখন আর এ-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপাতত আর্কিমিডিসের ম্যাপ খুঁজে বের করা ওদের প্রধান কাজ। সমাধিটা খুঁজে পেলে নাহয় বাকিটা ভাবা যাবে।

যাত্রার বাকি সময়টায় আর কথা হলো না ওদের মাঝে। ত্রিশ মিনিট পর ভিএক্সএন-এর এস্টেটের ফটকে পৌঁছুল রেঞ্জ রোভার। গাড়ি থেকে নেমে দেয়ালে লাগানো বাযার চাপল রানা।

'কী চাই?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে। বলার ভঙ্গিতে কড়া ইটালিয়ান টান।

'মাসুদ রানা এবং ড. রেমি হ্যাডলি। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ও হ্যাঁ। প্লিজ, ভিতরে আসুন।'

মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলে গেল ফটকের দশ ফুট উঁচু পাল্লাদুটো। গাড়ি নিয়ে আগে বাড়ল রানা। ফটকের ওপাশে একটা চওড়া শান-বাঁধানো পথ চলে গেছে ভিতরদিকে, দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো শানদার ওক গাছগুলো দেখেই বোঝা গেল—চমৎকার আবহাওয়া, উদয়াস্ত পরিচর্যা এবং একনিষ্ঠ

প্রচেষ্টার ফসল ওগুলো।

আধ-মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটার শেষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম একটা প্রাচীন ম্যানশন। এলিজাবেথিয়ান রীতিতে গড়া, কত বছর আগে তৈরি করা হয়েছে কে জানে। তবে নিয়মিত মেরামত এবং রেস্টোরেশনের ফলে ঝকঝক করছে বাড়িটা। হাঁ হয়ে গেল রানা ও রেমি। রাজপ্রাসাদ বললে ভুল বলা হয় না, এমনই বাড়িটার চেহারা।

উঠোনটা পাকা, সেখানে সার বেঁধে রাখা হয়েছে বেশ কিছু দামি গাড়ি। রানা নিজে গাড়ির সমঝদার, স্বভাবতই চোখ চলে গেল ওদিকে, একটা গাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর। লাল রঙের একটা *ফেরারি ফোর-ফাইভ-এইট ইটালিয়া,* দুনিয়ার সবচেয়ে দামি গাড়িগুলোর একটা। টপ স্পিড ঘণ্টায় দুই শ' মাইল! এই গাড়ির ছবিই শুধু দেখেছে ও, চালানোর সৌভাগ্য হয়নি।

ইটালিয়ার মুখোমুখি রেঞ্জ রোভার পার্ক করল রানা। সদর দরজার টোকা দেবার আগে কাছ থেকে একবার দেখে নিতে চায় ওটাকে। গাড়ি থেকে নেমে ইটালিয়ার দিকে এগিয়ে গেল ও। ঘুরে ঘুরে দেখল চারপাশ থেকে।

খানিক পরে পিছন থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের খটখটানি। এক সঙ্গে ঘুরল রানা আর রেমি। সওয়ারী নিয়ে বাদামি রঙের একটা টগবগে ঘোড়া দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ঘোড়াটাকে দেখেই সভয়ে পিছিয়ে গেল রেমি। আশ্রয় নিল রানার শরীরের পিছনে।

'কী হয়েছে?' ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল রানা।

'ঘোড়া পছন্দ করি না আমি,' অস্বস্তিমাখা কণ্ঠে জানাল রেমি।

'সে কী! কেন?'

'এত বড় একটা জানোয়ার... কিন্তু মেজাজ-মর্জির কোনও

ঠিক নেই।'

'কে বলেছে? ঘোড়ার মত শান্ত আর বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের ক'টা প্রাণী আছে, বলো?'

'এসব বলে লাভ নেই। ঘোড়া দেখলেই ভয় করে আমার।'

'ঘোড়াকে ভয়!' অবাক হলো রানা। 'তুমি না খামারে বড় হয়েছ? ওখানে ঘোড়া ছিল না?'

'ছিল। ঘোড়াকে ভয় পেতেও শুরু করেছি ওখানেই।' সংক্ষেপে বলল রেমি। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না।

আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না রানা। ঘোড়াটা থমকে দাঁড়িয়েছে ওদের কয়েক গজ সামনে। কারুকাজ করা দামি স্যাডলে বসে আছে তার সওয়ারী। অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে, বয়স ত্রিশের কোঠায়। টানা টানা চোখ, পুরুষ্ট ঠোঁট, আর মাথায় কাজল-কালো কেশ... এ-মুহূর্তে ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে। আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেসের তলায় বন্দি থাকতে চাইছে না উদ্ভিন্ন যৌবন, আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে সুডৌল স্তনযুগল ও নিতম্ব। সুগঠিত দেহ আর অপরূপ চেহারা মিলে নিখুঁত নারী-ই বলা যেত, যদি দু'চোখের দৃষ্টি শীতল না হতো। মেয়েটির চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে রাজ্যের কাঠিন্য; কমনীয়তার সামান্যতম চিহ্নও নেই ওখানে।

দুই অতিথির দিকে তাকিয়ে হাসল সে সুন্দর করে। বলল, 'শি'জ আ বিউটি! তাই না?'

নার্ভাসনেস সামলে রানার পাশে এসে দাঁড়াল রেমি। হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি এস্টেটের মালিকপক্ষের কেউ হবে। তার সামনে স্বাভাবিক থাকা দরকার। পাল্টা একটু হেসে ও বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াটা সত্যিই চমৎকার।'

'ঘোড়াটা শি নয়, হি।' রেমির ভুল ধরিয়ে দিল মেয়েটি। 'মনে হচ্ছে আপনি ঘোড়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না।' আদর

করে ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বোলাল। 'এ হচ্ছে জিয়োসেপ্পি... আমার খাস অ্যারাবিয়ান বাহন। বিউটি বলতে আমি গাড়িটাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপনারা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন ওটাকে—আমি লক্ষ করেছি।'

'হ্যাঁ, ওটারও তুলনা নেই,' বলে উঠল রানা। 'ঘোড়ার কথাই যদি তোলেন, ইটালিয়ার ভি-এইট ইঞ্জিনের ভিতর পাঁচশো ষাটটা ঘোড়া বাস করছে... মানে, ফাইভ হানড্রেড অ্যাণ্ড সিক্সটি হর্সপাওয়ার–সোজা কথা নয়! চালিয়ে নিশ্চয়ই খুব মজা!'

তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে আপাদমস্তক দেখে নিল মেয়েটি। মনে হলো যেন কেনার আগে যাচাই করে নিচ্ছে কোনও জিনিস। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ টিপে বলল, 'হ্যাঁ, মজা তো বটেই। চাইলে আপনাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে পারি, মিস্টার...'

'মাসুদ রানা।' ইশারাটা না বোঝার ভান করল রানা। কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই মেয়ে পুরুষখেকো। 'ইনি ড. রেমি হ্যাডলি।'

'আপনার ফ্রেণ্ড মনে হচ্ছে ঘোড়া পছন্দ করে না, মি. রানা,' রেকাবে পা ঠেকিয়ে এক লাফে মাটিতে নামল মেয়েটি।

'সবাই কি আর সব জানোয়ার পছন্দ করে?' হালকা গলায় বলল রানা। 'ড. হ্যাডলির পছন্দ বেড়াল।' শেষ কথাটা বানিয়ে যোগ করল।

'আমি আবার মেনিমুখো প্রাণী সহ্য করতে পারি না। আমার জানোয়ারকে হতে হবে তাগড়া... তেজি!' বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি। 'ঠিক আপনার মত।'

'প্রশংসা করছেন, নাকি অপমান... ঠিক বুঝতে পারলাম না,' নীরস গলায় বলল রানা।

জোরে হেসে উঠল মেয়েটি। 'আপনি রসিক লোক, মি. রানা। বলুন, কীভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?'

'আমরা আসলে এখানকার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমিই।' বলল মেয়েটি। 'আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি মায়া লরেঞ্জো।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল রেমির মুখ দিয়ে। রানাও অবাক হয়েছে, তবে সেটা প্রকাশ হতে দিল না। মায়া নামটা গতকালই শুনেছে ওরা গ্যারেটের মুখে। আর্কিমিডিসের পাযল সমাধানের দ্বিতীয় সূত্র খুঁজতে গিয়ে ঠিক একই নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় হতে পারে না।

শান্ত ভঙ্গিতে মায়ার সঙ্গে হাত মেলাল ও, কিন্তু মাথার ভিতরে বইছে চিন্তার ঝড়। কোনও সন্দেহ নেই, এই মেয়ের সঙ্গেই নেপলসের প্রাচীন টানেলে মাইডাসের সমাধি খুঁজে পেয়েছিল গ্যারেট... এর ব্যাপারেই ওদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে সে।

বাইশ

ট্রেন থেকে হোলবর্ন স্টেশনে নেমে ঘড়ি দেখল মুরল্যাণ্ড, ওর কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাকপ্যাক, তাতে আর্কিমিডিস কোডেক্সের ইংরেজি অনুবাদ। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশিই সময় ব্যয় হয়ে গেছে পাতাল-রেলে। ড. ফিলবির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। ভিড়ের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিল ও, ভূগর্ভস্থ স্টেশন থেকে উঠে এল লণ্ডনের ব্যস্ত রাস্তায়। দ্রুত পা চালাল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উদ্দেশে।

অনেকদিন পর লণ্ডনে এসেছে ও। ইচ্ছে হলো প্রিয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে, কিন্তু সময় নেই। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব ওর কাঁধে, এখন তার ডান-বাম করা চলবে না।

দশ মিনিটের ভিতর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনের চত্বরে পৌঁছুল মুরল্যাণ্ড, লাইন ধরে ঢুকে পড়ল প্রবেশপথ পেরিয়ে। মিউজিয়ামে ঢুকতে টিকেট লাগে না, তবে ছোট একটা নোটিশ টাঙিয়ে রাখা হয়েছে স্বেচ্ছায় ডোনেশন দেবার অনুরোধ জানিয়ে। ডলার ভাঙানোর সময় পায়নি মুরল্যাণ্ড, তাই ডোনেশন বক্সের স্লটে একটা বিশ ডলারের নোট গুঁজে দিল। তারপর পা বাড়াল গ্রেট কোর্টের দিকে।

বিশাল হলঘরটা লোকে লোকারণ্য, তবে কাঁচের তৈরি উঁচু ছাদের কারণে গুমোট ভাবটা আসেনি, আলো-বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারছে। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাল মুরল্যাণ্ড—দেশ-বিদেশের হাজারো টুরিস্ট এসেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা দেখতে। প্রতিটা ডিসপ্লের সামনে বিশাল ভিড়। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তারা তাকিয়ে আছে দুনিয়ার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর দিকে।

ইনফরমেশন ডেস্কে গিয়ে আরেক দফা লাইন ধরতে হলো। মুরল্যাণ্ডের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছে বেকুব টাইপের এক আমেরিকান লোক—জানতে চায়, কুইডিচ কাপে হ্যারি পটারের ব্যবহার করা জাদুর ঝাড়ু কোথায় ডিসপ্লে করা হচ্ছে। ডেস্কে বসা তরুণী তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, হ্যারি পটার আসলে রূপকথা, জাদুর ঝাড়ু বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

বেচারির করুণ দশা দেখে দু'পা এগোল মুরল্যাণ্ড। লোকটার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'ভাই, আপনি তো ভুল জায়গায় এসেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম না, আপনাকে যেতে হবে হগওয়ার্ট মিউজিয়ামে।'

'হগওয়ার্ট মিউজিয়াম! সেটা আবার কোথায়?'

'যেখানে হ্যারি পটার লেখাপড়া করেছে... সেই হগওয়ার্ট স্কুলে!'

'ওখানে যাওয়া যায়?' বোকা বনে গেছে লোকটা।

'যাবে না কেন? কিংস ক্রস স্টেশনে, *পৌনে দশ* নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেলেই হগওয়ার্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারবেন। বইয়ে পড়েননি বুঝি?'

'কী?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লোকটা।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, যান, নইলে ট্রেন মিস করবেন।' ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড। নিচু স্বরে গাল দিয়ে চলে গেল সে। এতক্ষণে টের পেয়েছে, তার সঙ্গে ফাজলামি করেছে মুরল্যাণ্ড।

'থ্যাঙ্কস!' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ইনফরমেশন ডেস্কের মেয়েটি।

'ও কিছু না,' হাসল মুরল্যাণ্ড। 'পাগল-ছাগল এভাবেই সামলাতে হয়।'

'আপনি দেখছি কাজটায় এক্সপার্ট! বলুন, কীভাবে উপকারের প্রতিদান দিতে পারি?'

'ডিনারের প্রস্তাব দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব নয় সময়স্বল্পতার কারণে। আপাতত ড. টেরেন্স ফিলবি-র অফিসটা দেখিয়ে দিলে খুশি হব। আমার নাম ববি মুরল্যাণ্ড। ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

'একটু ধরুন।' ইন্টারকমে কথা বলে নিল মেয়েটা। খানিক পরেই হাজির হলো এক জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট। মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড।

মিউজিয়ামের অলিগলি পেরিয়ে একবারে পিছন দিককার অফিস কমপ্লেক্সে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো। ছোট একটা কামরায়

ঢুকে দেখা পাওয়া গেল ড. ফিলবির। ষাটের কাছাকাছি বয়স, মাথায় মস্ত বড় টাক, নাকের উপর ঝুলছে ভারী পাওয়ারের চশমা। পোশাকে হাজার-হাজার ভাঁজ। আত্মভোলা পণ্ডিতের চেহারা যা হয় আর কী। রুমটাও তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুধু টেবিল নয়, মেঝেতেও স্তূপ হয়ে আছে অসংখ্য বই।

'গুড আফটারনুন, ড. ফিলবি!' সম্ভাষণ জানাল মুরল্যাণ্ড।

অ্যাসিসটেন্টকে বিদায় দিয়ে টেবিল থেকে উঠে এলেন ফিলবি। হাত মিলিয়ে বললেন, 'মি. ববি মুরল্যাণ্ড... রাইট?' তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন অতিথিকে। বোঝা গেল, গাঁট্টাগোট্টা শরীরের রেসলার টাইপ কাউকে আশা করেননি। 'এত লোক থাকতে আমার কাছে আসায় ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ... এত অল্প সময়ের নোটিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার জন্য।'

'নট অ্যাট অল। আপনার ওই ম্যানুস্ক্রিপ্টের স্যাম্পল দেখার পর আমি নিজেও আগ্রহী হয়ে উঠেছি।'

রেমির কানেকশন ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যোগাযোগ করেছিল মুরল্যাণ্ড, নিজের পরিচয় দিয়েছে *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর কনসালট্যান্ট হিসেবে। প্রাচীন এক গ্রিক পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় বলে জানিয়েছিল। পর পর কয়েকজন আর্কিয়োলজিস্ট অনাগ্রহ প্রকাশের পর ফিলবি-ই খানিকটা উৎসাহ দেখান। মূল কোডেক্সের একটা পাতার ফটোগ্রাফ এরপর ই-মেইল করেছিল মুরল্যাণ্ড, দ্রুত ভদ্রলোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার আশায়। পাতাটায় আর্কিমিডিস বা মাইডাসের উল্লেখ নেই, তবে হেরাক্লিস আর আফ্রোদিতির কথা আছে। ক্যাটালগ হবার আগেই অকশন হাউস থেকে কোডেক্সটা চুরি করেছিল গ্যারেট, কাজেই মুরল্যাণ্ডের পাণ্ডুলিপি আর চোরাই

কোডেক্স যে একই জিনিস, সেটা সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ নেই ফিলবির।

'প্লিজ, বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ফিলবি। নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

মুখোমুখি বসে কোডেক্সের সংক্ষিপ্তসার ডক্টরকে শোনাল মুরল্যাণ্ড। হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের ব্যাপারটার উপর জোর দিল একটু। বলল, এক কালেক্টরের কাছ থেকে পাওয়া গেছে পাণ্ডুলিপিটা; তিনি ধাঁধাটার জবাব জানতে চান। এরপর ফিলবিকে কোডেক্সের ধাঁধার অংশটার অনুবাদ পড়তে দিল ও।

প্রিন্ট করা কাগজগুলো কয়েক দফা পড়লেন ফিলবি। তাঁর চেহারায় উত্তেজনার ছাপ ফুটল। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে তিনি বললেন, 'ইটস্ রিমার্কেবল!'

'ধাঁধার অর্থ বের করতে পারবেন আপনি?' সাগ্রহে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'হয়তো। কিন্তু তার আগে এলজিন মার্বলসের কয়েকটা অংশ আবার দেখে নিতে হবে আমাকে। ওখান থেকেই নিতে হবে রেফারেন্স।'

'এখুনি দেখা যায় না?'

'নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু হাতের কাজটা শেষ না করে নড়তে পারব না আমি। বেশি সময় লাগবে না অবশ্য। এক কাজ করুন না কেন, আপনি চলে যান ওখানে। যে-পথ ধরে এখানে এসেছেন, সে-পথে ফিরলেই ডুভিন গ্যালারির সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। আমি একটু পরেই আসছি।'

'ঠিক আছে। তা-ই করি।'

ফিলবির অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল ডুভিন গ্যালারির উদ্দেশে। ওখানে কী পাওয়া

যাবে কে জানে! উত্তেজনা অনুভব করছে ও। আত্মভোলা আর্কিয়োলজিস্ট এখন দেরি না করলেই হয়।

মুরল্যাণ্ড বেরিয়ে যাবার পর ক-য়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন ফিলবি। ওকে সময় দিলেন অফিস থেকে দূরে চলে যাবার। এরপর পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন তিনি, চাইছেন না কলটা মিউজিয়ামের সুইচবোর্ড হয়ে যাক। সেটের ফোনবুকে নাম নেই, আছে স্রেফ এটা নাম্বার... ওটা সিলেক্ট করে ডায়াল প্রেস করলেন। বেশ ক'দিন আগেই এই নাম্বারটা পেয়েছেন তিনি; তাঁকে বলা হয়েছে—পার্থেনন সংক্রান্ত প্রাচীন কোনও ডকুমেন্টের সন্ধান পেলেই এই নাম্বারে জানাতে হবে। তা হলে মিলবে মোটা পুরস্কার।

ববি মুরল্যাণ্ডের জানা নেই, ওর সাহায্যের আবেদন ড. ফিলবির টেবিলে এমনি এমনি আসেনি। তিনি নিজেই জুনিয়র এক আর্কিয়োলজিস্টের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন কাজটা। প্রাচীন গ্রিক ম্যানুস্ক্রিপ্টের ব্যাপারে জনৈক আমেরিকান যোগাযোগ করেছে শুনেই হামলে পড়েছিলেন তিনি।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে রিসিভ করা হলো কল। 'কী খবর, ডক্টর?'

গলা কাঁপছে ফিলবির। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন, 'সুসংবাদ! আপনি যা খুঁজছেন, সেটার খোঁজ সম্ভবত পেয়ে গেছি আমি!'

তেইশ

ম্যানশনের স্টাডিতে অপেক্ষা করছে রানা ও রেমি। কামরাটার অবস্থান বাড়ির একেবারে পিছনদিকে। আকারে বড়-সড়, দেয়াল কাঠের প্যানেলে ঢাকা। বুকশেলফে শোভা পাচ্ছে হাজার হাজার বই, এ ছাড়া দেয়ালে ঝুলছে দুর্লভ বেশ কিছু পেইন্টিং। একপাশে চওড়া জানালা, সেখান দিয়ে বাড়ির পিছনের বিশাল আস্তাবল এবং আস্তাবলের পিছনের অবারিত সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। পরিবেশটাও চমৎকার। স্টাডির ফায়ারপ্লেসে গনগন করে জ্বলছে আগুন, ছড়িয়ে দিচ্ছে আরামদায়ক উত্তাপ। তবু স্বস্তিতে নেই রানা। বিপদের আশঙ্কা করছে প্রতি মুহূর্তে। বুদ্ধিমানের কাজ হতো, যদি একটা অজুহাত দেখিয়ে এস্টেট থেকে বেরিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু আর্কিমিডিসের ধাঁধা সমাধানের জন্য মোমফলকটা না দেখলেই নয়। অগত্যা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে থাকতে হচ্ছে এখানে।

ঘোড়া আস্তাবলে রেখে পোশাক বদলে আসবে বলে চলে গেছে মায়া। রোদে পোড়া, পেশিবহুল শরীরের এক লোক রানা আর রেমিকে নিয়ে এসেছে স্টাডিতে। বলা হয়েছে সে মায়ার অ্যাসিসটেন্ট; কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে রানা বুঝতে পেরেছে, লোকটা মাস্‌লম্যান ছাড়া আর কিছু না। বড়জোর বডিগার্ড হতে পারে, কিংবা সিকিউরিটির লোক—উটকো ঝামেলা সামলাবার জন্য একে চাকরিতে রেখেছে মায়া। সম্ভবত খালিহাতে মানুষের

হাড়গোড় গুঁড়ো করতে পারে বলেই।

কপালের ভাঁজ গভীর হয়েছে রানার। এ-ধরনের লোককে কোনও ভাল মানুষ কাজে লাগায় না। কে এই মায়া লরেঞ্জো? মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে—ভালমত খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল। আর কিছু না হোক, মায়া লরেঞ্জো যে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক, সেটা জানতে পারত। আরেকটু সতর্ক হতে পারত সেক্ষেত্রে।

স্টাডির দরজার দিকে চোখ চলে গেল ওর। পাল্লা ভেজিয়ে রাখা হয়েছে; তবে সন্দেহ নেই বাইরে পাহারা দিচ্ছে মায়ার মাস্‌ল্‌ম্যান। আড়িও পাতা হতে পারে।

রানার দিকে একটু ঝুঁকল রেমি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী মনে হয় তোমার, রানা? গ্যারেট কি জানে, ওয়্যাক্স ট্যাবলেটটা ওর বান্ধবী মায়ার দখলে?'

'জানা তো উচিত,' বলল রানা। 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লু স্রেফ কো-ইনসিডেন্সের বশে ওর হাতে আসতে পারে না। বিশেষ করে ওরা দু'জন যখন একই জিনিস খুঁজছে।'

'জানা থাকলে বলল না কেন?'

'কী জানি! ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছে বলে তো মনে হয় না। হয়তো ট্যাবলেটটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি গ্যারেট। ওটা যে ধাঁধা সমাধানের দ্বিতীয় সূত্র... এটাই বোধহয় ধরতে পারেনি।'

'কিন্তু এখন আমরা কী করব? মায়া যদি বুঝে ফেলে, আমরা কেন এসেছি এখানে?'

'আপাতত অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যাক। দেখি, ওকে বোকা বানিয়ে কাজ উদ্ধার করা যায় কি না। ট্যাবলেটটা দেখেই কেটে পড়ব এখান থেকে।'

'আর ও যদি সব বুঝে ফেলে?'

'বিপদ!' থমথমে গলায় বলল রানা।

গ্যারেটের সতর্কবাণী মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। মায়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মেয়ে... স্বার্থ হাসিলের জন্য খুনখারাপি করে ফেলতে পারে। সামনাসামনি দেখা হবার পর কথাটা বিশ্বাস করছে ও। মেয়েটাকে একেবারেই ভাল লাগেনি ওর। মানুষকে পড়তে জানে রানা, তাই বুঝতে পেরেছে, মায়ার ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে নিষ্ঠুর এক সত্তা। হাসতে হাসতে কঠোর নির্যাতন করতে পারে এই মেয়ে।

দরজা খোলার আওয়াজে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মায়াকে স্টাডিতে ঢুকতে দেখল ওরা। রাইডিং ড্রেসের বদলে গায়ে এখন ধূসর রঙের প্যান্টসুট—ওর দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে মানানসই ভাবে তৈরি করা। স্নিগ্ধ-সতেজ দেখাচ্ছে তাকে—সম্ভবত গোসল করে এসেছে। ভেজা চুল ছড়িয়ে দিয়েছে কাঁধের উপর, তার মাঝে হালকা মেকাপে ঢাকা সুন্দর মুখটা ঝলমল করছে। সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাকে। রূপ তো বটেই... ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও।

স্টাডির একপ্রান্তে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল মায়া। ভদ্রতা দেখাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা আর রেমি; ওদেরকে বসবার ইশারা করল।

'সরি, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আপনাদের,' বিনয় প্রকাশ করল সে। রানার উপর আটকে আছে তার চোখ। রেমিকে যেন দেখেও দেখছে না। 'চা-নাশতা কিছু খেয়েছেন?'

'কফি দিয়েছিল... ওটাই যথেষ্ট,' বলল রানা। 'ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না। আমার অ্যাসিসটেন্ট বলল, আপনারা একটা প্রাচীন মোমফলক দেখতে চাইছেন... যেটা আমি ছ'মাস আগে লণ্ডনের এক নিলাম থেকে কিনেছি। কিছু মনে করবেন না, ওটার

ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ কীজন্য, জানতে পারি?'

রানা জবাব দেবার আগেই গলা খাঁকারি দিল রেমি। সিলেব্রিটি ও—কারও উপেক্ষা পেতে অভ্যস্ত নয়। ওর প্রতি মায়ার নিরাসক্তি দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, 'মাফ করবেন, আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি ড. রেমি হ্যাডলি। টিভিতে *চেজিং দ্য পাস্ট* নামে একটা অনুষ্ঠান করি আমি—আর্কিয়োলজিকাল এবং হিস্টোরিকাল বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং বিষয়ের উপর। সামনের একটা এপিসোডে আপনার ওই ওয়্যাক্স ট্যাবলেট নিয়ে একটা সেগমেন্ট করব বলে ভাবছি। আপনার একটা সাক্ষাৎকারও থাকবে ওতে।'

টোপটা মন্দ নয়, মনে মনে ভাবল রানা। টিভিতে চেহারা দেখাতে কে না চায়! এ এক দুর্নিবার মোহ।

মায়ার মধ্যে অবশ্য সেই মোহ প্রকাশ পেল না। চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠল তার। চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'আপনার বিষয়ে আমার জানা আছে, ড. হ্যাডলি। বেশ বিখ্যাত মানুষ আপনি।' রানার দিকে তাকাল। 'আর আপনি, মি. রানা? *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর আপনার কী সম্পর্ক?'

'আমি স্রেফ একজন উপদেষ্টা, আর কিছু না,' বলল রানা।

'ট্যাবলেটের ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহটা এখনও কিন্তু পরিষ্কার হলো না, ড. হ্যাডলি।'

'আমাদের ধারণা, আপনার ওই ট্যাবলেট গ্রিক ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ের উপর আলোকপাত করতে পারবে,' বলল রেমি। 'সেকেণ্ড পিউনিক ওয়ারের কথা বলছি আমি। খ্রিস্টপূর্ব দুই শ' আঠারো থেকে দুই শ' এক সাল পর্যন্ত চলেছিল ওই যুদ্ধ—রোমান রিপাবলিক এবং কার্থেজের মধ্যে। ট্যাবলেটটা ওই সময়কার।'

'হুম। আপনি তা হলে আর্কিয়োলজিস্ট?'

'জী না। আমি একজন ক্লাসিসিস্ট—গ্রিক সভ্যতার উপর স্পেশালাইযেশন আছে আমার। ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছি।'

'ইম্প্রেসিভ,' মন্তব্য করল মায়া। 'মোমফলকটার ভিডিও করতে চান আপনারা?'

'আজ নয়,' বলল রেমি। 'আজ আমরা এসেছি প্রাথমিক ইন্সপেকশনের জন্য। যাতে শিয়োর হতে পারি... যেটা খুঁজছি, আপনার ট্যাবলেট সেটাই কি না। আপাতত এক নজর দেখতে পেলেই খুশি হব।'

'তাতে কোনও সমস্যা দেখছি না। ওটা এখানেই আছে।'

টেবিলের তলার একটা গোপন বোতাম চাপল মায়া। মৃদু আওয়াজ তুলে ফাঁক হয়ে গেল ডানদিকের দেয়ালে কাঠের প্যানেলের একাংশ। কাঁচের একটা ডিসপ্লে কেইস উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তাতে। কেইসের ভিতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু আর্টিফ্যাক্ট—দুটো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, ব্রোঞ্জের তৈরি একটা খাটো তলোয়ার, ছোট ছোট কয়েকটা মূর্তি... এবং একটা মোমফলক। ফলকটা বেশি বড় নয়—পাশাপাশি রাখা দুটো হার্ডকাভার বইয়ের সমান।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রেমি। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল ডিসপ্লে-র দিকে। রানা অনুসরণ করল ওকে। মায়াও চেয়ার ছাড়ল। রানার পাশে এসে হাত ধরল সে। ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা। জবাবে মদির হাসি হাসল মেয়েটা, চোখ টিপল। চক্ষুলজ্জার ধার ধারছে না, সরাসরি বুঝিয়ে দিচ্ছে—রানাকে ওর মনে ধরেছে।

যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা। তাকাল ট্যাবলেটের দিকে। কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই করা দু'টো মোমের ব্লক, কালের প্রবাহে সবুজাভ হয়ে এসেছে। মাঝখানে চৌকো খাঁজ,

ওর ভিতরে রাখা হতো কোডেক্স। ফ্রেমদুটো আবার কবজা দিয়ে আটকানো, যাতে বাক্সের মত বন্ধ করে রাখা যায় ফলকের দুই অংশ। একেবারে ঝকঝক করছে জিনিসটা, মনেই হচ্ছে না দু'হাজার বছরের পুরনো। আরেকটু এগিয়ে ভালমত দেখল ও। মোমের মাঝে স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে গ্রিক হরফের সারি। উত্তেজনায় দম আটকে এল ওর। স্বয়ং আর্কিমিডিসের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

রেমিও মুগ্ধ, তবে অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফলকটা নিরীখ করছে সে। রানা জানতে চাইল, 'লেখাটা পড়তে পারছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রেমি। 'এখানে বলা হচ্ছে: *সত্যকে যে বরণ করে নেবে, সে-ই পাবে অতুল ঐশ্বর্য। বাইরে নয়, তার জন্য নিজের ভিতরে অনুসন্ধান করো। আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য আর গ্রহ-নক্ষত্র... সব তোমার হবে। পার্থেননে লুকিয়ে আছে তার চাবিকাঠি।*'

হাততালি দিয়ে উঠল মায়া। 'চমৎকার, ড. হ্যাডলি। আমার এক্সপার্টও ঠিক একই অনুবাদ করেছে। তবে ওর সময় লেগেছে অনেক বেশি। এনিওয়ে... এখানে কীসের কথা বলা হয়েছে, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা করতে পারেন?'

রানার সঙ্গে চকিতে দৃষ্টি-বিনিময় করল রেমি। তারপর বলল, 'না, দুঃখিত। হেঁয়ালির মত লাগছে আমার কাছে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই। আমার দর্শকরা পুরনো আমলের অমীমাংসিত রহস্যই দেখতে চায়।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল মায়া। তারপর ফিরে গেল ডেস্কে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ, ড. হ্যাডলি... আমার সঙ্গে নাটক করবার কোনও প্রয়োজন নেই। সবই জানি আমি। আমার সামনে এসে বসো। কিছু কথা বলব। কথাগুলো শোনার প্রয়োজন আছে

তোমাদের।'

মুহূর্তের ভিতর চেহারা পাল্টে গেছে মেয়েটার। সম্বোধন পাল্টে গেছে... ভদ্রতার খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে বিষাক্ত এক কালনাগিনী। মাথার ভিতর পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল রানার—যা ভয় করছিল, তাই ঘটতে চলেছে। বিপদ! রেমির দিকে তাকাল। তরুণী ডক্টরের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। আপাতত মায়ার কথা মেনে নেয়াই ভাল। মেয়েটার মুখোমুখি আবার আসন নিল ওরা।

'আমার ধারণা, প্রাচীন একটা পাণ্ডুলিপি দেখে এসেছ তোমরা,' বলল মায়া। 'ওই পাণ্ডুলিপিতে রাজা মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজে পাবার সূত্র আছে। রাইট?'

'এমন অদ্ভুত ধারণা তোমার মাথায় এল কেন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা। মায়া যেহেতু ভদ্রতা দেখাচ্ছে না, ও-ও তা দেখাবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'কারণ আমার অ্যাসিসটেন্টের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইবার সময় আর্কিমিডিসের নাম উচ্চারণ করেছে ড. হ্যাডলি। আমার ট্যাবলেট আর আর্কিমিডিসকে একত্র করলে হারানো ওই কোডেক্স ছাড়া আর কোনও কিছুর কথা ভাবা যায় না।'

'আমার তো মনে হয় স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছ তুমি।'

'মোটেই না।' বড় করে শ্বাস নিল মায়া। 'এগারো বছর বয়সে একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার... সে ছিল আমার খালাতো ভাই। বেড়াতে এসেছিল আমাদের নেপলসের বাড়িতে। দু'জনে খুব ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করতাম। তা-ই করতে গিয়ে একদিন এক পরিত্যক্ত অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ভাঁড়ার ঘরে পুরনো এক গুপ্তপথ খুঁজে পাই আমরা... ওটা ধরে পৌঁছে যাই মাটির তলার প্রাচীন এক টানেল নেটওয়ার্কে। ওখানে দু'জন

ড্রাগ-ডিলারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের—লোকদুটো মাটির তলায় তাদের অবৈধ মালের গুদাম বানিয়েছিল। যা হোক, আমাদেরকে ধাওয়া করে ওরা। আমরাও পালাবার জন্য ছুট লাগাই। মাটির নীচের ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গে দিক ঠিক রাখা কঠিন, ফলে খুব শীঘ্রি পথ হারাই আমরা। এলোমেলোভাবে ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত বিশাল একটা গুহায় পৌঁছে যাই...'

নড়েচড়ে বসল রানা। এই কাহিনি গ্যারেটের মুখে শুনেছে ওরা, তবে মায়া বলছে অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে। কৌতূহল জেগে উঠেছে ওর।

'গুহায় ঢোকার পর চমকে উঠি আমরা,' বলে চলল মায়া। 'কারণ ওটা আসলে ঠিক গুহা নয়, নিখুঁত কিউবের আকারে বানানো একটা চেম্বার। আরও বেশি অবাক করা ব্যাপার হলো, চেম্বারের পুরোটাই ছিল সোনায় গড়া। বাড়িয়ে বলছি না, ওখানকার দেয়াল আর ভিতরের সবকিছুই ছিল সোনা দিয়ে তৈরি।'

'কী ছিল ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'চেম্বারের ঠিক মাঝখানে ছ'ফুট উঁচু একটা পেডেস্টালের উপর দাঁড়ানো ছিল নিখুঁত একটি নারীমূর্তি... ডান হাতটা কব্জি থেকে কাটা ছিল ওটার। চেম্বারের এক কোনায় ছিল একটা হট পুল—পানি টগবগ করছিল সারাক্ষণ। বাষ্পে ভরে ছিল চেম্বারের অভ্যন্তর। এ ছাড়া কামরার আরেক প্রান্তে... মঞ্চের উপর রাখা ছিল একটা সোনালি কফিন—রাজা মাইডাসের!'

'মাইডাস?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'কী করে বুঝলেন?'

'বলছি। একটু ধৈর্য ধরো।' চেয়ারে হেলান দিল মায়া। 'একটা সিঁড়ি ধরে নামতে হয় ওই চেম্বারে, ওটার তলায় লুকিয়েছিলাম আমরা। একটু পরেই আমাদের পিছু পিছু ওখানে হাজির হলো দুই ড্রাগ ডিলার। ভয়ে আত্মারাম শুকিয়ে গিয়েছিল

আমাদের, জানতাম ধরা পড়ে যাব। পালাবার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু চেম্বারে ঢুকে থ হয়ে গেল লোকদুটো। সোনা দেখে মাথা খারাপের মত অবস্থা। আমাদের কথা যেন ভুলেই গেল। তার বদলে আলোচনা শুরু করল দু'জনে—সোনা কীভাবে উদ্ধার করবে... কীভাবে সেই সোনা তাদের বসের অলক্ষে বিক্রি করবে... এইসব আর কী। খানিক পর একজন যখন পিঠ ফেরাল, অন্যজন হাতের শাবলের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দিল তার মাথা—খুন করে ফেলল! চেম্বারের সব সোনা একাই ভোগ করতে চাইছিল সে। সঙ্গীকে খুন করে মঞ্চে গিয়ে উঠল লোকটা। কফিনের ডালা ফাঁকা করে ভিতরে হাত ঢোকাল, বোধহয় ভাবছিল সোনার মোহর-টোহর পাবে। কিন্তু তার বদলে যা ঘটল, সেটা অবিশ্বাস্য! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল হাত। দেখলাম টকটকে লাল হয়ে গেছে চামড়া, অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছে লোকটা। পিছাতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গরম পানি ভরা পুলের ভিতর। ক্ষণিকের জন্য ডুবে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর যখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ভেসে উঠল, চমকে গেলাম আমরা। দুই হাত সোনায় পরিণত হয়েছে তার। আমাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে গলাও সোনা হয়ে যেতে দেখলাম। একটু পর পানিতে ডুবে গেল সে।'

'নিজ চোখে রক্তমাংসের একজন মানুষকে সোনার মূর্তি হয়ে যেতে দেখেছেন আপনারা?' হতভম্ব গলায় বলল রেমি। 'এ কীভাবে সম্ভব?'

'একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে এর,' বলল মায়া। 'মাইডাস টাচের শিকার হয়েছিল লোকটা। কফিনটা কেন রাজা মাইডাসের বলে ভাবছি, তা আশা করি বুঝতে পারছ এবার?'

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল মায়ার কাহিনি। তবে ওটাকে কাহিনি ছাড়া আর কিছু ভাবতে

পারছে না। যে-অভিজ্ঞতার কথা বলছে মেয়েটা, তা সত্যি হতে পারে না। ভয়ার্ত দুটি কিশোর-কিশোরী উত্তেজনার বশে ভুলভাল দেখেছে—এমনটা হবারই সম্ভাবনা বেশি।

'ইন্টারেস্টিং গল্প,' মন্তব্য করল ও। 'তোমরা পরে আবার ওখানে ফিরে যাওনি কেন?'

'বিশ্বাস করো, সেদিনের পর থেকে আমি ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি,' বলল মায়া। 'টানেল থেকে বহু কষ্টে বেরিয়ে আসি আমরা। সঠিক পথটা খুঁজে পেতে সেদিনের পুরো রাত লেগে যায়। বাড়ি ফেরার পর যখন বাবা-মা'কে গোল্ডেন চেম্বারের কথা বলি, বিশ্বাস করেননি ওঁরা। রাতভর বাইরে থাকায় ভীষণ খেপে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন শাস্তি এড়াবার জন্য মিথ্যে গল্প ফেঁদে বসেছি। এর কিছুদিন পরেই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটা ভেঙে ফেলা হয়, সেই জায়গায় তোলা হয় ইটালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা নতুন বিল্ডিং। কনস্ট্রাকশন শেষ হবার পর একবার আমি ওটার বেজমেন্টে ঢুকেছিলাম। দেখলাম, ফাউণ্ডেশনের কংক্রিটের কারণে টানেলে যাওয়ার গুপ্তপথটা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কোনও রাস্তা ছিল না ওখানে ঢোকার।'

'হুম,' মাথা দোলাল রানা। 'গল্প তো ভালই শোনালে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ওটার একবর্ণও বিশ্বাস হয়নি আমার।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মায়া। 'বিশ্বাস যদি না-ই করবে, তা হলে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে চাইছ কেন? কত টাকা পাচ্ছ এর জন্যে?'

'টাকা? কার কাছ থেকে?'

'সেটাও বলে দিতে হবে? সেই লোক, যে আমার কাছ থেকে কোডেক্সটা চুরি করেছে!'

'কোডেক্সটা তোমার?'

'অবশ্যই! সোনার হাতটাও... যেটা মাইডাসের সমাধি থেকে

খোয়া গিয়েছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমিই খোঁজ বের করেছিলাম ওগুলোর। ভেবেছিলাম অকশন হবার আগেই কবজা করে নেব... যাতে জিনিসদুটোর গুরুত্ব আর কেউ জানতে না পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাকে ধোঁকা দিয়ে ওগুলো হাতিয়ে নিয়েছে তোমাদের নিয়োগকর্তা। গত ছ'মাসে বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও সন্ধান পাইনি আমি। ভেবেছিলাম মারা গেছে সে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, লোকটা বহাল তবিয়তেই তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

চেহারায় কপট বিস্ময় ফোটাল রানা। 'কী সব কোডেক্স আর সোনার হাতের কথা বলছ... আমরা কিন্তু এ-সবের কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার সঙ্গে অভিনয় কোরো না, রানা!' হিসিয়ে উঠল মায়া। 'তার ফল ভাল হবে না। আমি খুব ভাল করেই জানি, হারানো জিনিসদুটোর খোঁজ তোমাদের কাছে আছে।'

'এ তোমার কল্পনা।'

'তা-ই?' মুখ বাঁকা করল মায়া। 'খানিক আগে একটা ফোন পেয়েছি আমি। জনৈক ভদ্রলোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেছেন প্রাচীন একটা গ্রিক কোডেক্স... যেটার সঙ্গে পার্থেননের সম্পর্ক আছে... সেটার ব্যাপারে ওখানকার এক্সপার্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ওই ভদ্রলোক নিজেকে ড. রেমি হ্যাডলির অনুষ্ঠানের কনসালট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। বলতে চাও ওকে তোমরা চেনো না?'

পেটের ভিতরটা শূন্য মনে হলো রানার, ওখানে যেন প্রজাপতি উড়ছে। মুরল্যাণ্ডের কথা বলছে মায়া!

ওদেরকে বাগে পাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা। বলল, 'হারানো কোডেক্সের কপি তোমাদের হাতে রয়েছে; এর অর্থ একটাই—যে-লোক ওটা চুরি করেছে, তার হয়ে কাজ করছ

তোমরা। ওর নামটাও বলে দিতে পারি। অ্যান্থনি গ্যারেট, তাই না? আমার খালাতো ভাই... বড় হয়ে মস্ত বড় ক্রিমিনালে পরিণত হয়েছে ও। ও-ই ধোঁকা দিয়েছে আমাকে... আর এর জন্য যথোপযুক্ত শাস্তিও পাবে। ওকে খুন করব আমি!'

চব্বিশ

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডুভিন গ্যালারিতে পায়চারি করছে মুরল্যাণ্ড। বিশাল এই গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে শুধুই এলজিন মার্বলসের ডিসপ্লের জন্য। লম্বা হলঘরটার দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে একসারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রস্তরখণ্ডগুলো। সঠিক টার্ম হলো *মেটোপি*, তবে বাস্তবে ওগুলো এক ধরনের নকশাদার টালি—পার্থেননের বাইরের রিং-টার ডগায় লাগানো ছিল ডেকোরেশন পিস হিসেবে। ডিসপ্লে-তে রাখা বেশিরভাগ টালিই ক্ষত-বিক্ষত—১৬৮৭ সালে পার্থেননে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে নষ্ট হয়েছে। বয়সের ভারে ভেঙে-চুরে গেছে, কিংবা তুলে আনার সময় ড্যামেজ হয়েছে... এমন টালির সংখ্যাও কম নয়।

গ্যালারির দু'প্রান্তে রাখা হয়েছে পার্থেনন থেকে উদ্ধার করা বেশ কিছু লাইফ-সাইজ পাথুরে মূর্তি। ওখানকার পেডিমেন্ট, অর্থাৎ ছাতের তেকোনা প্রান্তদেশে বসানো ছিল মূর্তিগুলো। তবে *মেটোপি*-র মত এগুলোও অক্ষত নয়। বেশিরভাগ মূর্তিরই মাথা আর হাত নেই... কবে-কীভাবে ভেঙে গেছে কেউ জানে না...

মুণ্ডুহীন ভূতের অবয়ব পেয়েছে ওগুলো। গ্যালারির আবছায়া পরিবেশে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে এইসব প্রাচীন মূর্তি।

'ম্যাগনিফিশেন্ট! কী বলেন?'

কানের কাছে ড. ফিলবির কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল মুরল্যাণ্ড। একদল টুরিস্টের পিছু পিছু গ্যালারিতে ঢুকেছেন তিনি, ও দেখতে পায়নি।

'তা তো বটেই,' চমক সামলে নিরাসক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। সত্যি বলতে কী, ভাঙাচোরা মূর্তিগুলো মোটেই মুগ্ধ করেনি ওকে। কীসের যেন অভাব অনুভব করেছে। 'ক্যাপশনে দেখলাম পার্থেননে বিস্ফোরণের কথা লেখা আছে। কী ঘটেছিল?'

'আর্কিয়োলজিকাল দিক থেকে চিন্তা করলে—ওটা বিশাল এক ট্র্যাজেডি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফিলবি। 'নির্মাণ হবার পর... প্রথম দু'হাজার বছরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পার্থেনন, কারণ শাসনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওটাকে চার্চ আর মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছিল। তারপরেও মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন ছিল ওটার—অ্যাথেনার মন্দির হিসেবে তখনও চেনা যেত ওটাকে। কিন্তু ১৬৮৭ সালে ঘটল ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ওটোম্যান তুর্কিরা দখল করে নিল অ্যাথেন্স, যুদ্ধ বাধাল ভেনিসের সঙ্গে। কী কারণে জানি না, অ্যাক্রোপোলিসে গান-পাউডার ম্যাগাজিন স্থাপন করে ওরা। ভেনিশিয়ানরা হামলা চালায় ওখানে। দূর থেকে ছুঁড়তে থাকে একের পর এক মর্টার শেল... শেষ পর্যন্ত সেগুলোর একটা আঘাত হানে তুর্কিদের অ্যামিউনিশনের গুদামে। ব্যস... ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটল। গুদাম-টুদাম তো গেলই, সেইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল পার্থেননের বেশিরভাগ স্তম্ভ ও ভাস্কর্য।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। নেভিতে কাজ করবার সুবাদে বিস্ফোরক সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে ওর। জানে, সুরক্ষিত জায়গায় অ্যামিউনিশন না রাখা হলে সেটা কত বড়

বিপদের কারণ হতে পারে। দুর্ঘটনা-জনিত বিস্ফোরণের কাহিনিও জানা আছে ওর। নিউক্লিয়ার বোমার কথা বাদ দিলে মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটেছিল কানাডার হ্যালিফ্যাক্স হারবারে—১৯১৭ সালে। দুটো জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল, যার একটার হোল্ডে ছিল প্রায় তিন কিলোটন টিএনটি। ভয়াবহ সেই বিস্ফোরণে জাহাজের আরোহী ছাড়াও বন্দরের দু'পাশে বসবাসকারী প্রায় দু'হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পুরো এলাকা। পার্থেননেও নিশ্চয়ই তেমনই কিছু ঘটেছিল। ভাঙাচোরা আর্টিফ্যাক্টগুলোর দিকে তাকাল ও। এগুলো যে সেই তাণ্ডবের পরও টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য!

'দুঃখজনক,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন।' সায় দিলেন ফিলবি।

'এগুলোই কি শুধু উদ্ধার করা গেছে পার্থেনন থেকে?' ডিসপ্লে-র দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড।

'উঁহুঁ। লর্ড এলজিন মাত্র অর্ধেক ভাস্কর্য আনতে পেরেছিলেন। বাকিগুলো এখন রয়েছে অ্যাথেন্সের নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়ামে। অবশ্য ওরা সবগুলোই ওখানে রাখতে চাইছে, কিন্তু আমরা রাজি হচ্ছি না। চিঠি চালাচালি চলছে সরকারি পর্যায়ে। দেখা যাক কতদিন ঠেকানো যায় ওদেরকে।'

'আপনাদের জিনিস ওরা চাইছে কেন? ব্রিটিশ মিউজিয়াম নিশ্চয়ই অবৈধ উপায়ে আর্টিফ্যাক্টগুলো নিয়ে আসেনি?'

'লর্ড এলজিনের কাছ থেকে এগুলো পেয়েছি আমরা। কিন্তু গ্রিকদের দাবি, তুর্কিরা অন্যায়ভাবে ওগুলো বিক্রি করেছিল তাঁর কাছে। বক্তব্যটা একেবারে অন্যায্য নয়। তা ছাড়া আরেক দেশের জাতীয় সম্পদ আমরা জোর করে রেখে দিতে পারি না। তারপরেও এতদিন আমরা বলে আসছিলাম, ভাস্কর্যগুলো ওখানে পাঠানো হলে নষ্ট হবে... এখানেই বরং বেশি নিরাপদে আছে

ওগুলো; তবে সম্প্রতি নতুন একটা উইং খাড়া করেছে নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়াম, ভাস্কর্য সংরক্ষণের অত্যাধুনিক সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে ওতে। কাজেই গ্রিকরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে সব ফেরত পাবার জন্য।'

'আপনার কী মনে হয়? ফেরত পাঠানো কি উচিত?'

'সন্দেহ নেই, মুভমেন্টে যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে... তবে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। এসব সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপার, আমার মাথা না ঘামালেও চলে।'

'হুম!' প্রসঙ্গ বদলাল মুরল্যাণ্ড। 'মার্বলসের যে-অংশটা আমাদের দরকার, সেটা কি আছে এই গ্যালারিতে?'

'আমার ধারণা, আছে। হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের কথা বলা হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে, তাই না? হেরাক্লিসের আরেক নাম হারকিউলিস, তা জানেন তো?'

'এখন জানলাম,' বিব্রত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড। গ্রিক পুরাণের বিষয়ে ওর জ্ঞান খুবই কম।

এলিয়ে বসে থাকা একটা নগ্ন পুরুষ-মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন ফিলবি। মাথা আস্ত আছে, তবে হাত নেই মূর্তিটার। গায়ের তলায় জড়ো হয়ে আছে আলখাল্লা। জিজ্ঞেস করলেন, 'থাবাটা দেখতে পাচ্ছেন?'

চোখ পিট পিট করল মুরল্যাণ্ড। আলখাল্লার ভাঁজের মাঝ থেকে বেরিয়ে আছে একটা বেড়াল জাতীয় প্রাণীর থাবা।

'আমাদের বিশ্বাস, ওটা সিংহের থাবা,' বললেন ফিলবি। 'তারমানে এটা হারকিউলিসের মূর্তি। পুরাণে আছে, নিমিয়ান সিংহকে হত্যা করেছিল সে—শুনে থাকবেন হয়তো। এবার এদিকে আসুন।'

মুরল্যাণ্ডকে ডানদিকে নিয়ে গেলেন তিনি। দুটো নারীমূর্তি দেখা যাচ্ছে ওখানে—স্রেফ ধড়, মাথা ভেঙে গেছে বহুকাল

আগে। একটার গায়ে অন্যটা হেলান দিয়ে বসে আছে।

ফিলবি বললেন, 'এদের পরিচয় সম্পর্কে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা। তবে অনেকের ধারণা, এখানে আফ্রোদিতি তার মা ডায়োনের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমিও সেটা সমর্থন করি।'

...হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা তোমাকে পথ দেখাবে...

কোডেক্সের হেঁয়ালিটা মনে পড়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। তীক্ষ্ণ চোখে মূর্তিগুলোর নীচের দিকে তাকাল ও। মিউজিয়াম ডিসপ্লে-র মার্বেল-বেইসের উপর বসে আছে ওগুলো।

'মূর্তির নীচে অরিজিন্যালি কী ছিল?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পেডিমেণ্টের বিম,' বললেন ফিলবি। 'পিলারের উপর সেই বিমের সাহায্যে বসতো গোটা কাঠামো।'

'হুম। তা হলে ধরে নিচ্ছি, হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা আসলে রেফারেন্স পয়েন্ট। কিন্তু কীসের?'

'আপনি আসলে কী খুঁজছেন, সেটা আমাকে বললে হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

দ্বিধায় ভুগল মুরল্যাণ্ড, মাইডাসের সমাধির কথা বলতে চাইছে না। কিন্তু একেবারে কিছু না বললেও মুশকিল, ভদ্রলোক সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন। ইতস্তত করে ও বলল, 'ইয়ে... আমাদের ধারণা, এগুলো প্রাচীন একটা ম্যাপ খুঁজে বের করবার সূত্র। সম্ভবত পার্থেননের আর্কিটেকচারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার।'

'ম্যাপ? ভারি ইন্টারেস্টিং তো! আপনার তা হলে গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গলের দিকে নজর দেয়া দরকার।'

'সোনালি আয়তক্ষেত্র?' একটু অবাক হলো মুরল্যাণ্ড। 'সেটা আবার কী?'

'সবচেয়ে নিখুঁত আয়তক্ষেত্র... অন্তত আর্কিটেক্টরা তা-ই মনে করে। পার্থেননের ডিজাইনে আপনি প্রচুর গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গল দেখতে পাবেন। *পাই* সিম্বল... যেটা গোল্ডেন রেশিও-কে রিপ্রেজেন্ট করছে, সেটার নাম এসেছে পার্থেননের নির্মাতা পাইডিয়াসের নাম থেকে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি।'

পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করে একটা সরলরেখা আঁকলেন ফিলবি। সেটার মাঝে এমন এক জায়গায় বিন্দু দিলেন, যাতে গোটা রেখাকে তিনভাগ করলে একপাশে দু'ভাগ, আর অন্যপাশে এক ভাগ থাকে। লম্বা অংশটার পাশে লিখলেন *এ*, আর ছোট অংশটার পাশে *বি*।

'গোল্ডেন রেশিও-তে,' বললেন তিনি, '*এ*-কে *বি* দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যাবে, তা হবে দুটোর যোগফলকে *এ* দিয়ে ভাগ করবার ফলের সমান।' এবার একটা আয়তক্ষেত্র আঁকলেন তিনি। লম্বা বাহুদুটো আগে আঁকা সরলরেখার সমান, আর ছোট বাহুদুটো শুধু *এ*-র সমান। 'এটাই গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গল। বাহুগুলো গোল্ডেন রেশিও-র অনুপাতে তৈরি। সে-কারণেই দেখতে খুব ভাল লাগে।'

'পার্থেনন কি এই লে-আউটে বানানো হয়েছিল?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'লে-আউট' না। ইমারতের সম্মুখভাগ... বা, ফাসাডগুলো সোনালি আয়তক্ষেত্রের মত। কলামগুলোর মাঝে যে-ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।'

তথ্যটা কীভাবে ওদের কাজে লাগবে, তা বুঝতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। শ্রাগ করে ও বলল, 'ধন্যবাদ, ড. ফিলবি। যথেষ্ট উপকার করলেন আমার।' হাত মেলাল ও। 'পরে কোনও প্রশ্ন জাগলে আপনাকে ফোন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!' নিজের সেলফোন নাম্বার দিলেন ফিলবি। 'যখন

খুশি যোগাযোগ করবেন। নির্দ্বিধায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরতে গেল মুরল্যাণ্ড, কিন্তু প্রবীণ আর্কিয়োলজিস্ট ওর হাত ছাড়লেন না। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মি. মুরল্যাণ্ড, কোডেক্সটা কবে নাগাদ জনসমক্ষে ডিসপ্লে করা হবে, জানতে পারি? গ্রিক ইতিহাস ও সভ্যতার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা যাবে ওটা থেকে।'

'দুঃখিত, আমি ওটার মালিক নই,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কাজেই বলতে পারছি না ওটা নিয়ে কী করা হবে।'

'উপযুক্ত স্কলারদের ওটা স্টাডি করতে না দেয়া হলে মস্ত বড় অন্যায় করা হবে। এখানে... এই মিউজিয়ামেই ওটা দান করে দিচ্ছেন না কেন আপনারা? আমাদের মত যত্ন আর কেউ করবে না ওটার।'

'আমি নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই ভাল কোনও জায়গায় স্থান পাবে জিনিসটা।'

'ইয়ে... আরেকটা কথা। কোডেক্সটা যদি বিক্রি করতে আগ্রহী হন আপনারা... আমার হাতে একজন ভাল ক্রেতা আছে।'

'কী বলতে চান?'

'না, মানে... বলতে চাইছিলাম যে... যদি ওটা আপনারা কোনও মিউজিয়ামে দান না করেন আর কী।'

ফিলবি হঠাৎ বিক্রির প্রসঙ্গ তুলছেন কেন? ক্রেতাই বা পেলেন কোথায়? চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ডের। একটাই অর্থ হতে পারে এর।

খপ্ করে ড. ফিলবির বাহু চেপে ধরল ও। 'আপনি কোডেক্সটার কথা কাউকে বলেছেন?'

অস্ফুট আওয়াজে ককিয়ে উঠলেন ফিলবি, মুরল্যাণ্ডের আঙুল বসে গেছে তাঁর পেশিতে। কিন্তু ছাড়া পেলেন না। দুর্বল গলায় বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. মুরল্যাণ্ড। কিন্তু আমার ওই

কণ্ট্যাক্ট বহুদিন থেকে খুঁজছেন এই কোডেক্সটা। টাকার পরিমাণ বড় নয় তাঁর জন্য... যা চাইবেন, তা-ই পাবেন। কিন্তু জিনিসটা তাঁর চাই-ই চাই।'

'অমন একটা আর্টিফ্যাক্ট বিক্রির প্রস্তাব আপনার মুখে অন্তত শোভা পায় না, ড. ফিলবি,' কঠিন গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

মাথা নিচু করে ফেললেন প্রবীণ আর্কিয়োলজিস্ট। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মিউজিয়ামের চাকরিতে নামমাত্র বেতন পাই আমি। কিছুদিন আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে আমার স্ত্রী-র সঙ্গে, ওর খোরপোষ দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন পর্যন্ত উকিলের ফি-ও পুরোটা শোধ করতে পারিনি। সেজন্যেই...'

ভদ্রলোকের দুঃখের কাহিনি শুনবার আগ্রহ বোধ করল না মুরল্যাণ্ড। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন আপনার কণ্ট্যাক্টকে জানিয়েছেন আমার কথা?'

'ইয়ে... আপনি আমার অফিস থেকে বের হয়ে যাবার পর। কিন্তু বিশ্বাস করুন... আমার মনে কোনও কুমতলব ছিল না।'

কুমতলব ড. ফিলবির হয়তো নেই, কিন্তু তাঁর কণ্ট্যাক্টের ব্যাপারে সে-কথা বলা যায় না। আর্কিয়োলজিস্টকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চারদিকে নজর বোলাল মুরল্যাণ্ড। বোঝার চেষ্টা করল, কেউ ওর উপর নজর রাখছে কি না।

'কে এই ক্রেতা?'

ঠোঁট কামড়ালেন ফিলবি। 'ভদ্রমহিলার নাম মায়া লরেঞ্জো। নামকরা বিজনেস টাইকুন। আমাকে বলে রেখেছিলেন, কোডেক্সটার ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখতে। যদি ওটা জোগাড় করে দিতে পারি, তা হলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেবেন। যদি কোনও ভুল করে থাকি, তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মি. মুরল্যাণ্ড। আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে

করে ফেলিনি?'

নামটা শোনামাত্র বুঝে ফেলল মুরল্যাণ্ড, কার কথা বলছেন ভদ্রলোক। এ নিশ্চয়ই গ্যারেটের সেই খালাতো বোন, যে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে... যার সঙ্গে ছোটবেলায় সে নেপলসের টানেলে ঢুকেছিল।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল মুরল্যাণ্ড, রানাকে সতর্ক করে দেবার জন্য। কিন্তু ডায়াল করবার আগেই দৃষ্টি আটকে গেল গ্যালারির একজন বিশালদেহী দর্শনার্থীর উপর। ধূসর রঙের সুট পরে আছে সে, হাতে একটা গাইড বই। ভাব করছে যেন গাইড বইয়ের সঙ্গে মেলাচ্ছে ডিসপ্লের আর্টিফ্যাক্টগুলো। কাঁচা অভিনয়। তা ছাড়া মিউজিয়ামের সাধারণ চেহারা-সুরতের টুরিস্টদের মাঝখানে গুণ্ডামার্কা এই ব্যাটাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। মুরল্যাণ্ডকে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে গেল সে।

দাঁতে দাঁত পিষল মুরল্যাণ্ড। বিশালদেহী ওই গরিলার সঙ্গে এখন বোঝাপড়া করতে হবে তাকে।

পঁচিশ

স্টাডিতে চুপচাপ বসে মায়ার কথা শুনে চলেছে রানা ও রেমি। গ্যারেটের সঙ্গে নিজের ইতিহাস খুলে বলছে মায়া। যত শুনছে, ততই শঙ্কিত হয়ে উঠছে রানা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, দু'জনের মধ্যকার বৈরি সম্পর্কের স্বরূপ। তা ছাড়া ইতিমধ্যে ওদেরকে গ্যারেটের দলে ফেলে দিয়েছে মেয়েটা। এর ফল ভাল

হতে পারে না।

মায়া আর গ্যারেটের মায়েরা ছিলেন চাচাতো বোন। কলেজের পড়া শেষ হবার পর গ্যারেটের মা আমেরিকায় যান গ্র্যাজুয়েশন করবার জন্য। সেখানেই গ্যারেটের বাবার সঙ্গে পরিচয় এবং বিয়ে। এরপর আমেরিকাতেই স্থায়ী হন তিনি। স্বামী-সন্তানকে নিয়ে শুধু একবার বেড়াতে এসেছিলেন ইটালিতে, গ্যারেটের বয়স তখন বারো। সে-বারই মায়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ওর। দু'জনে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসে মাইডাসের সমাধি।

সেই ঘটনার পর বাবা-মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে যায় গ্যারেট, আর কখনও নেপলসে ফেরা হয়নি ওদের। কয়েক বছর পেরিয়ে যাবার পর মায়া শুনেছিল, গ্যারেটের বাবা আত্মহত্যা করেছেন... কিছুদিন পর খবর পেয়েছে মারা গেছেন ওর মা-ও। কেন ওই অবস্থায় গ্যারেটকে ইটালিতে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠায়নি আমেরিকান সরকার, তা মায়ার অজানা। হতে পারে গ্যারেট নিজেই হয়তো আসতে চায়নি। আসল ঘটনা যা-ই হোক, ছেলেটার সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বড় হবার পর যখন মায়া মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার উদ্যোগ নিল, তখন খালাতো ভাইকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় ছিল না তার।

বছর চারেক আগে হঠাৎ করেই বদলে গেল সেই পরিস্থিতি। ইয়োরোপে হাজির হলো গ্যারেট, নিজেই যোগাযোগ করল মায়ার সঙ্গে। প্রস্তাব দিল মাইডাসের সমাধিতে ফিরে যাবার। মায়াও তা-ই চায়, পুরনো বন্ধুকে পাওয়ায় আগ্রহটা বেড়ে যায় আরও। দু'জনে আলোচনায় বসে। পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের জায়গায় তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভবনটার কথা গ্যারেটকে জানায় মায়া। গুপ্তপথটা ফাউণ্ডেশনের কংক্রিটে বুজে গেছে। ওটা

রি-ওপেন করতে গেলে বড় ধরনের ডেমোলিশন চালাতে হবে, পুরো বিল্ডিং ধসে পড়বার ঝুঁকি আছে। তা ছাড়া ওখান দিয়ে ঢুকলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। পুরো টানেল নেটওয়ার্কের ম্যাপিং না করে মাইডাসের চেম্বার খুঁজে বের করা যাবে না। তাতে বহু সময়ের প্রয়োজন, খরচাপাতিও পড়বে মেলা। গোলকধাঁধার মত ওই জায়গাটা ঠিকমত ম্যাপিং করা আদৌ সম্ভব কি না, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সোজা কথায় ওভাবে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তাই নানা দিক ভেবে দু'জনে একমত হয়—বিকল্প পথে অগ্রসর হওয়াই সবচেয়ে ভাল।

পরবর্তী তিন বছর গবেষণা করে কাটায় ওরা। মাইডাস বা প্রাচীন গ্রিস সংক্রান্ত যত ধরনের রেফারেন্স আছে, সব ঘেঁটে দেখেছে। কিন্তু কোথাও মাইডাসের সমাধি বা তার গোল্ডেন চেম্বার বিষয়ক কোনও তথ্য পায়নি। হতাশ হয়ে পড়ল দুজনে।

হঠাৎ করেই বছরখানেক আগে এক প্রয়াত ইংরেজ লর্ডের প্রাইভেট কালেকশনে পাওয়া গেল আর্কিমিডিসের হারানো কোডেক্স এবং একটা সোনার হাত। অ্যাকাডেমিক সার্কেলে মাতামাতি পড়ে গেল এ-নিয়ে। নিজস্ব কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে মায়া এবং গ্যারেটও খবর পায় ওগুলোর। সোনার হাতটার ছবি দেখে দুজনে নিশ্চিত হয়ে যায়, ওটা সেই গোল্ডেন চেম্বারে দেখা মূর্তিটার হাত। সেই সঙ্গে এ-ও জানতে পারে, কোডেক্সে মাইডাসের ঐশ্বর্য নিয়ে কী যেন লিখে রেখে গেছেন আর্কিমিডিস। ব্যস, ওরা নিশ্চিত হয়ে যায়—ওই কোডেক্সই ওদেরকে মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছে দিতে পারবে।

একটা ব্যাপার দু'জনে খুব ভাল করে বুঝতে পারছিল—কোডেক্স এবং ওই হাতটা নিলাম হবার আগেই কবজা করতে হবে ওদেরকে। যাতে এক্সপার্টরা জিনিসদুটো নিয়ে

গবেষণার সুযোগ না পায়। তা হলে মাইডাস চেম্বারের খবর ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই দুর্ধর্ষ এক পরিকল্পনা করে ওরা—অকশন হাউসের ভল্ট থেকে কোডেক্স এবং সোনার হাতটা চুরি করবার। এ-কাজ নিজ হাতে সারবার দায়িত্ব নেয় গ্যারেট; মায়া জুগিয়েছে খরচ ও লোকবল। সহকারী হিসেবে গ্যারেটকে পিন্টো ও মাযিনি নামে নিজের দুজন বিশ্বস্ত লোক দিয়েছিল সে, ওদের দায়িত্ব ছিল গোপনে কাজের অগ্রগতি ও গ্যারেটের গতিবিধির খবর মায়ার কাছে পৌঁছে দেয়া। নিয়মিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে ওরা... তবে সেটা অকশন হাউসে অপারেশন চালাবার আগের রাত পর্যন্ত। এরপর যেন পৃথিবীর বুক থেকে গায়েব হয়ে গেছে লোকদুটো... এবং গ্যারেটও!

অকশন হাউসে গ্যারেটের অপারেশন যে সফল হয়েছে, তা পত্র-পত্রিকা ও টিভির খবর মারফত জানতে পেরেছে মায়া। কিন্তু এরপর যে কোথায় হারিয়ে গেল ওরা, কিছুতেই বুঝতে পারেনি। চোখকান খোলা রেখেছে মায়া, লোক লাগিয়ে রেখেছে বিভিন্ন জায়গায়, তবে কোথাও উদয় হয়নি অকশন হাউস থেকে খোয়া যাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো। গ্যারেট যে বেঈমানী করতে পারে, এ-আশঙ্কা করেছে ঠিকই; কিন্তু টানা ছ'মাস কোনও খোঁজখবর না পেয়ে ভাবছিল পালাবার সময় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সাগরে ডুবে গেছে তার খালাতো ভাই।

'শেষ চেষ্টা হিসেবে মোমফলকটা কিছুদিন পরে কিনি আমি,' কাহিনির শেষে বলল মায়া। 'কোডেক্সের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছিল ওটা, কিন্তু মূল নিলামে তোলা হয়নি। ডাকাতি হবার পর অকশন হাউসের উপর থেকে আস্থা উঠে গিয়েছিল লর্ডের পরিবারের, ফলে সরাসরি ওদের কাছ থেকে চড়া দামে ওটা কিনে নিতে অসুবিধে হয়নি আমার। ভেবেছিলাম মোমফলক থেকে জরুরি কোনও সূত্র পাব, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হতাশা গ্রাস করছিল

আমাকে... তবে আজ তোমাদেরকে দেখে বুঝতে পারছি, এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। অ্যান্থনি বেঁচে আছে!'

বড় করে শ্বাস নিল রানা। বলল, 'ইন্টারেস্টিং গল্প। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক আছে তা ভাবছ কেন?'

'কারণ আর্কিমিডিসের কোডেক্সের কপি আছে তোমাদের বন্ধুর কাছে,' বলল মায়া। 'একটা উপায়েই সেটা তোমরা পেতে পারো—অ্যান্থনি গ্যারেটের কাছ থেকে! ডাকাতির রাতে যদি ও মারা গিয়ে থাকে, কীভাবে সেটা সম্ভব, বলো? ওই কোডেক্সের ক্যাটালগিং হতে দিইনি আমরা, কারও হাতেও পড়তে দিইনি। তার আগেই সরিয়ে নিয়েছি অকশন হাউস থেকে।'

'গ্যারেট কেন তোমার সঙ্গে বেঈমানী করবে? আত্মীয় তোমরা... ছোটবেলার বন্ধু। তোমাকে ঠকিয়ে কী লাভ ওর?'

'সোনার লোভ, রানা। সোনার লোভের সামনে আত্মীয়তার কোনও মূল্য নেই। তা ছাড়া অ্যান্থনি একটা লোভী বদমাশ। প্রায় তিন বছর ওর সঙ্গে কাজ করেছি আমি, পদে পদে দেখেছি ওর নীচতা। পার্টনার নয়, আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত আচরণ করেছে ও সবসময়। সাবধান করে দিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে যেন ছলচাতুরি না করে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি। মাইডাসের সমস্ত সোনা একা হজম করবার লোভে বেঈমানী করেছে ও, খুন করেছে আমার দুজন বিশ্বস্ত লোককে। এর শাস্তি পেতেই হবে ওকে।'

স্টাডির দরজা খুলে গেল এই সময়। মায়ার গাঁট্টাগোট্টা অ্যাসিসটেন্ট হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে ঢুকল ভিতরে। রানার ব্যাগ... ওটার ভিতরেই জিয়োলেবটা রেখেছে ও। রেঞ্জ রোভারের ট্রাঙ্ক থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসা হয়েছে। মায়ার সামনে ওটা নামিয়ে রাখল লোকটা, ভিতর থেকে বের করে আনল জিয়োলেব।

চকচক করে উঠল মায়ার চোখ। 'চমৎকার ডিভাইস,' হাসল

সে। 'নিশ্চয়ই মাইডাসের সমাধি খোঁজার কাজে লাগবে এটা?'

কিছু বলল না রানা বা রেমি। মুখ কালো হয়ে গেছে ওদের।

জিয়োলেবটা ব্যাগের ভিতরে আবার ঢুকিয়ে রাখল মায়া। সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে ইটালিয়ান ভাষায় হড়বড় করে কিছু বলল।

'সি, সেনিয়রা,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাসিসটেন্ট। ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল স্টাডি থেকে।

মনে মনে পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। আটকা পড়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কামরার ভিতরে কেউ অস্ত্র দেখাচ্ছে না বটে, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে চাইলেই বাধা দেবে মায়ার লোকজন। তারচেয়ে কথাবার্তা বলে মেয়েটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা ভাল। শান্ত গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি আমাদের কাছে?'

'অ্যান্থনির খোঁজ দেবে তোমরা আমাকে,' শীতল গলায় বলল মায়া। 'স্বেচ্ছায় যদি না দাও, টর্চার চালানো হবে!'

'ব্যস, এ-ই? মাইডাসের চেম্বার খোঁজায় সাহায্য চাও না আমাদের?'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই, রানা। অন্যের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়েছি আমি। কঠিন হলেও সরাসরি রাস্তাই ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছি। তার জন্য কোনও গ্রিক স্পেশালিস্ট বা শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট প্রয়োজন নেই আমার। প্রয়োজন শুধু টাকা এবং লোকবলের। দুটোই যথেষ্ট আছে আমার কাছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

চেয়ারে হেলান দিল মায়া। 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই বিল্ডিং আমি ক্লিনে নিয়েছি, রানা। হ্যাঁ, কলকাঠি নাড়তে হয়েছে... ইটালিয়ান সরকারের বেশ কিছু পকেটে ঘুষ দিতে হয়েছে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা করে ছেড়েছি আমি। আগামী সোমবারেই

ওটার দখল বুঝে পাব, আর তারপরেই আমার ডেমোলিশন টিম ওই বিল্ডিঙের ফাউণ্ডেশন ভেঙে টানেলে ঢোকার গোপন পথটা রি-ওপেন করবে। ভিতরে ঢুকে চিরুনি-তল্লাশি শুরু করব, তাতে যত লোক লাগে লাগুক। চেম্বারটা বের করে ছাড়ব আমি। আর্কিমিডিসের কোডেক্স বা তোমাদের সাহায্য কেন চাইছি না, তা বুঝতে পারছ আশা করি? এখন শুধু অ্যান্থনিকে শাস্তি দিতে পারলেই আমার মনের আশা পূর্ণ হয়।'

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। কেন চারদিনের মধ্যে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে চাইছে গ্যারেট, সেটা বুঝতে পারছে। সোমবারের পর থেকে টানেলের ভিতর মায়া তল্লাশি চালাবে। তখন আর ওখানকার ছায়াও মাড়াতে পারবে না সে। তাই মায়ার আগেই ওখানে পৌঁছুতে চাইছে।

'সাহায্য করতে পারলে খুশিই হতাম,' মায়ার উদ্দেশে বলল রেমি। 'কিন্তু গ্যারেট যে কোথায়, সেটা জানা নেই আমাদের।'

'মিছে কথা বলে লাভ হবে না, ড. হ্যাডলি।' ডেস্কের উপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকল মায়া। 'ভায়োলেন্স পছন্দ নয় আমার। তাই সহজ একটা সুযোগ দিচ্ছি। অ্যান্থনির খোঁজ দেবার বিনিময়ে টাকা দেব তোমাদেরকে। বলো কত চাও?'

ঠোঁট কামড়াল রানা। এ-ধরনের প্রস্তাব একবারই পাওয়া যায়। রাজি না হবার অর্থ মৃত্যু। ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে মায়া, যেভাবে হোক, গ্যারেটের খবর ওদের কাছ থেকে বের করে নেবে সে। একবার ভাবল মেয়েটার সঙ্গে হাত মেলাবে কি না, কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল ভাবনাটা। গ্যারেট যদি টের পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও র‍্যাচেলকে।

'তুমি যে কথা রাখবে, তার গ্যারান্টি কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মুখের কথায় আস্থা রাখতে হবে তোমাদেরকে,' বলল মায়া। 'ইউ সি, তেমন কোনও বিকল্প নেই তোমাদের হাতে। হয় অ্যান্থনির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সব খোয়াও, অথবা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে কামিয়ে নাও নগদ টাকা। বলো কোন্‌টা পছন্দ?'

কয়েক মুহূর্ত ভাববার ভান করল রানা। তারপর বলল, 'বেশ। তিন মিলিয়ন ডলার। জনপ্রতি।'

ঝট্‌ করে ওর দিকে তাকাল রেমি। দৃষ্টি বিস্ফারিত। 'কী বলছ তুমি এ-সব?'

ওকে চোখের ইশারা করল রানা। 'খামোকা ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কী, বলো? গ্যারেট আমাদেরকে এক মিলিয়ন দেবে বলেছে; এখন মায়া যদি তার তিনগুণ দিতে রাজি থাকে... ওর সঙ্গে হাত মেলানো ভাল না? তা ছাড়া আমার ধারণা, আমাদের পারিশ্রমিক মেটাবার আগেই খতম হয়ে যাবে গ্যারেট।'

ইশারা বুঝতে পেরেছে রেমি। ছোট্ট করে মাথা ঝোঁকাল।

'তিন মিলিয়ন?' পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকাল মায়া। 'ঠিক আছে। পাবে। এখন তা হলে বলো, অ্যান্থনি কোথায়?'

'ড. হ্যাডলি মিথ্যে বলেনি, আমরা সত্যিই জানি না গ্যারেট এ-মুহূর্তে কোথায় আছে,' বলল রানা। 'তবে তুমি যদি একটু ধৈর্য ধরো, ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারব। আমাদের পরবর্তী মিটিঙের লোকেশন খুব শীঘ্রি জানাবে ও। তখন নাহয় খবর দেব তোমাকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখভঙ্গি যাচাই করল মায়া, কিন্তু তাতে কোনও ভণিতা খুঁজে পেল না। ডেস্কের তলায় হাত দিয়ে বেল টিপল সে।

অ্যাসিসটেন্ট ফের ঢুকল স্টাডিতে। মায়ার ইশারা পেয়ে কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করল সে। তাক করল রানা

আর রেমির দিকে।

'এসবের মানে কী!' রাগী গলায় বলল রেমি। 'আমরা তো রাজি হয়েছি তোমার প্রস্তাবে!'

'কিছু মনে কোরো না,' বলল মায়া। 'আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে তোমাদেরকে। যতক্ষণ না অ্যান্থনির খোঁজ দিতে পারছ, ততক্ষণ আমিও তোমাদেরকে ছাড়তে পারছি না।'

'আর টাকা?' ভুরু নাচাল রানা।

'সেটাও অ্যান্থনিকে ধরিয়ে দেবার পর পাবে। কাজ খতম না হলে পেমেন্ট করি না আমি।'

রানা আর রেমিকে দাঁড় করিয়ে দক্ষ হাতে দেহতল্লাশি করল মায়ার অ্যাসিসটেন্ট। কেড়ে নিল সেলফোন। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের আর উপায় থাকছে না ওদের।

রানা বলল, 'এসব কিন্তু চরম বাড়াবাড়ি।'

'উঁহুঁ, স্রেফ সতর্কতা।' ঘড়ি দেখল মায়া। 'আমাকে জরুরি একটা কাজে যেতে হচ্ছে, ফিরে এসে আবার কথা বলব। আপাতত রবার্তোর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি তোমাদেরকে। ও তোমাদের কামরা দেখিয়ে দেবে। যাও, বিশ্রাম নাও। লাগেজ-টাগেজ বোধহয় নেই তোমাদের সঙ্গে। জামা-কাপড় আর অন্যান্য টুকিটাকি যা প্রয়োজন, রবার্তোকে জানালে ও আনিয়ে দেবে।'

রবার্তো নামের অনুচরটিকে ইটালিয়ানে কিছু নির্দেশ দিল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা আর রেমির দিকে পিস্তলের ইশারা করল লোকটা। 'চলুন।'

'গুডবাই, মি. রানা। গুডবাই, ড. হ্যাডলি।' বিদায় জানাল মায়া। 'লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মত থেকো। ডান-বাম করতে গেলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে।'

স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল মায়া। খানিক অপেক্ষা করে

রবার্তোও বেরুল রানা আর রেমিকে নিয়ে। পিস্তল হাতে পিছনে রইল সে, ওদেরকে ইশারা করল সামনে এগোতে। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী?'

'আমরা পালাচ্ছি,' সংক্ষেপে জানাল রানা।

'কীভাবে?'

'এখনও ভাবছি।'

'তাড়াতাড়ি ভাবো!'

পিছন থেকে ধমকে উঠল রবার্তো। মুখ বন্ধ রেখে দ্রুত পা চালাতে বলছে।

খানিক পরেই মার্বেলপাথরে মোড়া চওড়া একটা সিঁড়ির সামনে পৌঁছে গেল ওরা। রবার্তোর নির্দেশে ওটার ধাপ বেয়ে উঠে এল দোতলায়। ল্যাণ্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে, কাঠের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় এক পোর্সেলিন ভাস, গায়ে হাজারো নকশা—নিঃসন্দেহে জিনিসটা প্রাচীন কোনও আর্টিফ্যাক্ট।

মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল রানার। ভাসের দিকে ইশারা করে রেমিকে বলল, 'সাবধান!'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল রেমি। 'সাবধান মানে? আমি তো আর...'

কথা শেষ করতে পারল না ও। কোমরের হালকা ধাক্কায় ওকে ভাসের দিকে ঠেলে দিল রানা। তৈরি ছিল না রেমি, বেসামাল হয়ে সোজা গিয়ে পড়ল ভাসটার গায়ে। স্ট্যাণ্ডের উপর নড়ে উঠল ওটা, পড়ে যেতে শুরু করল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল রেমি। সবকিছু ভুলে হাত বাড়িয়ে দিল ভাসটা ধরবার জন্য। ইনস্টিঙ্কটের বশে একই কাজ করতে গেল রবার্তোও। আর সেখানেই করল ভুল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এগোতে থাকা রবার্তোকে

এক ধাক্কায় দেয়ালের উপর নিয়ে ফেলল ও। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই খামচে ধরল চুল, মাথাটা ঠুকে দিল হার্ডউডের প্যানেলের গায়ে। ককিয়ে উঠল রবার্তো। পরক্ষণে কবজির উপর একটা কারাতে চপ পড়তেই মুঠো থেকে ছেড়ে দিল পিস্তল। ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে লোকটাকে সিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। গড়াতে গড়াতে সে নেমে গেল নীচে। নীচতলার ল্যাণ্ডিঙে যখন আছড়ে পড়ল, তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, তাকাল সঙ্গিনীর দিকে। ভাসটা দু'হাতে ধরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোযি।

'এসো,' বলে রবার্তোর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল রানা। নেমে এল নীচতলায়। অজ্ঞান লোকটার পকেট হাতড়ে তিনটা সেলফোন পেল—ওর, রেমির, আর রবার্তোর নিজের। রেমির ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে বাকি দুটো জ্যাকেটের পকেটে ভরে ফেলল রানা। তারপর পা বাড়াল স্টাডির দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। 'পালাবে না?'

'ট্যাবলেটটা ছাড়া নয়,' বলল রানা।

স্টাডিতে ঢুকে মায়ার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ও। লুকানো বোতামটা খুঁজে বের করে চাপ দিল ওতে। প্যানেল সরে গিয়ে আবারও উন্মুক্ত হলো ডিসপ্লে কেইস। পিস্তলের বাটের আঘাতে ভেঙে ফেলল কাঁচ। মোমের ফলকটার দিকে হাত বাড়াতেই বাধা পেল রেমির কাছ থেকে।

'আমি নিচ্ছি ওটা,' বলল মেয়েটা। 'জিনিসটা খুব নাজুক। সাবধানে হ্যাণ্ডেল করা দরকার।'

'আমি হ্যাণ্ডেল করতে পারব না ভাবছ?'

'আপাতত আমাদের নিরাপত্তার দিকটা হ্যাণ্ডেল করো তুমি।'

ভাঙা ডিসপ্লে কেইস, থেকে সাবধানে মোমফলকটা বের করে

আনল রেমি। ঢুকিয়ে ফেলল পোশাকের তলায়। ওকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা। হাতল ঘোরাতে যাবে, এমন সময় বাইরে শোনা গেল উত্তেজিত হৈ-চৈ। রবার্তোকে খুঁজে পেয়েছে কেউ।

'যাশ্ শালা!' খেদোক্তি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে।

'কী করব এখন?' ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল রেমি।

স্টাডির বিশাল কাঁচের জানালার দিকে ইশারা করল রানা। 'দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে না, অতএব ওটাই আমাদের এগজিট। তবে তার আগে ছোট্ট একটা কাজ সেরে নেয়া দরকার।'

রবার্তোর ফোনটা বের করে স্মৃতি থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করল ও। একবার রিং হতেই জবাব ভেসে এল ওপাশ থেকে।

'ল্যারি কিং।'

'ল্যারি, আমি রানা।'

'রানা? এটা আবার কার নাম্বার...'

'কথা বলার সময় নেই। কুইক, এই কলটা রেকর্ড করতে থাকো। লাইনটা যতক্ষণ জ্যান্ত থাকবে, রেকর্ড চালিয়ে যাওয়া চাই। কিছুতেই বন্ধ কোরো না।'

'ঠিক আছে,' দ্বিরুক্তি না করে রাজি হয়ে গেল ল্যারি।

ফোনটা স্টাডির বইয়ের তাকের মাঝে গুঁজে রাখল রানা, যাতে সহজে খুঁজে না পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে জানালার পাল্লা খুলে ফেলেছে রেমি, হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। ওর দিকে পা বাড়াতেই শোনা গেল অ্যালার্মের আওয়াজ—পুরো এস্টেট জুড়ে বাজছে। শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। রবার্তোর মত কত লোক আছে সিকিউরিটিতে, কে জানে। ছোটখাট একটা বাহিনী উদয় হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। তাড়াতাড়ি কেটে পড়া দরকার।

চৌকাঠ টপকে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বাইরের লনে নামল

দু'জনে। ঘাপটি মারল একটা বড় ঝোপের পিছনে। উঁকি-ঝুঁকি মেরে আশপাশ দেখে নিল রানা, তারপর রেমির হাত ধরে ছুট লাগাল বাড়ির পিছনদিকে।

'ওদিকে যাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'আমাদের গাড়ি তো সামনে!'

'ওখানে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে মায়ার লোকজন,' বলল রানা। 'বিকল্প বাহন দরকার।'

'কিন্তু আমাদের জিয়োলেব?'

'আপাতত ওটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আগে প্রাণটা তো বাঁচাই!'

আস্তাবলের সামনে পৌঁছে গেল দু'জনে। এদিকটায় কেউ নেই। দরজা খুলে বিশাল বিল্ডিংটার ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। দ্রুত আস্তাবলের অভ্যন্তরে চোখ বোলাল রানা। মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলার রাস্তা, দু'পাশে ঘোড়া রাখার স্টল। সবগুলোতেই ঘোড়া আছে, তবে কোনও মানুষজন নেই এ-মুহূর্তে। দুই নবাগতের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকটা ঘোড়া অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকল। শোনা গেল মৃদু হ্রেষারব।

'এখানে কেন এলে?' বিরক্ত গলায় বলল রেমি। 'এখানে তো কোনও গাড়ি নেই।'

'গাড়ির জন্য তো আসিনি!' বলল রানা।

চোখ পিট পিট করল রেমি। কথাটার অর্থ বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। ঘোড়া নিয়ে পালাতে চাইছে রানা!

ছাব্বিশ

ড. ফিলবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত পা ফেলছে মুরল্যাণ্ড, বেরিয়ে এসেছে ডুভিন গ্যালারি থেকে। আড়চোখে লক্ষ করেছে, গরিলাও পিছু নিয়েছে ওর। সেলফোনে রানার কাছে একটা মেসেজ পাঠাল ও—সতর্ক করে দেবার জন্যে। একটু পরেই পেল জবাব।

খবর পাঠাতে একটু দেরি করে ফেলেছ, বন্ধু। অলরেডি ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। চেষ্টা করছি এখান থেকে বের হতে। হিথ্রোতে চলে যাও। ওখানেই দেখা করব।

রানা আর রেমির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে মুরল্যাণ্ডের, কিন্তু করার কিছু নেই। আপাতত নিজের ঝামেলা সামলাতে হবে। পিছু নেয়া লোকটাকে নিয়ে বিশেষ ভয় পাচ্ছে না। মারামারি বাধলে ব্যাটাকে শুইয়ে ফেলতে পারবে বলে বিশ্বাস আছে ওর। কিন্তু অমন কিছু করতে গেলে পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাবে। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। কাজেই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়তে হবে।

ব্যাকপ্যাকটা ভাল করে টেনে পিঠের সঙ্গে আটকে নিল মুরল্যাণ্ড। ম্যাপ বের করে দেখে নিল অবস্থান। ডুভিন গ্যালারি থেকে একশো গজ সরে এসেছে ও। এখান থেকে বেরুবার পথ

দুটো। একটা পিছনে—ওটা ধরে গ্রেট কোর্টে বেরুতে পারবে। অন্যটা সামনের দিকে... মিউজিয়ামের গিফট শপের ভিতর দিয়ে।

ব্যাকট্র্যাকিং পছন্দ করে না মুরল্যাণ্ড, তাই সামনে এগোবারই সিদ্ধান্ত নিল। মিউজিয়াম থেকে বের হতে পারলেই হয়। লণ্ডনের ভিড়বাট্টার মাঝে পিছনের লোকটাকে খসিয়ে ফেলতে কষ্ট হবে না। ওর থেকে ত্রিশ ফুট পিছনে থাকছে সে সবসময়। ডিসপ্লে কেইসের কাঁচে তার প্রতিফলন দেখে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড।

রুক্ষ চেহারার একজন মানুষ, ভুরু জোড়া অস্বাভাবিক রকমের পুরু। নাক ভাঙা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সুদর্শন তো নয়ই, সরাসরি কুৎসিত বলা চলে অনায়াসে। তবে চেহারার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়েছে তার শরীরের কাঠামো। মুরল্যাণ্ডের চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা লোকটা, বুকের ছাতিও বড়। হাতদুটো মুগুরের মত। উদ্ধত ভঙ্গিতে হাঁটছে, যেন দুনিয়ার কাউকেই পরোয়া করে না। বোঝা গেল, গায়ের জোর খাটিয়ে এবং মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করায় সে অভ্যস্ত। কৌশল খাটাতে জানে না। এ-ধরনের লোককে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, তা মুরল্যাণ্ড জানে। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকটার সঙ্গী-সাথী থাকতে পারে আশপাশে। সবার সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। কাজেই সময় থাকতেই কেটে পড়া ভাল।

পরের আর্চওয়েতে পৌঁছে মোড় নিল মুরল্যাণ্ড। বাড়িয়ে দিল চলার গতি। দুটো গ্যালারি আর সবশেষে গিফট শপ পেরিয়ে পৌঁছে গেল মিউজিয়ামের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের কাছাকাছি। দুপুর বেলায় ভিড় কম, আঙিনার মত জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকাই পাওয়া গেল। খুশি হয়ে উঠল ও। রাস্তায় নেমে তিন ব্লক গেলেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশন। দূরত্ব খুব বেশি নয়।

কিন্তু বিধি বাম।

গেট পেরুতেই একটা বিএমডব্লিউ গাড়ি এসে ব্রেক কষল পেভমেন্টের পাশে। কালো পোশাক পরা দু'জন লোক নামল ওটা থেকে। ডানে-বামে কোথাও তাকাল না, সরাসরি মুরল্যাণ্ডের উপর নিবদ্ধ হলো ওদের দৃষ্টি। এগিয়ে আসতে শুরু করল আগ্রাসী ভঙ্গিতে। বদখত চেহারা দু'জনেরই—একজন শুকনো-পাতলা, নাকের তলায় শোভা পাচ্ছে সরু এক টুকরো গোঁফ... সময় নিয়ে যত্ন করে ছাঁটা... গোঁফটা শয়তানি ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। দ্বিতীয়জন মাঝারি গড়নের, ক্লিন-শেভড্, মাথায় লম্বা চুল... পিছনে ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে। গরিলার উপযুক্ত সঙ্গীই বটে!

থমকে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, বিশালদেহী লোকটা ওর দশ ফুটের মধ্যে এসে গেছে। তিনদিক থেকে ওকে ঘিরে দাঁড়াল শত্রুরা। কোথাও যাবার উপায় নেই।

গোঁফঅলা লোকটা গরিলার উদ্দেশে ইটালিয়ানে কিছু বলল। কথাগুলো বুঝতে পারল না মুরল্যাণ্ড, শুধু এটুকু বুঝল, গরিলার নাম টমি।

'সি,' সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল টমি। তারপর মুরল্যাণ্ডের দিকে ফিরল। 'মি. ববি মুরল্যাণ্ড, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

একে একে তিন প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'যদি যেতে না চাই?'

কোটের একটা পাশ সরিয়ে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তল দেখাল টমি। বুঝিয়ে দিল, কথা না শুনলে ওকে গুলি করা হবে।

'তুমি কি জানো, লণ্ডনে বেআইনী অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ?' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশের হাতে যদি অ্যারেস্ট হও ওই কামান-সহ, তা হলে কিন্তু বিরাট গাড্ডায় পড়বে।'

'এ-মুহূর্তে আপনিই গাড্ডার মধ্যে আছেন,' নীরস গলায়

বলল টমি।

'মায়া লরেঞ্জো পাঠিয়েছে তোমাদেরকে, তাই না?'

নামটা শোনামাত্র একটু কেঁপে উঠল টমির চোখের পাতা। কঠিন গলায় বলল, 'কথা কম। গাড়িতে উঠুন!'

'সত্যি ঝামেলা করতে চাও?'

বিভ্রান্তি ভর করল টমির চোখের তারায়। তার হুমকির সামনে এই প্রথম কাউকে অটল থাকতে দেখছে। 'উঠুন বলছি!' ধমকে উঠল সে।

'পারলে ওঠাও।'

দৃষ্টি বিনিময় করল তিন গুণ্ডা। তারপর একযোগে আগে বাড়ল।

পেশি শক্ত করে ফেলল মুরল্যাণ্ড, শত্রুরা পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতে বলল, 'মস্ত ভুল করছ। এখনও সময় আছে, চলে যাও।'

'ধর্ ব্যাটাকে!' বলে উঠল টমি।

দু'পাশ থেকে গোঁফঅলা আর ঝুঁটিঅলা হাত বাড়াল মুরল্যাণ্ডের হাত ধরার জন্য। এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। নিমেষে ঝড় বয়ে গেল।

এরা স্রেফ রাস্তার গুণ্ডা, আনআর্মড্ হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাটের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ, নইলে এভাবে বোকার মত নিজেদের অরক্ষিত করে ফেলত না। সামান্য ঘুরে গিয়ে গোঁফঅলার ঘাড়ে বিরাশি সিক্কার এক রদ্দা বসাল মুরল্যাণ্ড। প্রায় একই সময়ে অন্যহাতের কনুই চালাল ঝুঁটিঅলার নাক বরাবর। গোঁফঅলা ইতিমধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, দু'হাতে ভাঙা নাক ধরে কাতরে উঠল ঝুঁটিঅলা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে অঝোর ধারায় নামছে রক্ত। সোলার-প্লেক্সাসে ভয়ানক এক গুঁতো খেতেই খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে।

ক্ষণিকের জন্য থমকে গিয়েছিল টমি, সংবিৎ ফিরতেই

হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে আনল পিস্তল। কিন্তু মুরল্যাণ্ডের নাগালের মধ্যে থেকে মস্ত ভুল করেছে সে। কবজির উপর কারাতে চপ পড়তেই ককিয়ে উঠে মুঠো ছেড়ে দিল। সাইডওঅকের উপর খটমট করে পড়ে গেল পিস্তলটা। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল, মনের সাধ মিটিয়ে তার ঊরুসন্ধিতে একটা পেনাল্টি কিক ঝাড়ল মুরল্যাণ্ড। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল গরিলার মুখ দিয়ে। তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল সে কংক্রিটের উপর। দু'হাতে আহত স্থানটা চেপে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল শরীর। বেশ কিছুটা সময়ের জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়েছে।

এতকিছু ঘটে গেছে মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে। পরাজিত প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড, ব্যাপারটা এত সহজ হবে ভাবেনি। বোকার দল, ওকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিল। ঝুঁকে লোক-তিনটের কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করে নিল ও। ম্যাগাজিন খুলে ফেলল, আলাদা করে ফেলল স্লাইডগুলো; তারপর অচল অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলল পেভমেণ্টের উপর।

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার উপর নজর পড়ল ওর। খামোকা হাঁটার দরকার কী? তা ছাড়া গাড়ি না থাকলে ওর পিছুও নিতে পারবে না এরা। বিএমডব্লিউ-র ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়ল ও। আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশন পর্যন্ত আরামে চলে যাবে। তারপর গাড়িটা ওখানকার পার্কিং লটে ফেলে রাখলেই হলো।

ইঞ্জিন বন্ধ করেনি গুণ্ডারা, গিয়ার দিল মুরল্যাণ্ড। চলতে শুরু করবার আগে খোলা জানালা দিয়ে তাকাল পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'একটা উপদেশ দিচ্ছি, টমি। আগামীতে আরও বেশি লোক এনো!'

ব্রেক রিলিজ করে গাড়িকে সামনে বাড়াল ও। পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল টমি, ইটালিয়ানে গালাগালির তুবড়ি

ছুটিয়েছে। তবে ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড, গালিগুলো ওর কানে পৌঁছুল না।

সাতাশ

'আমি ওটার পিঠে চড়ছি না,' বলে উঠল রেমি।

আস্তাবলের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ভয়ার্ত চোখে দেখছে, মায়ার অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে রানা। ঘন ঘন ঢোঁক গিলল ও।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। হাতে সময় নেই, যে-কোনও মুহূর্তে ওদের খোঁজে আস্তাবলে তল্লাশি চালাতে আসবে শত্রুরা। 'ঘোড়ায় চড়তে বলছি তোমাকে, বাঘ বা সিংহের পিঠে নয়। তা ছাড়া... আর কোনও বাহনও নেই আমাদের হাতে।'

'তুমি যাও। আমি নাহয় চেষ্টা করে দেখি, গাড়িটা উদ্ধার করা যায় কি না।'

'এবার কিন্তু বোকার মত কথা বলছ। কীভাবে উদ্ধার করবে গাড়ি? তাও আবার একা!'

'আ... আমি ঘোড়ায় চড়তে চাই না!'

'কেন... রাইডিং জানো না? এর আগে কোনোদিন চড়োনি?'

'চড়েছি... প্রায় বিশ বছর আগে। আর সে-কারণেই বুঝতে পারছি, ঘোড়ার চেয়ে মায়ার গুণ্ডাদের ডিল করা সহজ।'

'কিছুই ডিল করতে হবে না তোমাকে। আমার পিছনে

চড়বে।'

'তা-ও...'

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে এক দফা আলোচনা হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। ওদের গাড়িটা রয়েছে বাড়ির সামনে—ধরা না পড়ে ওখানে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। পুলিশে ফোন করেও লাভ হবে না। পুলিশ আসা পর্যন্ত যদি লুকোচুরি করে টিকেও থাকতে পারে... তেমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ... মায়া সরাসরি অস্বীকার করবে সমস্ত অভিযোগ। উল্টো পুলিশের কাছে নালিশ জানাবে, রানা আর রেমি ওর বাড়ির ভিতরে ভাঙচুর করেছে, ওর বডিগার্ডকে আহত করেছে। তার প্রমাণও দেখাতে পারবে সে। এর অর্থ, ওদেরকে গ্রেফতার করবে পুলিশ। তাতে জীবন নিয়ে এই এস্টেট থেকে বেরুনো গেলেও আটকা পড়তে হবে হাজতে। কিছুতেই গ্যারেটের দেয়া ডেডলাইনের ভিতর কাজ শেষ করতে পারবে না। অগত্যা পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

দ্রুত ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো শেষ করল রানা, লাগাম পরাল। স্ট্র্যাপের বাঁধন পরীক্ষা করে ফিরল সঙ্গিনীর দিকে।

'আমি রেডি। এসো।'

'আ... আমি পারব না, রানা।'

'পারতেই হবে!' ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না রানার পক্ষে। রেমির দিকে এগিয়ে গেল ও। খপ্ করে ধরল ওর একটা বাহু। কড়া গলায় বলল, 'শোনো, তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বে তুমি... আর ঘোড়ায় চড়েই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। ক্লিয়ার?'

আপত্তি জানাবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল রেমি, বাধা পেল বাইরে থেকে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ভেসে আসায়। ওকে জাপটে ধরে মাটিতে ডাইভ দিল রানা, পরক্ষণে দরজার পুরনো কাঠ ফুটো করল কয়েকটা বুলেট।

গাল দিয়ে উঠল রানা, ওদের খোঁজ পেয়ে গেছে শত্রুরা। দরজার তক্তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। অস্ত্র উঁচিয়ে ছুটে আসছে চারজন লোক।

'মুভ!' এক টানে রেমিকে দাঁড় করাল রানা। নিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে।

স্যাডলের সামনে হাতড়াল রেমি। 'এখানে একটা শিঙের মত জিনিস থাকে না? ওটা কোথায়?'

গ্রিপে। কথা জানতে চাইছে ও। রানা বলল, 'ওই জিনিস আমেরিকান স্যাডলে থাকে। এটা ব্রিটিশ স্যাডল।'

'সে কী! পড়ে যেতে গেলে আমি তা হলে কী ধরব?'

'আমাকে,' সংক্ষেপে বলল রানা। এক লাফে চড়ে বসল স্যাডলে, স্টিরাপে পা বাধিয়ে টান দিয়ে রেমিকে তুলে নিল নিজের পিছনে। জুতোর হিল দিয়ে খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে।

আস্তাবলের পিছন দিকে ছুটে গেল প্রাণীটা। ওদিকে আরেকটা দরজা আছে, সেটার ছিটকিনি আগেই খুলে রেখেছে রানা। ঘোড়ার পায়ের লাথিতে হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লা। সেখান দিয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরুল প্রাণীটা। ছুটতে শুরু করল প্রাণপণে।

পঞ্চাশ গজ যেতেই পিছনে শোনা গেল হৈচৈ। ঘাড় ফেরাল রানা। আস্তাবলের পিছনে উদয় হয়েছে মায়ার লোকেরা। একজন রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করতে গেল, কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই কোত্থেকে যেন ছুটে এল মায়া। থাবা দিয়ে নামিয়ে দিল রাইফেলের ব্যারেল।

'ওর দাম তোমার চেয়ে অনেক বেশি!' ইটালিয়ানে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, দূর থেকেও তার গলা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। প্রিয় ঘোড়াটার আহত হবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না সে।

তাই বলে হাল ছাড়ল না ওরা। আরও কিছুদূর এগোবার পর

শোনা গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। দুটো জিপ চলে এসেছে বাড়ির সামনে থেকে। আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে তুলে নিল মায়া ও তার সঙ্গীদের, তারপর ধাওয়া করল রানা আর রেমিকে।

ডানদিকে জঙ্গল দেখতে পেয়ে সেদিকে ঘোড়া ছোটাল রানা। গাছগাছালির ভিতরে ওদের পিছু নিতে পারবে না জিপদুটো। ঘাড় ফিরিয়ে রেমিকে দেখে নিল। ওকে মাকড়সার মত জাপটে ধরে রেখেছে মেয়েটা, চোখ বন্ধ... তবে পড়ে যাবার ভয় নেই। সন্তুষ্ট হয়ে ঘোড়াকে আরও জোরে ছোটাল রানা।

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। গাছপালা খুব ঘন নয়, যে-রকম আগাছা আর ঝোপঝাড় থাকার কথা মাটিতে, তা-ও নেই। বোঝা গেল, এটা আসলে কৃত্রিম জঙ্গল—পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে এস্টেটের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য। অবশ্য তারপরেও জায়গাটা রানার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যথেষ্ট। গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল ও। পিছনে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল জিপের আওয়াজ।

দম ফেলবার ফুরসত পেয়ে রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'হচ্ছে না মানে!' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল রেমি। 'পুরোটাই তো অসুবিধে!'

হাসল রানা। 'একটু ধৈর্য ধরো, খুব শীঘ্রি ওদেরকে খসিয়ে ফেলব পিছন থেকে।'

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ একটা মাঠে বেরিয়ে এল ওরা। আড়াআড়ি পথে মাঠ অতিক্রম করবার জন্য ঘোড়া ছোটাল রানা। কিন্তু কিছুদূর যেতেই কানে ভেসে এল ইঞ্জিনের গর্জন। জঙ্গলের কিনার থেকে উদয় হলো জিপদুটো। ঘুরপথে চলে এসেছে।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা। খসানো যায়নি

প্রতিপক্ষকে। একটা রাইফেল গর্জে উঠল, ঘোড়ার দশ গজ দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'ওরা গুলি করছে, রানা!'

'করুক,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইছে আমাদের। ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগার ভয়ে নিশানা করতে পারছে না। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট।'

নির্দয় ভঙ্গিতে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারল ও। হ্রেষারব করে প্রাণপণে ছুট লাগাল অ্যারাবিয়ান। পিছনে রৈ রৈ করে ছুটে এল মায়া ও তার চ্যালা-চামুণ্ডারা। আরেকটা গুলি হলো, রানা আর রেমির মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা।

মিনিটপাঁচেক চলল দৌড় প্রতিযোগিতা, তারপরেই রানা টের পেল, হার হতে চলেছে ওদের। জিপের গতি ঘোড়ার চেয়ে বেশি, ওদের বিশ গজের ভিতর পৌঁছে গেছে যান্ত্রিক বাহনদুটো, ধরে ফেলবে এক্ষুণি। লাগাম টানল ও, যেন ব্রেক কষল ঘোড়াটা। থেমে গেল। একই সঙ্গে মায়ার চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে। ঘোড়ার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে তার জিপ।

বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল ড্রাইভার। ডান দিকের দুই চাকার উপর প্রায় খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা। কোনোমতে সংঘর্ষ এড়িয়ে পাশ কাটাল ঘোড়াকে। কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল, থমকে দাঁড়াল। ঝাঁকিতে বেসামাল হয়ে গেছে আরোহীরা। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ঘোড়াকে আগে বাড়াল রানা। জিপের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাপের মত ছোবল মারল ওর হাত, অসতর্ক এক গুণ্ডার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রাইফেল। একেবারেই তৈরি ছিল না লোকটা, অস্ত্র হারিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল।

দ্বিতীয় জিপটা চলে এসেছে কাছে, ওটার দিকে এবার মনোযোগ দিল রানা। ইচ্ছে করেই গতি কমাল বাহনের, যাতে

ওদেরকে নাগালে পায় প্রতিপক্ষ। রেমি চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছ তুমি? ওদেরকে কাছে আসতে দিচ্ছ কেন?'

জবাব দিল না রানা। জিপটা পাশে আসতেই নড়ে উঠল। এতক্ষণ শরীরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল রাইফেল, এবার ওটা তুলে তাক করল জিপের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।

বিকট শব্দে ফাটল জিপের টায়ার। ছুটন্ত অবস্থায় হোঁচট খাবার ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেলো গাড়িটা। মাতালের মত নাক ঘুরে গেল... ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে। আঘাত সামলে নেবার আগেই চুপসানো চাকাটা আচমকা আটকে গেল মাটিতে। গতিবেগের কারণে বাকি তিনটে চাকা উঠে গেল শূন্যে, চোখের পলকে খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

ততক্ষণে প্রথম জিপটা আবার ধাওয়া শুরু করেছে। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল রানা। মাঠের একপ্রান্তে ছোট্ট একটা নদী দেখতে পেয়েছে, অন্য পারে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। সংকীর্ণ একটা ফুটব্রিজ চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওদিকে। মায়ার জিপ ওদের নাগাল পাবার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে।

ফুটব্রিজের দিকে তাকিয়ে দমে গেল রানা। অনেক পুরনো, নড়বড়ে। দু'জন মানুষসহ একটা ঘোড়ার ওজন নিতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর কোনও বিকল্পও নেই, দুলকি চালে উঠে পড়ল ব্রিজে। ঘোড়ার পায়ের তলায় প্রতিবাদ করে উঠল পুরনো কাঠ। থামল না রানা, এগিয়ে চলল। অর্ধেক যেতেই ঘটল বিপত্তি। মড়মড় আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়তে শুরু করল ব্রিজ। উপায়ান্তর না দেখে ঘোড়াসহ পানিতে ঝাঁপ দিল রানা। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

ঝপাস করে নদীর বুকে আছড়ে পড়ল অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। যুঝতে শুরু করল ভেসে থাকবার জন্য।

নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেছে দুই আরোহীর। কাশতে কাশতে রেমির উদ্দেশে রানা বলল, 'আমাকে ধরে থাকো!'

বলবার প্রয়োজন ছিল না, মাকড়সার মত ইতিমধ্যেই ওকে জাপটে ধরেছে মেয়েটা। ঘোড়ার দিকে মনোযোগ দিল রানা। স্রোতের মাঝে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেছে প্রাণীটা। ওটাকে শান্ত করে মুখ ঘোরাল। বুঝিয়ে দিল কোন্‌দিকে সাঁতার কাটতে হবে। এরপর নজর ফেরাল নদীর ধারে।

এসে পড়েছে মায়ার জিপ। গাড়ি থেকে নেমে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'পাশে তার সঙ্গীরা। ক্ষুব্ধ চেহারা, জিপ নিয়ে নদী পেরুবার উপায় নেই ওদের। একজন সঙ্গী রাইফেল উঁচু করতে গেলে বাধা দিল। ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মায়া।

স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে কয়েক মিনিট পরেই নদীর অন্যপারে উঠে এল অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। ডাঙায় পা রেখে গা ঝাড়া দিল। হাসিমুখে মায়ার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। তারপর ভেড়ার পালের মাঝ দিয়ে জোর কদমে ছোটাল ঘোড়া। খানিক পরেই ঢুকে গেল গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

'তুমি ঠিক আছ?' দম ফেলবার ফুরসত পেয়ে রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' কোনোমতে বলল রেমি। 'মনে হচ্ছে বমি করে ফেলব। এজন্যেই আমি ঘোড়ায় চড়তে চাই না।'

হাসল রানা। 'বিপদ কিন্তু কেটে গেছে... আর সেটা এই ঘোড়াটার কল্যাণে!' অ্যারাবিয়ানের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল ও।

'এখন কী করবে? নাকি ভাবছ ঘোড়ায় চড়েই লণ্ডনে ফিরবে?'

'উঁহুঁ।' বাম দিকে ইশারা করল রানা। 'আসার পথে ওদিকে একটা শহর পেরিয়ে এসেছিলাম, এখান থেকে বড়জোর মাইলখানেক। ওখানে গিয়ে দেখব, একটা গাড়ি পাওয়া যায় কি

না।'

খুব বেশি সময় লাগল না পৌঁছুতে। শহরে ঢুকতেই মুখোমুখি হলো স্থানীয় লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টির। ভেজা শরীরে দু'জন অশ্বারোহীকে দেখে এমন প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। নির্বিকার রইল রানা। রাস্তা ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়া। হঠাৎ শুনতে পেল ট্রেনের হুইসেল। গাড়ির চেয়েও ভাল বাহন ওটা।

দু'ব্লক যেতেই স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। বাইরে বসে থাকা এক ভবঘুরের হাতে ধরিয়ে দিল ঘোড়ার লাগাম, তাকে দশ ডলার বখশিশ দিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। টিকেট কেটে দ্রুত উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে। লণ্ডনের উদ্দেশে চলেছে ট্রেনটা, ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছুবে এক ঘণ্টা পর।

যাত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে সিট খুঁজে নিল রানা। বসে পড়ল রেমিকে নিয়ে। হুইসেল বাজিয়ে গতি বাড়ল ট্রেনের। সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদল রানা।

আটাশ

আকাশে মধ্যদুপুরের গনগনে সূর্য। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে টেরেন্স ম্যালকমের ট্রেইলার ট্রাক। উইণ্ডশিল্ড গলে ড্রাইভিং ক্যাবের ভিতরে ঢুকে পড়ছে প্রখর রোদ, লোহার তৈরি পুরো কাঠামোটা তেতে উঠছে সেই রোদের আঁচে। ট্রাকের পুরনো এসি এই তীব্র উত্তাপের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠছে না। দরদর করে ঘামছে টেরেন্স। পুরো লোড নিয়ে ভার্জিনিয়া অ্যাপালাচিয়ানের

পাহাড়ি পথে চলতে গিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে ইঞ্জিন, নিচু গলায় বসদের উদ্দেশে একটা গালি দিল সে।

ত্রিশ বছর ধরে গিবসন'স ফার্ম সার্ভিসে কাজ করছে টেরেন্স, কোনোদিন কোনও অভিযোগ করেনি। কিন্তু এখন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চলেছে। ট্রাক মেইনটেন্যান্সের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের এমন উদাসীনতা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এই তো, গত সপ্তাহেই বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা হলো তার—ফার্টিলাইযার নিয়ে ব্ল্যাকস্‌বার্গ যাবার পথে ড্রাইভ অ্যাকসেলের বিয়ারিং সিজ করল, পাক্কা চার ঘণ্টা বসে থাকতে হলো তাকে জনমনিষ্যিহীন একটা জায়গায়; তারপর এল রিপেয়ার ক্রু। দিনে দিনে বাড়ছে এই ধরনের ঘটনা—ঠিকমত ট্রাকের রক্ষণাবেক্ষণ না করাতেই ঘটছে এসব।

এসি বন্ধ করে দিল টেরেন্স—ওটা চলা না চলা সমান কথা। নামিয়ে দিল জানালার কাঁচ। গরম বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভিতর। যতটুকু স্বস্তি পাবে বলে ভেবেছিল, তার ছিটেফোঁটাও পেল না। আরও দ্রুত ঘামছে সে, বুক-পিঠের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে ভেজা শার্ট। বাইরে এক দলা থুতু ফেলল টেরেন্স, তারপর হাত বাড়িয়ে অন করল রেডিয়ো—একটু গান শোনা যাক। নব ঘুরিয়ে একটাই স্টেশন ধরতে পারল; সেটায় চড়া গলায় রাজনৈতিক ভাষণ দিচ্ছে এক পাতি নেতা। ধ্যাত্তেরি বলে রেডিয়ো অফ করে দিল টেরেন্স, দিনটাই কুফা।

দশ মিনিট হলো হাইওয়ে ছেড়ে সাইড রোডে নেমে এসেছে সে, যাচ্ছে ডিয়ারফিল্ডের এক খামারে। রাস্তা একেবারে নির্জন, এ-পর্যন্ত মাত্র দুটো গাড়ির দেখা পেয়েছে—ওকে ওভারটেক করে চলে গেছে গাড়িদুটো, সাইড দেবারও সময় দেয়নি। এত তাড়াহুড়োর কী আছে বোঝে না টেরেন্স। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই বড় বড় সড়ক-দুর্ঘটনা ঘটে, তা কি জানে না লোকে?

পিছনে হর্নের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সাইড-মিররে চোখ

বোলাল টেরেন্স। আরেকটা গাড়ি উদয় হয়েছে—সাদা রঙের একটা ভ্যান। হেডলাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সঙ্কেত দিল তাকে। এরও তাড়া! কাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রাক একটু ডানে সরিয়ে আনল টেরেন্স, জানালা দিয়ে হাত বের করে ইশারা দিল। সঙ্গে সঙ্গে উল্কার বেগে ওকে পেরিয়ে গেল গাড়িটা। রাস্তার মাঝখানে আবার ট্রাককে নিয়ে এল টেরেন্স। গতি বাড়িয়ে আরেকটু বাতাস পাবার চেষ্টা করল।

মুখে আর গায়ে বাতাসের ঝাপটায় কিছুটা আরামবোধ হলো তার। আবেশে চোখ মুদতে গিয়েই সচকিত হয়ে উঠল, চট করে তাকাল সামনে। পরক্ষণে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার দৃষ্টি। টায়ারের ঘর্ষণে সামনের সাদা ভ্যানটার পিছনে ধোঁয়া উড়ছে—আচমকা ব্রেক কষেছে ওটা। চোখের পলকে আধপাক ঘুরল, আড়াআড়িভাবে ব্লক করে ফেলল রাস্তা।

আঁতকে উঠে ব্রেক প্যাডাল চেপে ধরল টেরেন্স। অ্যাসফল্ট আর টায়ারের ঘর্ষণে বিচ্ছিরি শব্দ হলো। ঘষটাতে ঘষটাতে ভ্যানের বিশ গজ দূরে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভ্যানের দরজা। আপাদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া দু'জন মানুষ এক লাফে নেমে এল রাস্তায়। হাতে উদ্যত এম-ফোর অ্যাসল্ট রাইফেল। চেহারা দেখা গেল না, মুখ স্কি-মাস্কে ঢেকে রেখেছে লোকদুটো। অস্ত্র হাতে ছুটে এল ট্রাকের দিকে।

চমকে উঠল টেরেন্স। কাঁপতে থাকা হাত বাড়িয়ে দিল গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের দিকে—বিপদ মোকাবেলার জন্য ওখানে একটা পয়েন্ট থারটি এইট ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল রেখেছে সে। কিন্তু অস্ত্রটা হাতে পাবার আগেই ঝট্ করে খুলে গেল তার পাশের দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেলের কালো ব্যারেল দেখতে পেল টেরেন্স—ঠিক ওর মাথা বরাবর তাক

হয়ে আছে ওটা।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' বিদেশি উচ্চারণে বলে উঠল অস্ত্রধারী।

আস্তে আস্তে দু'হাত তুলল টেরেন্স।

'নেমে এসো নীচে,' বলল লোকটা। 'এখুনি!'

সিটবেল্ট খুলে নড়তে শুরু করল টেরেন্স, কিন্তু তার শ্লথগতি পছন্দ হলো না অস্ত্রধারীর। খপ্ করে ট্রাক ড্রাইভারের শার্ট মুঠো করে ধরল সে, এক টানে বাইরে এনে ফেলল তাকে। ধড়াম করে রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল টেরেন্স। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। ক্ষণিকের জন্য চলৎশক্তি হারাল।

সঙ্গীর উদ্দেশে কী যেন বলতে শুরু করল প্রথম লোকটা, তার এক বর্ণ বুঝতে পারল না টেরেন্স। তবে ভাষাটা চেনা চেনা লাগছে—আরবি বা এই জাতীয় কিছু। টিভিতে শুনেছে। কারা এরা? টেরোরিস্ট? ওর উপরে হামলা করল কেন? টেরেন্স তো স্রেফ একজন মাঝবয়েসী ট্রাক ড্রাইভার বৈ আর কিছু নয়। একেবারেই গুরুত্বহীন ছা-পোষা একজন মানুষ!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। বুক ধুকপুক করছে ভয়ে। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তোমরা? আমার কাছে তো...'

'চুপ করো!' গর্জে উঠল টেরোরিস্ট। রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত হানল টেরেন্সের তলপেটে।

খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল ট্রাক ড্রাইভার। চোখের সামনে জ্বলে উঠেছে লাল-নীল তারা। সেজদার ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে গেল।

দ্বিতীয় টেরোরিস্টকে ট্রাকের পাশে যেতে দেখল সে। হাত দিয়ে তলা থেকে খুলে আনল কী যেন। একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস—দেখামাত্র চিনল টেরেন্স, ওটা একটা ট্র্যাকার! ওকে ট্র্যাক করছিল এরা! কায়দামত নির্জন জায়গায় এসে হামলা করেছে! কিন্তু কেন?

প্রথম টেরোরিস্ট এগিয়ে এল তার দিকে। হাত ধরে হ্যাঁচকা এক টানে দাঁড় করাল। দুই হাত মুচড়ে নিয়ে গেল পিছনে, কবজিদুটো একত্র করে আটকে দিল প্লাস্টিকের জিপলাইন দিয়ে। অত্যন্ত কার্যকর জিনিস, কিছুতেই ছিঁড়বে না। এরপর ধাক্কা দিয়ে টেরেন্সকে ভ্যানের দিকে নিয়ে গেল সে, ওঠাল পিছনে। আরেকটা জিপলাইন দিয়ে এবার দুই গোড়ালি বাঁধা হলো।

কাজ শেষে রাইফেল উঁচু করল প্রথম টেরোরিস্ট। চেঁচিয়ে উঠল, *'আল্লাহু আকবার!'*

দ্বিতীয়জনও তাল মেলাল তার সঙ্গে। *'আল্লাহু আকবার!'*

এরপরেই দুই টেরোরিস্ট উঠে পড়ল দুই গাড়িতে—প্রথমজন ভ্যানে, দ্বিতীয়জন ট্রাকে। প্রায় একই সঙ্গে চালু হলো দুই বাহনের ইঞ্জিন। ভ্যান সরিয়ে জায়গা করে দিল প্রথম টেরোরিস্ট, ট্রাকটা এগিয়ে গেল। ওটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ভ্যানকে আগে বাড়াল সে। ছুটে চলল উল্টোদিকে।

হতভম্ব হয়ে ভ্যানের মেঝেতে পড়ে আছে টেরেন্স। হাইজ্যাকিঙের শিকার হয়েছে সে... কিন্তু কেন? যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে দুই টেরোরিস্ট—ওর ট্রাকে লাগানো ট্র্যাকিং ডিভাইস, এবং ওদের ঝটিতি কার্যসমাধার কৌশল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অথচ এর পিছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না টেরেন্স। ট্রাকে যদি সোনাদানা থাকত, তা হলে নাহয় একটা কথা ছিল!

হু হু করে গতি বেড়ে গেল ভ্যানের। গড়িয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে পড়ল টেরেন্স। ট্রাকের ড্রাইভিং ক্যাবে ওর সেলফোন রয়ে গেছে, কাজেই কারও সাহায্য চাইতে পারছে না। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু আঁকাবাঁকা পথে ঘন ঘন মোড় নিচ্ছে ভ্যান, তাল হারিয়ে বার বার মেঝের উপর আছড়ে পড়ল সে। বিশ মিনিট পেরুলে ক্লান্ত হয়ে গেল। উঠবার চেষ্টা করল না আর,

পড়ে রইল মেঝেতে। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে; কিন্তু সে-প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না টেরোরিস্ট।

আরও বিশ মিনিট চলবার পরে গতি কমল ভ্যানের। বাঁক নিয়ে নতুন একটা রাস্তায় নামল গাড়িটা। শুরু হলো ঝাঁকুনি। বুঝতে পারল টেরেন্স, পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমেছে ওরা। পথটা ঢালু, ধীরে ধীরে উপরদিকে উঠছে ভ্যান। একটু যেতেই রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। খানাখন্দে চাকা পড়ায় বার বার লাফিয়ে উঠছে গাড়িটা।

এভাবে আধঘণ্টা এগোবার পর ব্রেক কষল ড্রাইভার। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনের দরজা খুলল। তার ডান হাতে একটা নাইন মিলিমিটারের বেরেটা দেখতে পেল টেরেন্স, তাক করে রেখেছে ওর দিকে। বাম হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ধারালো ছুরি। সাবধানে ছুরি বাড়িয়ে টেরেন্সের পায়ের বাঁধন কেটে দিল সে।

'নামো!' হুকুম এল এরপর।

রক্ত চলাচল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝি ধরে গেল পায়ে। ভ্যান থেকে নামতেই তাল হারাল টেরেন্স। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে এবং শরীরের একপাশে লাথি খেল।

'ওঠো বলছি!' কর্কশ গলায় বলল টেরোরিস্ট।

কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুতে ভর দিয়ে নিলডাউনের ভঙ্গিতে উঠে বসল টেরেন্স। চারপাশে নজর বোলাল। গাছপালা আর ঝোপঝাড় ছাড়া আর কোনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। জায়গাটা কোথায় আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। সম্ভবত জর্জ ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ফরেস্ট।

আচমকা শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল তার। এখানে কেন ওকে আনা হয়েছে, আন্দাজ করতে পারছে।

নিশ্চয়ই খুন করবার জন্য!

'উঠে দাঁড়াও!' গমগম করে উঠল টেরোরিস্টের গলা। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মুখোশ পরা মুখটাকে।

গলা শুকিয়ে গেল টেরেন্সের, কিন্তু চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটতে দিল না। আর যা-ই হোক, কাপুরুষ নয় সে, একটা সন্ত্রাসীর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে না। যেভাবে ছিল, সেভাবেই রইল ও। উদ্ধত গলায় বলল, 'দাঁড়াব না! যা খুশি করো!'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পা চালাল টেরোরিস্ট, টেরেন্সের বুকের উপর পড়ল লাথি। ছিটকে পিছনের একটা গর্তে পড়ে গেল সে, গড়ান খেয়ে চলে গেল গর্তের তলায়। সোজা হবার চেষ্টা করতেই গুলি করল টেরোরিস্ট। বাম কানের উপর দিয়ে যেন আগুনের একটা হলকা বয়ে গেল, ধপাস করে পড়ে গেল টেরেন্স। টের পেল, মুখের বাম পাশটা ভিজে গেছে রক্তে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বেঁচে আছে সে! নিশ্চয়ই তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে টেরোরিস্ট। আবার কি গুলি চালাবে? জানে না টেরেন্স। মুখ থুবড়ে মড়ার মত পড়ে রইল গর্তের তলায়। কপাল ভাল হলে দ্বিতীয়বার গুলি না করেই চলে যেতে পারে লোকটা।

তা-ই ঘটল। একটু পরেই ভ্যানের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল টেরেন্স। ইঞ্জিন চালু হলো। শুকনো মাটিতে চাকার শব্দ করে মুখ ঘোরাল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ।

নীরবতা নেমে আসার পরেও কয়েক মিনিট নিস্তেজ পড়ে রইল টেরেন্স। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখের একটা পাশ রক্তে রঞ্জিত, তবে বেঁচে গেছে সে। সম্ভবত রক্ত দেখে ওকে মৃত ভেবে নিয়েছে টেরোরিস্ট।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল সে। মাথা টনটন করছে ব্যথায়। একটু সুস্থির হবার পর উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে

শার্ট ছিঁড়ে বেঁধে নিয়েছে মাথা। দুর্বল পায়ে রওনা হলো সাহায্যের আশায়।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপারই শুধু ঘুরপাক খেতে থাকল ওর মাথায়। টেরোরিস্টরা হাইজ্যাকিঙের জন্য ওর ট্রাকটাকেই বেছে নিল কেন? ট্রাকে রাসায়নিক সার থাকলে নাহয় একটা কথা ছিল—ওই জিনিসের সাহায্যে টেরোরিস্টরা বোমা বানাতে পারে। কিন্তু তা তো ছিল না!

বিস্ময়ের সীমা রইল না টেরেন্সের, কারণ ওর ট্রাকে ছিল স্রেফ একশো কিউবিক ফুট *সওডাস্ট*... মানে কাঠের গুঁড়ো। সেগুলো কী কাজে লাগবে ওদের?

উনত্রিশ

বাথরুমটা বিশাল, বাথটাব-সহ অন্যান্য আধুনিক ফিটিংসে সজ্জিত। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে শরীর ভেজাচ্ছে রেমি। চোখ বন্ধ করে উপভোগ করছে নগ্ন ত্বক বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকা গরম পানির স্পর্শ। গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল লালচে হয়ে উঠল গায়ের চামড়া; গত কয়েক ঘণ্টার সমস্ত ক্লান্তি আর উত্তেজনা ধীরে ধীরে যেন ধুয়ে গেল, সেই সাথে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল দেহমনে।

হিথ্রো এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ম্যারিয়ট হোটেলে দুটো কামরা নিয়েছে ওরা—একটা সিঙ্গেল, অন্যটা ডাবল। সিঙ্গেলটা দেয়া হয়েছে ওকে, ডাবলটা শেয়ার করছে রানা ও মুরল্যাণ্ড। ভিক্টোরিয়া

স্টেশন থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছে ওরা। মুরল্যাণ্ড আগেই এসেছে, তবে ওর সঙ্গে এখনও কথা বলা হয়নি ওদের। কামরায় এসেই যার যার বাথরুমে ঢুকেছে রানা আর রেমি।

সময় নিয়ে গোসল করল রেমি। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেলে বেরুল বাথরুম থেকে। মাথায় প্যাঁচানো তোয়ালে মাত্র খুলেছে, এমন সময় ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

'আমি,' রিসিভার তুলতেই শোনা গেল রানার কণ্ঠ। 'রেডি হয়ে চলে এসো আমাদের কামরায়। ডিনার আনতে বলেছি রুম সার্ভিসকে। খেতে খেতে কথা হবে।'

'দশ মিনিটের ভিতর আসছি,' জানাল রেমি।

সাদা রঙের একটা শার্ট আর সুতি ব্যাগি প্যান্ট পরল রেমি, উপরে চড়াল একটা সোয়েটার। মুখে হালকা মেকাপ মেখে চুল আঁচড়াল, তারপর স্যাণ্ডেল পরে বেরিয়ে পড়ল রানা ও মুরল্যাণ্ডের কামরার উদ্দেশে।

ইতিমধ্যে সার্ভ করা হয়েছে ডিনার। বড় একটা টেবিল পেতে তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অন্তত দশ পদের ডিশ। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্ক তো আছেই। দেখে চক্ষু চড়কগাছ হলো রেমির। বিস্মিত গলায় বলল, 'সর্বনাশ! এ-সব কী! পুরো কিচেন তুলে নিয়ে এসেছেন নাকি?'

'অর্ডারের দায়িত্বটা ববিকে দিয়েছিলাম,' চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করল রানা। 'ও যে ভোজনরসিক, সে-কথা মনে ছিল না।'

'ভদ্র ভাষায় আমাকে খোঁচা মারল, দেখলেন?' গোমড়ামুখে বলল মুরল্যাণ্ড। 'পেটুক না বলে ভোজনরসিক বলল... ভাবছে আমি তফাৎটা বুঝতে পারব না।'

'ওকে দোষ দিতে পারেন?' হাসল রেমি। 'এতসব খাবার...'

'আপনিও ওকে সাপোর্ট দিচ্ছেন?' আহত গলায় বলল

মুরল্যাণ্ড। 'কেন এত খাবার এনেছি বুঝতে পারছেন না? পরীক্ষিত সত্য—পেটে খেলে পিঠে সয়। যে-ধকলটা গেছে...'

'খুব ধকল গেছে বুঝি?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'আমাদের চেয়েও বেশি? কী ঘটেছিল, জানতে পারি?'

'আগে খাওয়া শুরু করো। সামনে খাবার রেখে কথা বলতে নেই।'

হাসিমুখে প্লেট টেনে নিল ওরা। খেতে শুরু করল। টেবিল খালি হতে সময় লাগল মাত্র বিশ মিনিট। সবশেষে ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মুরল্যাণ্ড বলল, 'দেখলে তো? কোথায় এত খাবার? সবই তো শেষ।'

'নাইন্টি পার্সেন্ট তো আপনিই সাবাড় করলেন!' ফোড়ন কাটল রেমি।

রানা বলল, 'অসুবিধে নেই। বিলের নাইন্টি পার্সেন্টও ও-ই পরিশোধ করবে। আমি বলি কী... ববি... বাকি দশ পার্সেন্ট আর আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কী? পুরোটাই তুমি দিয়ে দাও।'

'এ ভারি অন্যায়,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'খেলাম তিনজন, অথচ বিল দেব একা আমি?'

'ধরে নাও আমরা তোমার গেস্ট।'

আরও কয়েক মিনিট ঠাট্টা-মশকরা চলল। রুম সার্ভিসের ওয়েইটার এসে খালি বাসন-কোসন নিয়ে যাবার পর শুরু হলো আসল আলোচনা। যার যার অভিজ্ঞতা খুলে বলল ওরা। প্রথমে মুরল্যাণ্ড, তারপর রানা আর রেমি।

'আপনি ঘোড়ায় চড়তে ভয় পাচ্ছিলেন?' রেমির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি না গ্রাম্য এক খামারে বড় হয়েছেন? ওখানে ঘোড়া ছিল না?'

'ছিল,' ইতস্তত করে বলল রেমি। 'ছোটবেলায় একবার সেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মাথা ফেটে গিয়েছিল আমার। তিন

সপ্তাহ হাসপাতালে পড়ে ছিলাম। সেই থেকে ঘোড়া আমার দু'চোখের বিষ!'

'ওই ঘোড়াই কিন্তু আজ প্রাণ বাঁচিয়েছে আমাদের,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'আশা করি এবার তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে।'

'উঁহুঁ। আগামীতে আবার যদি এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ি, প্রার্থনা করব যাতে ঘোড়ার আস্তাবলের বদলে ধারেকাছে গাড়ির কোনও গ্যারাজ থাকে।'

রেমির কথা শুনে হেসে ফেলল রানা আর মুরল্যাণ্ড।

'এনিওয়ে,' প্রসঙ্গ বদলাল রেমি। 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী? এগোবার তো কোনও রাস্তা দেখছি না। জিয়োলেবটাও খুইয়েছি।'

'ওটা ফিরে পাওয়াই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি,' বলল রানা। 'ডিভাইসটা ছাড়া আর্কিমিডিসের ধাঁধা সমাধান করা যাবে না।'

'আরেকটা বানিয়ে নেয়া যায় না?'

'সম্ভব নয়। অমন জটিল ডিভাইস তৈরি করতে অনেক সময় দরকার। বানাবার ইন্সট্রাকশনও নেই আমাদের কাছে। গ্যারেটের কাছে চাইতে হবে। ও যদি শোনে, মায়া ওটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, রেগে গিয়ে কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে। কাজেই ওকে আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানাতে চাই না।'

'তা হলে একটাই উপায় দেখছি,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'মায়ার এস্টেটে হানা দিয়ে ওটা চুরি করতে হবে।' চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ওর। 'ইণ্টারেস্টিং।'

'সেটাও সম্ভব না,' রানা বলল। 'আজ ও ইংল্যাণ্ড থেকে চলে যাচ্ছে। জিয়োলেবটাও নিচ্ছে সঙ্গে।'

ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'সেটা তুমি কী করে জানলে?'

হাসল রানা। 'মায়া ভেবেছে আমরা ইটালিয়ান বুঝি না।

আমাদের সামনেই ওর বডিগার্ডকে বলছিল—জিয়োলেবটা ওর গাড়ির ট্রাঙ্কে রাখতে; আজ রাতে মিউনিখে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'মিউনিখ? মানে জার্মানি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'খারাপ খবর,' গম্ভীর হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। 'ওকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে। জিয়োলেবটাও।'

'এতটা হতাশ হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'মায়ার বডিগার্ডের ফোনটায় ল্যারিকে ফোন করে ওটা ওর অফিসে লুকিয়ে রেখে এসেছি আমি। ল্যারিকে বলেছি যতক্ষণ ওটা চালু থাকে, সবকিছু রেকর্ড করে রাখতে। এক ধরনের বাগিং আর কী। দেখা যাক, ওখান থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না। বলা যায় না, মায়ার ট্র্যাভেল প্ল্যানের খবর পেয়ে যেতে পারি।'

'এটা একটা কাজের কাজ করেছ!' খুশি হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'ওখান থেকে যে-ট্যাবলেটটা চুরি করে আনলে, সেটার ব্যাপারে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'তা ছাড়া পার্থেননেও যাওয়া দরকার আমাদের...'

'ওসব পরে দেখা যাবে,' বলল রানা। 'আগে জিয়োলেব উদ্ধার করা জরুরি। ল্যারির সঙ্গে কথা বলব এখুনি। দেখা যাক ও ডিভাইসটার ট্র্যাকার সিগনাল ডিকোড করতে পেরেছে কি না।'

'তার আগে গ্যারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার,' ঘড়ি দেখে বলল রেমি। 'আমাদের ডেইলি কণ্ট্যাক্টের সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। তা হলে ওর সঙ্গেই আগে কথা বলছি।' সেলফোন বের করল রানা। ওর সেটটা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। হোটেলে আসার পথে নতুন একটা সেট কিনে নিয়েছে। কপাল ভাল, সিমকার্ডের কিছু হয়নি।

'কী বলবে ওকে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'মায়ার সঙ্গে দেখা হবার কথা?'

'না। সেটা ওর জানার প্রয়োজন নেই। শুধু আমরা কতটুকু এগিয়েছি, তা-ই বলব।'

গ্যারেটের নাম্বারে ডায়াল করে স্পিকার অন করল রানা। রিং হতে না হতেই কল রিসিভ করল গ্যারেট। বলল, 'বাহ্, একেবারে সময়মত রিং করেছ দেখছি, রানা। তোমাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের খবর বলো।'

'বহাল তবিয়তে আছে ওরা। আমাদের কথা শেষ হবার পর ওদের ভিডিও পাবে। কদ্দূর এগোলে তা-ই বলো।'

মোমফলক আর পার্থেননের ব্যাপারে গ্যারেটকে সংক্ষেপে জানাল রানা। এস্টেট আর মিউজিয়ামের ঘটনা এড়িয়ে গেল। ওসব গ্যারেটের জানার প্রয়োজন নেই।

'হুমম,' বলল গ্যারেট। 'এবার কী করবে?'

'মিউনিখে যাব বলে ঠিক করেছি আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে একটা সূত্র পাব বলে আশা করছি।'

'গুড। কাজ চালিয়ে যাও। আগামীকাল আবার কথা হবে।'

'আমাদের ভিডিও?'

'ইমেইল চেক করো।'

ল্যাপটপ খুলে ইমেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকল রানা। দুটো ভিডিও ফাইল পেল। প্রথমটা র‍্যাচেলের। চেয়ারে বসিয়ে কোলের উপর ফেলে রাখা হয়েছে *ইউএসএ টুডে* পত্রিকার একটা সংখ্যা। তাতে আজকের তারিখ ছাপা। নার্ভাস দেখাল র‍্যাচেলকে, মুখ শুকিয়ে গেছে। তবে অক্ষত এবং সুস্থ মনে হলো।

বোনের বন্দিদশা দেখে বুক হু হু করে উঠল রেমির। উদ্গত

আবেগ চাপা দেবার জন্য কামড়ে ধরল ঠোঁট। ওর বাহুতে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল রানা, 'শান্ত হও। ওকে উদ্ধার করব আমরা।'

এরপর দ্বিতীয় ভিডিওটা ওপেন করল ও। র‍্যাচেলের মত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখা গেল চেয়ারে বসা অবস্থায়। কোলের উপর পত্রিকা। চট্ করে *ইউএসএ টুডে*-র ওয়েবসাইট দেখে নিল রানা—নিশ্চিত হয়ে নিল পত্রিকাটা সত্যিই আজকের কি না।

হঠাৎ ভিডিওতে একটা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল ওর। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চোখ পিট পিট করছেন অ্যাডমিরাল, যেন মুখের উপর পড়া আলো সহ্য করতে পারছেন না। চোখের কোনও সমস্যা? ভাল করে দেখল ও। আচমকা টের পেল, সমস্যা নয়... ইচ্ছেকৃতভাবেই চোখ পিট পিট করছেন তিনি। মোর্স কোডের মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন!

মুরল্যাণ্ডও খেয়াল করেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল, 'রানা...'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। মনোযোগ দিল সঙ্কেতটা বোঝায়।

'কীসের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'মোর্স কোড ব্যবহার করছেন অ্যাডমিরাল,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'চোখের সাহায্যে।'

'কোনও মেসেজ দিচ্ছেন?' রেমিও উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কী সেটা?'

কাগজে সঙ্কেতটা লিখে ফেলেছে রানা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল লেখার দিকে। দুটো অক্ষর আর একটা সংখ্যা। অর্থহীন।

'কী বলছেন উনি?' আবার জানতে চাইল রেমি।

কাগজটা দেখাল রানা। তাতে লেখা: *এস আর ৯০।*

'মানে কী এর?' মুরল্যাণ্ডের কপালেও ভাঁজ পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপরেই রেমি বলল,

'এস আর ৯০! মানে স্টেট রোড ৯০! আমাদেরকে ঠিকানা দিচ্ছেন ভদ্রলোক!'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'স্টেট রোড মানে হাইওয়ে... আর একেকটা হাইওয়ের দৈর্ঘ্য হয় কয়েকশো মাইল। এত লম্বা একটা এলাকায় কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই অন্য কিছুর কথা বলছেন।'

'ল্যাপটপটা আমাকে দাও,' বলে হাত বাড়াল মুরল্যাণ্ড। 'দেখি গুগল থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না।'

কম্পিউটারটা ওর দিকে ঠেলে দিল রানা। খানিক পরে মুরল্যাণ্ড বলল, 'ওরে বাবা! এ দেখি ডেঞ্জারাস ব্যাপার!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এস আর ৯০-এর সার্চে পাওয়া প্রথম এন্ট্রিই বলছে—ওটা স্ট্রনটিয়াম-৯০ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।'

স্থির হয়ে গেল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন নিজের মুক্তির ব্যাপারে কোনও সূত্র না দিয়ে স্ট্রনটিয়ামের সঙ্কেত একটা কারণেই শুধু দিতে পারেন। মুরল্যাণ্ডের চেহারাতেও মেঘ জমেছে।

'কী ব্যাপার?' ওদের পরিবর্তন লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি। 'স্ট্রনটিয়াম-৯০ মানে কী?'

'মারাত্মক রেডিও-অ্যাকটিভ একটা আইসোটোপ,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল বলতে চাইছেন, গ্যারেটের হাতে স্ট্রনটিয়াম-৯০ আছে।'

'রেডিয়ো-অ্যাকটিভ? অমন জিনিস গ্যারেট পাবে কোথায়?'

'আজকাল ব্ল্যাক মার্কেটে সবই পাওয়া যায়,' বলল মুরল্যাণ্ড। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল। 'এখানে বলছে, নিউক্লিয়ার ফিউয়েলের উচ্ছিষ্টের মাঝে থাকে স্ট্রনটিয়াম-৯০। পুরনো আমলে সোভিয়েত থারমাল জেনারেটরে জিনিসটা পাওয়ার

সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হতো।'

'যদি গ্যারেটের হাতে স্ট্রনটিয়াম থেকেও থাকে, সমস্যা কোথায়?'

'শখের বশে কেউ স্ট্রনটিয়াম জোগাড় করে না, রেমি,' বলল রানা। 'তখনই জোগাড় করে, যখন সে রেডিয়োলজিক্যাল ওয়েপন তৈরি করতে চায়।'

'রেডিয়োলজিক্যাল বলতে কী বোঝাচ্ছ? নিউক্লিয়ার?'

'পুরোপুরি নয়, কাছাকাছি একটা কিছু—সহজে তৈরি করা যায়। কনভেশনাল একটা বোমার মধ্যে রেডিয়োঅ্যাকটিভ আইসোটোপ মেশানো হয়। নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মত ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থাকে না ওটার, তবে ফলআউট ডাস্টের মাধ্যমে বিশাল এলাকা তেজস্ক্রিয় করে ফেলা যায়। মাঝারি আকারের একটা বোমা ফাটিয়েই বিশাল একটা শহরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে ফেলা সম্ভব।'

'অ্যাডমিরাল বলতে চাইছেন, গ্যারেটের হাতে অমন ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র আছে?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি।

ত্রিশ

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে হোটেল-কক্ষে। কেউ কোনও কথা বলছে না। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, শত্রু

হিসেবে অ্যান্থনি গ্যারেট কতখানি ভয়ঙ্কর। স্রেফ স্বর্ণলোভী ক্রিমিনাল নয় সে, বরং রেডিয়োলজিক্যাল বোমাধারী একজন টেরোরিস্ট! সে-কারণে হঠাৎ করেই পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। এখন স্রেফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেল নয়, বরং লক্ষ-কোটি মানুষের জীবন পড়েছে হুমকির মুখে—সংখ্যাটা নির্ভর করছে কোন্ শহরের উপর বোমাটা ব্যবহার করে গ্যারেট, তার উপর।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেলে মুরল্যাণ্ড বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা এখুনি এফবিআই-কে জানিয়ে দেয়া দরকার।'

'না,' দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। 'তাতে অযথা প্যানিক সৃষ্টি হবে। এফবিআই পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠবে গ্যারেটকে অ্যারেস্ট করবার জন্য। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলের প্রাণের পরোয়া করবে না। তা ছাড়া... আমরা তো শিয়োর নই। স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছি। এস আর ৯০-এর আরও অনেক রকম অর্থ হতে পারে। হয়তো কারও নাম বা ঠিকানা... বোমাই হতে হবে, এমন তো কোনও কথা নেই।'

'হুম, এটা অবশ্য ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'রেডিওলজিক্যাল বোমা ব্যবহারের পিছনে গ্যারেটের তো কোনও মোটিভও নেই। যদি টেরোরিজমই ওর উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আমাদেরকে খামোকা মাইডাস চেম্বারের পিছনে ছোটাচ্ছে কেন?'

'এমন হতে পারে না, চেম্বারটা খুঁজে পাবার পর ওখানে বোমাটা ফাটাবার প্ল্যান করেছে সে?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওই যে... জেমস বণ্ডের ভিলেন গোল্ডফিঙ্গারের মত। ফোর্ট নক্সের ভিতরে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে সমস্ত সোনা রেডিয়েটেড করে দিতে চেয়েছিল সে।'

'ওভাবে নিজের জমা করা সোনার দাম বাড়াতে চেয়েছিল গোল্ডফিঙ্গার,' বলল রানা। 'আমার তো মনে হয় না, ওর মত

সোনার স্টক আছে গ্যারেটের।'

'তাই বলে এত বড় একটা ব্যাপার কাউকে জানাব না আমরা?' প্রতিবাদ করল মুরল্যাণ্ড।

'তা বলছি না। জানাব তো বটেই, তবে সেটা শুধুমাত্র মি. রেডক্লিফকে। বিকল্প ব্যবস্থায় খোঁজখবর নেবার ক্ষমতা আছে তাঁর... প্যানিক সৃষ্টি না করে। সেটাই তো চাই আমরা, তাই না?'

'কিন্তু একটা বিষয় তুমি ভুলে যাচ্ছ—গ্যারেটের হাতে যদি সত্যিই স্ট্রনটিয়াম-৯০ থাকে, আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সেটা দেখে ফেলে থাকেন... ওঁকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না শয়তানটা। আমরা ওর কথামত যা-ই করি না কেন।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল রেমির। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে খুন করবে গ্যারেট, অথচ র‍্যাচেলকে বাঁচিয়ে রাখবে... তা হতে পারে না!

'সবকিছুই মাথায় আছে আমার,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে এখুনি হতাশ হবার কোনও কারণ দেখছি না। রণকৌশল সামান্য পাল্টাতে হবে আমাদেরকে। জিয়োলেবটা ফিরে পেলে ডিফেন্সের বদলে অফেন্সে চলে যাব।'

'অফেন্স মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড।

'সিম্পল। এরপর যখনই গ্যারেটের সঙ্গে দেখা হবে, ওকে আটক করব আমরা। এরপর অদল-বদল হবে—গ্যারেটের বদলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল। তারপর এফবিআই-কে ডেকে এনে ওকে ধরিয়ে দেব।'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের। 'এতক্ষণে একটা পছন্দসই টেকনিকের কথা শোনালে, বন্ধু!'

'কী বলছ এ-সব!' আঁতকে উঠল রেমি। 'দোহাই লাগে, অমন কিছু করতে যেয়ো না। যদি ব্যর্থ হও, সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাচেলকে খুন করবে গ্যারেট। অ্যাডমিরালকেও।'

'ব্যর্থ হব না আমরা,' জোর গলায় বলল রানা। 'আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নামব। আমাদের উপর আস্থা রাখো। এ-ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আছে ববির ও আমার।'

পালা করে ওকে আর মুরল্যাণ্ডকে দেখল রেমি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কিছুতেই তোমাদের ফেরানো যাবে না, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ব্যাটাকে এখুনি টোপ দিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছি বললেই তো ছুটে আসবে নেপলসে। সত্যি সত্যি সমাধানের তো প্রয়োজন নেই। অযথা খাটনি।'

'প্রয়োজন আছে,' বলল রানা। 'শুধু সমাধান করেছি শুনেই সন্তুষ্ট হবে না গ্যারেট। নানা ধরনের প্রশ্ন করবে নিশ্চিত হবার জন্য। মনগড়া জবাব দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারি। গ্যারেট আর যা-ই হোক, বোকা নয়।'

'কী করতে চাও তা হলে?'

'যা করছিলাম। জিয়োলেবটা উদ্ধার করব মায়ার হাত থেকে। তারপর যাব পার্থেননে।'

নুমা হেডকোয়ার্টারে ফোন করল রানা। প্রথমে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলে অনুসন্ধানের অগ্রগতি জানাল। স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে আশঙ্কার কথাও জানাল। গোপনে খোঁজ নেবেন বলে কথা দিলেন রেডক্লিফ। এরপর ল্যারি কিং-কে রিং করল ও। ইমেইলে মায়ার বডিগার্ডের ফোন থেকে পাওয়া রেকর্ডিং ওর কাছে পাঠাতে বলল তাকে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে গেল ফাইলটা। ওটা ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নিল রানা। তারপর প্লে করল। রেকর্ডিঙের মান খুব একটা ভাল নয়, তবে পাঠাবার আগে ভয়েস ফিল্টারিঙের সফটওয়্যারের সাহায্যে বাজে শব্দগুলো সরিয়ে দিয়েছে ল্যারি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলেছে রেকর্ডিং, তারপর ব্যাটারি ফুরিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে সেলফোন। এর মধ্যে মাত্র একবার রয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর। রানা আর রেমির পিছনে ব্যর্থ ধাওয়া শেষে অফিসে দশ মিনিটের জন্য ফিরে এসেছিল মায়া, তখন অনুচরদের সঙ্গে কথা বলেছে... তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে তার কণ্ঠে।

আলাপচারিতার অংশটা কয়েকবার শুনল রানা আর রেমি। মুরল্যাণ্ড ইটালিয়ান বোঝে না, অধৈর্য হয়ে উঠল। জানতে চাইল কী বলা হচ্ছে অডিওতে।

খাতায় মায়ার সমস্ত কথা টুকে নিয়েছে রেমি। খানিক পরে তাতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, শুরুতে অনেকক্ষণ গুণ্ডাগুলোকে গালাগাল দিয়েছে মায়া—আমাকে আর রানাকে আটকাতে না পারার জন্য। ও শপথ করেছে, অফিসে ভাঙচুর, আর মোমের ট্যাবলেটটা চুরি করায় আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে ছাড়বে। তারপর ওর এক সহকারী জানতে চেয়েছে, তা হলে কি ম্যাডাম আজ রাতে রওনা হচ্ছেন না? মায়া তখন টিকেট বদলাতে বলেছে—রাতের টিকেটের বদলে সকালের টিকেট। সাড়ে আটটায়।

'"আমার *ফেরারি* গাড়িটা আগেই পাঠিয়ে দিয়ো," বলেছে ও। "আমি ব্রাসেলসে নেমেই যেন ওটাকে রেডি অবস্থায় পাই। ডিয়েটজ্‌কে ফোন করে দাও, বলবে—*গ্রেইডেল*-এ পৌঁছুতে বিকেল চারটে বেজে যাবে আমার। মিটিংটা যেন তার পরে রাখে। আলোচনার জন্য বিশ মিনিট পেলেই আমার চলবে। ক্লিয়ার?"'

খাতা বন্ধ করে মুখ তুলল রেমি। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

'ব্রাসেলসে যাচ্ছে মায়া,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু কেন? ওর তো মিউনিখে যাবার কথা।'

'হয়তো যাত্রাবিরতি নিচ্ছে ওখানে,' অনুমান করল রেমি।

'কেন? বিমানে চেপে একটানে মিউনিখ যাওয়া সম্ভব।'

রানার সামনে থেকে ল্যাপটপটা টেনে নিল মুরল্যাণ্ড। খটখট করে টাইপ করল কিছু। তারপর বলল, 'সকাল সাড়ে আটটায় লণ্ডন থেকে ব্রাসেলস বা মিউনিখের কোনও ফ্লাইট নেই। তবে ট্রেন আছে—*ইউরোস্টার*। হাই স্পিড চানেল ট্রেন। সেইন্ট প্যানক্রাস থেকে ছাড়ে।'

'তা হলে ওটাতে চড়েই ব্রাসেলসে যাচ্ছে ও,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'ওখান থেকে সড়কপথে মিউনিখ যাবে। এ-কারণেই গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেছে ব্রাসেলসে। ওই গাড়ির ট্রাঙ্কে রেখেছে জিয়োলেবটা। ববি, গ্রেইডেল বা ডিয়েটজের ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না দেখো।'

ল্যাপটপের কি-বোর্ডে নেচে বেড়াল মুরল্যাণ্ডের আঙুল। খানিক পরে বলল, 'ডিয়েটজ্‌কে পাচ্ছি না, তবে গ্রেইডেল একটা জার্মান রিয়াল-এস্টেট ব্রোকারেজ ফার্ম। হেডকোয়ার্টার মিউনিখে। ডিয়েটজ্ হয়তো ওখানে কাজ করে।'

'খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে। বোর্স্টের ব্রোকারেজ সম্পর্কে কী পাচ্ছ ইন্টারনেটে।'

'তেমন কিছু না। সবই রুটিন। ইন্টারেস্টিং তথ্য বলতে একটাই দেখতে পাচ্ছি—ওদের মিউনিখ হেডকোয়ার্টারে সম্প্রতি একটা রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজ উদ্বোধন করা হয়েছে।'

'ওটা আবার কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'রোবোটিক মেকানিজমের সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষ বলতে পারেন। বহুতল-বিশিষ্ট স্ট্রাকচারের ভিতরে অটোমেটিক পার্কিং। গাড়ি নিয়ে স্রেফ একটা মুভেবল প্ল্যাটফর্মে রাখতে হবে আপনাকে। এরপর প্ল্যাটফর্মটা নিজেই খালি জায়গা খুঁজে নিয়ে আপনার গাড়িটা রেখে দেবে। পরে আবার বেরও করে আনবে।'

'পার্কিং গ্যারাজ?' চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল রানার।

হাসল মুরল্যাণ্ড। 'আমি যা ভাবছি, তুমিও সম্ভবত একই কথা ভাবছ। তাই না?'

'হ্যাঁ। মিটিঙে যাবে মায়া। গাড়ি থাকবে গ্যারাজে। ট্রাঙ্ক থেকে যদি জিয়োলেবটা বের করে না নিয়ে থাকে, ওখান থেকেই ওটা সরিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'গুড আইডিয়া। কখন যেতে চাও মিউনিখে? আজ, নাকি আগামীকাল?'

'আজ অনেক ধকল গেছে আমাদের সবার উপর দিয়ে। রাতটা বিশ্রাম নেয়া যাক। আগেভাগে মিউনিখে গিয়ে বসে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। কাল বিকেলের আগে ওখানে পৌঁছুচ্ছে না মায়া।' রেমির দিকে ফিরল রানা। 'ট্যাবলেটের পাঠোদ্ধারও আজ রাতে করবার দরকার নেই। এখান থেকে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ো। ঠিক আছে?'

উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। 'আমি তা হলে পাইলটকে বলে দিচ্ছি, ফিউয়েল নিয়ে যেন সকাল আটটায় রেডি রাখে জেট। আটটায় রওনা দিতে পারলে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব মিউনিখে। কারও আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল রানা ও রেমি। ওরাও উঠে দাঁড়াল।

'চলো, তোমাকে রুমে পৌঁছে দিই,' রেমিকে প্রস্তাব দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রেমি। দু'জনে বেরিয়ে এল করিডোরে। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকল। রেমিকে ঠোঁট কামড়ে ধরতে দেখল রানা, কান্না চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'কিচ্ছু ভেবো না,' নরম গলায় বলল রানা, 'র‍্যাচেলকে উদ্ধার করব আমি। কথা দিলাম!'

ম্লান একটু হাসল রেমি। 'কথা দিতে হবে না। আমি জানি, তুমি চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তারপরেও... মন মানছে না। কারণ

যতই সান্ত্বনা দাও, আমি বুঝতে পারছি ওকে জীবন্ত ফিরে পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'মাথায় এ-ধরনের চিন্তাকে ঠাঁই দিয়ো না। স্রেফ সাহস ধরে রাখো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এসব তোমার জন্য নতুন নয়, রানা। তাই এমন কথা তুমি বলতে পারছ। কিন্তু আমি তো কোনোদিন এমন কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি!'

'আমিও তো কোনও একদিন প্রথমবারের মত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারব না কেন?'

'আমি সে-কথা বলছি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'আসলে, র‍্যাচেলের কথা ভাবলেই... ও কেন আইন পড়ছে, জানো? অসহায় মানুষকে সাহায্য করবার জন্য... ওদেরকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবার জন্য!'

'আশা করি ও সফল হবে।'

'আমার পয়েন্টটাই তুমি ধরতে পারোনি, রানা। অপরাধীদের ঘৃণা করে র‍্যাচেল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা যদি গ্যারেটকে বোমা ফাটাতে দিই, নিরীহ মানুষ হত্যা করতে দিই... ও কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে না। তারচেয়ে ও নিজের প্রাণ দিয়ে...'

রেমির হাতে হাত রাখল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও একই আদর্শের মানুষ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওঁদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা আমরা করব না। তা ছাড়া... এখনও ওঁদের আশা ছেড়ে দেবার মত কিছু ঘটেনি। এখনও সব কূল রক্ষা করা সম্ভব।'

একটু যেন আশান্বিত হয়ে উঠল রেমি। 'জানি না কোত্থেকে এত আত্মবিশ্বাস পাচ্ছ তুমি, তবু... ধন্যবাদ, রানা।'

কামরার সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘুরে রানাকে জড়িয়ে ধরল রেমি। রানাও পাল্টা আলিঙ্গন করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল দু'জনে, তারপর রেমির কপালে চুমো খেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। বলল, 'যাও, ঘুমাতে যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরায় ঢুকে গেল রেমি। রানাও ফিরতি পথ ধরল। কিছুদূর যেতেই বেজে উঠল পকেটে রাখা সেলফোন। নাম্বার দেখল রানা—জর্জ রেডক্লিফ।

'হ্যালো, রানা,' কল রিসিভ করতেই বলে উঠলেন তিনি। 'একটা খবর দেবার জন্য ফোন করলাম। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্রান্সমিটারের সিগনাল ডিকোড করতে পেরেছি আমরা।'

'গ্যারেট কোথায় বসে রিসিভ করছে সিগনাল, সেটা বের করতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ। কেসটা অন্যরকম। ল্যারি আমার সঙ্গে আছে, ওর কাছেই শোনো।'

দু' সেকেণ্ড পরেই ভেসে এল ল্যারি কিঙের কণ্ঠ। 'লোকটা কোনও রিসিভার ব্যবহার করছে না, রানা। ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর জিপিএস লোকেশন ট্রান্সমিট করে ডিভাইসটা—সেটা রিসিভ করা হয় একটা রিমোট সার্ভারে। সেখান থেকে ইন্টারনেটের একটা ওয়েবসাইটে ভেসে ওঠে লোকেশন। দুনিয়ার যে-কোনও প্রান্ত থেকে ওটা দেখে নেয়া সম্ভব। সরি, গ্যারেটকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় নেই। লোকটা অতি চতুর।'

'ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে পারো?' বলল রানা। 'জিয়োলেবটা হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের। ওটা কখন-কোথায় থাকবে, সেটা জানা দরকার আমার, যাতে উদ্ধার করতে পারি।'

'ঠিক আছে, আমি ইমেইলে অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, ল্যারি।'

'মি. রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলো।'

'দাও।'

'রানা,' বললেন রেডক্লিফ, 'তোমার ওই মায়া লরেঞ্জোর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। রেযাল্ট যা পেয়েছি, তা শুনে খুশি হবে না।'

'কেন, সমস্যা কোথায়?'

'কারণ ওর ব্যাপারে সমস্ত ডিটেইলস্ আমাকে পেতে হয়েছে ইন্টারপোলের ডেটাবেজ থেকে। ওদের ধারণা, মেয়েটা *ক্যামোরা*-র উঠতি নেত্রী। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ওদের ফাইলে বেশ কিছু ছবি দেখেছি—শত্রুদেরকে কতটা নির্মমভাবে ও খতম করে, তার প্রমাণ। গা শিউরে ওঠার মত ব্যাপার। ইতিপূর্বে কয়েকজনকে ইলেকট্রিকাল গ্রাইণ্ডার মেশিন দিয়ে কিমা বানিয়ে ফেলার রেকর্ড আছে ওর। তবে... ইটালিয়ান পুলিশ ওর বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পায়নি।'

মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল রানার। মি. রেডক্লিফ ঠিকই বলেছেন—খবরটা পছন্দ হয়নি ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যামোরা মানে কি...'

'মাফিয়া,' বললেন রেডক্লিফ। 'সিসিলিতে যেটাকে কোসা নোস্ট্রা বলে, ওটাই নেপলসে ক্যামোরা। দুঃসংবাদ, রানা। ইটালিয়ান মাফিয়ার সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে গেছ তুমি।'

একত্রিশ

হাই-স্পিড ট্রেন *ইউরোস্টার*-এর বিজনেস প্রিমিয়ার ক্লাসের একটা আরামদায়ক সিটে বসে আছে মায়া লরেঞ্জো। ওর সামনে, পিছনে আর পাশের সিটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে তিনজন বডিগার্ড; সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারদিকে। একশো ছিয়াশি মাইল বেগে ছুটছে ট্রেন, জানালার পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ছবির মত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এ-মুহূর্তে ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকা পাড়ি দিচ্ছে ট্রেনটা।

বাইরে মন নেই মায়ার, সামনের টেবিলের উপর রাখা জিয়োলেবের উপর দৃষ্টি আটকে আছে তার। জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। প্রাচীন ডিজাইনের এই অদ্ভুত ডিভাইসটা কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে—বোঝার চেষ্টা করছে মাইডাসের সমাধি খোঁজার কাজে ওটা কীভাবে সাহায্য করতে পারে। এখনও কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল মায়া। খামোকা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে-পদ্ধতিতে গোল্ডেন চেম্বারে পৌঁছুবার পরিকল্পনা করেছে সে, তার জন্য জিয়োলেবের কোনও প্রয়োজন নেই। রানাকে যদি পরে কখনও বাগে পাওয়া যায়, তখন নাহয় জেনে নেবে ওটা কীভাবে কাজ করে। এরপর ডিভাইসটা ঠাঁই পাবে তার সংগ্রহশালায়।

বিমানে চেপেই লণ্ডন থেকে মিউনিখে যেতে পারত মায়া;

কিন্তু যায়নি স্রেফ একটা শখ পূরণের জন্য—নতুন কেনা অত্যাধুনিক গাড়ি *ফেরারি-৪৫৮*-টা চালিয়ে দেখার শখ। ওটা কিনতে অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ঠিকমত চালানো হয়নি—ইংল্যাণ্ডে সেটা সম্ভবও নয়। স্পেসিফিকেশন বলছে গাড়িটার টপ স্পিড ঘণ্টায় দুই শ' দুই মাইল, ওই গতিতে ইংল্যাণ্ডের কোনও রাস্তায় পুলিশ ড্রাইভ করতে দেবে না ওকে। টপ স্পিডে ফেরারিকে ছোটাবার মত রাস্তা রয়েছে স্রেফ একটা—জার্মানির *অটোবান*... দুনিয়ার একমাত্র ফ্রিওয়ে, যেখানে স্পিড লিমিটের কোনও বিধিনিষেধ নেই।

গাড়িটা গত রাতেই ব্রাসেলসে পাঠিয়ে দিয়েছে মায়া। রানা আর রেমিকে পালাতে দেয়ায় শাস্তি হিসেবে রবার্তোর কাঁধে জুটেছে কার্গো ডিউটিটা। এতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে যাবার কথা ওর। স্টেশনে অপেক্ষা করবে মায়ার জন্য। ফেরারি চালিয়ে মিউনিখে যাবে মায়া, ভাড়া করা একটা বিএমডব্লিউ সেডানে ওকে অনুসরণ করবে রবার্তো আর ট্রেনে আসা তিন বডিগার্ড... মানে, যদি ওরা ওর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে আর কী। এমনিতে সড়কপথে সাত ঘণ্টা লাগে ব্রাসেলস থেকে মিউনিখে পৌঁছুতে, তবে মায়া আশা করছে ওর শখের ফেরারি চার ঘণ্টায় দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারবে।

সামনের একটা সিট থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকা এক ব্যবসায়ীর উপর দৃষ্টি পড়ল মায়ার। সুন্দরী মেয়ে দেখে সম্ভবত পাশে এসে আলাপ জমাতে চাইছে, কিন্তু বডিগার্ডদের কারণে সাহস পাচ্ছে না। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটল মায়ার—পালোয়ান গোছের বডিগার্ড থাকবার এই এক সুবিধে। আজেবাজে লোক এসে উত্যক্ত করতে পারে না।

ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রানার কথা।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, দুর্ধর্ষ বাঙালি যুবকটির প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে। সুদর্শন, একরোখা, বুদ্ধিমান! এক সঙ্গে এতসব বৈশিষ্ট্য এর আগে কোনও পুরুষের মাঝে দেখেনি মায়া। ওর লাইনে এমন মানুষের দেখা পাওয়া দুষ্কর।

ছ'বছর হলো লরেঞ্জো পরিবারের মাথা হিসেবে কাজ করছে মায়া। নেপলসের ক্যামোরার নগণ্য সদস্য থেকে নিজের পরিবারকে তুলে এনেছে শীর্ষে। ব্যাপারটা মিরাকলই বলা চলে, কারণ ইটালিয়ান মাফিয়া শুরু থেকেই পুরুষশাসিত একটা জগৎ; ওখানে কোনও মেয়ে সহজে নেতৃত্ব পায় না। তাও আবার এত অল্প বয়সে। এর জন্য যথেষ্ট ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে মায়াকে, মুখোমুখি হতে হয়েছে বহু লোকের বিরোধিতার। কিন্তু কূটকৌশল খাটিয়ে, এবং বাছাই করা ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে সব সামাল দিয়েছে ও। প্রমাণ করে দিয়েছে, ক্যামোরা চালাবার মত যোগ্যতা ওর আছে।

কোনও পরিকল্পনা ছিল না মায়ার মাফিয়া-নেত্রী হবার। সবই ঘটে গেছে ভাগ্যচক্রে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল ওর, বিয়ের এক বছরের মাথায় প্রতিপক্ষ মাযোরেলা পরিবারের হাতে খুন হয়েছিল ওর স্বামী—কংক্রিট সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় রেষারেষির জের ধরে। রাগের মাথায় প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেয় মায়া, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে মাযোরেলা পরিবারের প্রতিটা সদস্যের। নিখুঁত ছক সাজিয়ে ওদের সবাইকে দুনিয়া-ছাড়া করে ও, কারও লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবেগের বশে করা এই কাজই ওকে তুলে আনে মাফিয়া জগতের পাদপ্রদীপে। নেপলসের অপরাধীরা বশ্যতা স্বীকার করে নেয় ওর। নতুন এই ক্ষমতা আর প্রতাপ উপভোগ করতে শুরু করে মায়া, হাল ধরে নেপলসের ক্যামোরার।

দ্বিতীয়বার বিয়েশাদী করবার ইচ্ছে আর হয়নি ওর। তার বদলে ঘনিষ্ঠ ও দূর-সম্পর্কের ভাই-বোনদের বিয়ের আয়োজন

করে ধীরে ধীরে পরিবার বড় করে নিয়েছে মায়া। তাদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার দিকে কড়া নজর রেখেছে। ফলে এখন এরা সবাই ওর বিশ্বস্ত, সামান্য ইশারাতেই প্রাণ উৎসর্গ করে দেবার জন্য প্রস্তুত। কৌশলে নিজের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে মায়া—আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে আলবেনিয়া, লিবিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি-সহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় কার্টেল-বসদের সঙ্গে। ফলে নির্বিঘ্নে ড্রাগস্ আর অবৈধ অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা করে যেতে পারছে ও। একই সঙ্গে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজ খুলে বৈধ ব্যবসায় নাম লিখিয়ে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সারিতেও যোগ দিয়েছে। ওর এই সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেনি নেপলসের প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলো। মায়ার দাপটে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে তারা।

সম্প্রতি নতুন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে মায়া। দৃশ্যপটে উদয় হয়েছে রাশান আর চাইনিজরা। প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলোকে অস্ত্র আর লোক সরবরাহ করে চলেছে তারা। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ওকে। খুব শীঘ্রি কিছু একটা করতে না পারলে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকবে না আর। সে-কারণেই মাইডাসের সমাধিটা খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে মায়া। অতুল সে ঐশ্বর্য হাতে এসে গেলে কেউ আর ধারেকাছে পৌঁছুতে পারবে না ওর। সত্যিকার অর্থেই মাফিয়ার শীর্ষ নেত্রীতে পরিণত হবে ও।

মিউনিখে সেই লক্ষ্যেই চলেছে মায়া। গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হান্স ডিয়েটজ্ ওর খাস লোক। তার মাধ্যমেই পিয়াৎজা কাভোর-এর সেই বিল্ডিংটা... যেটার তলায় লুকিয়ে আছে টানেল নেটওয়ার্কে ঢোকার প্রবেশপথ... কিনে নিচ্ছে সে, জনৈক জার্মান ক্রেতার ভুয়া পরিচয়ে। নইলে কুখ্যাত একজন মাফিয়া নেত্রীর কাছে সরকারি

বিল্ডিং বিক্রি করতে রাজি হতো না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ডিয়েটজ্ আরও একটা কাজ করবে ওর হয়ে। মাইডাস চেম্বার খুঁজে পাবার পর সমস্ত সোনা ও-ই বিক্রি করবে মায়ার পক্ষ থেকে। কাজটা সারতে হবে অত্যন্ত দ্রুত, নইলে খবর পেয়ে চেম্বারের দখল নিতে পারে ইটালিয়ান সরকার। হাজার হোক, ওটা জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।

রানা, রেমি আর ববি মুরল্যাণ্ডের কথা ভাবল মায়া। অনুসন্ধানের কাজে ভাল একটা টিমই বেছে নিয়েছে গ্যারেট, কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে মায়া, জানতে পেরেছে রানা আর মুরল্যাণ্ডের পুরনো আর্কিয়োলজিকাল অ্যাচিভমেন্টের খবর। রেমি হ্যাডলিকেও হালকা করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। অ্যাকাডেমিক সার্কেলে ওর যথেষ্ট সুনাম আছে। এদেরকে মাইডাস চেম্বারের ট্রেইল থেকে হটাতে না পারলে সমূহ বিপদ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মায়া—খুন করবে ওদের, যাতে অকূল পাথারে পড়ে যায় গ্যারেট; সফল হতে না পারে।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীতে যথেষ্ট লোক আছে মায়ার। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে চোখকান খোলা রাখতে। ওদের খোঁজ পাওয়ামাত্র মায়াকে খবর দেবে তারা। না পেলেও অসুবিধে নেই, টানেলের মুখ খোলা পর্যন্ত ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই চলে। এরপর ওখানে মোতায়েন থাকবে ওর লোক, কেউ মাইডাস চেম্বারের খোঁজে ভিতরে তল্লাশি চালাতে পারবে না। আর গ্যারেটের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ... সেটা সোনা খুঁজে পাওয়ার পরেও নেয়া যাবে। হাতে যখন অঢেল টাকা চলে আসবে, তখন দুনিয়ার কোথাও গিয়ে রেহাই পাবে না ওর আমেরিকান ভাইটি। তার মাথার জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করবে মায়া।

সন্তুষ্ট হয়ে চোখ মুদল ও। সাফল্য এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

জার্মানির ফ্রানয্ জোসেফ স্ট্রস এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল অডি সেডান, এ-৯২ অটোবান ধরে ছুটল মিউনিখের দিকে। রেন্টাল এজেন্সি থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছে রানা। দু'ঘণ্টারও কম লেগেছে লণ্ডন থেকে জার্মানিতে পৌঁছুতে, ফলে মিউনিখে গিয়ে গ্রেইডেল প্রপার্টিজের হেডকোয়ার্টার এবং তার আশপাশের এলাকা স্কাউট করে নেবার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছে ওরা।

মুরল্যাণ্ড ড্রাইভ করছে, পাশের সিটে বসে আধবোজা চোখে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা। পিছনের সিটে বসে একগাদা প্রিন্টআউট নিয়ে ব্যস্ত রেমি, মোমফলকের গায়ে খোদাই করা সঙ্কেতগুলোর ছবি তুলে প্রিন্ট করে নিয়েছে ও। জিয়োলেবটা খুইয়ে সতর্ক হয়ে গেছে রানা, মোমফলকটা সঙ্গে আনেনি, ওটা বিমানেই পাইলটদের জিম্মায় রেখে এসেছে। কাজ চালাবার জন্য ছবি তুলতে হয়েছে রেমিকে।

'হয়ে গেছে আমার,' খানিক পরে বলে উঠল ও।

'অনুবাদ করে ফেলেছ লেখাগুলো?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ।' নিজের নোটবুকটা ওর হাতে তুলে দিল রেমি।

'অনুমান করতে দিন,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'নিশ্চয়ই নতুন আরেকটা আইটেম খুঁজবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওতে?'

'উঁহুঁ।' হাসল রেমি।

নোটবুক খুলল রানা। পড়তে শুরু করল:

'...রাজা হেরনের এক গুপ্তচরকে পাঠানো হয়েছিল মাটির তলা দিয়ে রোমানদের দুর্গে ঢোকার পথ খুঁজে বের করবার জন্য। তা করতে গিয়ে ভাগ্যক্রমে ও খোঁজ পেয়ে যায় রাজা

মাইডাসের সমাধির। ওর ভাষ্যমতে, সমাধিটা সম্পূর্ণ সোনায় মোড়া। প্রমাণস্বরূপ ওখানে রাখা একটা স্বর্ণমূর্তির হাত কেটে আনে সে। ওটা দেখে আমরা বুঝতে পারি, কাহিনিটা মিথ্যে নয়।

'সমাধিটা কিছুতেই রোমানদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। তা হলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে যাবে ওরা, জোগাতে পারবে যুদ্ধের খরচ। শাসন কায়েম করতে পারবে পুরো পৃথিবীর উপর। তাই তিনটি সূত্রের সাহায্যে ওই গুপ্তধন পর্যন্ত পৌঁছুবার নকশা লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি আমি—এই মোমফলক, একটি পাণ্ডুলিপি আর পার্থেনন...'

'এটা আর্কিমিডিসের ভাষ্য?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'তারমানে মাইডাসের গুপ্তধনের কাহিনিটা সত্যি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'রোমানদের হাত থেকে ওই গুপ্তধন বাঁচাবার জন্য ধাঁধাটা বানিয়ে রেখে গেছেন তিনি। একটা ব্যাপার শুধু বুঝতে পারছি না—নিজেই ওই গুপ্তধন উদ্ধার করলেন না কেন?'

'কারণ টানা দু'বছর রোমান নৌবাহিনী অবরোধ করে রেখেছিল গ্রিক নগরী সাইরাকিউজ, এখন যেটা সিসিলি নামে পরিচিত,' ব্যাখ্যা করল রেমি। 'ওখানেই থাকতেন আর্কিমিডিস। শহরটা শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয় রোমানরা, তাদের হামলায় মারা পড়েন আর্কিমিডিস। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, গুপ্তধন উদ্ধার করলেও সেগুলো সাইরাকিউজ থেকে বের করতে পারবেন না; সে-কারণেই সমাধিটা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দিয়েছেন। পার্থেননে কেন সূত্র লুকিয়ে রেখেছেন—সেটাও পরিষ্কার। সে-আমলে পার্থেনন ছিল গ্রিকদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। ওটা দখল করবার কোনও উপায় ছিল না

রোমানদের।'

'বোঝা যাচ্ছে, রোমানরা ওই সোনা খুঁজে পায়নি,' বলল রানা। 'কারণ গ্যারেট আর মায়া চেম্বারটা অক্ষত অবস্থায় দেখেছে ছোটবেলায়। আর্কিমিডিসের সূত্র অনুসরণ করলে আমরাও ওখানে পৌঁছুতে পারব।'

'বাকিটা পড়ো,' বলল রেমি। 'আমি যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় অনুবাদ করেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নোটবুকের দিকে দৃষ্টি ফেরাল রানা।

'...মেগারাইডের দ্বীপের জন্য হেরাক্লিসের আসন যা, পার্থেনোপ অ্যাক্রোপোলিসের জন্য আফ্রোদিতির পা-ও তা।

'শুরুতে সবগুলো ডায়াল ঊর্ধ্বমুখী করে রাখতে হবে। এরপর পার্থেননের দিকে মুখ করে জিয়োলেবকে এমনভাবে শোয়াতে হবে, যাতে নবগুলো ইমারতের পেডিমেন্টের দিকে থাকে। সূর্যের ছায়া সানডায়ালের উপর পড়তে শুরু করলে বামদিকের নব ঘুরিয়ে কাঁটার ডগা হেরাক্লিসের আসনের দিকে নিয়ে আসতে হবে। উল্টোপাশের ডায়ালটা তখন মেগারাইডের দিকনির্দেশ করবে।

'জিয়োলেবকে আগের জায়গায় রেখে এবার ডানদিকে নব ঘোরাতে হবে। কাঁটার ডগা নিয়ে আসতে হবে আফ্রোদিতির পায়ের দিকে। এতে উল্টোপাশের ডায়ালটা আক্রোপোলিসের দিকনির্দেশ করবে।

'এভাবেই... দিকগুলোর সম্মিলনে পাওয়া যাবে ভূ-গর্ভস্থ গুহায় ঢোকার কুয়ো। কর্কটের চিহ্ন দেয়া ওই গুহার ভিতরে ঢোকার পরে জিয়োলেব তোমাকে পথ দেখাবে।'

প্রথমে দুই সঙ্গীকে শোনাবার জন্য জোরে জোরে পড়ল রানা,

এরপর পড়ল নিঃশব্দে। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর।

রেমি বলল, 'অনুবাদে কোনও ভুল করেছি কি না জানি না। এই অংশটা হেঁয়ালির মত মনে হয়েছে আমার কাছে।'

'হেঁয়ালি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এক ধরনের ট্রায়াঙ্গুলেশন প্রসেসের বর্ণনা এটা। চারটে রেফারেন্স পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকে জিয়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট লোকেশনটা খুঁজে বের করতে হবে। কী বলো, রানা?'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রানা। 'টানেল নেটওয়ার্কে ঢোকার প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়া যাবে এই নির্দেশনা অনুসরণ করলে।'

'তা কী করে হয়?' ভুরু কোঁচকাল রেমি। 'পার্থেননে কীভাবে নেপলসের টানেলের ঢোকার প্রবেশপথ থাকে?'

'ব্যাপারটা তা নয়,' বলল রানা। 'ট্রায়াঙ্গুলেশন প্রসেসে দুটো ত্রিকোণ পাব আমরা। ওগুলো যেখানে পরস্পরকে ওভারল্যাপ করবে, সেখানে রয়েছে প্রবেশপথ। ক্যালকুলেশনটা নেপলসের ম্যাপের উপর বসাতে হবে।'

'ক্যালকুলেশনটাই আসল?'

'হ্যাঁ। এখানে হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের কথা আছে। ওগুলো তো পার্থেননের পেডিমেন্টে ছিল, তাই না? ওই দুটো রেফারেন্স পয়েন্ট। জিয়োলেবের সাহায্যে বাকি দুটো রেফারেন্স, মানে আক্রোপোলিস আর মেগারাইড খুঁজে বের করতে হবে।'

'মেগারাইডটা আবার কী জিনিস?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'শুনে তো মনে হচ্ছে কোনও থিম পার্কের রোলার কোস্টারের নাম।'

হাসল রেমি। 'উচ্চারণটা আসলে হবে মেইগারিডে। নামটা আগেও শুনেছি আমি। দাঁড়ান, ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখি।'

'নাম যা-ই হোক, ওটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে

না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে পার্থেননের পেডিমেন্টের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওটা তো এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে!'

'আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে,' আশ্বাস দিল রানা। 'পেডিমেন্টটার অরিজিন্যাল লোকেশন... মানে হেরাক্লিস আর আফ্রোদিতির প্রতিকৃতিদুটো অতীতে কোথায় ছিল, সেটা জেনে নেয়া সম্ভব। দাঁড়াও, এখুনি ল্যারিকে মেসেজ দিচ্ছি—পার্থেননের অরিজিন্যাল স্কেম্যাটিক্সের একটা কপি যেন পাঠিয়ে দেয় আমাদের কাছে।'

'এই তো, পাওয়া গেছে মেইগারিডে,' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত গলায় বলল রেমি। 'নিয়াপোলিসের উপকূলের একটা দ্বীপ ছিল ওটা। এখন অবশ্য আর দ্বীপ বলা চলে না—পাথর দিয়ে সেতু বানিয়ে মেইনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। নেপলসের দর্শনীয় স্থানগুলোর একটা এখন ওটা—কাসল ডেলোভো... দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি প্রাচীন দুর্গ।'

'কিন্তু দ্বিতীয় রেফারেন্স পয়েন্ট তো অ্যাক্রোপোলিস,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ট্রায়াঙ্গুলেশনের জন্য পয়েন্ট হিসেবে যদি নেপলস আর অ্যাথেন্সকে ব্যবহার করি আমরা, প্রবেশপথের লোকেশন তো অনেক দূরে সরে আসবে! নেপলসে কিছুতেই থাকবে না ওটা।'

'বুঝতে একটু ভুল হচ্ছে আপনার,' বলল রেমি। 'এখানে বলছে পার্থেনোপ অ্যাক্রোপোলিস। গ্রিক ভাষায় অ্যাক্রোপোলিস বলতে যে-কোনও শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গাকে বোঝায়। প্রাচীন পার্থেনোপ... মানে আজকের নেপলস্-এ... সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রয়েছে আরেকটা দুর্গ—কাসল সান্তেলমো। পাহাড়ি একটা ব্লাফের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়। যে-দুটো দুর্গের কথা বললাম, আর্কিমিডিসের আমলে ওগুলোই ছিল নিয়াপোলিসের সবচেয়ে নামকরা দুই নিদর্শন।'

'কাজেই রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবেও আদর্শ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন আমাদেরকে জিয়োলেবের সাহায্যে বাকি দুটো পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে। আর সেজন্যে যেতে হবে পার্থেননে। হুম... ভেরি স্মার্ট!'

'কীসের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'আর্কিমিডিসের প্রশংসা করছি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। পার্থেননে ধাঁধার তৃতীয় অংশ লুকিয়ে রেখে গেছেন, যাতে বাকিদুটো হাতে পেলেও রোমানদের কোনও উপকার না হয়। পুরো গ্রিক সাম্রাজ্য ধ্বংস না করে কিছুতেই পার্থেননে পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে। আর ওখানে না গেলে জিয়োলেব বা আর্কিমিডিসের পাণ্ডুলিপি কোনও কাজে আসবে না।'

'কুয়োর ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'নিশ্চয়ই টানেলে ঢোকার প্রবেশপথ,' বলল রেমি। 'গ্যারেটও আমাদেরকে কুয়োর কথাই বলেছে। পুরো নেপলস্ জুড়েই আছে পুরনো আমলের অসংখ্য কুয়োমুখ। ওগুলো দিয়ে প্রাচীন অ্যাকোয়াডাক্ট সিস্টেমে সহজে ঢোকা যায়। রাজা হেরনের গুপ্তচর নিশ্চয়ই অমন কোনও কুয়ো দিয়ে ঢুকেছিল মাটির তলায়। বোধহয় ওটার গায়েই কর্কট, মানে কাঁকড়া-র ছবি এঁকে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। খোদাই করে এঁকে থাকলে ওই ছবি এখনও পাওয়া যাবে।'

'হুম, তারমানে কুয়োটার খোঁজ পাবার জন্য পার্থেননে যেতে হবে আমাদের। জিয়োলেবের সাহায্যে ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে বের করতে হবে ওটার লোকেশন। শুনতে তো জটিল কিছু বলে মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু এই সহজ কাজটা করবার জন্য জিয়োলেবটা মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে,' বলল রেমি। 'ওটাই চ্যালেঞ্জ।'

রানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। সেটা লক্ষ করে মুরল্যাণ্ড বলল,

'কী হলো? তুমি এমন গুম মেরে গেলে কেন?'

'আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান এত সহজ বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে,' বলল রানা। 'শুধু পার্থেননে গেলেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব, তা কী করে হয়? রোমানদের পক্ষে পার্থেননে পৌঁছুনো কঠিন ছিল মানি, কিন্তু ধাঁধার সমাধান তো ওরা কোনও গুপ্তচর পাঠিয়েও করে নিতে পারত। আর্কিমিডিসের মাথায় কি সেটা আসেনি?'

'কী বলতে চাও?'

'এখন পর্যন্ত যতটুকু সূত্র পেয়েছি, তাতে স্রেফ টানেল নেটওয়ার্কের প্রবেশপথের কথা আছে। কিন্তু তারপর? ওই গোলকধাঁধার ভিতরে কীভাবে এগোতে হবে, সে-সংক্রান্ত কোনও রেফারেন্স তো দেখছি না! তিনটে সূত্রের কথা বলেছেন আর্কিমিডিস। পার্থেননের পর তো আর কোনও সূত্র নেই।'

'ওখানে নিশ্চয়ই কোনও ম্যাপ লুকানো আছে। গেলেই জানা যাবে।'

'সেটা কতখানি বাস্তবসম্মত? ম্যাপ তৈরি করলে সেটা রোমানদের হাতে পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর্কিমিডিসের মত বুদ্ধিমান মানুষ কি অমন ঝুঁকি নেবেন?'

'ম্যাপ না থাকলে গোলকধাঁধার মত ওই টানেলের ভিতরে আমরা মাইডাস চেম্বার খুঁজে পাব কী করে?'

রেমির নোটবুকের দিকে চোখ ফেরাল রানা। বিড়বিড় করে পড়ল শেষ লাইনটা।

...গুহার ভিতরে ঢোকার পরে জিয়োলেব তোমাকে পথ দেখাবে।

একটাই অর্থ এর। আলাদা কোনও ম্যাপ নেই। জিয়োলেবটাই মাইডাসের চেম্বারের ম্যাপ। ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি!

বত্রিশ

বন্দিদশায় দু'দিন পেরিয়ে গেছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের, কিন্তু এখনও তিনি অবিচল। মাথায় আজেবাজে চিন্তা জেঁকে বসতে দিচ্ছেন না, তার বদলে খাটিয়ে চলেছেন মগজটাকে। ইতিমধ্যে চোখের ইশারায় রানার কাছে স্ট্রনটিয়ামের খবর পাঠিয়েছেন তিনি, আশা করছেন মেসেজটা বুঝতে পেরেছে ও। এখন তিনি ভাবছেন শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি পাবার উপায় নিয়ে। চেষ্টা করছেন এদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য জোগাড় করতে। লোকগুলোর সত্যিকার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আঁচ করা গেলে পরিকল্পনা সাজাতে সুবিধে হবে তাঁর।

ভিডিও-তে দেখাবার জন্য প্রতিদিন যে-পত্রিকাটা আনা হয়, সেটা তাঁকে পড়তে দেবার জন্য কাটনার এবং বেনসনকে রাজি করিয়েছেন অ্যাডমিরাল। পত্রিকা থেকে দেশের দৈনন্দিন ঘটনাবলী জানতে পারছেন তিনি, তবে অন্য কোনও উপকার হচ্ছে না। *ইউএসএ টুডে* একটি বহুল-প্রচারিত দৈনিক, আমেরিকার যে-কোনও জায়গায় ওটা কিনতে পাওয়া যায়। কাজেই পত্রিকা থেকে নিজের লোকেশন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি অ্যাডমিরাল। একই কথা খাটে খাবারের বেলাতেও। সাধারণ স্যাণ্ডউইচ, বা হ্যামবার্গার খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে; সেই সঙ্গে ডায়েট কোক। এসবও সবখানে পাওয়া যায়। তাই বলে হাল ছাড়ছেন না অ্যাডমিরাল। অপেক্ষায় রয়েছেন সুযোগের।

দিনে মাত্র একবার প্রকোষ্ঠ থেকে বের করা হয় তাঁকে, ভিডিও করবার জন্য। তার আগে ফোকর দিয়ে ভিতরে ফেলা হয় হ্যাণ্ডকাফ, সেটা হাতে লাগানোর পর খোলা হয় দরজা। ওই সময়টাই কাজে লাগাতে হবে—এটা বেশ ভালমতই বুঝতে পারছেন হ্যামিলটন। ভিডিও করায় ব্যস্ত দুই গুণ্ডাকে ঘায়েল করে সটকে পড়তে হবে র‍্যাচেল নামের মেয়েটিকে নিয়ে। তার জন্য মোটামুটি একটা প্ল্যানও খাড়া করেছেন তিনি। চমৎকার কিছু না, তবে ভাগ্যের সহায়তা পেলে সফল হবার ভাল সম্ভাবনা আছে।

পালাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো হ্যাণ্ডকাফ। হাতবাঁধা অবস্থায় লড়াই করা সম্ভব নয় গুণ্ডাদের সঙ্গে। এই সমস্যার একটা সমাধান বের করেছেন অ্যাডমিরাল—হ্যাণ্ডকাফ যেহেতু তিনিই আটকান, ওটা আলগা করে রাখা কোনও ব্যাপারই না। পরে ঝটকা দিলেই খুলে পড়ে যাবে। হ্যাণ্ডকাফ পরবার সময় শত্রুরা একটু অন্যমনস্ক থাকলেই কৌশলটা খাটাতে পারেন তিনি। কথা হলো কখন প্ল্যানটাকে কাজে পরিণত করবেন। গতকালই চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন। ভিডিও করবার সময় গতকাল তিনজন উপস্থিত ছিল। এতজনকে একাকী সামলানো সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। দু'জন থাকলে নাহয় ঝুঁকি নিতেন।

ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। দরজার কাছে গিয়ে ফোকরের ঢাকনার ফাটল দিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। দ্বিতীয় ভ্যানটা ঢুকছে ভিতরে। গতকাল একটা পণ্যবাহী ট্রেইলার-ট্রাক নিয়ে এসেছে লোকগুলো, সেটার পাশে এসে থামল ভ্যান। রাতের ভিতর ট্রাকের রঙ পাল্টে ফেলা হয়েছে। ধূসরের বদলে এখন ওটা গাঢ় নীল। রক্তলাল হরফে ট্রেইলারের গায়ে বড় করে লেখা হয়েছে—উইলবিক্স কনস্ট্রাকশন। ওতে কী আছে, জানেন না অ্যাডমিরাল।

ট্রাকটা আসার পর থেকেই রেনফিল্ড নামের লোকটা কী নিয়ে যেন এক নাগাড়ে খেটে মরছে। দৃষ্টিসীমার আড়ালে থাকায় বোঝা যাচ্ছে না কাজটা কী। মাঝে মাঝেই শোনা যায় লোহা-কাটার কর্কশ আওয়াজ, কিংবা দেখা যায় ওয়েল্ডিং টর্চের চোখ-ধাঁধানো আলো... কিন্তু এ-থেকে কাজের গতি-প্রকৃতি আঁচ করা সম্ভব নয়। এ-ব্যাপারে কোনও রকম আলোচনাও করে না রেনফিল্ড। দু'একবার তাকে দেখতে পেয়েছেন অ্যাডমিরাল—কোমরে ঝোলানো ওয়াকম্যান, আর কানে হেডফোন লাগিয়ে আপনমনে ঘুরে বেড়ায়। কাটনার বা বেনসনের সঙ্গে তার একেবারেই খাতির নেই। প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলে না।

ট্রাকের পাশে এসে থামল ভ্যান। দরজা খুলে গ্যারেট, কাটনার আর বেনসনকে নামতে দেখলেন অ্যাডমিরাল। পিছনের দরজা খোলা হলো এরপর। হাতবাঁধা দু'জন মানুষকে নামানো হলো। কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে রাখা হয়েছে তাদের। ভুরু কুঁচকে গেল অ্যাডমিরালের। নতুন হস্টেজ? এবার আবার কাদের ধরে আনল ওরা? জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ড পরেই। মুখের উপর থেকে কালো কাপড় সরাতেই দেখা গেল অল্পবয়েসী দুজন তরুণের চেহারা। বিশ-বাইশের বেশি নয় বয়স। আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে মুখ। গায়ের রঙ আর চেহারা বলে দিচ্ছে—এরা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ।

'কে তোমরা?' আরবী উচ্চারণে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল টি-শার্ট আর জিন্স পরা এক তরুণ। 'কেন আমাদেরকে ধরে এনেছ?'

'আমরা কিছু করিনি,' ফুঁপিয়ে উঠে তার সঙ্গে যোগ করল দ্বিতীয়জন—এর পরনে সাদা শার্ট আর স্ল্যাকস্। 'এ-দেশে আমরা বৈধভাবে এসেছি।'

'তা আমি জানি,' রুক্ষ গলায় বলল গ্যারেট। 'ভালমত

খোঁজখবর নিয়েই তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে।'

'কীসের জন্য বাছাই?'

'যথাসময়ে সেটা জানতে পারবে। আর কথা নয়।' দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল গ্যারেট। 'নিয়ে যাও ওদের!'

অস্ত্রের মুখে ঠেলাধাক্কা দিয়ে দুই তরুণকে বন্দিশালার দিকে নিয়ে চলল বেনসন আর কাটনার। গ্যারেট এগোল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রকোষ্ঠের দিকে। তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল।

খানিক পরে খুলে গেল ফোকরের ঢাকনা। হাসিমুখে গ্যারেট বলল, 'হ্যালো, অ্যাডমিরাল!'

জবাব দিলেন না হ্যামিলটন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

'বড্ড একগুঁয়ে মানুষ আপনি,' অভিযোগের সুরে বলল গ্যারেট। 'রানার সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছি আপনার। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের এখনও পরিচয় হয়নি। আমি অ্যান্থনি গ্যারেট... এই আউটফিটের লিডার।'

মুখ ঘোরালেন না হ্যামিলটন। শান্ত গলায় বললেন, 'নাম-ধাম যেহেতু বলে দিচ্ছ, ধরে নিচ্ছি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও ইচ্ছে তোমার নেই। রানা সেটা জানে?'

'অযথা শঙ্কিত হচ্ছেন,' বলল গ্যারেট। 'আপনাকে খুন করবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই... অন্তত রানা যতক্ষণ কথা শুনছে।'

আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। বললেন, 'যদি ভেবে থাকো, আমাকে আটকে রেখে রানাকে দিয়ে যা-খুশি-তাই করিয়ে নিতে পারবে, তা হলে মস্ত ভুল করছ তুমি, মিস্টার।'

'ভুল আমি নই, আপনি করছেন। হি'জ আ সেন্টিমেন্টাল ফুল, অ্যাডমিরাল। আপনাকে বাঁচাবার জন্য এরই মধ্যে রানা আমার হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'কিংবা হয়তো তোমার চোখে ধুলো দিচ্ছে... আসলে প্রস্তুতি নিচ্ছে তোমাকে ঘায়েল করবার।'

'তেমন কিছু করতে গেলে পস্তাবে। আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ঘায়েল করতে পারেনি, অ্যাডমিরাল। না আইন, না প্রতিপক্ষ... কেউ না।'

'সবকিছুতেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। তোমার বেলায় সেটা প্রথম ও শেষবার হতে চলেছে। মাসুদ রানাকে তুমি চেনো না, গ্যারেট। ওকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ তুমি। তোমাদের এই নোংরা পরিকল্পনা রানা ভণ্ডুল করে দেবে... আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি!'

অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন কান এড়াল না গ্যারেটের। বাঁকা সুরে বলল, 'হুম! অনেক কিছুই দেখে ফেলেছেন মনে হচ্ছে! আমাদেরকে নিছক কিডন্যাপার ভাবছেন না... তা হলে কী করছি আমরা, কিছু বুঝতে পারছেন?'

'ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটাতে চলেছ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তোমাকে দেখে টেরোরিস্ট বলে মনে হয় না, নিশ্চয়ই টাকার লোভে করছ কাজটা।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল গ্যারেট। 'নাহ্, প্রশংসা না করে পারছি না। আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান মানুষ। আপনার সঙ্গ সত্যিই মিস করব আমি। এনিওয়ে, ভিডিও করবার সময় হয়েছে। চলুন।'

ফোকরের সামনে থেকে সরে গেল সে। ওখানে উদয় হলো বেনসন। হ্যাণ্ডকাফ ছুঁড়ে দিল প্রকোষ্ঠের ভিতরে। ওটা কুড়িয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। আজও লোক বেশি, পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু যা করবার, তা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। গতকাল লোকগুলো সোমবারের কথা বলছিল... আজ শুক্রবার। আগামী দু'দিনের মধ্যে যদি তিনি পালাতে না পারেন, তা হলে আর কোনোদিনই পারবেন না।

তেত্রিশ

রাস্তার উল্টোপাশের ক্যাফেতে বসে গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারের উপর নজর রাখছে মুরল্যাণ্ড। ম্যারিয়ানপ্লাৎজের উত্তরে অবস্থিত, আধুনিক নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব প্রদর্শনী এই ইমারত। মূল কাঠামো ইস্পাত ও কংক্রিটের হলেও দশতলা উঁচু বিল্ডিঙের বাইরের দিক পুরোপুরি কাঁচে মোড়া—ঠিক যেন একটা কাঁচের প্রাসাদ। এ-ছাড়া মাটির তলায় রয়েছে সাতটা লেভেল-বিশিষ্ট রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজ। গ্যারাজের এণ্ট্রান্স দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে স্রেফ একটা প্ল্যাটফর্মে রাখতে হয় ড্রাইভারকে। এরপর ওটাকে নীচে নিয়ে যায় স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড সিস্টেম। রেখে দেয় ফাঁকা স্লটে। যথাসময়ে আবার বেরও করে আনে। গ্যারাজের এণ্ট্রান্সের পাশেই রয়েছে হেডকোয়ার্টারের কাঁচে ঘেরা লবি।

গ্রেইডেল বিল্ডিঙের ঠিক পাশেই রয়েছে আরেকটা নতুন বিল্ডিং। ওটার নীচতলায় রয়েছে অভিজাত গাড়ির একটা শো-রুম। ওখান দিয়ে যাবার সময় নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ছে মানুষ, সাগ্রহে তাকাচ্ছে ভিতরে রাখা দামি গাড়িগুলোর দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস। সবার পক্ষে ওসব গাড়ি কেনা সম্ভব নয়। এ-মুহূর্তে শো-রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক, পিছনের র‍্যাম্প খুলে নামাচ্ছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা আনকোরা নতুন *ল্যাম্বোর্গিনি গ্যালার্ডো* স্পোর্টস কার।

ঘড়ি দেখল মুরল্যাণ্ড। বিকেল চারটে বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। সামনে রাখা ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ বোলাল এরপর। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্র্যাকারের রিড-আউট দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটে। ওদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে মায়া। আশা করা যায় ঠিক সময়েই গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুবে।

মুরল্যাণ্ডের মুখোমুখি, টেবিলের উল্টোপাশে বসে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে রেমি। চোখাচোখি হতেই বলল, 'রানা এখন কী করছে কে জানে!'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না,' আশ্বাস দিল মুরল্যাণ্ড। 'সুযোগ পেয়ে নির্ঘাত এক দফা ঘুমিয়ে নিচ্ছে।'

'প্ল্যানটায় কাজ হবে তো?' শঙ্কা প্রকাশ করল রেমি।

'আলবত হবে! মায়া যদি ওর গাড়িতে জিয়োলেবটা রেখে যায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসবে রানা। দেখবেন, কোনও ঝামেলা হবে না।'

'আর যদি জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে যায়?'

'নেবার তো কোনও কারণ দেখছি না। গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারে ওটা ওর কোনও কাজে আসবে না। তারপরেও... ওটা গাড়ি থেকে বের করে নিলে জিপিএস থেকে জানতে পারব আমরা। ওসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না। আপনি রেডি তো?'

'হ্যাঁ। মায়া আমাকে দেখে না ফেললেই হয়।'

'তেমন কোনও ভয় নেই। ও বিল্ডিঙে ঢুকে যাবার পর আপনি যাবেন।'

পুরো পরিকল্পনার একমাত্র দুর্বলতা হলো গ্যারাজের ভিতরে বসানো সিকিউরিটি ক্যামেরা। বিল্ডিঙের লবিতে বসে একজন গার্ড মনিটর করে সেই ক্যামেরার ফিড। মায়ার গাড়ি থেকে

জিয়োলেব সরিয়ে নেবে রানা, কিন্তু সেটা ধরা পড়ে যাবে গার্ডের চোখে। এই সমস্যা দূর করবার দায়িত্ব পেয়েছে রেমি। রানা যখন জিয়োলেবটা চুরি করবে, তখন আলাপ জমিয়ে গার্ডকে ব্যস্ত রাখবে ও। ভাল জার্মান বলতে পারে রেমি, সেইসঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী... কাজটা ওর জন্য কঠিন কিছু নয়। তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে রেমির পোশাকের দিকে। ফুলপ্যাণ্ট আর ফুলহাতা ব্লাউজ পরেছে মেয়েটা, বোতাম আটকে রেখেছে একেবারে গলা পর্যন্ত। এমন ভদ্র সাজসজ্জা দেখে গার্ড ওর প্রতি আকৃষ্ট না-ও হতে পারে। কথাটা এরই মধ্যে রেমিকে জানিয়েছে সে, কিন্তু মেয়েটা তাতে কান দেয়নি।

'ওভাবে তাকাবেন না তো!' মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি লক্ষ করে বিরক্ত গলায় বলল রেমি। 'আমার পোশাক ঠিকই আছে।'

'আমার আইডিয়াটা কাজে লাগালে কিন্তু ভাল করতেন।'

'বুকের অর্ধেকটা বের করে রাখার আইডিয়া? নো, থ্যাঙ্কস্। অর্ধনগ্ন না হয়েও কাজটা সারতে পারব আমি।'

'তা হলে তো ভালই।'

'আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে কীভাবে?'

'সেলফোন হাতে রাখবেন। জিয়োলেবটা রানা হাতে পেলেই এসএমএস করব আপনাকে।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত কফি শেষ করল রেমি। বুকের ভিতর অনুভব করল উত্তেজনা। 'এ-ধরনের সিচুয়েশন আগেও ট্যাকেল করেছেন আপনারা?'

'বহুবার।' বাইরে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। 'ওই তো, এসে পড়েছে।'

মোড় ঘুরে দৃষ্টিসীমায় উদয় হয়েছে চকচকে একটা ফেরারি। ওটার ঠিক পিছনে রয়েছে আরেকটা বিএমডব্লিউ সেডান।

গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের সামনে পৌঁছে গতি কমাল গাড়িদুটো, মুখ ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল গ্যারাজের এন্ট্রান্স দিয়ে। দু'মিনিট পরেই কাঁচঘেরা লবিতে মায়া লরেঞ্জোকে দেখতে পেল ওরা। সঙ্গে তিনজন বডিগার্ড। ওদেরকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল গার্ড। গটমট করে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল মায়া ও তার সঙ্গীরা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরাল মুরল্যাণ্ড। জিপিএস ট্র্যাকার কোনও পজিশন দেখাচ্ছে না। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাওয়ায় কংক্রিটের মেঝেতে বাধা পাচ্ছে ওটার সিগনাল। মায়া যদি ওটা সঙ্গে নিয়ে ওপরতলায় উঠত, এমনটা ঘটত না।

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রেমিকে বলল ও। 'এবার আপনি যেতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রেমি। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরুল। ঢুকে পড়ল গ্রেইডেলের লবিতে। গার্ডের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখল মুরল্যাণ্ড। সন্তুষ্ট হয়ে বের করল সেলফোন। রিং করল রানাকে। জিপিএস ট্র্যাকারের চেয়ে সেলফোনের সিগনাল শক্তিশালী, সহজেই ভেদ করতে পারছে গ্যারাজের কংক্রিটের মেঝে।

একবার রিং হতেই রানার কণ্ঠ শুনতে পেল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যালো?'

'জেগে আছ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'খুব একটা না। কোনও খবর আছে?'

'হ্যাঁ। এসে গেছে মায়া। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছে। জিয়োলেবটা গ্যারাজে। রেমি গার্ডকে ব্যস্ত রাখছে, কাজেই এবার কাজে নামতে পারো।'

'ঠিক আছে। গাড়িটা কেমন?'

'গাড়ি আসলে একটা না, দুটো। মায়া এসেছে একটা

ফেরারি-তে। বডিগার্ডরা এনেছে আরেকটা বিএমডব্লিউ এম-ফাইভ।'

'হুম। ফেরারিতে ট্রাঙ্ক নেই। জিয়োলেবটা বিএমডব্লিউ-তে থাকবে। অসুবিধে নেই, দরকার হলে দুটোই তল্লাশি করব। লাইসেন্স নাম্বার বলো।'

নাম্বারদুটো দেখে নিয়েছিল মুরল্যাণ্ড, রানাকে জানিয়ে দিল।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বলল রানা। 'কাজ শেষে রিং করব তোমাকে।'

লাইন কেটে দিল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল মুরল্যাণ্ড। আপাতত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। গোলমাল দেখা না দিলেই হয়!

ভাড়া করা গাড়িটার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে রানা। সেলফোন পকেটে ঢুকিয়ে সাবধানে ডালা খুলল। তাকাল বাইরে। গাড়ির পিছনটা দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লেগে আছে—মাত্র এক ফুট জায়গা পাচ্ছে ও নামবার জন্য। কসরত করে ওখানেই নামতে হলো ওকে। এতক্ষণ পা ভাঁজ করে শুয়ে থাকতে হয়েছে, সোজা হতেই টনটন করে উঠল দুই হাঁটু। ঠোঁট কামড়ে ব্যথাটা সহ্য করে চারপাশে নজর বোলাল ও। মাথায় পরল একটা জকি ক্যাপ—কার্নিশের কারণে ক্যামেরায় এখন আর ওর চেহারা দেখা যাবে না।

গ্যারাজ অন্ধকার হতে পারে ভেবে একটা ফ্ল্যাশলাইট এনেছে রানা, তবে তার কোনও প্রয়োজন পড়ল না। সাততলা স্ট্রাকচারটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত—সম্ভবত সিকিউরিটি ক্যামেরায় ছবি তোলার সুবিধার্থেই। ফ্ল্যাশলাইট আর জ্বালল না রানা, গুঁজে রাখল কোমরের বেল্টে।

রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজের সবকিছুই অটোমেটেড। মূল

বিল্ডিঙের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে দুটো প্ল্যাটফর্ম রয়েছে—ওগুলোর উপর গাড়ি রাখলেই ড্রাইভারের দায়িত্ব শেষ। অটোমেটিক কাউন্টার থেকে পার্কিং টিকেট সংগ্রহ করামাত্র গাড়ি-সহ প্ল্যাটফর্ম নেমে আসে ভূগর্ভস্থ স্ট্রাকচারে। কাঠামোটা সিলিণ্ডারের মত। চারপাশের দেয়ালে রয়েছে গাড়ি রাখার উপযোগী অসংখ্য খোপ। মাঝখানের ফাঁকা জায়গা ধরে নেমে আসে প্ল্যাটফর্ম, ফাঁকা খোপ বাছাই করে সেখানে ঢুকিয়ে রাখে গাড়িকে। গ্যারাজের সাতটা লেভেলের মেঝে কংক্রিটের তৈরি, তবে খোপের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে গার্ডার বা শেকল দিয়ে। ওগুলো টপকে এক খোপ থেকে অন্য খোপে সহজেই যাওয়া সম্ভব।

গাড়ির সামনে চলে গেল রানা, খোপের সামনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। ছ'নম্বর লেভেলে পার্ক করা হয়েছে ওর অডি। বিএমডব্লিউ আর ফেরারিটা কোথায় কে জানে। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল দৃশ্যমান সমস্ত গাড়ির উপর। আর তখুনি সামনে দিয়ে নেমে এল ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। পাশের একটা গাড়ির সামনে গিয়ে থামল। খোপের পিছন দিকটা হাইড্রলিক মোটরের সাহায্যে একটু উঁচু হয়ে গেল, পিছলে প্ল্যাটফর্মের উপর চলে গেল গাড়িটা। ওটাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম আবার উঠে গেল উপরে।

তিন মিনিটের মাথায় কাঙ্ক্ষিত গাড়িদুটোর খোঁজ পেল রানা। মুরল্যাণ্ডের দেয়া লাইসেন্স নম্বর মিলে গেছে। ওর এক লেভেল নীচে রয়েছে বিএমডব্লিউ—উল্টোপাশে। ফেরারিটা রয়েছে একেবারে নীচের লেভেলে, চকচক করছে ওটার রক্তলাল শরীর।

লণ্ডনের এস্টেটে বডিগার্ড রবার্তোকে নির্দেশ দিয়েছিল মায়া—জিয়োলেবটা গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখতে। কিন্তু ফেরারি-তে ট্রাঙ্ক নেই, হুডের তলায় রয়েছে স্রেফ একটা ছোট্ট স্টোরেজ স্পেস। ওখানে জিয়োলেব রাখা সম্ভব, তারপরও রানা অনুমান করল—ট্রাঙ্কের কথা যখন বলেছে মায়া, ওটা

বিএমডব্লিউতে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাই ওটাই প্রথমে তল্লাশি করবার সিদ্ধান্ত নিল। না পেলে ফেরারির ভিতর খোঁজা যাবে।

বিএমডব্লিউ-র কাছে পৌঁছুনোর জন্য মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেরুতে হবে ওকে। চওড়ায় ওটা বিশ ফুট, লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। তবে মেইনটেন্যান্স ওঅর্কের জন্য গ্যারাজের দু'পাশে অ্যাক্সেস ল্যাডার আর সরু ওয়াকওয়ে আছে। কাছাকাছি একটা ক্যাটওয়াক দেখতে পাচ্ছে রানা, খোপের সীমানা টপকে রওনা হলো ওদিকে। লবির গার্ডকে রেমি ব্যস্ত রাখতে পারছে কি না ভেবে শঙ্কিত হলো। আশপাশে আড়াল বলতে কিছু নেই, লোকটা কোনও কারণে মনিটরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ওকে। টুপির কার্নিশ আরেকটু নামিয়ে দিল রানা—অন্তত চেহারাটা যেন ক্যামেরায় ধরা না পড়ে।

ক্যাটওয়াক পেরিয়ে অ্যাক্সেস ল্যাডারে পৌঁছুতে লাগল দু'মিনিট। মই বেয়ে আর মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পাঁচ নম্বর লেভেলে নেমে এল রানা। একের পর এক খোপ পেরিয়ে পৌঁছে গেল বিএমডব্লিউ-র পাশে। গাড়ির সবগুলো কাঁচ টিণ্টেড—ভিতরে কী আছে না আছে, দেখা গেল না। তার কোনও প্রয়োজনও অবশ্য নেই। জিয়োলেবটা ট্রাঙ্কে থাকার কথা, ওদিকেই মনোযোগ দিল।

অডি-র মত বিএমডব্লিউ-র পিছনটাও একেবারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে। এ-অবস্থায় ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা মুশকিল। তাই গাড়ির দরজা খুলবে বলে ঠিক করল ও। স্টিয়ারিং হুইলের ড্যাশবোর্ডের তলায় ট্রাঙ্ক খোলার লিভার থাকে, ওটা ব্যবহার করবে। ফ্ল্যাশলাইটটা গাড়ির ছাতের উপর রেখে ড্রাইভারের দরজার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। কোটের পকেট থেকে বের করল লক-পিকিং ইকুইপমেণ্টের পাউচ। সূক্ষ্ম দুটো পিক বের করে

ঢুকিয়ে দিল কি-হোলে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই মৃদু আওয়াজ করে খুলে গেল তালা।

সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিতেই খুলে গেল দরজা। নিচু হয়ে গাড়ির ভিতরে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঢোকাল ও, এক হাতে হাতড়াতে শুরু করল ড্যাশবোর্ডের তলা। লিভারটা পেয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর। ওটায় চাপ দিতেই ঘটাং করে খুলে গেল ট্রাঙ্কের ডালা। আর তখুনি ঘাড়ের খাটো চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল ওর। বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল মাথার ভিতর।

গাড়িতে ও একা নয়!

আড়চোখে পিছনের সিটে একটা ছায়ামূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখল রানা। কোনোকিছু করবার সুযোগ পেল না, তার আগে খুলির একপাশ স্পর্শ করল পিস্তলের হিমশীতল নল। জমিয়ে দিল ওকে।

'হ্যালো, সেনিয়র রানা!' কানের পাশে গমগম করে উঠল মায়ার বডিগার্ড রবার্তোর হাসিহাসি কণ্ঠ।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

ট্রেজার হান্টার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা!
গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের তৈরি করা যে-ধাঁধা
দু'হাজার বছরেও ভেদ করতে পারেনি কেউ,
সেটাই সমাধান করতে চাইছে রানা মাত্র চারদিনে!
নইলে খুন করা হবে পিতৃসম অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।
পাগলের মত চষে বেড়াচ্ছে ও দু-দুটো মহাদেশ।
পাঠক, চলুন ওর সঙ্গে ঘোড়া ছোটাই ইংল্যাণ্ডের প্রান্তরে;
চুরি করি গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরের অমূল্য সম্পদ;
দুইশ' মাইল বেগে গাড়ি চালাই জার্মানির ফ্রিওয়ে-তে;
অথবা হারিয়ে যাই ইটালির ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সুড়ঙ্গে,
কিংবা আমেরিকার রাস্তায় জড়িয়ে পড়ি মরণপণ সংঘর্ষে।
নিষ্ঠুর দুই শত্রু পিছু নেবে আপনার।
পদে পদে থাকবে মৃত্যুর হাতছানি।
কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, রানা পাশে রয়েছে আপনার।
সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে ওর সঙ্গে একসময় ঠিকই পৌঁছুবেন
আপনি রাজা মাইডাসের সেই সোনার সমাধিতে।
লোভ হচ্ছে? তা হলে চলুন, রওনা হই!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

ট্রেজার হান্টার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাঠক, গ্রিক উপকথার মাইডাস টাচের গল্প জানেন তো?
স্বর্ণলোভী রাজা মাইডাসকে অদ্ভুত এক বর দিয়েছিলেন দেবতারা—
শুধু স্পর্শ দিয়ে যে-কোনও জিনিসকে সোনায় রূপান্তরিত
করতে পারতেন তিনি। সেটা তাঁর জন্য হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ।
ভুল করে নিজের মেয়েকে সোনার মূর্তি বানিয়ে ফেলেন তিনি।
করুণ... সেইসঙ্গে সুন্দর এক কাহিনি, তাই না?
কিন্তু গল্পটা যদি গল্প না হয়? যদি ওটা সত্যি হয়ে থাকে?
এত বছর পর পাগলাটে কোনও ভিলেন যদি সেই ক্ষমতার
অধিকারী হতে চায়... খুঁজে পেতে চায় রাজা মাইডাসের সমাধি...
এবং মাসুদ রানাকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য করতে চায়
সেই কাজ করে দিতে? কী ঘটবে তা হলে?

না, পাঠক, কল্পনার সাগরে ভেসে যাবার কোনও দরকার নেই।
এই বইয়ের ভিতরেই রয়েছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব।
সেই সঙ্গে রয়েছে পাতায় পাতায় দমবন্ধ করা উত্তেজনা,
রক্ত গরম করা অ্যাকশন আর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ-সহ অনেক কিছু।
তা হলে আর দেরি কেন, চলুন রানার সঙ্গে যোগ দিই
শ্বাসরুদ্ধকর আরেকটি অভিযানে। কথা দিচ্ছি, হতাশ হবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

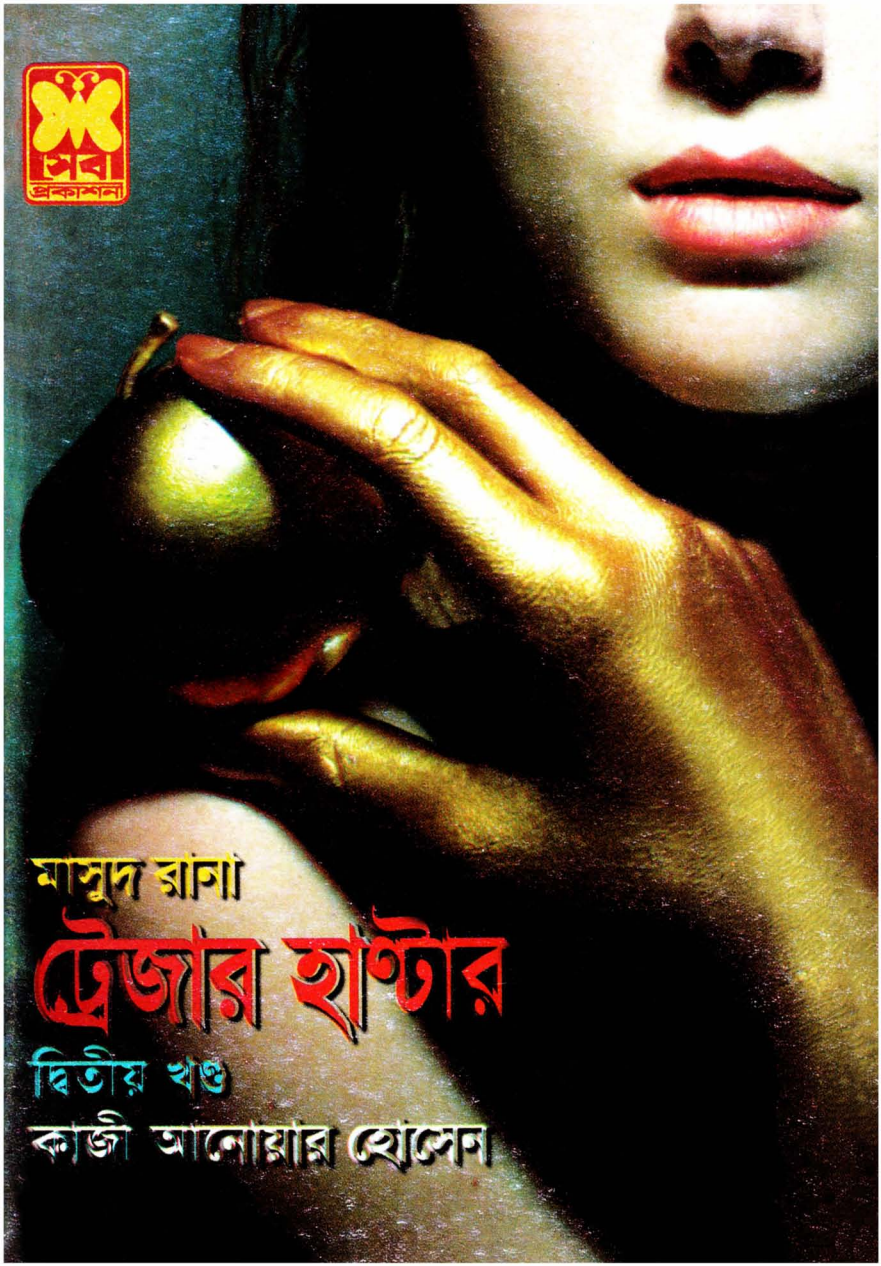

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ট্রেজার হান্টার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২২

ট্রেজার হান্টার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7422-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-422
TREASURE HUNTER
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উননব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না রবার্তো। ইংল্যাণ্ডের এস্টেটে মাসুদ রানা ও ড. রেমি হ্যাডলিকে আটকে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বসের বিরাগভাজন হয়েছিল সে। শাস্তি হিসেবে বডিগার্ড থেকে ডিমোশন দিয়ে তাকে গাড়ির এসকর্ট বানিয়ে দিয়েছিল মায়া লরেঞ্জো, পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্রাসেলসে। মিউনিখে পৌঁছুবার পরেও মায়ার সঙ্গে গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের ভিতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি, বরং গাড়ির সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে নেমে আসতে হয়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং গ্যারাজে। কিন্তু এখানেই যে ভুল শোধরাবার সুযোগ পেয়ে যাবে, কে ভেবেছিল! কপাল আর কাকে বলে... নিজে থেকেই ওর কাছে এসে ধরা দিয়েছে রানা!

বিএমডব্লিউ-র পিছনের সিটে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল রবার্তো, টিন্টেড গ্লাসের কারণে ওকে দেখতে পায়নি বাঙালি ছোকরা, গাড়ির দরজা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খুটখাট আওয়াজ শুনে তন্দ্রা টুটে গিয়েছিল রবার্তোর, চোখ পিটপিট করতেই দেখতে পেয়েছে রানাকে। চমকে গেলেও ভুল করেনি কোনও। পিছনের সিটে ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল। রানা গাড়ির ভিতরে শরীর ঢোকাতেই পিস্তল বের করে এনেছে সে, ঠেকিয়েছে ওর কপালের পাশে।

মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে রানা। মনে মনে গাল দিচ্ছে

নিজেকে। আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তা হলে এই বিপদে পড়ত না।

'নড়বেন না, সেনিয়র রানা,' বলল রবার্তো। পিস্তলটা ওর কপালের পাশ থেকে সরাল একটু, তারপর সাবধানে মুক্ত হাতে খুলে ফেলল পিছনের একটা দরজা। বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। অস্ত্রটা সারাক্ষণ তাক করে রাখল রানার দিকে।

'বেরোন,' নির্দেশ দিল রবার্তো। 'সাবধান, কোনও চালাকি নয়। হাতদুটো যেন উপরদিকে থাকে।'

ধীরে ধীরে গাড়ির ভিতর থেকে শরীর বের করল রানা। হ্যাণ্ডস্ আপ ভঙ্গিতে লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল রবার্তো। ডায়াল করল মায়ার ডানহাত নিরো-র নাম্বারে, সে এখন বসের সঙ্গেই আছে।

'সি?' রিং হতেই বলে উঠল নিরো।

'নিরো, বসের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে,' বলল রবার্তো। জলদি ওঁকে নিয়ে গ্যারাজে এসো।'

'বস্ এখন ব্যস্ত, রবার্তো।'

'তা হলে লুকা-কে নিয়ে তুমিই এসো। কথা দিচ্ছি, তোমরাও চমকে যাবে!'

'ধ্যাত্তেরি! কী হয়েছে বলবে তো!'

'উঁহুঁ। নিজের চোখে দেখে যাও। বললাম তো, সারপ্রাইজ আছে আমার কাছে!'

'চুপ করে বসে থাকো, রবার্তো। এখানকার কাজ শেষ হলে আসছি আমরা।'

'না, না! এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। ব্যাটা কখন কী করে বসে...'

'কার কথা বলছ?'

'আরে... সেটা দেখাবার জন্যই তো ডাকছি তোমাদেরকে।

প্লিজ, তাড়াতাড়ি এসো। বাইরের স্লটে পার্কিং টিকেট না ঢোকালে এখান থেকে বেরুতে পারছি না আমি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমরা। কিন্তু ব্যাপারটা যদি ভাঁওতা হয়...'

'আগে এসো তো!' বিরক্তি প্রকাশ করে লাইন কেটে দিল রবার্তো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। 'অ্যাই! কী করছ?'

ফোনে কথা বলতে গিয়ে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল লোকটা, সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে রানা। ছোঁ মেরে গাড়ির ছাতের উপর রাখা ভারী ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিল ও, মুগুরের মত ওটা চালাল রবার্তোর কবজিতে। ককিয়ে উঠল ইটালিয়ান গুণ্ডা, কবজির হাড় ভেঙে গেছে, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। আহত জায়গাটা অন্যহাতে চেপে ধরল ইন্সটিঙ্কটের বশে। পিছিয়ে গেল দু'পা।

ফ্ল্যাশলাইট উঁচু করে তার দিকে এগোল রানা, চাঁদিতে একটা ঘা বসাতে চায়। মরিয়ার মত একটা লাথি ছুঁড়ল রবার্তো, রানার বুকে লাগল সেই লাথি। পিছনদিকে ছিটকে গেল ও, গার্ডার টপকে উল্টে পড়ল গ্যারাজের পাশের খোপে। সোজা হতেই রবার্তোকে পকেট থেকে একটা সুইচব্লেড নাইফ বের করতে দেখল, খুট করে বেরিয়ে এল ওটার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ফলা।

বাঘের মত তার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল রানা। ধাক্কা খেয়ে বিএমডব্লিউ-র গায়ে আছড়ে পড়ল রবার্তো। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ছুরি চালাল রানার পেট লক্ষ্য করে। একটু সরে গিয়ে আঘাতটা এড়াল রানা। পরমুহূর্তে ছোবল মারল, খপ্ করে ধরে ফেলল কবজি, মোচড় দিয়ে একটানে তুলে আনল হাতটা রবার্তোর পিঠের উপর... প্রায় ঘাড়ের কাছাকাছি।

তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ইটালিয়ান গুণ্ডা, গা-ঝাড়া দিয়ে মুক্ত করতে চাইল নিজেকে, কিন্তু একচুল আলগা হলো না রানার বজ্রমুষ্টি। কবজি ভেঙে যাওয়ায় অন্য হাতটাও ব্যবহার করতে

পারছে না রবার্তো। অগত্যা মুঠো আলগা করে ছেড়ে দিল হাতের ছুরি। ঝন-ঝন শব্দে পড়ল সেটা মেঝেতে।

ইটালিয়ান গুণ্ডার মাথার চুল মুঠো করে ধরল রানা, চাপ দিয়ে তাকে কুঁজো হতে বাধ্য করল, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে দিল গাড়ির দিকে। সাইড-উইণ্ডোর কাঁচ ভেঙে সবেগে বিএমডব্লিউ-র ভিতরে ঢুকে গেল রবার্তোর মাথা। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। টান দিয়ে তাকে মেঝের উপর এনে ফেলল রানা। গায়ে লাথি মেরে নিশ্চিত হলো—সত্যিই বেহুঁশ হয়ে গেছে, না কি অভিনয় করছে।

দম ফিরে পাবার জন্য কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর কুড়িয়ে নিল মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা। পিস্তল কোথায় পড়েছে কে জানে, দেখা গেল না। ওটা খোঁজার জন্য সময়ও নষ্ট করল না রানা—এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। রেমির পক্ষে আর বেশিক্ষণ লবির গার্ডের নজর ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। লোকটা সিকিউরিটি ক্যামেরার মনিটরের দিকে তাকালেই সর্বনাশ!

দ্রুত রবার্তোর শরীরতল্লাশি করল রানা। আর কোনও অস্ত্র নেই; তবে পাসপোর্ট, ওয়ালেট আর চাবির রিং পাওয়া গেল। রিঙে দুটো স্পেয়ার চাবি রয়েছে—একটা বিএমডব্লিউ-র, অন্যটা ফেরারির। খুশি হয়ে উঠল ও। চাবি পাওয়ায় ভাল হয়েছে। ফেরারি-তে যদি তল্লাশি চালাতে হয়, তা হলে আর তালা ভাঙার প্রয়োজন পড়বে না।

চাবিদুটো পকেটে ভরে সেলফোন বের করল রানা। বিএমডব্লিউ-র ট্রাঙ্কের দিকে এগোতে এগোতে ডায়াল করল বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ডের কাছে।

'কাজ শেষ?' ডিসপ্লে-তে ওর নাম্বার দেখে সরাসরি জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'না,' বলল রানা। 'মায়ার এক স্যাঙ্গাতের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গিয়েছিল... ওকে ঘুম পাড়াতে হলো।'

'কী সর্বনাশ! গ্যারাজে একজনকে রেখে গিয়েছিল ও?'

রানা বুঝতে পারছে, মুরল্যাণ্ড নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে ব্যাপারটা ধরতে না পারায়। যদিও ওর কোনও দোষ নেই; কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ির ভিতরে কেউ বসে থাকলে রাস্তার ওপারের ক্যাফে থেকে সেটা বোঝা অসম্ভব।

'রিল্যাক্স, আমার কিছু হয়নি,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে জ্ঞান হারাবার আগে দোস্তদেরকে ফোন করেছিল লোকটা। ওরা নীচে নেমে আসছে। বিকল্প এগজিট স্ট্র্যাটেজি দরকার আমাদের। রেমিকে বলো, জলদি লবি থেকে কেটে পড়তে। নইলে ধরা পড়ে যাবে।'

'যাশ্ শালা! ওরা অলরেডি লবিতে পৌঁছে গেছে!'

'দেখো কী করা যায়। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।'

ফোন পকেটে রেখে দিয়ে বিএমডব্লিউ-র পিছনে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকল রানা। ধাক্কা দিয়ে একটু সামনে ঠেলে দিল গাড়িটাকে। ঠিকমত দাঁড়াবার জায়গা পেলে ট্রাঙ্কের ডালা উঁচু করল। ভিতরে মায়া ও তার সঙ্গীদের লাগেজ রাখা হয়েছে—ছোট-বড় পাঁচটা ব্যাগ। ওগুলোরই কোনও একটা ভিতরে আছে জিয়োলেব—আন্দাজ করল ও। দেয়াল আর গাড়ির মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে একে একে সবগুলোই ট্রাঙ্ক থেকে বের করতে শুরু করল ও। শেষ ব্যাগটা মাত্র নামিয়েছে, এমন সময় গাড়ির ভিতরে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর।

রবার্তো!

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ইটালিয়ান গুণ্ডা, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েছে বিএমডব্লিউ-র ভিতরে। ত্রস্ত হাতে গ্লাভবক্স খুলে বের করে আনল আরেকটা পিস্তল। পরক্ষণে গাড়ির পিছনের উইণ্ডশিল্ড

চৌচির করে রানার দিকে ছুটে এল তপ্ত বুলেট। কানে তালা লেগে গেল গুলির আওয়াজে।

ঝট্ করে বসে পড়ল রানা, শরীর লুকাল বাম্পারের পিছনে। খেদোক্তি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। লোকটা মানুষ, না গণ্ডার? সাংঘাতিক আহত হয়েছিল...তারপরেও এত দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেল কীভাবে? ওর দিকে নজর না রেখে মস্ত ভুল করেছে রানা। এখন সে-ভুল শোধরানোর উপায় নেই।

পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে রবার্তো। উইণ্ডশিল্ড বাদ দিয়ে এখন ব্যাকসিট আর চেসিস ফুটো করছে—যেভাবেই হোক শত্রুর গায়ে একটা গুলি লাগাতে চায়। রানার দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে আসতেই প্রমাদ গুনল ও। গাড়ির ঠুনকো শরীর গুলি ঠেকাতে পারছে না, যে-কোনও মুহূর্তে ঘায়েল হবে ও। পাল্টা আক্রমণের উপায় নেই, অস্ত্র বলতে স্রেফ রবার্তোর ছুরিটা রয়েছে ওর কাছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে ওটা অচল।

মেঝের উপর উপুড় হয়ে যেতে শুরু করল রানা, আর তখুনি চেসিস ভেদ করে বেরিয়ে আসা একটা একটা বুলেট নাগাল পেয়ে গেল ওর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা, বাম হাতের বাইসেপে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শোয়া অবস্থাতেই হাত ঠেকাল ক্ষতে। কপাল ভাল, মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। ক্ষতের ভিতরে আটকে নেই। শার্টের তলা থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে বাইসেপ বেঁধে ফেলল ও।

এখনও চলছে গুলি। রাগে, দুঃখে উন্মাদ হয়ে গেছে রবার্তো, প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। গাড়ির গ্লাভবক্সে শুধু বাড়তি পিস্তল নয়, যথেষ্ট অ্যামিউনিশনও নিয়ে এসেছিল সে; সব খরচ করছে এখন রানাকে খতম করবার জন্য। হতাশা অনুভব করল রানা—এতক্ষণে গুলির শব্দ বাইরের লোকে শুনে ফেলেছে কি না কে জানে। গ্যারাজটা সাউণ্ডপ্রুফ কি না তাও জানা নেই ওর।

বুলেটপ্রুফ হলেও লাভ নেই। সিকিউরিটি ক্যামেরায় নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে গোলাগুলির দৃশ্য। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও।

ম্যাগাজিন বদলাবার জন্য রবার্তো একটু বিরতি নিতেই ঝট্ করে উঠে বসল রানা। পিঠ ঠেকাল বিএমডব্লিউ-র রিয়ার-এণ্ডে, পা ভাঁজ করে ঠেকাল গ্যারাজের দেয়ালে। সর্বশক্তিতে গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করল ও। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগে বাড়ল বিএমডব্লিউ। রানার পা পুরোপুরি সোজা হতেই খোপের কিনার অতিক্রম করল ওটার সামনের দুই চাকা। পিছলাতে শুরু করল গাড়িটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বেরিয়ে গেল খোপ থেকে, তারপরেই প্রায় খাড়া হয়ে খসে পড়ল গ্যারাজের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে। গাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল রবার্তোর আর্তনাদ।

পঞ্চাশ ফুট নীচে, গ্যারাজের কংক্রিটের মেঝেতে উল্টে পড়ল বিএমডব্লিউ। বিকট আওয়াজ হলো সংঘর্ষের। উঠে গিয়ে খোপের কিনার থেকে উঁকি দিল রানা। মরা তেলাপোকার মত দেখাচ্ছে গাড়িটাকে। ছাতের উপর ভর দিয়ে পড়েছে, থেঁতলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাঙা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রবার্তোর রক্তাক্ত দেহের একাংশ—পটল তুলেছে সে। পরক্ষণে দপ করে গাড়ির আণ্ডারক্যারিজে জ্বলে উঠল আগুন। কালো ধোঁয়া পাক খেতে শুরু করল গ্যারাজের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে বেজে উঠল অটোমেটিক ফায়ার অ্যালার্ম।

প্রমাদ গুনল রানা। চুপিসারে কাজ সারতে চেয়েছিল... তা আর হলো না। এমন সময় অ্যালার্মের চিৎকার ছাপিয়ে উপর থেকে ভেসে এল ভারী যান্ত্রিক গুঞ্জন। এগজিট বে থেকে নেমে আসছে খালি প্ল্যাটফর্ম। নিশ্চয়ই রবার্তোর সঙ্গীরা পার্কিং টিকেট জমা দিয়েছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের কণ্ট্রোল প্যানেলে। বিএমডব্লিউ-কে তুলে নেবার জন্য আসছে প্ল্যাটফর্মটা। সবগুলো ব্যাগ নিয়ে

তাড়াতাড়ি পাশের খোপে চলে গেল ও। বিএমডব্লিউ-র শূন্য খোপটার সামনে এসে থামল প্ল্যাটফর্ম। মেঝের পিছন দিক উঁচু হয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে প্ল্যাটফর্ম আবার উঠে গেল উপরে।

দ্রুত হাতে সবগুলো ব্যাগ তল্লাশি করল রানা। ভিতর থেকে বের করে আনল কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে সবকিছু। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, জিয়োলেবটা নেই! একটাই অর্থ এর—জিনিসটা রয়ে গেছে ফেরারিতে!

আবারও যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এল। নেমে আসছে এগজিট বে-র প্ল্যাটফর্ম। ওকে পেরিয়ে নেমে গেল নীচে। এবার ফেরারি-টাকে তুলে আনতে চলেছে ওটা। দাঁতে দাঁত পিষল রানা। যান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মের আগে গাড়িটার কাছে পৌঁছুবার কোনও উপায় নেই ওর। মই বেয়ে নামতে অনেক সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া শুধু গাড়ির কাছে পৌঁছুলেই চলছে না। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে। বের করে আনতে হবে জিয়োলেব। কিছুতেই আর সেটা সম্ভব নয়।

সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভজকট হয়ে গেছে ওর!

দুই

গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্টের হেডকোয়ার্টারের লবিতে... রিসেপশনে দাঁড়িয়ে আছে রেমি। আলাপ জুড়ে দিয়েছে

গার্ডের সঙ্গে। টুরিস্ট সেজেছে ও, যেন ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না। রেন্টাল কারের গ্লাভবক্সে পাওয়া ম্যাপ নিয়ে হাজির হয়েছে গার্ডের সামনে, ভাঙা ভাঙা জার্মানে জানতে চাইছে দিকনির্দেশ।

ইউনিফর্ম পরা গার্ডের নাম ম্যাথিয়াস; বয়সে তরুণ, খুব বেশিদিন হয়নি লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছে। রেমির মত সুন্দরীকে দেখামাত্র মন গলে গেছে তার, দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওকে সাহায্য করতে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে রেমি, যাতে ওর মুখোমুখি হতে গেলে গার্ডের পিঠ চলে যায় সিকিউরিটি ক্যামেরার মনিটরের দিকে। কৌশলটা বেশ কাজে দিয়েছে। প্রথম পনেরো মিনিটে একবারও ক্যামেরা ফিডের দিকে তাকায়নি ম্যাথিয়াস।

হঠাৎ মৃদু ভাইব্রেট করে উঠল রেমির সেলফোন। মুরল্যাণ্ড মেসেজ পাঠিয়েছে:

উল্টো ঘুরবেন না। আপনার ঠিক পিছন দিয়ে যাচ্ছে মায়ার দু'জন লোক।

জমে গেল রেমি। পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সত্যিই ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছিল ও। ওর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে ম্যাথিয়াস জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা, *ফ্রাউলাইন?*'

'না, না...' তাড়াতাড়ি বলল রেমি। 'তেমন কিছু না।'

'পানি-টানি দেব? চাইলে কাউন্টারের এপাশে এসে বসতে পারেন।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই...'

কথা শেষ হলো না রেমির। তার আগেই বিকট এক সংঘর্ষের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা বিল্ডিং। চমকে উঠে মনিটরের দিকে তাকাল রেমি, সঙ্গে সঙ্গে হুলকে উঠল বুকের রক্ত। গ্যারাজের তলায় আছড়ে পড়েছে একটা গাড়ি—বিএমডব্লিউ সেডান। মায়ার বডিগার্ডরা যেটায় চড়ে এসেছিল... সেটাই। গ্যারাজের নীচে

পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ভিতরে কেউ আছে কি নেই, বোঝা যাচ্ছে না। গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, মনিটরের দিকে তাকায়নি, ফলে জানে না কী ঘটেছে ওখানে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফাঁকা একটা খোপের কিনারে দেখতে পেল রানার পরিচিত অবয়ব। করছে কী লোকটা?

বিকট আওয়াজে ম্যাথিয়াসও থমকে গেছে। কথা বলে তার মনোযোগ ফেরাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাল রেমি, লাভ হলো না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারস্বরে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, গার্ড স্টেশনের প্যানেলে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল লাল বাতি। ঝট্ করে সেদিকে তাকাল ম্যাথিয়াস, আঁতকে উঠল।

'মাইন গট!' মাতৃভাষায় ঈশ্বরকে ডেকে উঠল তরুণ গার্ড। সবকিছু ভুলে ছিটকে বেরিয়ে এল কাউন্টারের পিছন থেকে, পড়িমরি করে ছুটল গ্যারাজের দিকে। রেমির ডাক কানেই তুলল না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেমি। চারদিক থেকে ভেসে আসছে হাঁকডাক। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল। বুঝতে পারল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি পা বাড়াল লবির দরজার দিকে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই এলিভেটরের দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেল ও। শুনতে পেল মায়া লরেঞ্জোর পরিচিত কণ্ঠ।

তড়িৎগতিতে উল্টো ঘুরল রেমি। একছুটে চলে এল সিকিউরিটি গার্ডের কাউন্টারের পিছনে। বসে পড়ল মেঝেতে। উঁকি দিয়ে দেখল, এক বডিগার্ডকে নিয়ে গ্যারাজের দিকে ছুটে যাচ্ছে মায়া। গালাগাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে সঙ্গীর।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। ফাঁদে পড়ে গেছে। কাঁচে ঘেরা লবিটায় আড়াল বলতে কিছু নেই। কাউন্টারের পিছন থেকে

বেরুলেই ওকে দেখে ফেলবে শত্রুরা। কোথাও যাবার উপায় নেই ওর।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে, বিএমডব্লিউ-র শূন্য খোপে দাঁড়িয়ে আছে রানা। মাথায় চিন্তার ঝড়। ইতিমধ্যে খালি প্ল্যাটফর্মটা নেমে গেছে নীচে, খোপ থেকে বের করে আনছে মায়ার ফেরারি। এখুনি উঠে আসবে। গাড়িটায় পৌঁছুনোর একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে ও—সেটাই করবে বলে ঠিক করল। পিছিয়ে গেল পায়ে পায়ে, খোপের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে বের করল সেলফোন। ডায়াল করল মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে।

'পেয়েছ?' ফোন ধরেই জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'পেয়ে যাব, চিন্তা কোরো না,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'উপরের খবর বলো।'

'দুঃসংবাদ, বন্ধু, ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরে বসেছ। ডাইনি মায়া তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জমায়েত হয়েছে গ্যারাজের এন্ট্রান্সে। কীভাবে বের হবে বলে ভাবছ?'

'রাস্তা তো ওই একটাই। রেমি কোথায়?'

'লবিতে আটকা পড়েছে। ওকে বের করে আনার কোনও পথ দেখছি না।'

'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। ওকে শুধু বলো রেডি থাকতে। আমাকে দেখামাত্র যেন লবির দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।'

'কী যেন আমাকে বলছ না তুমি,' অভিযোগের সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আস্তিনের ভিতর কোনও জাদু লুকিয়ে রেখেছ?'

হাসল রানা। 'তেমন কিছু না। দেখলেই বুঝতে পারবে। বাই দ্য ওয়ে, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। গোলমাল কমলে সাবধানে কেটে পড়বে, ঠিক আছে? কোথায় আবার দেখা করব,

সেটা ফোনে জানাব।'

'ঠিক হ্যায়। তুমিও সাবধানে থেকো।' লাইন কেটে দিল মুরল্যাণ্ড।

প্ল্যাটফর্ম উঠে আসছে, ফেরারির ছাত দেখতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটে গেল সামনে। খোপের কিনারে পৌঁছে প্রাণপণে ঝাঁপ দিল সামনে। লাফটা নিখুঁত হলো, প্ল্যাটফর্ম আর খোপের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সহজেই পেরিয়ে গেল ও; তারপরেই ঘটল বিপত্তি।

ধড়াম করে ফেরারির বনেটের উপর আছড়ে পড়ল রানা। ব্যালান্স রাখতে পারল না, শরীর গড়িয়ে গেল গাড়ির মসৃণ-ঢালু শরীর বেয়ে। চোখের পলকে প্ল্যাটফর্মের সারফেসে পড়ল, সেখান থেকে দেহটা ছিটকে গেল বাইরে। পাগলের মত দু'হাত ছুঁড়ল রানা, ডান হাতে ঠেকল প্ল্যাটফর্মের কিনার, খামচে ধরল ওটা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়ল শরীর। গ্যারাজের তলা থেকে ষাট ফুট উঁচুতে এখন পেণ্ডুলামের মত দুলছে ও।

টনটন করে উঠল বাইসেপ আর পেক্টোরাল মাসল্। যেন ছ্যাঁকা দেয়া হচ্ছে পেশিতে। শরীরের ওজনের কাছে হার মানতে চাইল... চাইল ছিঁড়ে পড়তে। হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা, জোর করে কয়েক ইঞ্চি তুলে আনল নিজেকে। তারপর বাম হাত তুলে ধরে ফেলল প্ল্যাটফর্মের কিনারা। দু'হাতে ওজন ভাগাভাগি করতে পারায় স্থির হলো শরীর।

অস্থির হলো না রানা। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষা করল একটু। এরপর দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে এল প্ল্যাটফর্মের উপরে। উঠেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁপছে সারা শরীর, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে ও। আরেকটু হলেই...

তড়াক করে উঠে বসল রানা—এখন বিশ্রামের সময় নয়। এগজিট বে-র কাছাকাছি চলে এসেছে প্ল্যাটফর্ম। ত্রস্ত হাতে

পকেট থেকে চাবির রিং বের করল—যেটা রবার্তোকে তল্লাশি করে পেয়েছিল। ফেরারির স্পেয়ার কি আছে ওটায়। দ্রুত দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন।

গাড়ির পুরো কাঠামো মৃদু ঝাঁকি খেলে সামনে তাকাল রানা। এগজিট বে-তে ঢুকে পড়েছে প্ল্যাটফর্ম, থমকে দাঁড়িয়েছে। গুঞ্জন করে দু'পাশে সরে গেল যান্ত্রিক দরজা, দেখা গেল বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাট একটা ভিড়। ভিড়ের সামনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি আর কেউ নয়, মায়া লরেঞ্জো।

রানাকেও দেখতে পেয়েছে মায়া। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল তার। কয়েক মুহূর্ত এক হয়ে থাকল দু'জনের দৃষ্টি। তারপরেই মায়া চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও ওকে!'

হুকুম তামিল করবার জন্য এগিয়ে এল তিন বডিগার্ড, কোটের ভিতর থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, ফেরারির পিছনের দুই চাকা ঘুরতে শুরু করল প্রচণ্ড বেগে, প্ল্যাটফর্মের সারফেসে ঘষা খেয়ে তুলল রাবার পোড়া কালো ধোঁয়া। ব্রেক রিলিজ করতেই ছিটকে সামনে এগোল গাড়িটা।

লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ফেরারির গতিপথ থেকে সরে গেল তিন বডিগার্ড। মায়াও সরে গেছে। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল গাড়ি। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ওটাকে রাস্তায় নামিয়ে আনল রানা। লবির এন্ট্রান্সের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল। ঝুঁকে খুলে ফেলল প্যাসেঞ্জার সাইডের ডোর।

কাঁচের ওপারে রেমিকে দেখতে পাচ্ছে ও। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মেয়েটা। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল পেভমেন্টে। সেখান থেকে প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল গাড়ির ভিতরে।

'দরজা আটকাও,' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'সিটবেল্ট বাঁধো।'

রিয়ারভিউ মিররে তাকাল ও। হৈ চৈ করতে করতে গ্যারাজের এন্ট্রান্স ধরে বেরিয়ে এসেছে মায়া ও তার সঙ্গীরা। পিস্তল তুলে গুলি করল নিরো। ফেরারির রিয়ার-এণ্ডে ঠক করে বিঁধল গুলিটা।

গিয়ার দিয়ে আবারও অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা। ছুট লাগাল ফেরারি।

'ধরো ওকে!' চেঁচাচ্ছে মায়া। 'পালাতে দিয়ো না!'

'কীভাবে?' বোকা বোকা গলায় বলল লুকা। 'আমাদের সঙ্গে কোনও গাড়ি নেই!'

'আছে,' বলল মায়া। গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের পাশে গাড়ির শো-রুমটা চোখে পড়েছে ওর। ট্রাকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে সামনে, আনলোড করছে নতুন গাড়ি। এ-মুহূর্তে হলুদ রঙের একটা *ল্যাম্বোর্গিনি* আর কুচকুচে কালো আরেকটা *পাগানি যোণ্ডা* ঢোকানো হচ্ছে শো-রুমে। 'ওই তো!'

পিস্তল উঁচিয়ে শো-রুমের দিকে ছুটে গেল ওরা। টেনে-হিঁচড়ে গাড়িদুটোর ড্রাইভিং সিট থেকে নামিয়ে আনল শো-রুমের দুই কর্মচারীকে। নিজেরা দখল করল তাদের জায়গা। যোণ্ডায় উঠল মায়া আর নিরো, ল্যাম্বোর্গিনি-তে লুকা এবং তৃতীয় বডিগার্ড... তার নাম স্তেফান।

'তোমাদের মালিককে বোলো, গাড়িদুটো মায়া লরেঞ্জো নিয়ে গেছে,' খোলা জানালা দিয়ে শো-রুমের হতভম্ব কর্মচারীদের উদ্দেশে চেঁচাল মায়া। তারপরেই গিয়ার দিয়ে সবেগে ছুটল ফেরারি যেদিকে গেছে সেইদিকে। তাকে অনুসরণ করল লুকা আর স্তেফানের ল্যাম্বোর্গিনি।

ক্যাফের জানালায় বসে দৃশ্যটা নীরবে প্রত্যক্ষ করল মুরল্যাণ্ড। তারপর নিঃশব্দে উঠে পড়ল ওখান থেকে।

তিন

রিয়ারভিউ মিররে কালো যোগ্তা আর হলুদ ল্যাম্বোর্গিনি-কে উদয় হতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা—বিপদ মোটেও কাটেনি। ওর পিছু নিয়েছে শত্রুপক্ষ। ঝকঝকে দুটো গাড়ি, লাইসেন্স প্লেট নেই; অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না, কোত্থেকে ওগুলো জোগাড় করেছে মায়া। বড্ড একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে, পর পর দু'বার রানাকে হাত ফসকে পালাতে দেবার পাত্রী নয়।

সুবিধামত কোনও জায়গা খুঁজে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যাবে বলে ভেবেছিল রানা, মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে এরপর চলে যাবার ইচ্ছে ছিল মিউনিখের *ইউ-বান* সাবওয়ে-তে। সেখান থেকে পাতাল রেল ধরে যে-কোনও দিকে উধাও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার আধিক্যের কারণে স্পিড তুলতে পারেনি; ফলে শত্রুরা সুযোগ পেয়ে গেছে কাছাকাছি পৌঁছুবার। ও আর রেমি নিরস্ত্র, কাজেই গাড়ি ছেড়ে পদব্রজে কোথাও পৌঁছুবার চেষ্টা করাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। পুলিশের কাছেও যাওয়া চলে না—গ্রেইডেলের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে যা ঘটিয়ে এসেছে, তাতে মোটেই আইনের সহানুভূতি আশা করা যায় না। বরং ওকে ধরতে পারলে সোজা জেলে পুরে দেবে পুলিশ।

'ওহ্ গড!' হঠাৎ বলে উঠল রেমি। 'তুমি তো দেখছি আহত!'

রানার বাম হাতের উপর নজর পড়েছে ওর। শার্ট ছিঁড়ে বানানো ব্যাণ্ডেজে খুব একটা কাজ হয়নি। ক্ষত থেকে চুইয়ে বেরুচ্ছে রক্ত, ভিজে গেছে শার্টের হাতা।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা। উত্তেজনায় আঘাতটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। রেমি মনে করিয়ে দেয়ায় টনটন করে উঠল এখন হাত।

'ও কিছু না,' ব্যথা অগ্রাহ্য করে বলল ও। 'সামান্য ইনজুরি... শীঘ্রি সেরে যাবে।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে গুলি খেয়েছ। আর কোথাও লেগেছে?'

'নাহ্।'

'কী ঘটেছে গ্যারাজে, বলবে আমাকে? সিকিউরিটি ক্যামেরায় মায়ার আরেকটা গাড়ি উল্টে পড়ে থাকতে দেখেছি। কী হয়েছিল?'

'একটু ঝামেলার মধ্যে পড়েছিলাম। গাড়ির ভেতর শুয়ে রবার্তো ওখানে পাহারা দিচ্ছিল।'

'রবার্তো? মানে এস্টেটের সেই বডিগার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

জবাব দিল না রানা। সামনে কিছুটা ফাঁকা হয়ে এসেছে রাস্তা। অ্যাকসেলারেটর চেপে গতি খানিকটা বাড়াল ও। দুটো গাড়িকে ওভারটেক করে চলে গেল সামনে। বাঁয়ে একটা সাইডরোড দেখা যাচ্ছে, টার্ন করল ওখানে। রাস্তার মুখে বড় একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল—*স্টেইনডর্ফস্ট্রাস*। নদীর পার ঘেঁষে এগিয়েছে এই রাস্তা। গাড়ির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গতি আরও বাড়াল রানা। পিছনের গাড়িদুটোর সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে চায়।

'জিয়োলেবটা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সামনের বুটে থাকার কথা,' জানাল রানা।

'যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'এখনও ঠিক করিনি। আগে পিছনের জোঁকদুটোকে খসিয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখব কোথায় যাওয়া যায়।'

শহরের সংকীর্ণ রাস্তা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, বুঝতে পারছে রানা। যানজটের কবলে পড়লে সর্বনাশের বাকি থাকবে না।

নীল রঙের একটা নিয়ন সাইন চোখে পড়ল—তাতে হাইওয়ে ওভারপাসের প্রতীক। তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে: *৯৫।* ওদিকেই অটোবান। দুনিয়ার একমাত্র ফ্রিওয়ে, যেখানে কোনও স্পিড লিমিট নেই। চকিতে রিয়ারভিউ মিরর দেখে নিল রানা—ল্যাম্বোর্গিনি আর যোগ্য যথারীতি লেগে রয়েছে পিছনে। শহরের ভিতরে ওগুলোকে পিছে ফেলা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তবে ফ্রিওয়ে পেলে একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল রানা, রেমির হাতে তুলে দিল। 'ববিকে ফোন করো। বলবে একটা গাড়ি ম্যানেজ করে এদিকে আসতে।'

'ও আমাদের নাগাল পাবে না,' বলল রেমি।

'সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওকে শুধু বলো, আমরা *অটোবান নাইন্টি ফাইভ*-এ উঠছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডায়াল করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেমি। রানা মন দিল ড্রাইভিঙে। সামনে ইন্টারসেকশন। লাল আলো জ্বলে উঠেছে, কিন্তু পরোয়া করল না। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। টায়ার আর অ্যাসফল্টের মাঝে তীব্র আওয়াজ তুলে গাড়িকে নিয়ে গেল বামদিকের রাস্তায়। পিছনে ব্রেক কষার বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা গেল, সঠিক দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছিল, ওটা শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়েছে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য। খেপে গিয়ে

গাড়ির চালক গালাগালের তুবড়ি ছোটাল, তবে রানা তা শুনতে পেল না, কল্পনা করে নিল।

রিয়ারভিউ মিররে আবারও চোখ বোলাল রানা। ইন্টারসেকশনে পৌঁছে গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে ধাওয়াকারীরা, তবে থামেনি। পেভমেন্টের উপরে গাড়ির একপাশের চাকা তুলে দিয়ে তীক্ষ্ণ টার্ন নিয়েছে, তারপর ফিরে এসেছে ড্রাইভিং লেনে। হাল ছাড়ার পাত্রী নয় মায়া। খুব একটা পিছিয়েও পড়েনি।

ফেরারির ফিউয়েল গজ দেখল রানা। আধ ট্যাঙ্ক ফিউয়েল আছে। মায়া সম্ভবত ব্রাসেলস থেকে রওনা হবার আগে ট্যাঙ্ক পুরো করে নিয়েছিল। গজটা দেখামাত্র একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। সময়... স্রেফ সময় ব্যয় করতে হবে ওকে, তা হলেই হারিয়ে দিতে পারবে ধাওয়াকারীদের। পিছনের গাড়িদুটো ডেলিভারি দেয়া হচ্ছিল শো-রুমে, কাজেই ওগুলোর ট্যাঙ্কে খুব ফিউয়েল সামান্যই থাকার কথা। অটোবানে উঠে যদি দৌড় প্রতিযোগিতায় নামানো যায় ওগুলোকে, হাই-স্পিডে রাক্ষসের মত ফিউয়েল খাবে ইঞ্জিনদুটো। ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবে অল্পক্ষণেই। ওই সময়টুকু টিকে থাকতে পারলেই হয়।

সেলফোনে মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা বলছে রেমি। '...রানা ড্রাইভ করছে... আপনি কোথায়? রাস্তায়? থ্যাঙ্ক গড!' রানার দিকে ফিরল ও। 'ববি আমাদের অডি-টা গ্যারাজ থেকে বের করতে পেরেছেন। উনি বের হবার পর পরই ওখানে পুলিশ হাজির হয়েছে। বললেন শো-রুম থেকে দুটো গাড়ি হাইজ্যাক করে আমাদের পিছু নিয়েছে মায়া।'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'আর কিছু?'

'ল্যাম্বোর্গিনিতে দু'জন বডিগার্ড উঠেছে, তৃতীয় বডিগার্ডকে নিয়ে যোগ্যায় উঠেছে মায়া। ওকে খুব খ্যাপা মনে হয়েছে ববির কাছে।'

'স্বাভাবিক,' হালকা গলায় বলল রানা। 'শখের ফেরারি চুরি হয়ে গেলে আমিও খেপতাম।'

সেলফোন আবার কানে ঠেকাল রেমি। মুরল্যাণ্ডকে জানাল, 'আমরা অটোবান নাইন্টি ফাইভে উঠছি।' ওপাশ থেকে প্রশ্ন শুনে পুনরাবৃত্তি করল রানার উদ্দেশে, 'ববি তোমার প্ল্যান জানতে চাইছেন।'

'আপাতত পিঠটান দেব বলে ঠিক করেছি,' বলল রানা। 'ওকে সাউথ অটোবান ধরে এগোতে বলো। পরে আবার যোগাযোগ করব।'

কথা শেষ করেই রাস্তা বদলাল ও। ই-৫৪ হাইওয়ে ধরে ছুটল ফেরারি, এটাই অটোবানে গিয়ে মিশেছে। এদিকটায় প্রচুর গাড়ি, অনেক চেষ্টা করেও আশি মাইলের উপরে স্পিড তুলতে পারল না রানা। যানবাহনের ভিড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল গাড়ি। ওর পাগলাটে ড্রাইভিং দেখে বিরক্ত হলো আশপাশের চালকেরা। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল নানা ধরনের কটূক্তি।

পিছনে ঘন ঘন হর্নের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ক্রমশ জোরালো হচ্ছে সেই আওয়াজ। তারমানে মায়া ও তার সঙ্গীরাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করছে সামনে এগোবার জন্য। ধীরে ধীরে কমছে শিকার ও শিকারির মধ্যকার দূরত্ব।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাটল কয়েক মিনিট, তারপরেই দেখা গেল একটা সাইনবোর্ড—অটোবান-৯৫ আর মাত্র এক কিলোমিটার।

বাঁয়ে অটোবানে ওঠার র‍্যাম্পওয়ে, দ্রুত মোড় নিল রানা, চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যানজট বললে ভুল হয় না, লম্বা এক লাইন পড়েছে অটোবানের প্রবেশপথে। শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে গাড়িগুলো, না থেমে উপায় নেই।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'এখন কী করবে?'

'হোল্ড অন!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা। ঝট্ করে একদিকে ঘোরাল স্টিয়ারিং।

এক লাফে গাড়ির সারির পিছন থেকে বেরিয়ে এল ফেরারি, ডানদিকের দুই চাকা নেমে গেল মাটিতে। প্রায় স্থির হয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ওটাকে ছোটাল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, অন্যান্য গাড়ির আরোহীদের চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। পরোয়া করল না ও।

রাস্তার ধারের মাটি মসৃণ নয়, ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে ফেরারি। সিটবেল্ট চেপে বসল রানা আর রেমির শরীরে। খানিক পরেই অবশ্য কমে গেল ঝাঁকুনি, অটোবানের সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে ওরা। বিশাল এক ট্রাক মোড় ঘুরছে ওখানে, পিছনে নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করছে পরের গাড়িটা। ফাঁকের মধ্যে ফেরারিকে ঢুকিয়ে দিল ও। কোনাকুনিভাবে পার হলো জায়গাটা, তারপর ঘুরতে থাকা ট্রাকের সামনে দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পুরোপুরি সফল হলো না রানা। ব্রেক চেপে ধরেছিল ট্রাকের ড্রাইভার, কিন্তু তারপরেও স্কিড করে ওটা আলতো একটা ঢুস মারল ফেরারির পিছনের কোনায়। লাটিমের মত ঘুরে গেল ফেরারি, চাকা ঘষটে সোজা চলে গেল ফ্রিওয়ের ঠিক মাঝখানে। দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তখুনি ভেসে এল হর্নের বিকট আওয়াজ। মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই চমকে উঠল রানা। একটা এসইউভি ছুটে আসছে রাস্তা ধরে, আঘাত হানতে চলেছে ফেরারির গায়ে।

চিৎকার করে উঠল রেমি। ত্রস্ত হাতে গিয়ার বদলাল রানা, ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়নি বলে। দ্রুত গাড়িকে পিছিয়ে এনে এসইউভি-র পথ থেকে সরে গেল। ব্রেক কষে ওদের ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়াল এসইউভি। দরজা

খুলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল ড্রাইভার।

রানার সেদিকে মনোযোগ নেই। ল্যাম্বোর্গিনি আর যোগুা এসে পড়েছে। ট্রাককে পাশ কাটিয়ে অটোবানে উঠে আসছে গাড়িদুটো। ফেরারির অ্যাকসেলারেটর চাপল ও; এসইউভি এবং ওটার ড্রাইভারকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে এল ড্রাইভিং লেনে। ছুটল পাগলের মত। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে ওর পিছনে চলে এল ল্যাম্বোর্গিনি আর যোগুা। শুরু হলো দৌড় প্রতিযোগিতা। দেখতে দেখতে স্পিডোমিটারের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি চলে গেল কাঁটা। জানালার দু'পাশের দৃশ্য এখন ঘোলা, কিছুই আলাদা করা যাচ্ছে না। তাই বলে বিপদ কাটল না।

মনে মনে ভাগ্যকে গালি দিল রানা। ছোট্ট দুর্ঘটনায় মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে, ওদেরকে নাগালে পেয়ে গেছে ধাওয়াকারী গাড়িদুটো। প্রতিপক্ষের ফিউয়েল খতম করে দেবার যে-প্ল্যান এঁটেছিল, তা মাঠে মারা পড়েছে। ফেরারির তুলনায় ল্যাম্বোর্গিনি বা যোগুা কোনও অংশে কম নয়। পাল্লা দিয়ে ছুটছে ওগুলো। কমিয়ে আনছে শেষ ব্যবধানটুকু। ফিউয়েল শেষ হবার আগেই ধরে ফেলবে ওদেরকে।

কয়েক মিনিট পরেই শুরু হলো গুলিবর্ষণ—রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে ওদের উদ্দেশে ফায়ার ওপেন করেছে প্রতিপক্ষ। ফেরারির রিয়ার-এণ্ডে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধতে শুরু করল একটার পর একটা গুলি, রিয়ার উইণ্ডো আর টেইল-লাইট চুরমার হয়ে গেল, একটা বুলেট রানার মাথার উপর দিয়ে ছাদ ভেদ করে চলে গেল। কিন্তু ও নির্বিকার, গুলি শুধু ফিউয়েল-ট্যাঙ্কে না লাগলেই হলো।

'মাথা নামিয়ে রাখো,' রেমিকে বলল ও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল মেয়েটা।

আরেকটা গুলি ঢুকে পড়ল গাড়ির ভিতরে, সামনের দু'সিটের মাঝখান দিয়ে গেল ওটা, বেরুল ফ্রণ্ট-উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে।

সিটের উপর একটু নিচু হয়ে গেল রানা, শত্রুদের কাছ থেকে টার্গেট-মাস্ ছোট করে আনতে চায়। অবশ্য এই পজিশনও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। চেসিস ভেদ করে ভারী বুলেট চলে আসতে পারে ওর পিঠ পর্যন্ত। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে, ফেরারির টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে শত্রুরা—থামাতে চাইছে ওদের।

পুরোপুরি না হলেও ওদের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হলো। গুলির আঘাত এড়াবার জন্য এঁকে-বেঁকে ছুটছে রানা। কিছুটা হলেও কমে গেছে গতি। ফেরারির পাশে চলে এল ল্যাম্বোর্গিনি। জানালায় লুকার মুখ দেখা গেল, হাতে পিস্তল। রানাকে ইশারা করল গাড়ি থামাতে, নইলে গুলি করবে।

অস্থির হলো না রানা। রেমিকে বলল, 'গ্লাভবক্সটা খোলো। দেখো কী আছে।'

বক্সের ডালা খুলতেই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির। একটা নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে ভিতরে। ওর হতভম্ব গলায় বলল, 'এটা কোত্থেকে এল? তুমি জানতে, এখানে পিস্তল আছে?'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'আন্দাজ করেছি। বিএমডব্লিউ-র গ্লাভবক্সে একটা পিস্তল ছিল... তাই ভাবলাম এখানেও থাকতে পারে। গাড়ির ভিতরে স্পেয়ার ফায়ার-আর্মস রাখাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দাও ওটা আমাকে।'

রানার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে লুকা। পিস্তল তাক করে গুলি চালাল... তবে রানা বা রেমির উদ্দেশে নয়, ফেরারির ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। হুড ফুটো করে ঢুকে গেল পর পর চারটে বুলেট।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশ থেকে ধাক্কা দিল ল্যাম্বোর্গিনিকে। ওটার ড্রাইভার স্তেফানও এদিকে স্টিয়ারিং

ঘুরিয়েছে—পাল্টা ধাক্কা দিল। বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের। বিপরীতমুখী গাড়িগুলোর জানালায় বিস্মিত মুখ দেখতে পেল রানা, অবাক হয়ে কাণ্ডটা দেখছে... পুলিশ-টুলিশে খবর দেবে নিশ্চয়ই।

কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল দুটো গাড়িই, কেউ কাউকে রাস্তা থেকে ঠেলে সরাতে পারছে না। তবে একটু পরেই হার মানতে শুরু করল ফেরারি, শক্তিশালী ল্যাম্বোর্গিনি ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার বাইরে। হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশের গাড়ির উপর থেকে চাপ কমিয়ে আনল রানা, একই সঙ্গে ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে ঠেসে ধরল অ্যাকসেলারেটর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত আগে বাড়ল ফেরারি, চোখের পলকে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। লক্ষ্যস্থির করবার ঝামেলায় গেল না রানা, ঘাড়ও ফেরাল না, শুধু হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল ও—যেখানে উইণ্ডশিল্ড, সেখানটা আন্দাজ করে।

মাকড়সার জাল হয়ে গেল ল্যাম্বোর্গিনির কাঁচ। রানার মনে হলো, অস্পষ্ট একটা আর্তনাদও যেন শুনতে পেয়েছে। তবে বাতাসের গর্জনও হতে পারে। কয়েক মুহূর্ত টলোমলো করল গাড়িটা, তারপর পিছিয়ে পড়ল। পিছোবার সময় বাঁ দিকে সরে গিয়ে ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেলো। রাস্তার কিনারায় উঁচু হয়ে থাকা পাড়ে উঠতে শুরু করল ল্যাম্বোর্গিনি, দৃশ্যটা সাইডভিউ মিররে পরিষ্কার ধরা পড়ল রানার চোখে। পাড়ের কিনারায় এক সেকেণ্ড যেন স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, তারপরেই উল্টে গেল। পতনের বা সংঘর্ষের শব্দটা এতই অস্পষ্ট, কেউ যেন তুড়ি মারল। ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ফেরারি, বিধ্বস্ত গাড়িটা হারিয়ে গেল আয়না থেকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় পিছিয়ে পড়েছিল যোণ্ডা। তবে খুব শীঘ্রি চমক সামলে নিল মায়া, স্পিড বাড়িয়ে চলে এল রানাদের পিছনে। রিয়ার-এণ্ডে গুঁতো খেয়ে কেঁপে উঠল গোটা ফেরারির

চেসিস—পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে টালমাটাল করে দিতে চাইছে মায়া। ডানে-বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আর ব্রেক ব্যবহার করে স্থির রইল রানা। আবার ধাক্কা দেয়া হলো পিছন থেকে, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

'শান্ত থাকো,' রানা বলল। 'ওভাবে কিছুই করতে পারবে না ওরা।'

কার-ফাইটিঙে মায়া একদম আনাড়ি—বুঝতে পারছে ও। নইলে পিছন থেকে গুঁতো মারত না। এই আক্রমণে সামনের গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, দক্ষ ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণও হারায় না সহজে। ওর উচিত ছিল পাশে এসে আঘাত করা, তবে প্রথম গাড়িটার পরিণতি দেখে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়। মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ভড়কে দিতে পেরেছে মায়াকে, এবার আরেকটু কৌশল খাটানো যায়।

স্পিড বাড়াল ও, তারপর আচমকা ডানে কেটে চেপে ধরল ব্রেক। অ্যাসফল্টের উপর টায়ার পিছলানোর শব্দ হলো, অকস্মাৎ থেমে যাচ্ছে ফেরারি। ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পারেনি মায়া, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না... ফেরারিকে পিছনে ফেলে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল সামনে। এবার আবার অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, যোগুার রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায় নিয়ে এল ফেরারিকে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুই গাড়ির জায়গা বদলে গেছে।

স্পিড বাড়িয়ে এগোল রানা, ফ্রন্ট বাম্পারের বাম প্রান্ত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল যোগুার রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায়। হিসেব করা আঘাত—ব্যালান্স পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল গাড়িটার, লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল। একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরতেই মায়া ও তার বডিগার্ডের হতবিহ্বল চেহারা চোখে পড়ল রানার। হাত নেড়ে টা-টা করল ও, বিদায় সম্ভাষণটা ওরা দেখল কি না কে জানে; গাড়িটা তখনও ঘুরছে... একই সঙ্গে পিছলে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে।

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা, পিছনে মায়ার গাড়ি রাস্তার পাশের ঢালে বেকায়দা ভঙ্গিতে উঠে গেল। ল্যাম্বোর্গিনির মত উল্টে গেল না, তবে ভয়ানক এক কাশি দিয়ে নিথর হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'উঠে বসতে পারো,' রেমিকে বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেছে।'

ধীরে ধীরে সিটের উপর সিধে হলো রেমি। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'সত্যি?'

'বিশ্বাস না হলে পিছনে তাকাও।'

এবার হাসি ফুটল রেমির ঠোঁটে। 'ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, জানো? এখন দেখছি সেটা একদমই উচিত হয়নি।'

'আমিও ভয় কম পাইনি,' বলল রানা।

'যাহ্! কী বলছ!'

'সত্যি!'

'তা হলে এতকিছু করলে কী করে?'

'ইনস্টিঙ্কট... আর ট্রেইনিং। আর কিছু না।'

একটা সাইনবোর্ড ভেসে উঠল সামনে—*অস্ফার্ট*... মানে, এগজিট। দু'কিলোমিটার দূরে। লেন বদলাল রানা। খানিক পরেই একটা র‍্যাম্পওয়ে ধরে বেরিয়ে এল অটোবান থেকে। ফ্রিওয়ে-র সমান্তরালভাবে কাঁচা একটা রাস্তা গেছে, সেটা ধরে ফিরতি পথে চলল ও। সেলফোনে যোগাযোগ করল মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে। ঠিক করল রন্দিভু পয়েন্ট।

বিশ মিনিট পর একটা ডাইনারের সামনে পৌঁছুল ফেরারি। মুরল্যাণ্ড আরও আগেই পৌঁছেছে, পার্কিং লটে ওর অডির পাশে গিয়ে থামল রানা। ফেরারিটা এখানেই ফেলে যাবে। সন্দেহ নেই, গাড়িটা ফিরে পাবে মায়া; তবে মেরামতের কাজে মোটা অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যাবে দস্যুরানীর।

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল রানা ও রেমি। অডির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুরল্যাণ্ড। ওদেরকে দেখে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঠাট্টা করল, 'এখনও আস্ত আছ দেখে খুশি হলাম।' তুবড়ে যাওয়া ফেরারির দিকে ইশারা করল। 'গাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে মাইনফিল্ডের মাঝ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছ!'

'মাইনফিল্ড না,' বলল রানা। 'রেসিং ট্র্যাক থেকে এলাম। মজাটা মিস করেছ তুমি।'

'থাক বাবা, অমন মজায় অংশ নেবার ইচ্ছে নেই আমার।' রানার রক্তাক্ত হাত চোখে পড়ল মুরল্যাণ্ডের। 'হাতে কী হয়েছে?'

'সিরিয়াস কিছু না। ভালমত ব্যাণ্ডেজ করে নিলেই চলবে।'

'হুম। যার জন্য এতকিছু, সেটা পেয়েছ তো? নাকি খামোকাই যুদ্ধ করে এলে?'

'দেখাই যাক।'

ফেরারির ফ্রন্ট এণ্ডের দিকে এগোল রানা, খুলে ফেলল হুডের তলার ট্রাঙ্ক। কালো এঁকটা ব্যাগ দেখা গেল, ভিতরে হাত দিয়ে জিয়োলেবটা বের করে আনল ও। শেষ বিকেলের আলোয় চকচক করে উঠল রানার হাতে ধরা ডিভাইসটার ব্রোঞ্জ-শরীর।

'গ্রেট!' হাততালি দিয়ে উঠল রেমি। 'মিশন সাকসেসফুল।'

রানা ওর সঙ্গে একমত হতে পারছে না। জিয়োলেবটা বের করতে গিয়ে ধাতব আওয়াজ পেয়েছে ও, যেন ভিতরের কোনও কম্পোনেন্ট আলগা হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে তুলতেই দেখতে পেল সমস্যাটা। মুখ কালো হয়ে গেল ওর।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

জিয়োলেবটা ওদের দিকে তুলে ধরল রানা। বিশাল একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে। লুকার গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে ডিভাইসটা!

চার

'কী বুঝছ? রিপেয়ার করতে পারবে?' অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। অনবরত পায়চারি করছে ও।

'আগে খুলতে তো দাও,' বলল রানা। 'তার আগে বলি কী করে?' টেবিলের উপরে ঝুঁকে জিয়োলেব ডিজঅ্যাসেম্বল করছে ও আর মুরল্যাণ্ড।

'সরি,' বিব্রত গলায় বলল রেমি। 'আমার আসলে খুব অস্থির লাগছে।'

'শান্ত হয়ে বসো। অস্থির হয়ে লাভ কী? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল টেবিলের অন্যপাশে।

রানা এজেন্সির মিউনিখ শাখার সেফহাউসে উঠেছে ওরা। এজেন্সির ডাক্তার এসে রানার হাতের ক্ষতের ড্রেসিং করেছে, ওষুধ দিয়েছে। বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া শেষে জিয়োলেব নিয়ে বসেছে তিনজনে।

রেমি চেয়ারে বসতেই বেজে উঠল রানার সেলফোন। ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে তিক্ততা ফুটল রানার চেহারায়। অ্যান্থনি গ্যারেটের নাম্বার। কল রিসিভ করে স্পিকার অন্ করল ও।

'ইয়েস?'

'কেমন আছ রানা?' কপট ভদ্রতা প্রকাশ করল গ্যারেট। 'খবর কী তোমাদের? সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'কাজ করে যাচ্ছি। এখনও সুখবর দেবার মত সময় আসেনি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো, মাই ফ্রেণ্ড। আর দু'দিন পরেই নেপলসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমাকে।'

তাড়ার কারণটা এখন জানে রানা। সোমবারে টানেলের এণ্ট্রান্সের দখল পাবে মায়া, এরপর শুরু হবে তল্লাশি। গ্যারেট যদি তার আগেই ওখানে ঢুকতে না পারে, আর কোনোদিনই পারবে না। চিরতরে ছাড়তে হবে মাইডাস চেম্বারের আশা। রানাকে দেবার মত বাড়তি সময় তার হাতে, তারপরেও কোনও রকম প্রতিবাদ না করলে সেটা অস্বাভাবিক দেখাবে।

তাই রানা বলল, 'আরও সময় চাই আমাদের। রোববারের ভিতর কাজ শেষ করা অসম্ভব!'

'অসম্ভবকে সম্ভব করো, রানা,' কড়া গলায় বলল গ্যারেট। 'নইলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের জন্য কবর খুঁড়ে ফেলো।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ হয়ে গেল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, গ্যারেট। রোববারে নেপলসে আসব আমরা। কিন্তু কীভাবে অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেলকে আমাদের হাতে তুলে দেবে? আমার তো মনে হয় না ওদেরকে তুমি ইটালিতে নিয়ে আসছ।'

'বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই তোমার। রোববারে... ওয়াশিংটন সময় বিকেল তিনটায় লিঙ্কন মেমোরিয়ালে কাউকে থাকতে বোলো। ওখানেই পৌঁছে দেয়া হবে বন্দিদের। ফোনে ব্যাপারটা কনফার্ম করে নিতে পারবে তুমি। তখন নেপলসে বাজবে রাত ন'টা। পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতো-য় একটা আউটডোর কনসার্ট চলতে থাকবে। ওখানেই আমার সঙ্গে দেখা করবে

তোমরা—মানে, তুমি, ড. হ্যাডলি আর ববি মুরল্যাণ্ড।'

'উঁহুঁ। শুধু আমি দেখা করব।' বলল রানা।

'গোঁয়ার্তুমি কোরো না, রানা। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে। তোমাদের তিনজনকেই পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতো-য় চাই আমি। শুধু তা-ই নয়, আমাকে প্রমাণও দেখাতে হবে তোমাদের—আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান করতে পেরেছ কি না। তার আগে ছাড়া পাবে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেল হ্যাডলি।'

'আমার দিকটাও ভাবতে হবে তোমাকে,' রানা অনড়। 'কীভাবে বুঝব, ধাঁধার সমাধান পাওয়ামাত্র বেঈমানী করবে না তুমি? বোকার মত সবাই পা দেব তোমার ফাঁদে? অসম্ভব!'

'আমি কথা দিচ্ছি...' বলতে চাইল গ্যারেট।

'তোমার কথার ফুটো-কড়ি দামও দিই না আমি,' রূঢ়ভাবে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

থমকে গেল গ্যারেট। স্পিকারে তাকে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুনল রানা, সম্ভবত রাগ সামলাচ্ছে। খানিক পরে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'বেশ, ববি মুরল্যাণ্ডকে না আনলেও চলবে। কিন্তু তোমাকে আর ড. হ্যাডলিকে আমি চাই, রানা। ঠিক ন'টায়, পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর কনসার্টে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'কিন্তু ওখানে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব কীভাবে?'

'সময়মত ওখানে থেকো, বিস্তারিত নির্দেশ পরে জানতে পারবে।'

'হুম। আজকের ভিডিও কিন্তু এখনও পাইনি আমরা।'

'ইমেইল চেক করো।' বলে লাইন কেটে দিল গ্যারেট।

ল্যাপটপ খুলে ইমেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকল রানা। গত দু'দিনের মতই ভিডিও পাঠিয়েছে গ্যারেট। দুটো ফাইল—একটায়

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, অন্যটায় র‍্যাচেল হ্যাডলির ছবি। কোলের উপর আজকের খবরের কাগজ। গতকালের তুলনায় শীর্ণ দেখাল দু'জনকেই, তবে টর্চার চালানো হয়েছে বলে মনে হলো না। চোখ পিটপিট করে আগের সঙ্কেতটাই দিলেন অ্যাডমিরাল: *এস আর ৯০।*

মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাপটপটা রেমির দিকে ঠেলে দিল রানা। মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'আমাদের সামনে খুব বেশি অপশন দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও তা-ই ভাবছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'মি. রেডক্লিফ বা ল্যারি যদি নতুন কোনও সূত্র দিতে না পারে, গ্যারেটের কথামত কাজ না করে উপায় নেই।'

হতাশা অনুভব করল রানা। মুক্তিপণ বা বন্দি-বিনিময়ের মত জটিল কাজ দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। যে-কোনও মুহূর্তে, যে-কোনও পক্ষ বেঈমানী করে বসতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাহিদা মেটাবার পরেও কিডন্যাপাররা মুক্তি দেয় না বন্দিকে। অপরপক্ষের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসও রাখতে পারে না তারা—মুক্তিপণ দেবার সময় প্রায়ই ফাঁদ পাতা হয় তাদের জন্য। পুরো ব্যাপারটার সাফল্য নির্ভর করে দুই পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের উপর, যেটা গ্যারেট আর ওদের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রানা ভাবতেই পারছে না লোকটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলকে মুক্তি দেবে। বরং শয়তানটা নির্ঘাত কাজ শেষে ওদের তিনজনকে খতম করবার প্ল্যান আঁটছে!

ল্যাপটপের ডালা নামিয়ে রেমি প্রশ্ন করল, 'কী করবে বলে ভাবছ তুমি?'

জোর করে মাথা থেকে দুশ্চিন্তা দূর করল রানা। বলল, 'ওসব নিয়ে পরে ভাবব। আগে হাতের কাজটা শেষ করা যাক।'

জিয়োলেবের দিকে আবার মনোযোগ দিল ও। ডায়ালের এক

পাশে, একদিক থেকে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। মাঝখান বরাবর লাগেনি, এটাই সৌভাগ্য। তা হলে পুরো ডিভাইসটাই দু'টুকরো হয়ে যেত। ক্ষতি তারপরেও অবশ্য কম হয়নি। নবগুলো ঘোরাবার চেষ্টা করেছে রানা, পারেনি। জ্যাম হয়ে গেছে ওগুলো। জিনিসটা নাড়লেই পাওয়া যাচ্ছে ধাতব আওয়াজ—ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ভেঙেছে।

ছোট ছোট স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়েছে জিয়োলেবের আউটার মেটাল ফেস। একে একে সবগুলো স্ক্রু খুলে নিল রানা। সাবধানে কেসিং থেকে তুলে আনল ঢাকনার মত ফেসটা। জিপিএস ট্র্যাকারটা পাওয়া গেল ওটার উল্টোপাশে, সুপার গ্লু দিয়ে আটকানো অবস্থায়। ফেসটা একপাশে রেখে এবার ডিভাইসের অভ্যন্তরে নজর বোলাল ও।

সাতচল্লিশটা গিয়ারের কম্বিনেশনে গড়া ইন্টেরিয়র-টা প্রথম দর্শনে দুর্বোধ্য ঠেকে। তবে দৃশ্যটা নতুন নয় রানার জন্য। কয়েক মাস আগে পুরো ডিভাইসটা টুকরো টুকরো করে ফের জোড়া দিয়েছে ও। ছোট একটা টর্চলাইট নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ডিভাইসের অভ্যন্তর। খুব শীঘ্রি ধরতে পারল সমস্যাটা।

'শিট!' নিজের অজান্তেই বলে উঠল ও।

ওর দিকে ঝুঁকল রেমি। 'অবস্থা কী বেশি খারাপ?'

তিনটা ছোট ছোট গিয়ার খুলে আনল রানা, ওগুলো অক্ষত। তবে গিয়ারগুলো সরাতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ডিভাইসের মেইন ইউনিভার্সাল গিয়ার—পুরো মেকানিজমকে যেটা ঘোরায়। মাউন্টিং থেকে বের করে আনল ওটা, দেখাল দুই সঙ্গীকে।

বুলেট শুধু এই একটা গিয়ারকেই স্পর্শ করেছে। তবে তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। প্রায় এক ডজন দাঁত ভেঙে গেছে চাকাটার শরীর থেকে, পুরো আকৃতিটা বেঁকেও গেছে

বিচ্ছিরিভাবে। এক দেখাতেই বোঝা গেল—এ জিনিস মেরামতের অযোগ্য।

রানার হাত থেকে গিয়ারটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল মুরল্যাণ্ড। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ও, মন্তব্য করল, 'জোড়াতালি দিয়েও এটা ঠিক করা যাবে না। রিপ্লেসমেণ্ট দরকার আমাদের।'

'আরেকটা বানাতে কত সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সূক্ষ্ম কাজ,' বলল রানা। 'সঠিক ইকুইপমেণ্ট পেলেও... অন্তত দু'দিনের কম নয়।'

'দু'দিন! রেডিমেড কিনতে পাওয়া যাবে না?'

'এই রেশিয়ো-র কোনও রেডিমেড গিয়ার তৈরি হয় না,' জানাল মুরল্যাণ্ড। 'নতুন করে বানানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

'ল্যারিকে ফোন করব?' বন্ধুর দিকে পরামর্শের আশায় তাকাল রানা। 'স্পেসিফিকেশন পাঠিয়ে দিলে ও হয়তো নুমার ওঅর্কশপ থেকে দ্রুত একটা বানিয়ে দিতে পারবে।'

'আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা লাভ হবে,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'আমেরিকায় এখন শুক্রবার বিকেল। ল্যারি যদি অলৌকিক কোনও পন্থায় গিয়ারটা দ্রুত বানিয়েও দিতে পারে, ওটা আমাদের হাতে পৌঁছুতে প্রচুর সময় লাগবে। তারপর আবার পার্থেননে গিয়ে পরের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, পরশু হাজির থাকতে হবে নেপলসে... এতকিছু করবার সময় কোথায়?'

ঠোঁট কামড়াল রানা। ঠিক পয়েণ্টই ধরেছে মুরল্যাণ্ড, ওদের হাতে একদমই সময় নেই।

'তারমানে গিয়ারের রিপ্লেসমেণ্ট কোনোভাবেই পাব না আমরা?' মুখ কালো হয়ে গেছে রেমির। 'ইশ্‌শ্‌... আর্কিমিডিসের অরিজিনালটা যদি হাতে পাওয়া যেত!'

মাথার ভিতরে যেন একশো ওয়াটের একটা বাতি দপ করে জ্বলে উঠল রানার। মুখে হাসি ফুটল ওর। রেমিকে বলল, 'কে

বলল অরিজিনালটা হাতে পাওয়া যায় না? অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের কথা ভুলে গেছ? ওটার ভিতরের গিয়ারগুলোর সঙ্গে প্রচুর মিল আছে জিয়োলেবের। বিশেষ করে দুটোরই মেইন গিয়ারের ডাইমেনশন আর স্পেসিফিকেশন হুবহু এক।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কীসের কথা বলছ তোমরা? সেদিন কী এক নেভিগেশন ডিভাইসের কথা শোনালে... সেটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তুমি সিরিয়াস?' বিস্মিত হয়ে বলল রেমি। 'অ্যান্টিকাইথেরার গিয়ার ব্যবহার করতে চাইছ? যেটা অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে? দ্যাটস্ ইনসেইন, রানা! ওই ডিভাইস দু'হাজার বছরের পুরনো। তা ছাড়া সাগরতলের মাটি-কাদায় ক্ষয়ে গিয়ে ওটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'শিপরেকের ভিতরে যেটা পাওয়া গেছে, সেটার কথা বলছি না,' রানা বলল। 'আমি বলছি ওটার রেপ্লিকার কথা। মাউন্টিঙে বসাবার জন্য মেইন গিয়ারে হয়তো সামান্য মডিফিকেশনের প্রয়োজন হবে... কিন্তু ওটার ডায়ামিটার, থিকনেস আর দাঁতের সংখ্যা হুবহু আমাদেরটার মত।'

'তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না,' বলল রেমি। 'ওটাও অ্যাথেন্সের মিউজিয়ামের সম্পত্তি।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি কি ভাবছ ওরা আমাদেরকে অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা ধার দেবে, যাতে জিনিসটা টুকরো টুকরো করে একটা গিয়ার আমরা আমাদের জিয়োলেবে ব্যবহার করতে পারি?'

'এ অসম্ভব,' বলল রেমি। 'প্রতিটা মিউজিয়ামই তাদের আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সরকারি চ্যানেলে

নিয়মমাফিক এগোলেও বছরের পর বছর লেগে যায় একটা আইটেম ধার পেতে। আর আমরা তো সাধারণ মানুষ!'

'তুমি বৈধ উপায়ের কথা বলছ,' বাঁকা সুরে বলল রানা।

কথাটার অর্থ ধরতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল রেমির। তারপরেই ওর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'তুমি ঠাট্টা করছ?'

হা হা করে হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'এতক্ষণে একটা মনের মত কথা বললে, বন্ধু। মিউজিয়াম-ডাকাতি! আমার জন্য এটাই প্রথম। গায়ের লোম তো খাড়া করে দিলে হে!'

'আপনারা পাগল হয়ে যাননি তো?' রেমি হতভম্ব। 'হানা দিতে চাইছেন গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরে? ধরা পড়লে কী ঘটবে, তা ভেবে দেখেছেন?'

'কৌশলে কাজ সারব আমরা, ধরা পড়বার প্রশ্নই ওঠে না,' রানা আশ্বস্ত করল ওকে। 'তা ছাড়া... এর কোনও বিকল্পও নেই। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।'

'তাই বলে চুরি-ডাকাতি? নৈতিকতা বলে একটা কথা আছে না?'

'আমরা তো জিনিসটা কোথাও বিক্রি করব না। কাজ শেষে ফেরত দিয়ে দেব। তুমি আমাদের সঙ্গে আছ কি না বলো।'

মাথা নামিয়ে ফেলল রেমি। ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ রাখল রানার চোখে। হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে উঠেছে ওর চেহারা।

'এইমাত্র আমার বোনকে আমি অস্ত্রের মুখে বন্দি অবস্থায় দেখেছি, রানা,' বলল ও। 'কাজেই চুরিটা করব কি করব না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, কীভাবে সেটা করব?'

পাঁচ

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে আলইটালিয়ার সেভেন ফোর সেভেন জাম্বো জেট, গন্তব্য রোম। বিজনেস ক্লাসের স্টারবোর্ড সাইডে, জানালার পাশের একটা সিটে শরীর এলিয়ে বসে আছে অ্যান্থনি গ্যারেট। দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। এইমাত্র ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শ্যাম্পেন পরিবেশন করে গেছে, আয়েশ করে চুমুক দিল গ্লাসে। তার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে, সেই আনন্দে পান করছে সে। মন ফুরফুরে।

যদিও ঘুম আসছে না, তাও ফুটরেস্ট তুলে এবং ব্যাকরেস্ট ঠেলে সিটের উপর আধশোয়া হয়ে পড়ল গ্যারেট। রোমে পৌঁছুতে এখনও ছ'ঘণ্টা বাকি, একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। দিব্যচোখে মাইডাস চেম্বারের ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। গত বিশ বছর থেকে অতুল ওই ঐশ্বর্যের দখল নেবার স্বপ্ন দেখছে সে। এ শুধু বিত্ত-বৈভবের স্বপ্ন নয়, পৃথিবীর বিরুদ্ধে... সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবারও স্বপ্ন। যারা এতকাল টাকার জোরে দুনিয়া শাসন করে বেড়িয়েছে, তাদেরকে এক ধাক্কায় পথের ফকির বানাবে সে। একদা-ক্ষমতাশালী সেইসব লোকেরা তখন বাধ্য হবে ওর সামনে নতজানু হতে।

গ্যারেটের পাশের সিটে বসে আছে কাটনার, কানে হেডফোন

লাগিয়ে গান শুনছে। বেনসন আর রেনফিল্ড রয়ে গেছে আমেরিকায়—বন্দিদেরকে পাহারা দেবে, সেই সঙ্গে সম্পন্ন করবে তাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে লোক গ্যারেট, পুরো পরিকল্পনা কাউকেই খুলে বলেনি। সবাইকে সবকিছু জানানো ঠিক নয়। এমনকী কাটনারও জানে না ইটালিতে গিয়ে কী করতে হবে তাকে। বিমান থেকে নামার পর জানবে।

অপরাধ জগতে গ্যারেটের মত দক্ষ প্ল্যানার খুব কমই রয়েছে, সেটাই তার সাফল্যের রহস্য। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মাথার ভিতরে রাখে সে, সহকারীরাও সেটার খুঁটিনাটি জানতে পারে না। ফলে ওর উদ্দেশ্য বা কর্মপদ্ধতি ফাঁস হয় না কখনও। কোনও ধরনের সূত্র বা আলামতও রাখে না সে, রাখে না কোনও প্রমাণ। এ-কারণে আজ পর্যন্ত আইন তার নাগাল পায়নি। এবারের অপারেশনের ক্ষেত্রেও তা-ই করতে চলেছে সে।

রোমে পৌঁছুনোর পর *ফ্রেসিয়োরোসা* হাই-স্পিড ট্রেন ধরে নেপলসে যাবে গ্যারেট, সময় লাগবে মোটামুটি এক ঘণ্টা দশ মিনিট। ওখানে পৌঁছুনোর পর ভাড়া করবে গাড়ি, ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার থেকে সংগ্রহ করবে ওভারনাইট সার্ভিসে পাঠানো সরঞ্জাম। ভুয়া নামে জিনিসগুলো পাঠিয়েছে সে, ওগুলো সঙ্গে আনতে গেলে বিপদ হতো—নির্ঘাত অ্যারেস্ট হতো বিমানে চড়বার আগেই।

গত পাঁচ বছরে নেপলসে আসেনি গ্যারেট, তবে শহরটার খুঁটিনাটি ভালই মনে আছে তার। বিশাল এই শহরে চল্লিশ লক্ষ মানুষ বসবাস করে, কাজেই নাম-পরিচয় গোপন রাখলে ওর উপস্থিতি বা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর পাবে না মায়া... যত ভাল কানেকশনই ওর থাকুক না কেন। কীভাবে কী করবে, সব ঠিক করে রেখেছে গ্যারেট। একদিন আগেই পৌঁছে যাচ্ছে গন্তব্যে। রানা আসার আগে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে পারবে।

মাসুদ রানার কথা ভাবতেই চিন্তার একটা রেখা ফুটল গ্যারেটের কপালে। ও কি সফল হবে? বিপজ্জনক লোক এই রানা, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে না। অবশ্য এখন পর্যন্ত উল্টেপাল্টা কিছু ঘটায়নি সে; বরং হাবভাবে মনে হচ্ছে, গ্যারেটের কথামতই কাজ করে চলেছে। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো জিপিএস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে রানাকে লণ্ডন আর মিউনিখে ট্র্যাক করেছে গ্যারেট। ওসব জায়গায় কী ধরনের সূত্র খুঁজছে রানা বা রেমি, জানে না সে। তা নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাচ্ছে না। যা খুশি করুক ওরা, যেখানে খুশি যাক... গ্যারেটের উদ্দেশ্য সফল হলেই চলে।

ব্যর্থতার ভয় যে করছে না গ্যারেট, তা নয়। তবে সেজন্যে একটা ব্যাকআপ প্ল্যান রেখেছে সে—অনাকর্ষণীয়, খুব সাধারণ এক প্ল্যান। রানা আর রেমি যদি আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান করতে না পারে, তা হলে সরাসরি মায়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে গ্যারেট। প্রস্তাব দেবে হাত মেলাবার। জানা কথা মায়া রাজি হবে না, কাজেই ভয় দেখাবে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে গোল্ডেন চেম্বারের খবর ফাঁস করে দেবে বলে। ওটা জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ... সরকার যদি দখল করে নেয়, তা হলে কারও কপালেই কিছু জুটবে না। গ্যারেটের প্রস্তাব তাই মেনে নিতে বাধ্য হবে মায়া। মায়ার সঙ্গে মাইডাসের সোনা ভাগাভাগি করতে ভাল লাগবে না তার... কিন্তু একেবারে কিছু না পাবার চেয়ে তো সেটা ভাল!

নিজের উপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে গ্যারেটের, তবে ও জানে—অপারেশনের সাফল্য একা তার উপর নির্ভর করছে না। নিখুঁত ছকও প্রায়শই তছনছ হয়ে যায় অদক্ষ ও বোকা অনুচরদের কারণে। তাই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে লোক বাছাই করেছে সে। কাটনার আর বেনসন পোড়-খাওয়া অপরাধী। দুর্বলতা যে ওদের

নেই, তা নয়। জাত-জুয়াড়ি কাটনার, ঋণের বোঝা চেপে আছে তার কাঁধে। এটা গ্যারেটের জন্য প্লাস পয়েন্ট। দু'মিলিয়ন ডলার পাবার আশায় জীবন বাজি রাখবে সে। বেনসনের দুর্বলতা মেয়েমানুষ—পতিতাদের পিছনে অকাতরে টাকা ওড়ায় সে। ব্যাটার শরীরে কত ধরনের যৌন রোগ যে বাসা বেঁধেছে কে জানে! তবে কাজের দিক থেকে কাটনার বা বেনসনের জুড়ি নেই। আগেও বহুবার গ্যারেটের সঙ্গী হয়েছে তারা, কখনোই কোনও গোলমাল করেনি।

দুশ্চিন্তা যদি করতেই হয়, তা হলে সেটা করতে হবে রেনফিল্ডকে নিয়ে। এই প্রথম অপরাধ করতে চলেছে সে, যে-কোনও মুহূর্তে নার্ভ হারাতে পারে, ঘটিয়ে বসতে পারে অঘটন। কিন্তু ওকে না নিয়ে উপায়ও ছিল না। অভিজ্ঞ একজন বম্ব-এক্সপার্ট দরকার গ্যারেটের, হাতের কাছে আর কাউকে পায়নি। অসুবিধে নেই, ভাবল গ্যারেট, কাজ শেষ হবার পর রেনফিল্ডকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেই চলবে।

ভবিষ্যতে কাটনার আর বেনসনের ব্যাপারেও হয়তো একই ব্যবস্থা নিতে হবে। উশৃঙ্খল লোক ওরা, দু'মিলিয়ন ডলার ওড়াতে সময় নেবে না। এরপর আবারও টাকার জন্য হাত পাতবে। তবে ততদিনে মহা-ক্ষমতাবান হয়ে যাবে গ্যারেট; কাটনার বা বেনসন যদি ওকে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করে, ওদের মুখ চিরতরে বন্ধ করবার হাজারটা উপায় থাকবে তার হাতে।

দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে গ্যারেট, এতদিনে সে-পরিকল্পনা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। শুরুতে মায়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সে অস্বস্তি নিয়ে। তবে মায়ার সাহায্য ছাড়া আর্কিমিডিসের কোডেক্সের খবর পাওয়া সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না ওটা চুরি করা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল তার, উচিত ছিল দু'জনের মধ্যকার চুক্তিটাকে সম্মান

দেখানো। কিন্তু তা দেখায়নি গ্যারেট। তার পিছনে সঙ্গত কারণও রয়েছে। পুরো লরেঞ্জো পরিবারের উপরেই রয়েছে গ্যারেটের ভয়ানক ক্ষোভ।

ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা যাবার পর লরেঞ্জোদের কাছে আশ্রয় পাবে বলে ভেবেছিল ও। আমেরিকা থেকে যোগাযোগও করেছিল ওদের সঙ্গে। কিন্তু মায়ার বাবা তাতে রাজি হননি। গোঁয়ার টাইপের লোক ছিলেন তিনি, আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি প্রখর। গ্যারেটের বাবার আত্মহত্যাকে তিনি পরিবারের জন্য মস্ত বড় এক সম্মানহানি বলে রায় দিয়েছিলেন। জানিয়ে দিয়েছিলেন, অমন কাপুরুষের ছেলেকে তিনি নিজের পরিবারে ঠাঁই দেবেন না। কিছুতেই তাঁকে টলানো যায়নি। গ্যারেট তাই নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আর সংগ্রামের জন্য তাঁকেই দায়ী করে। মায়ার হয়তো এতে কোনও ভূমিকা ছিল না, তাই বলে লরেঞ্জো পরিবারকে সাহায্য করবার কোনও যুক্তি দেখে না সে। মায়ার বাবা মারা গেছেন বহু বছর আগে, তাতে ক্ষতি নেই। মেয়েই বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

ইদানীং যে ক্যামোরায় মায়া প্রভাব-প্রতিপত্তি আর নেতৃত্ব খর্ব হতে চলেছে, তা জানে গ্যারেট। মাইডাসের গুপ্তধন উদ্ধারের মাধ্যমে হারানো পজিশন পুনরুদ্ধার করতে চাইছে মেয়েটা। কিন্তু সেটা কিছুতেই হতে দেবে না গ্যারেট। এক তোলা সোনাও ওকে দেবে না সে।

এক চুমুকে শ্যাম্পেন শেষ করে চোখ মুদল গ্যারেট। মনে মনে কল্পনা করল মায়া লরেঞ্জোর পতনের দৃশ্য। এতকাল বিত্তশালীর জীবন কাটিয়েছে ওর খালাতো বোন, অভাব-অনটন কাকে বলে, তা জানতেই পারেনি। অথচ কয়েক হাজার মাইল দূরে... গ্যারেটকে প্রতিনিয়ত করতে হয়েছে জীবন-সংগ্রাম। যে ধনী সমাজকে ঘৃণা করে ও, মায়া যেন তারই প্রতীক। ওর

ধ্বংসের মাঝেই লুকিয়ে আছে গ্যারেটের সাফল্য... গ্যারেটের প্রতিশোধ। খুব শীঘ্রি সব হারিয়ে পথে বসবে মায়া, ওর জীবন হয়ে উঠবে অভিশপ্ত।

অবশ্য সেই জীবন স্থায়ীত্ব খুব একটা দীর্ঘ হবে না, মুচকি হেসে ভাবল গ্যারেট। একদা-ক্ষমতাশালী মাফিয়া নেত্রী যখন সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসবে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরাই তখন খতম করে দেবে ওকে।

ছয়

শনিবারের সুন্দর সকাল। বেলা দশটায় দর্শনার্থীদের জন্য অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামের দরজা খুলে যেতেই টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়ল মুরল্যাণ্ড। একাই এসেছে ও। রানা আর রেমি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করবার কাজে ব্যস্ত, ওকে পাঠানো হয়েছে জাদুঘরে রিকনিসান্সের জন্য।

গতকাল রাতেই নুমার জেটে চড়ে মিউনিখ থেকে গ্রিসের রাজধানীতে এসেছে ওরা। উঠেছে একটা হোটেলে। তার আগে থেকেই চলছে আলোচনা—মিউজিয়াম থেকে অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা কীভাবে চুরি করা যায়, সেটা নিয়ে অনবরত মাথা ঘামিয়েছে ওরা।

ইন্টারনেট থেকে জাদুঘরের ব্লু-প্রিন্ট আর অসংখ্য ছবি ডাউনলোড করা হয়েছে। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত

একটা প্ল্যান খাড়া করা হয়েছে, তবে সেটাকে নিখুঁত বলা যাবে না কিছুতেই। ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্য কতখানি অথেনটিক, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু। ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন হবে ওদের।

ঘুরে ঘুরে মিউজিয়ামের ভিতরটা দেখছে মুরল্যাণ্ড। ক্লাসিকাল ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে বিল্ডিংটা। দুটো ওপেন-এয়ার কোর্টইয়ার্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মার্বেল পাথরে মোড়া ডিসপ্লে হলের সারি। অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজম রাখা হয়েছে বিল্ডিঙের পিছনের অংশে, ছোট্ট একটা কামরায়। গোলকধাঁধা-তুল্য দীর্ঘ করিডোর, আর বড় একটা আউটার হল পেরিয়ে পৌঁছুতে হয় ওখানে। সঙ্গে ম্যাপ না থাকলে পথ হারাত মুরল্যাণ্ড নির্ঘাত।

হাঁটতে হাঁটতে ডিজিটাল ক্যামেরায় ক্রমাগত ছবি তুলছে মুরল্যাণ্ড, যেন বোকাসোকা টুরিস্ট... যা দেখছে তাতেই মুগ্ধ হচ্ছে। খেয়াল না করলে বোঝাই যাবে না, আসলে আর্টিফ্যাক্ট বা ডিসপ্লের ছবি তুলছে না ও; তুলছে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন আর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের ছবি। প্রতি কামরাতেই একজন করে অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে, তবে তাদের বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণী। পোড়-খাওয়া কোনও সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট চোখে পড়েনি ওর।

মিউজিয়ামের ভিতরে এয়ার-কণ্ডিশনিং কাজ করছে না, ঘামতে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ড। এই ধরনের তাপে মহামূল্যবান অ্যাটিফ্যাক্টগুলোর ক্ষতি হতে পারে, তা কি জানে না গ্রিক কর্তৃপক্ষ? সিকিউরিটির ব্যাপারেও যথেষ্ট উদাসীন মনে হচ্ছে তাদেরকে। একদিক থেকে সেটা অবশ্য ভাল।

কয়েকটা ডিসপ্লে কেইস পেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড, সেগুলোতে প্রাচীন স্বর্ণালঙ্কার আর ভাঙাচোরা মাটির পাত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সিলিং থেকে নেমে এসেছে তারের কুণ্ডলী, মিশেছে

ডিসপ্লে কেইসগুলোর গায়ে। নিশ্চয়ই ইলেকট্রিসিটি আর অ্যালার্ম সিস্টেমের তার, আন্দাজ করল ও।

পুরো দশ মিনিট পেরিয়ে যাবার পর প্রথম সিকিউরিটি গার্ডের দেখা পেল মুরল্যাণ্ড। ব্লেজার পরা লোকটা সুন্দরী এক অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে খোশগল্পে মশগুল। কোমরে ওয়াকি-টকি ঝুলছে, হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে একটা পিস্তল। রেট্রাক্টেবল কর্ডে বাঁধা চাবির গোছা আটকানো আছে বেল্টের সঙ্গে। চাবিগুলো বিভিন্ন ডিসপ্লে কেইসের। ইমার্জেন্সি দেখা দিলে কেইস খুলে মূল্যবান কালেকশন সরিয়ে নেয়া গার্ডদেরই দায়িত্ব। চট করে লোকটার একটা ছবি তুলে নিল মুরল্যাণ্ড। এরপর পা বাড়াল অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে-র দিকে।

ছোট্ট কামরাটায় ঢুকে একটু হতাশই হলো ও। দর্শনীয় কিছু নয়। কামরার ঠিক মাঝখানে, কাঁচের একটা কেইসের ভিতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে তিন টুকরো ডিভাইসটা—দু'হাজার বছর সাগরের পানিতে পড়ে থাকায় ক্ষয়ে গেছে টুকরোগুলো। কোনোটাই মুরল্যাণ্ডের হাতের মুঠোর চেয়ে বড় নয়। এই ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে কীভাবে রেপ্লিকা তৈরি করা হলো, তা ভেবে অবাক হলো ও। মূল মেকানিজমের ঠিক পাশেই আরেকটা ডিসপ্লে কেইসে রাখা হয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি রেপ্লিকাটা।

প্যাডেস্টাল-সহ কেইসটার উচ্চতা সাত ফুট। উপরের এক ফুট অংশ ধাতব আবরণে ঢাকা, তার তলায় রয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি। কেইসের চারপাশে এক চক্কর ঘুরল মুরল্যাণ্ড। দেখতে পেল বিশেষ ধরনের চাবির ফুটো। রেমির কাছে শুনে এসেছে, সাধারণ চাবি ঢুকবে না ওখানে। গার্ডের কাছে রাখা চাবিতে কাজ হবে, তবে সেটাও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ থেকে মোশন ডিটেক্টর অ্যালার্ম অফ্ করে তারপর ঢোকাতে হয় চাবি। মোচড় দিলেই ডিসপ্লের ফ্রন্ট উইণ্ডো খুলে

হবে, ভিতর থেকে বের করা যাবে ডিভাইসটা। অ্যালার্ম যদি অফ্ না করা হয়, তা হলে চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে মিউজিয়ামের সিকিউরিটি সেন্টারে বেজে উঠবে সতর্কঘণ্টা।

দুই কেসের মাঝখানে, স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে রাখা হয়েছে ডিসপ্লে-বোর্ড। তাতে মূল অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের এক্স-রে ইমেজ শোভা পাচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভিতরের বিভিন্ন গিয়ারের ছবি। সন্দেহ নেই, ইমেজগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে রেপ্লিকাটা।

কামরার ভিতরে নজর বোলাল মুরল্যাণ্ড। একটামাত্র সিকিউরিটি ক্যামেরা চোখে পড়ল ওর—ছাত থেকে ঝুলছে। আরেকটা ক্যামেরা লাগাবার জায়গা আছে, তবে সেটা শূন্য। এর ফলে কামরার একটা অংশ ব্লাইণ্ড স্পটে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে কামরার অনেকগুলো ছবি তুলল ও। ভিতরে আরও কিছু ডিসপ্লে কেইস আছে, ওগুলোর মধ্যকার গ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে রানা। একটা গ্যাপ রয়েছে নিঃসঙ্গ সিকিউরিটি ক্যামেরার ঠিক তলায়।

পাশের কামরায় চলে গেল মুরল্যাণ্ড। এটা বিল্ডিঙের শেষ প্রান্ত। ফায়ার এগজিট লেখা একটা দরজা চোখে পড়ল ওর, সেটা দিয়ে জাদুঘরের উত্তর দিকে বেরিয়ে পড়া যায়। চেয়ার নিয়ে দরজার পাশে বসে আছে একজন সিকিউরিটি গার্ড। ঝিমোচ্ছে। কোমরে ঝুলছে এই উইঙের সমস্ত ডিসপ্লে কেইসের চাবির গোছা। হোলস্টারে যথারীতি পিস্তল। আরেকটা ছবি তুলল ও।

ইন্টেরিয়রের রিকনিসান্স শেষ। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বিল্ডিঙের উত্তর দিকে চলে গেল মুরল্যাণ্ড, ফায়ার এগজিট দিয়ে বেরোলে কোথায় পৌঁছুনো যাবে, তা দেখা দরকার। মার্বেল পাথরে ঢাকা বড় একটা কোর্টইয়ার্ড দেখতে পেল ও, একপাশে ফায়ার এগজিটের দরজা, অন্য পাশটা মিশেছে মিউজিয়ামের

জমির শেষ সীমানায়। সীমানা ঘেঁষে চলে গেছে পাকা রাস্তা। গাছের ছায়ায় ওখানে একটা বাস স্টপ আর ইনফরমেশন বক্স রয়েছে। কোর্টইয়ার্ড আর সাইডওঅকের মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে ছ'ফুট উঁচু ফেন্স, সেই ফেন্স ঘেঁষে পার্ক করে রাখা হয়েছে বেশ কিছু মোটরসাইকেল এবং স্কুটার।

দ্রুত সবকিছুর ছবি তুলে নিল মুরল্যাণ্ড। সন্তুষ্ট হয়েছে মিউজিয়ামের সেটআপ দেখে। পারফেক্ট না হলেও কাছাকাছি তো বটেই। সেলফোন বের করে রিং করল রানাকে।

'কী বুঝলে?' ওকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলতে ভাল লাগছে না,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'কিন্তু আমার ধারণা কাজটা সত্যিই সম্ভব!'

মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা শেষ করে রেমির দিকে ফিরল রানা। 'ববি গ্রিন সিগনাল দিয়েছে। এবার রওনা হওয়া যেতে পারে।'

ইতিমধ্যে পোশাক পাল্টে নিয়েছে ওরা। দু'জনেই শর্টস পরেছে, তার উপরে রানা চড়িয়েছে একটা টি-শার্ট, রেমি পরেছে ট্যাঙ্ক টপ। ওর সুডৌল কাঁধ উন্মুক্ত হয়ে আছে, সেখানে দুটো চায়নিজ হরফের উল্কি দেখল রানা।

'অর্থ কী এর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অ্যাডভেঞ্চার,' ম্লান হাসল রেমি। 'ছোটবেলায় খামারে খুব বোরিং সময় কাটাতাম। স্বপ্ন দেখতাম অ্যাডভেঞ্চারের। সেটাই উল্কি করে রেখেছি। কী কপাল... সত্যিই অ্যাডভেঞ্চারে নামতে হয়েছে এখন।'

'আশা করি শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'চলো বেরোই।'

হোটেলের পার্কিং লটে নেমে এল দু'জনে। অ্যাথেন্সে পৌঁছেই দুটো বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেল ভাড়া করেছে ওরা, যানজট

এড়িয়ে চলাফেরার জন্য গাড়ির চেয়ে মোটরসাইকেল অনেক বেশি কার্যকর। একটা মোটরসাইকেল নিয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড, অন্যটা রয়ে গেছে পার্কিং লটে। সঙ্গে দুটো হেলমেট নিয়ে এসেছে রানা—একটা নিজে পরল, অন্যটা বাড়িয়ে দিল রেমির দিকে। স্টার্ট দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরেই রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

সকালের পুরো সময়টা টেলিফোনে কেটেছে রানার, রেমি ওকে দোভাষী হিসেবে সাহায্য করেছে। টেলিফোন গাইড থেকে নাম্বার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছে দুটো বিশেষ স্টোর, যেখান থেকে পাওয়া যাবে ওদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো।

মোটরসাইকেল চালাচ্ছে রানা, পিছন থেকে ওকে নেভিগেট করল রেমি। বিশ মিনিটে পৌঁছে গেল রাজধানীর উত্তর অংশে। ঘিঞ্জি এলাকা এটা, গলিঘুপচির মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে পাওয়া দায়। পথচারীদের সাহায্য নিল রেমি, খানিক পরেই পুরনো একটা বিল্ডিঙের সামনে নিয়ে গেল রানাকে। বিল্ডিঙের সামনে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ঝলমলে সাইনবোর্ড ঝুলছে, আশপাশের পরিবেশের তুলনায় সেটা বেশ ব্যতিক্রম।

'এটাই,' রানার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল রেমি।

সাইডওঅক ঘেঁষে মোটরসাইকেল থামাল রানা। স্টোরের সামনে নেমে পড়ল রেমি। হেলমেট খুলতেই জলপ্রপাতের মত ওর কাঁধের উপর নেমে এল সোনালি এলোকেশ। একটু ঘেমে গেছে ও, গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস। প্রকট হয়ে উঠেছে সুগঠিত শরীরের আঁকবাঁক। মুগ্ধ চোখে ওকে দেখল রানা।

'অ্যাই! কী দেখছ অমন করে?' চোখ রাঙাল রেমি।

'তোমাকে,' সপ্রতিভ গলায় বলল রানা। 'যা লাগছে না!'

'আমাকে পটাবার চেষ্টা করছ?' ভুরু কোঁচকাল রেমি।

'উঁহুঁ। সতর্ক করতে চাইছি। এমন চেহারা-সুরত নিয়ে স্টোরে ঢুকছ... সেলসম্যান নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে। কিছুতেই ভুলবে না তোমার কথা। মিউজিয়ামের ঘটনার পরে পুলিশ যদি এখানকার কানেকশন খুঁজে পায়, লোকটা তখন তোমার চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারবে।'

'সর্বনাশ! এ-কথা আগে বলোনি কেন? নাহয় চেহারা-সুরত পাল্টে আসতাম!'

'এখনও দেরি হয়ে যায়নি।'

একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে এসেছে রানা, ওটা থেকে একটা মেরিনার্স ক্যাপ বের করে দিল। নিজের চোখ থেকে খুলে দিল সানগ্লাস। খোঁপা বেঁধে ক্যাপ পরে ফেলল রেমি, চোখ ঢাকল সানগ্লাসে।

'ভিতরে ক্যাপ বা সানগ্লাস খুলবে না, ঠিক আছে?' বলে দিল রানা। 'কথাবার্তা কম বলবে। নগদে মেটাবে দাম, আমাদের কোনও ট্র্যাক থাকবে না তাতে। তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবে, আমি বাইরেই অপেক্ষা করছি।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' বলল রেমি। 'আমি যাব আর আসব।'

'স্পেশাল আইটেমটার নাম মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'হ্যাঁ। ফ্লেইমলেস ইলেকট্রিক ইগনিশন স্মোক গ্রেনেড... যেগুলো সিনেমার শুটিঙে ব্যবহার হয়।'

'রাইট। হাফ মিলিয়ন কিউবিক ফুটের মডেলটা কিনবে।'

'দুটো নিয়ে আসব, তাতে চলবে?'

'চলবে। অন্যান্য জিনিসপত্র আগে কিনবে। স্মোক গ্রেনেড কিনবে সবার শেষে... ভাব দেখিয়ো যেন হঠাৎ মনে পড়েছে ওগুলো কেনার কথা।'

'ঠিক আছে। তুমি অপেক্ষা করো। আমি আসছি।' রেমি ঢুকে

গেল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে।

স্ট্যাণ্ডের উপর ভর দিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করালো রানা। সাইডওঅকে শুরু করল পায়চারি। দশ মিনিটের মাথায় ফিরতে দেখল রেমিকে। হাতে একটা বড় শপিং ব্যাগ। কাছে এসে তুলে দিল রানার হাতে।

'কোনও সমস্যা হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাহ্। দেখো সব ঠিক আছে কি না।'

ব্যাগ খুলে ভিতরে নজর বোলাল রানা। দুটো গ্রেনেড দেখা যাচ্ছে। গায়ে লেখা স্পেসিফিকেশন পড়ল—ঠিক জিনিসই এনেছে রেমি। এ ছাড়া এনেছে ইলেকট্রিকাল ওয়ায়্যার, ডাক্ট টেপ আর একটা পেইন্ট গান। কালো একটা ক্যাপ আর সানগ্লাসও দেখা গেল ব্যাগের ভিতরে।

'ওগুলো কেন?' জানতে চাইল ও।

'তোমার জন্য,' বলল রেমি। ইশারা করল নিজের মাথার ক্যাপ আর চোখের সানগ্লাসের দিকে। 'এগুলো তো আমাকে দিয়ে দিয়েছ।'

'থ্যাঙ্কস্।' একটু হাসল রানা। শপিং ব্যাগ থেকে সবকিছু ভরে ফেলল ব্যাকপ্যাকে, রাখল শুধু সানগ্লাসটা। তারপর ব্যাকপ্যাক বাড়িয়ে দিল রেমির দিকে—ওর পিঠে থাকবে ওটা।

স্ট্যাণ্ড থেকে মোটরসাইকেল নামাতেই রেমির চেহারায় গাম্ভীর্য লক্ষ করল ও। 'কী হয়েছে?'

'আমরা কি সত্যিই কাজটা করছি?'

'মিউজিয়ামের ব্যাপারটা? কেন, তোমার সন্দেহ আছে?'

'ধরা পড়লে অন্তত দশ বছর কাটাতে হবে গ্রিসের জেলখানায়—সেটা ভেবে দেখেছ?'

'ভাবব না কেন? কিন্তু আমাদের সামনে তো আর কোনও পথ নেই! তাই চেষ্টা করব যাতে ধরা না পড়ি।'

'তারপরেও... কাজটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ছে না?'

'তা তো পড়ছেই। কিন্তু গ্যারেটের মত উন্মাদকে ঠেকাবার জন্য একটু-আধটু পাগলামি আমাদেরকেও করতে হবে। ভুলে যেয়ো না, শুধু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল ওর হাতে বন্দি নয়; লোকটার হাতে একটা নিউক্লিয়ার বোমাও রয়েছে।'

'ওটা কেন যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বোমা দিয়ে ও কী করবে?'

'সেটা একমাত্র ও-ই জানে। তবে যা-ই করুক, সেটা যে ভাল কিছু হবে না... তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'এমন হতে পারে না, মাইডাস চেম্বার খোঁজার সঙ্গে বোমার কোনও সম্পর্ক নেই? ওটা হয়তো অন্য কোনও কাজের জন্য জোগাড় করেছে গ্যারেট।'

'একসঙ্গে দু'ধরনের কাজে হাত দেবার মানুষ বলে মনে হয়নি তাকে। তা ছাড়া মাইডাসের গুপ্তধন ওর জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আপাতত অন্য কিছুতে ও মনোযোগ দেবে না। আমি শিয়োর, নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান নিয়ে এগোচ্ছে গ্যারেট, সেটারই অংশ ওই বোমা। কিন্তু প্ল্যানটা যে কী, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই আমার।'

'আমরা কোথাও ভুল করছি না তো? এস.আর. ৯০ মানে তো অন্য কিছুও হতে পারে।'

'অন্য কিছু হলে সেটার সঙ্কেত দিতেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তাঁর সঙ্গে বহু বছর থেকে কাজ করছি আমি আর মুরল্যাণ্ড... আমাদের জন্য তাঁর ইশারাই যথেষ্ট। স্ট্রনটিয়ামের কথাই বলেছেন অ্যাডমিরাল, সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'তা হলে আর দেরি করে লাভ কী? চলো দ্বিতীয় দোকানটায় যাই। ওখান থেকে তো রিমোট ইগনাইটার কিনবে তুমি, তাই না?' টুপি খুলে হেলমেট পরল ও।

তারপর ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝুলিয়ে হাত বাড়াল রানার দিকে।

'কী?' একটু অবাক হলো রানা।

'চাবি দাও। এবার আমি চালাব মোটরসাইকেল।'

হার মানল রানা।

সাত

নেপলস নগরীর পশ্চিমে, ভূমধ্যসাগরের পারে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মায়া লরেঞ্জার প্রাসাদোপম ভিলা। আগের মালিকের পুরনো জরাজীর্ণ কেবিন ভেঙে তৈরি করা হয়েছে এই অপূর্ব ইমারত। জানালাগুলো রঙিন কাঁচে মোড়া, মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত লম্বা, সে-কারণে ঘরের ভিতরে অবাধে ঢুকতে পারে আলো-বাতাস। মূল প্রবেশপথে রয়েছে চমৎকার দুটো খিলান, তার উপরে ভর দিয়ে ঝুলছে বিশাল এক খোলামেলা ব্যালকনি, রেলিঙগুলো সবুজ লতায় ছাওয়া। লাল টালিতে ঢাকা ছাতের উপর রাজকীয় ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে দুটো পেঁচানো চিমনি। ভিলার চারপাশে গড়ে তোলা হয়েছে চমৎকার এক বাগান। লাগানো হয়েছে হরেক রকমের ফুল আর ফলের গাছ, তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্য-মণ্ডিত অনেকগুলো পানির ফোয়ারা। সবমিলিয়ে পুরো জায়গাটা হয়ে উঠেছে অসাধারণ এক আভিজাত্যের প্রতীক। এখানে এলে মন ভাল হয়ে যাবে যে-কারও।

কিন্তু আজ মন ভাল হচ্ছে না মায়ার। মাথায় আগুন জ্বলছে

তার। সদর দরজা পেরিয়ে ভিলায় ঢুকতেই দেখতে পেল ফয়েই-এর মাঝখানে টেবিলে রাখা চিনামাটির ফুলদানী, এলোমেলো ভঙ্গিতে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য হারাল সে। ফুলদানীটা তুলে ছুঁড়ে মারল দেয়ালে। বিকট আওয়াজ করে চৌচির হয়ে গেল সেটা। কাঁপতে কাঁপতে এক চাকরানী ছুটে এল চিনামাটির ভাঙা টুকরো পরিষ্কার করবার জন্য। তার দিকে ফিরেও তাকাল না মায়া, গটমট করে দোতলায় উঠে গেল সিঁড়ি ভেঙে, চলে গেল ব্যালকনিতে।

ব্যালকনির চারপাশ তিনফুট উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। কিনারে দাঁড়ালে চোখে পড়ে নেপলস্ নগরীর একাংশ। আরও চোখে পড়ে দিগন্ত-বিস্তৃত ভূমধ্যসাগরের সুনীল পানি। সেদিক থেকে ভেসে আসছে মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। রেলিঙে ভর দিয়ে সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল মায়া, চেষ্টা করল মাথা ঠাণ্ডা করতে। পারল না। উল্টো ঘুরে রেলিং ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ারের গায়ে লাথি মারল সে, উল্টে পড়ল ওটা।

'গর্দভের বাচ্চা গর্দভ, রবার্তো!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল মায়া। 'মরে গিয়ে বেঁচেছে। নইলে আমিই ওকে খুন করতাম।'

মায়ার পিছু পিছু ব্যালকনিতে উঠে এসেছে নিরো। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তাকেই কিছুটা পছন্দ করে মায়া, নিজের অ্যাসিসটেন্ট বানিয়েছে। গায়ের জোরের পাশাপাশি মোটামুটি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তার, অত্যন্ত অনুগত। কাজে-কর্মেও পাকা।

'আপনি কিছু ভাববেন না, বস,' বলল নিরো। 'মাসুদ রানাকে এর মূল্য চুকাতে হবে... আমি কথা দিচ্ছি।'

ওর দিকে ফিরল মায়া। 'গতকাল আমার কত ক্ষতি হয়ে গেছে, তা তুমি জানো, নিরো? তিন লাখ ইউরো খরচ হবে ফেরারি আর যোগুার রিপেয়ারে; ল্যাম্বোর্গিনিটা গেছে... দাম মেটাতে হবে ওটার। ধ্বংস হয়েছে বিএমডব্লিউ-টাও।'

'তিনজন লোকও হারিয়েছি আমরা,' মনে করিয়ে দিল নিরো। রবার্তো মারা গেছে গ্রেইডেলের গ্যারাজে, আর স্তেফান মারা গেছে রানার গুলি খেয়ে। লুকাও পটল তুলেছে—উল্টে যাবার পর ল্যাম্বোর্গিনিতে আগুন ধরে গিয়েছিল... বেরোতে পারেনি।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' সখেদে বলল মায়া। 'আরও তিনটা পরিবারের বোঝা চাপল আমার কাঁধে।' দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের দেখাশোনা করে সে। ভালমানুষি নয়, এটা আসলে আনুগত্য কেনার কৌশল।

অটোবানে রানার হাতে নাকানি-চোবানি খাওয়ার পরে লেজ দাবিয়ে পালিয়ে এসেছে মায়া। পুলিশ তাকে খোঁজাখুঁজি করবার আগেই। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান্স ডিয়েটজ্-এর অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। শো-রুমে ল্যাম্বোর্গিনি আর যোণ্ডার দাম পরিশোধের পাশাপাশি যেখানে যত ঘুষ দিতে হয় সব দেবে। ধামাচাপা দেবে পুরো ঘটনা। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ম্যানেজ করে ফেলেছে ডিয়েটজ্, উদ্ধার করেছে গুলিতে ক্ষতবিক্ষত ফেরারি-টাও। ফোন করে জানিয়েছে যোণ্ডা আর ফেরারির মেরামত-খরচ। ল্যাম্বোর্গিনির ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগুন লেগে ওটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

এতসব দুঃসংবাদের মধ্যে সুসংবাদ কেবল একটা—স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিংটার সমস্ত ফর্মালিটি শেষ, মায়া এখন ওটার আইনগত মালিক। তবে সোমবারের আগে ডেমোলিশনের কাজ শুরু করা যাবে না। হেভি ইকুইপমেন্ট দরকার কাজটার জন্য, উইকএণ্ডে সেগুলো জোগাড় করা সম্ভব নয়।

দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? ভাবল মায়া। মাসুদ রানাকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে সে। ব্রোঞ্জের তৈরি অদ্ভুত ওই ডিভাইসের জন্য মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে লোকটা। কিন্তু কেন?

ইংল্যাণ্ডের এস্টেট থেকে মায়ার মোমফলকও চুরি করেছে সে। নিশ্চয়ই ওগুলোর সাহায্যে মাইডাসের চেম্বার খুঁজে পাবে বলে ভাবছে। সত্যিই কি পাবে?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যেখানে যা-ই করুক, গুপ্তধন উদ্ধার করবার জন্য নেপলসে আসতে হবে রানা ও গ্যারেটকে। মায়ার শহরে... মায়ার রাজ্যে! এখানেই প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব ওদের বিরুদ্ধে।

নিরোর দিকে তাকাল মায়া। 'এয়ারপোর্ট আর রেল স্টেশনে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছ?'

'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের লোক থাকছে,' বলল নিরো। 'মাসুদ রানা, রেমি হ্যাডলি, ববি মুরল্যাণ্ড বা অ্যান্থনি গ্যারেট... ওদের কারও পক্ষেই আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নেপলসে ঢোকা সম্ভব হবে না।'

ওর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হতে পারল না মায়া। গ্যারেট অত্যন্ত ধুরন্ধর, নেপলসে ঢোকার সময় নিশ্চয়ই নাম-পরিচয় আর চেহারা পাল্টে ফেলবে। মাসুদ রানাও ইতিমধ্যে নিজেকে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণ করেছে, সময়ের অভাবে তার ব্যাপারে এখনও খোঁজ নিতে পারেনি মায়া, কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার—তাকেও অবহেলা করা চলবে না কিছুতেই।

'শহরের সব হোটেলেও লোক লাগাও,' নিরোকে বলল মায়া। 'চোখ-কান খোলা রাখতে বলবে সবাইকে। অস্বাভাবিক কাউকে দেখলেই যেন রিপোর্ট করে।'

'যদি ওদের কাউকে স্পট করতে পারি, তা হলে কী করব?' জানতে চাইল নিরো।

'আপাতত সোনার চেম্বারটাকে প্রোটেক্ট করাই আমাদের প্রধান প্রায়োরিটি,' বলল মায়া। সঙ্গী-সাথীদের মাঝে একমাত্র নিরোই জানে আসলে কী খুঁজছে মায়া।

'তারমানে কি দেখামাত্র ওদেরকে খুন করব না?'

দ্বিধায় ভুগল মায়া। রানা ও তার সঙ্গীদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ। কেউ এ নিয়ে মাতামাতিও করবে না। ইটালিয়ান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিশাল একটা অংশ তার কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়। কিন্তু তারপরেও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ও। মাইডাস চেম্বারের খোঁজে বিকল্প পথে এগোচ্ছে গ্যারেট আর রানা। ওদের কাছে মূল্যবান সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওর জন্যেও সহজ হবে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া। কোনোকিছু না জেনে ওদেরকে খুন করলে নিজেরই ক্ষতি হতে পারে।

'না, একেবারে বাধ্য না হলে খুন কোরো না ওদের,' ইতস্তত করে বলল মায়া। 'চেষ্টা করবে জ্যান্ত ধরার। আর যা-ই ঘটুক, এবার যেন ওরা কিছুতেই পালাতে না পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, বস,' মাথা ঝাঁকাল নিরো। 'কিন্তু কেন ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন, জানতে পারি?'

'আমার কাছ থেকে মস্ত ঝুঁকি নিয়ে মোমফলক আর ব্রোঞ্জের ডিভাইসটা চুরি করেছে রানা। জানা দরকার, ওগুলোকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খোঁজ নিলে কেমন হয়? আমি যখন ববি মুরল্যাণ্ডকে তুলে আনতে গেলাম, তখন ড. ফিলবির সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছিল ও... বেশ অনেকটা সময় ধরে।'

'ফিলবির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল মায়া। 'মুরল্যাণ্ড একটা পুরনো কোডেক্সের পাতা ফটোকপি করে নিয়ে গিয়েছিল, ও সেটা ডিসাইফার করতে পারেনি।'

'কোডেক্সের সঙ্গে ব্রোঞ্জের ডিভাইসের সম্পর্ক থাকতে পারে,' আন্দাজ করল নিরো। 'রানা হয়তো সে-কারণেই ওটা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। ফিলবি এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না, তা আমার

বিশ্বাস হচ্ছে না। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে তা হলে কী নিয়ে কথা বলেছে সে?'

কপালে ভাঁজ পড়ল মায়ার। নিরোর কথায় যুক্তি আছে। রাগ কিছুটা কমতে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন আবার রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়। বুড়ো ফিলবি কি তা হলে কিছু গোপন করেছে ওর কাছে? রাগী চোখে তাকাল নিরোর দিকে। 'ফিলবিকে ফোন করো। এক্ষুণি!'

কয়েক মিনিট পরেই যোগাযোগ হলো ব্রিটিশ আর্কিয়োলজিস্টের সঙ্গে। 'বস কথা বলবেন,' বলে রিসিভার মায়ার হাতে তুলে দিল নিরো।

'গুড আফটারনুন, মিস লরেঞ্জো!' অভিবাদন জানালেন ফিলবি।

'নিকুচি করি তোমার আফটারনুনের!' খেঁকিয়ে উঠল মায়া। 'ববি মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে সব কথা বলোনি তুমি আমাকে। কেন?'

'কী বলছেন এসব? বলিনি মানে? যা যা ঘটেছে তার সবই তো...'

'চুপ করো! বাজে কথা একদম বলবে না। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে তোমার আলোচনার বিস্তারিত জানতে চাই আমি। জলদি বলো! নইলে তোমার এমন দশা করা হবে...'

'প্লিজ, প্লিজ, শান্ত হোন,' ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বললেন ফিলবি। 'বলছি এখুনি। মি. মুরল্যাণ্ডকে পার্থেননের ওয়েস্ট পেডিমেন্টের দুটো মূর্তির বিষয়ে খুবই আগ্রহী মনে হয়েছে আমার কাছে—হেরাক্লিস আর আফ্রোদিতি। আমার সঙ্গে ওগুলো নিয়েই কথা বলেছেন ভদ্রলোক। বিলিভ মি... ফলপ্রসূ আলোচনা ছিল না ওটা। সেজন্যেই আপনাকে ডিটেইলস্ জানিয়ে বিরক্ত করিনি।'

'ন্যাকা সেজো না। মূর্তিদুটোর বৈশিষ্ট্য কী?'

'তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তবে কোডেক্সের একটা ধাঁধার

ভিতরে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ওগুলোর উল্লেখ আছে। আমি ধাঁধাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'হুম! মুরল্যাণ্ড কি পরে তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেছে? বা মিউজিয়ামে এসেছিল?'

'না তো! তেমন কিছু ঘটলে তো আমিই খবর দিতাম আপনাকে।'

'তা হলে কি ধরে নেব ধাঁধাটার সমাধান করে ফেলেছে সে?'

'মনে হয় না। কোডেক্সে বলা হয়েছে, ধাঁধার সমাধান করতে হলে পার্থেননে যেতে হবে।'

'পার্থেনন? হুম! ধন্যবাদ, ডক্টর। ভাল একটা সূত্র দিলে আমাকে। তবে অনেক দেরিতে।'

'ক্ষমা করবেন, আমি ইচ্ছে করে কিছু লুকাইনি।'

'বেশ, এবারকার মত মাফ করছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এ-ধরনের ভুল করলে কঠিন শাস্তি পাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'আর ভুল হবে না। কথা দিলাম।'

'গুড।' রিসিভার নামিয়ে রেখে চিন্তায় ডুবে গেল মায়া। ধাঁধার কথা বলল ফিলবি... কীসের ধাঁধা? মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজে পাবার কোনও সূত্র? সেটা তো ওরও দরকার! ঘড়ি দেখল ও, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে মিউনিখের ঘটনার পর। ব্রোঞ্জের ডিভাইস হাতে পেয়ে গেছে রানা, এরই মধ্যে ওরা পার্থেননে গিয়ে ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে কি না কে জানে।

আনমনে মাথা নাড়ল মায়া। না, এখুনি হতাশ হবার কোনও মানে হয় না। পার্থেননে এখনও হয়তো পৌঁছায়নি রানা। ওখানে ফাঁদ পাততে দোষ কোথায়?

'টমি আর অ্যান্টোনিয়োকে খবর দাও,' নিরোকে বলল ও। 'আজ রাতেই যেন অ্যাথেন্সে চলে যায়। ওরা তো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, ববি মুরল্যাণ্ডকে দেখলেই

চিনতে পারবে। রানা আর রেমি হ্যাডলিও থাকবে ওর সঙ্গে। আমার ধারণা, ওরা তিনজনেই এখন অ্যাথেন্সে।'

'তা হলে আমিও যাই,' প্রস্তাব দিল নিরো। 'ওদের সবাইকে আমি চিনি। আমি গেলে সুবিধে হবে।'

'না, তোমাকে এখানে আমার প্রয়োজন,' মাথা নাড়ল মায়া। 'রানা তো বটেই, গ্যারেটেরও নেপলসে আসার কথা। এখানে ওদের জন্য *বিশেষ* আয়োজন রাখতে হবে আমাদের।'

'বেশ, আপনি যা বলেন,' মাথা ঝাঁকাল নিরো। 'কিন্তু অ্যাথেন্সে গিয়ে টমি আর অ্যান্টোনিয়ো কী করবে?'

'পার্থেননে বসে থাকবে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের ওখানে যাবার কথা। মুরল্যাণ্ডকে তো ওরা চেনে, বাকি দু'জনের ছবিও জোগাড় করে দাও ওদেরকে।'

'আর যদি ওখানে তিনজনকেই পেয়ে যায়?'

ঠোঁট কামড়াল মায়া। বুঝতে পারছে, তিন-তিনজন বন্দিকে গ্রিস থেকে ইটালিতে আনা একটু কঠিন হয়ে পড়বে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। জানিয়ে দিল নিজের সিদ্ধান্ত।

'সবাইকে প্রয়োজন নেই আমার। শুধু রানাকে ধরে আনবে। আর খুন করবে মুরল্যাণ্ড-রেমিকে।'

আট

বেলা পৌনে তিনটা। আর পনেরো মিনিট পরেই বন্ধ হয়ে যাবে মিউজিয়াম, তাই দর্শনার্থীরা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে

বিল্ডিঙের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের দিকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না রানা বা রেমি। টিকেট কেটে আলাদাভাবে মিউজিয়ামে ঢুকেছে ওরা। ঘুরে বেড়াচ্ছে একের পর এক এগজিবিশন রুমে।

কলারঅলা একটা শার্ট পরেছে রানা, সেইসঙ্গে জিন্স। কাঁধে ঝুলিয়েছে ব্যাকপ্যাক। ইয়ারপিস কানে গোঁজা, মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে সেলফোনের ওপেন কানেকশনে কথা বলছে খানিক পর পর; সে এখন ফায়ার এগজিটের কাছাকাছি পার্ক করা মোটর-সাইকেলগুলোর পাশে অপেক্ষা করছে।

'তুমি রেডি?' ফোনে জানতে চাইল রানা।

'বাস স্টপে সামান্য ভিড় আছে, নইলে কোনও সমস্যা নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'ঝামেলার আভাস পেলে আমাকে জানিয়ো।'

'নিশ্চয়ই!'

রেমির দেয়া টুপিটা পরে ফেলল রানা। কার্নিশটা একটু নামিয়ে রাখল, যাতে ছাত থেকে ঝুলতে থাকা ক্যামেরায় ওর চেহারা ঠিকমত দেখা না যায়। এরপর পা বাড়াল অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে-র দিকে। ছবিতে আগেই দেখেছে, তবু সামনাসামনি রেপ্লিকাটা দেখে স্বস্তি অনুভব করল। জিয়োলেবের সঙ্গে আকার-আয়তনে হুবহু মিলে যাচ্ছে ওটা।

আশপাশে নজর বোলাল রানা। কামরায় কোনও টুরিস্ট নেই। কামরার অ্যাটেনডেন্ট কানে সেলফোন ঠেকিয়ে কার সঙ্গে যেন আলাপে মগ্ন। গদগদ চেহারা আর মধুকণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে কথা বলছে সে। আর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। চমৎকার... এ-ই তো চাই!

কামরার একমাত্র সিকিউরিটি ক্যামেরার তলায় চলে গেল রানা। পজিশন নিল একটা ডিসপ্লে কেইস আর পিলারের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়। জুতোর ফিতা বাঁধার ভঙ্গিতে নিচু

হলো ও, পরক্ষণে ঝটপট ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে আনল ডাক্ট টেপে মোড়া ছোট একটা প্যাকেট। স্মোক গ্রেনেড, ইলেকট্রিকাল ওয়ায়্যার, আর ইগনাইটারের রিসিভার মিলিয়ে রিমোট কন্ট্রোল একটা বোমা বানিয়েছে ও আর মুরল্যাণ্ড, সেটাই রয়েছে প্যাকেটের ভিতরে। জিনিসটা রেখে দিল ডিসপ্লে কেইসের পিছনে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

পরের কয়েকটা মিনিট অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজম আর রেপ্লিকার ডিসপ্লের চারপাশে ঘুরল ও। ভান করল কেইসের গায়ে লাগানো ইনফরমেশন কার্ড পড়বার। সেই সুযোগে দেখে নিল চাবির ফুটোটা। এরপর চলে গেল পাশের কামরায়। ফায়ার এগজিট দেখল... দেখল এগজিটের পাহারায় থাকা গার্ডকেও। দুনিয়ার প্রতি তিতিবিরক্ত এক লোক, চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। চাবির গোছা ঝুলছে তার কোমরে। ওটা হাতিয়ে নিতে কষ্ট হবে না।

অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের ডিসপ্লে থেকে একশো ফুট দূরে রয়েছে প্রাচীন সমাধিফলক আর ভাস্কর্যের এগজিবিশন গ্যালারি। ওখানে পৌঁছুতেই রেমিকে দেখতে পেল রানা—পুরনো একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল। ওর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ওটাই চূড়ান্ত সঙ্কেত। মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল রেমি।

মিউজিয়ামের ভিতরের বসানো সবক'টা ফায়ার অ্যালার্মের লোকেশন নোট করে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড। তার একটা রয়েছে এই গ্যালারির ভিতরে। অ্যালার্মের কাছাকাছি মাঝবয়েসী কয়েকজন টুরিস্ট কথা বলছে গাইডের সঙ্গে। ওদেরকে পাশ কাটানোর ছলে দেয়ালের কাছে চলে গেল রেমি, আলতো করে টেনে দিল ফায়ার অ্যালার্মের লিভার।

সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী আওয়াজে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

সিলিঙে লাগানো মাইক থেকে আসছে আওয়াজ, সবার চোখ ঘুরে গেল সেদিকে; রেমির দিকে তাকাল না কেউ। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুরু হলো হৈ-হল্লা আর টুরিস্টদের আতঙ্কিত চিৎকার।

গ্যালারির দু'প্রান্ত থেকে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে কয়েকজন অ্যাটেনডেন্ট আর গার্ডকে ছুটে আসতে দেখল রানা—কী হয়েছে খোঁজ নিতে আসছে। মিউজিয়ামের মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট আর আর্টওঅর্কের জন্য আগুন ভয়ানক এক হুমকি, কিন্তু স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম অটোমেটিক মোডে রাখা হয়নি—একেবারে অনন্যোপায় না হলে ভিতরে পানি ছিটাতে চায় না জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। পানির স্পর্শে সমস্ত এগজিবিটের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। নিশ্চিন্ত মনে পকেটে রাখা রিমোট ইগনাইটারের বাটন চাপল রানা।

দুপ্ করে মৃদু বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের কামরা থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে এল কালো ধোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে নরক ভেঙে পড়ল মিউজিয়ামের ভিতরে। চেঁচামেচি বেড়ে গেল কয়েক গুণ, পাগলের মত ছুটতে শুরু করল দর্শনার্থীরা। তাদের স্রোতের মাঝে আটকা পড়ল সিকিউরিটি গার্ড আর অ্যাটেনডেন্টরা, ঘটনাস্থলের দিকে এগোতে পারছে না।

আর দেরি করল না রানা, উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। গোলমালের সুযোগটা কাজে লাগাবে... চুরি করবে রেপ্লিকা। রেমিকে নিয়ে চিন্তা নেই, টুরিস্টদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারবে ও।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে কামরার প্রবেশপথে পৌঁছে গেল রানা। যা ভেবেছিল তা-ই, ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে ভিতরের অ্যাটেনডেন্ট। বাইরে বেরুনোর চেষ্টা না করে ভিতরেই কাশছে খক খক করে, অথচ গ্রেনেড যে-ধোঁয়া তৈরি করেছে, সেটা মোটেই বিষাক্ত নয়।

ব্যাকপ্যাক থেকে পেইন্ট গান বের করে সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে কয়েকবার ফায়ার করল রানা। লেন্স ঢেকে দিল কালো রঙে। গানটা আবার ব্যাগে ভরে ফেলল, চলে গেল পাশের কামরায়।

ফায়ার এগজিটের সামনে হতভম্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। চেহারায় ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব। জরুরি পরিস্থিতিতে আটকা পড়া লোকজনকে দরজা খুলে বের করে দেয়া তার দায়িত্ব, কিন্তু এখনও কেউ আসেনি এদিকে। ভিজিটিং আওয়ারের শেষদিকে বলে সমস্ত দর্শনার্থী মিউজিয়ামের সামনের দিকে চলে গিয়েছিল, ওখান দিয়েই বের হচ্ছে তারা। এগজিটের সামনে একা রয়ে গেছে লোকটা। বোধহয় ভাবছে অনর্থক প্রাণের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে।

'এখানে একজন আটকা পড়েছে,' গার্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'প্লিজ, জলদি আসুন!'

দ্বিধা কেটে গেল লোকটার। তড়িঘড়ি করে ছুটে এল। তাকে নিয়ে অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের কামরায় ঢুকল রানা। ভিতরে ঢুকেই প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল তার ঘাড়ে। মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে। পকেট নাইফ বের করে তার কোমরের রিট্র্যাক্টেবল কর্ড কেটে ফেলল, নিয়ে নিল চাবির রিং। অ্যাটেনডেন্ট এখনও কাশছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে কামরা, রানাকে দেখতে পাবে না সে। ধোঁয়ায় কোনও ক্ষতিও হবে না তার, একটু পরে নিজে থেকেই বেরিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে।

হাতড়ে হাতড়ে রেপ্লিকার কেইসের কাছে চলে গেল রানা। গোছা থেকে সঠিক চাবিটা খুঁজে নিতে গিয়ে পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট। খানিক পরে সঠিক চাবিটা কি-হোলে ঢুকিয়ে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে বেজে উঠল দ্বিতীয়

অ্যালার্ম—এটা মোশন ডিটেক্টরের। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই ওর, নরকতাণ্ডব বেধে গেছে মিউজিয়ামে। সিকিউরিটির লোকজন এ-পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় নেবে।

চাবিতে মোচড় দিতেই খুলে গেল কেইসের উইণ্ডো। ভিতরে হাত ঢোকাতে যাবে রানা, এমন সময় পিছনে শোনা গেল অপরিচিত গলা।

'থামুন, মিস্টার! খবরদার, কোনও চালাকি নয়!'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল রানা। ইউনিফর্ম পরা অ্যাটেনডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে ওর কয়েক ফুট পিছনে। হাতে পিস্তল, তাক করে রেখেছে ওর দিকে। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। নিশ্চয়ই কামরা থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিল সে, পথে পেয়ে গেছে অজ্ঞান গার্ডকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কেটে গেছে তার, বুঝে ফেলেছে আসল ঘটনা। খুঁজে বের করেছে রানাকে। ওকে ঠেকাবার জন্য নিয়ে এসেছে গার্ডের পিস্তল।

কথা বলতে যাওয়া বৃথা, বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। অ্যাটেনডেন্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপ দিল ও, লোকটাকে জাপটে ধরে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

বেকায়দায় পড়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট, পিস্তলটা আটকা পড়ে গেছে দু'জনের দেহের মাঝখানে—ব্যবহার করা যাচ্ছে না, আবার ফেলে দেবারও সাহস পাচ্ছে না। এক হাতে রানাকে জাপটে ধরতে চাইল সে, কিন্তু সফল হলো না। প্রতিপক্ষের সুটের সামনের অংশ খামচে ধরল রানা, ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে; চেষ্টা করল মাথাটা মেঝেতে বাড়ি খাওয়াতে। পা দিয়ে পেঁচিয়ে ওকে শরীরের উপর থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল অ্যাটেনডেন্ট। কিন্তু মুঠোটা ছাড়ল না ও, কাত হবার সময়ও শত্রুকে ধরে রাখল দেহের সঙ্গে, কিছুতেই অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ

দেবে না।

বিচিত্র ভঙ্গিতে লড়ে চলল দুজনে—হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে... কখনও এ ওর উপরে, কখনও ও এর উপরে, কখনও বা পাশাপাশি জড়িয়ে ধরে রেখেছে একে অন্যকে। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। উপায়ান্তর না দেখে কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল রানা লোকটার নাকে। নাক থেঁতলে গেল অ্যাটেনডেন্টের, কাতরে উঠল সে। স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের বশে রানাকে ছেড়ে দিয়ে আহত মুখ ঢাকতে চাইল সে দু'হাতে। হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ল তার পিস্তল।

তাকে আর সুযোগ দিল না রানা। চিত হয়ে পড়া শরীরটার উপর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে পড়ল ও, হাঁটু দিয়ে আটকে ফেলল হাতদুটো। তারপর ইস্পাতকঠিন দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরল ও। চাইলে শ্বাসনালী ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু তা করল না ও, শুধু হালকা চাপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করল। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাটেনডেন্টের, কয়েক দফা মোচড়ামুচড়ি করে জ্ঞান হারাল। হাঁপাতে হাঁপাতে তার উপর থেকে সরে গেল রানা। বিরাট এক ফাঁড়া কেটেছে। লোকটা অস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ হলে খবর ছিল।

গ্যালারির দিক থেকে ভেসে আসছে পায়ের আওয়াজ। ভিড় ঠেলে এপাশে চলে এসেছে অন্যান্য অ্যাটেনডেন্ট আর সিকিউরিটির লোকেরা। দ্রুত হাত চালাল রানা। ডিসপ্লে কেইস থেকে রেপ্লিকাটা বের করে ঢুকিয়ে ফেলল ব্যাকপ্যাকে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে ফায়ার এগজিট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বিকেলের উজ্জ্বল রোদ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। দৃষ্টি একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ডকে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। বাস স্টপে কেউ নেই। তামাশা দেখবার জন্য সবাই চলে গেছে মিউজিয়ামের সামনের দিকে।

ছুট লাগাল রানা। মিউজিয়ামের ফেন্স টপকে চলে গেল মোটরসাইকেলের কাছে। মুরল্যাণ্ড জানতে চাইল, 'কাজ হয়েছে?'

'নইলে এভাবে ছুট লাগাই?' এক লাফে মোটরসাইকেলে চড়ে বসল রানা।

মুরল্যাণ্ডও নিজেরটায় চড়ল। 'কোনও ঝামেলা হয়নি তো? তোমার তো কোনও কিছুই প্ল্যান মোতাবেক এগোয় না।'

'এবার তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'জনৈক অ্যাটেনডেন্ট অতি-উৎসাহী হয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি।'

'কী!' আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাধা দিয়েছে তোমাকে? তা হলে শুধু ঘুম পাড়িয়ে কী লাভ হলো? ওর তো ব্রেইনওয়াশ করা দরকার, যাতে তোমার চেহারা মনে করতে না পারে!'

'চিন্তার কিছু নেই। ভিতরে এত ধোঁয়া... ওর চেহারাও ঠিকমত দেখতে পাইনি আমি, আমারটা দেখবে কী করে?'

'শুনে খুশি হলাম। চলো কেটে পড়া যাক।'

মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল দু'জনে। রানা চলে গেল বিপরীতমুখী রাস্তায়। মুরল্যাণ্ড গেল মিউজিয়ামের সামনে, রেমিকে তুলে নেবার জন্য।

মিনিটদশেক পরে পুলিশ যখন সাইরেন বাজিয়ে হাজির হলো, তখন ওরা তিনজনই গায়েব হয়ে গেছে।

নয়

রেমিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে অ্যাথেন্সের কামারপাড়ায় চলে গেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। ওখানে রানার পরিচিত এক গ্রিক ভদ্রলোকের মেটাল ওঅর্কশপ আছে। তাঁর সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছে রানা, একান্তে কাজ করবে বলে সন্ধ্যার জন্য ধার চেয়েছে ওঅর্কশপটা। ওর কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ গ্রিক ভদ্রলোক, এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছেন। কৌতূহল দেখাননি। রানা আর মুরল্যাণ্ড ওঅর্কশপে হাজির হতেই চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

টানা সাত ঘণ্টা কাজ করল দু'বন্ধু। রেপ্লিকা খুলে বের করে আনল মেইন গিয়ার। সেটার উপরে আবার কারিগরি ফলাল জিয়োলেবের ভিতরে সেট করবার জন্য। ডিভাইসটা পুরোপুরি খুলে ফের জোড়া দিতেও ব্যয় হলো প্রচুর সময়। মাঝরাতে কাজ শেষ হলো ওদের। চূড়ান্ত ইন্সপেকশন শেষে সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। ওয়ার্কিং কণ্ডিশনে ফিরে গেছে জিয়োলেব। নবগুলো ঘোরানো যাচ্ছে মসৃণভাবে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাঁটাগুলোও চমৎকারভাবে ঘুরছে।

'নট ব্যাড,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড। 'অন্তত এটার দিকে তাকিয়ে মিউজিয়াম-ডাকাতির মত একটা কলঙ্কের কথা ভুলে থাকা যাবে।'

'ব্যাপারটাকে কলঙ্ক না ভেবে অ্যাচিভমেন্ট ভাবলেও কিন্তু চলে,' বলল রানা। 'যা-ই বলো, অসাধ্যসাধন করেছি আমরা। একটা দেশের জাতীয় জাদুঘরে ঢুকে তুলে এনেছি মহামূল্যবান একটা আর্টিফ্যাক্ট। যে-সে কথা নয়!'

'ওটা অ্যাচিভমেন্ট নয়, আমাদের জন্য ক্রিমিনাল রেকর্ড,' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'ধরা পড়লে মালা পরাবে না কেউ, বরং জুটবে হাতকড়া। সোজা নিয়ে ঢোকাবে শ্বশুরবাড়িতে।'

'তার আগেই কাজ শেষ করে জিনিসটা ফেরত দিয়ে দেব,' বলল রানা। 'কারা নিয়েছিল, আর কারাই বা ফেরত দিল, তা টেরই পাবে না কেউ।'

'তা হলে তো ভালই,' টেবিলের উপর থেকে রেপ্লিকার অংশগুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ?'

'বিশ্রাম। সকাল আটটায় খুলবে পার্থেনন। তার আগ পর্যন্ত কিছুই করার নেই। গত দু'দিনে যথেষ্ট ধকল গেছে, বিশ্রামটা খুব জরুরি।'

'আগামীকাল কিন্তু গ্যারেটের দেয়া শেষ দিন!' মনে করিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'পার্থেননে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি কাজ নেই আমাদের। ওখান থেকে সরাসরি চলে যাব এয়ারপোর্টে। জেট রেডি থাকবে... আশা করি লাঞ্চের আগেই রোমে পৌঁছুতে পারব আমরা।'

ইতিমধ্যে দু'জনে আলোচনা করে দেখেছে, নেপলসে ল্যাণ্ড করা ঠিক হবে না। মায়া ওখানে ওদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকবে। রোমে যাওয়াই নিরাপদ। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সড়কপথে পৌঁছুনো যাবে নেপলসে। পথে কোনও ঝামেলার

আভাস পেলে গাড়ি বদলে নেবে, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বিকল্প রুট।

চোখ কচলাল রানা। ঘুমানো দরকার ওর, কিন্তু মাথার ভিতরে হাজারটা দুশ্চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। বিছানায় শুলেও ঘুম আসবে কি না সন্দেহ।

বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে মুরল্যাণ্ড। নরম গলায় বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কীভাবে হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'গ্যারেটকে মাইডাস চেম্বারের খোঁজ দিলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ওর হাতে একটা নিউক্লিয়ার বোমা আছে!'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ওটা ওর কোন্ কাজে লাগবে। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক।'

'বড় ধরনের কোনও প্ল্যান আছে গ্যারেটের। নইলে একই সঙ্গে গুপ্তধনের সন্ধান আর নিউক্লিয়ার বোমা জোগাড় করত না।'

'ওয়াশিংটনে যদি ওটা ফাটায়, আগামী বিশ বছরের জন্য ভুতুড়ে শহরে পরিণত হবে আমাদের রাজধানী।'

'হয়তো আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আক্রোশ আছে ওর,' আন্দাজ করল রানা।

'সে তো আমারও আছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ইনকাম-ট্যাক্স দিতে পছন্দ করি না আমি!'

হাসল রানা। 'আপাতত গ্যারেটের কথামত কাজ করাটাই বোধহয় ভাল। তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের কোনও ক্ষতি হবে না।'

'অ্যাডমিরাল কিন্তু চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নন। নিশ্চয়ই পালাবার চেষ্টা করবেন। আমরা এদিকে গ্যারেটের ইশারায় নাচছি... অথচ উনি হয়তো নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।'

'বড় কোনও বিপদ হবে বলে মনে হয় না। আমাদের কাছে প্রতিদিন ভিডিও পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে গ্যারেট। অ্যাডমিরালের কিছু হলে আমরা বেঁকে বসব, তা ও খুব ভাল করেই জানে। আসলে... অ্যাডমিরাল কিছু করতে পারলে বরং ভালই হয়। এফবিআই তো এখন পর্যন্ত কোনও সূত্রই খুঁজে পায়নি।'

রানার কথার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না মুরল্যাণ্ডের। সত্যিই এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অ্যাডমিরালকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায়। গতকাল সকালে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা হয়েছে ওদের। তিনি জানিয়েছেন, এফবিআই কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গ্যারেটের সেলফোনের লোকেশন বের করতে পারছে না ওরা, এক ধরনের স্ক্র্যাম্বলার ব্যবহার করছে সে। জিয়োলেবের জিপিএস ট্র্যাকারের সিগনালও যাচ্ছে ইন্টারনেটের একটা সার্ভারে—সেটা ভুয়া নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে লোকটা। কোনও পেপার ট্রেইল নেই। প্রতিদিন যদিও ইমেইলে ভিডিও পাঠাচ্ছে গ্যারেট, সেটা আসছে ইয়োরোপের তিনটে গোস্ট সার্ভারের মাধ্যমে। ওগুলোতে উৎসের কোনও তথ্য জমা থাকে না। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের বিস্ফোরণে ধ্বংস হওয়া ট্রাকটা পরীক্ষা করা হয়েছে—ওটা দু'দিন আগে চুরি করা হয়েছিল, মালিকের সঙ্গে গ্যারেটের কোনও সম্পর্ক নেই। এক্সপ্লোসিভের কাঁচামালগুলোও সাধারণ যে-কোনও দোকান থেকে কেনা যায়। ফলে সেদিক থেকেও ট্র্যাক করা যাচ্ছে না লোকটাকে। সবমিলিয়ে চরম হতাশাজনক এক পরিস্থিতি। গ্যারেটকে আটক করবার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছে রানা, কিন্তু তাতে হিতে-বিপরীতও ঘটে যেতে পারে। এখন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন যদি নিজ চেষ্টায় মুক্ত হতে পারেন... কিংবা নিদেনপক্ষে নিজের লোকেশনের ব্যাপারে কোনও সূত্র পাঠাতে পারেন, বড্ড উপকার হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে রানা বলল, 'বসে থেকে লাভ নেই। চলো হোটেলে ফিরি।'

ব্যাকপ্যাকে জিয়োলেব ঢুকিয়ে ফেলল ও। তারপর মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওঅর্কশপ থেকে।

হোটেলে তিন রুমের একটা স্যুইট নিয়েছে ওরা। ভিতরে ঢুকতেই লিভিং রুমের সোফায় রেমিকে বসে থাকতে দেখল রানা আর মুরল্যাণ্ড। মাঝরাত পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জেগে আছে মেয়েটা।

'ঘুমোওনি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রানা।

'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল রেমি। 'কাজ হলো? মেরামত করতে পেরেছ ডিভাইসটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যাগ থেকে জিয়োলেবটা বের করে দেখতে দিল রেমিকে। বলল, 'গুড অ্যাজ নিউ!'

'চমৎকার!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেমির মুখ। 'হাত-মুখ ধুয়ে নাও তা হলে। আমি খাবার আনিয়ে রেখেছি।'

'তার কোনও দরকার ছিল না। কাজের ফাঁকে ডিনার সেরে নিয়েছি আমরা। ববি ছেলেমানুষ, খিদে সহ্য করতে পারে না।'

'আহ্ হা!' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বেচারি শখ করে আমাদের খাওয়াতে চাইছে... তুমি মানা করছ কোন আক্কেলে?'

'পেটুক কোথাকার!' চোখ পাকিয়ে বলল রানা।

হেসে ফেলল রেমি। 'বসো তোমরা। আমি নিয়ে আসছি খাবার।'

'কষ্ট করে সার্ভ করবার প্রয়োজন নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তা ছাড়া টেবিলে বসে ভদ্রোচিতভাবেও খেতে পারব না এখন। কোথায় রেখেছেন বলে দিন। আমি রুমে নিয়ে খাব। তারপর সোজা বিছানায়।'

'ফ্রিজের ভিতরে পাবেন। ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কারি আর

মিক্সড ভেজিটেবল। আভনে গরম করে নিন।'

'থ্যাঙ্কস।' খাবার নিয়ে দু'মিনিট পরেই নিজের কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

রানা সোফায় বসে পড়েছে। রেমি জানতে চাইল, 'তুমি খাবে না?'

'উঁহুঁ। খিদে নেই।'

'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'তোমাকেই বা ফ্রেশ দেখাচ্ছে কেন?'

'সন্ধ্যায় এক দফা ঘুমিয়ে নিয়েছি। করার মত কোনও কাজ ছিল না তো!'

'ভাল করেছ।'

মাথা এদিক-ওদিক করল রানা। ককিয়ে উঠল মৃদু। টেবিলের উপরে ঝুঁকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়েছে ওকে, আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘাড়ের পেশি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রেমি। বলল, 'স্থির হয়ে বসো। আমি তোমার ঘাড় মালিশ করে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই...' আপত্তি জানাতে গেল রানা।

'চুপ করো তো! দরকার আছে কি নেই, সেটা আমি বুঝব।'

রানার ঘাড়ে হাত রাখল রেমি। ধীরে ধীরে শুরু করল মালিশ। ওর হাতে যেন জাদু আছে, অদ্ভুত এক আরাম অনুভব করল রানা। চোখ মুদে ওর হাতে সঁপে দিল নিজেকে।

দশ মিনিটের মাথায় ঘাড়ের ব্যথাটা অনেকখানিই দূর হয়ে গেল রানার। রেমিকে থামতে বলে সোফায় হেলান দিল ও। এলিয়ে দিল শরীর। ওর মুখোমুখি এসে বসল রেমি। জিজ্ঞেস করল, 'ভাল লাগছে এখন?'

'হুঁ। ধন্যবাদ। তবে এভাবে সেবাযত্ন পেতে অভ্যস্ত নই আমি। চাইও না, কেউ আমার সেবা করুক।'

'দূর! কীসের সেবাযত্ন? এতকিছু করছ তুমি... তার বিনিময়ে কী-ই বা করছি আমি?'

বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কথা বলছে রেমি। রানা তা লক্ষ করে বলল, 'তোমাকে আজ বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ব্যাপার কী?'

'তোমার উপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছি। কেন যেন মনে হচ্ছে, সব ঠিক করে ফেলবে তুমি।'

একটু ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। 'তোমার মনে ভয় ঢোকাতে চাই না... কিন্তু তারপরেও বলছি, এতটা নিশ্চিত হয়ো না। আমি নিজেই ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। সামনের সবকিছুই ভীষণ অনিশ্চিত। কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না।'

একটু হাসল রেমি। 'তোমার ভয়ের কারণ আমি জানি, রানা। পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই, সেজন্যেই ভুগছ অনিশ্চয়তায়। অটোবানে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য চেহারা দেখেছি তোমার। কারণ সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত ছিলে তুমি; জানতে কীভাবে কী করলে পিছনের গাড়িদুটোকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে। কিন্তু এখন তুমি সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছ। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর আমার বোনকে উদ্ধারের কঠিন দায়িত্ব তোমার কাঁধে, অথচ জানো না কীভাবে সেটা করা সম্ভব। সম্ভবত ভয়ও পাচ্ছ আমার আর ববির কিছু হয়ে যায় কি না সে-কথা ভেবে।'

'আমার সাইকো-অ্যানালিসিস করছ?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'উঁহুঁ। শুধু সমস্যাটা ধরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ব্যর্থতার ভয় করছ তুমি, তাই না?'

স্থির হয়ে গেল রানা। রেমি যেন ওর মনের ভিতরটা পড়তে পারছে! ভুল বলেনি মেয়েটা... সত্যিই ব্যর্থতার ভয় জেঁকে বসেছে ওর মনে। গ্যারেট মূলত ওকে টার্গেট করেছে, তাই পুরো ব্যাপারটার জন্য নিজেকেই পরোক্ষভাবে দায়ী করছে ও। ওর কারণেই অপহৃত হয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন... ওর কারণেই

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অভিযানে বেরোতে হয়েছে রেমি আর মুরল্যাণ্ডকে। এখন ওদের কারও যদি কিছু হয়ে যায়, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না রানা।

বিষণ্ন চোখে রেমির দিকে তাকাল ও। 'এসব প্রসঙ্গ কেন তুলছ?'

উঠে এসে রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রেমি। হাত রাখল ওর হাতে। বলল, 'কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, রানা। যা ঘটেছে... অথবা সামনে যা ঘটবে, তার জন্য তুমি দায়ী নও। একাও নও তুমি। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, আমি আর ববি তার সমান ভাগীদার হবো।'

ওর কথাগুলো হৃদয় স্পর্শ করল রানার। সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। চোখে চোখ রাখল দু'জনে, ভুলে গেল সবকিছু। ধীরে ধীরে কাছাকাছি হলো ওদের মুখ। ভারী হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। আর এক ইঞ্চি এগোলেই স্পর্শ করবে দু'জনের ঠোঁটজোড়া। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে চোখের পাতা মুদল রেমি।

আর তখুনি সংবিৎ ফিরে পেল রানা। সচেতন হয়ে উঠল। এ কী করতে চলেছে ও? পরিস্থিতির কারণে ক্ষণিকের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রেমি... এ ধরনের আবেগ সাধারণত চিরস্থায়ী হয় না, পরে ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বুকের ভিতরে দাপাদাপি করছে হৃৎপিণ্ড, বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল ও। সাবধানে রেমিকে ঠেলে দিল দূরে।

বিস্ময় নিয়ে চোখ খুলল রেমি। দৃষ্টিতে মিশে আছে অপমান আর অভিমান। বলল, 'ত্... তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'করি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই আবেগের বশে তুমি যা করতে চাইছ, তার সুযোগ নিতে চাই না। এখন একটা অস্থির সময় কাটাচ্ছি আমরা, রেমি। কেউই ঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছি না। এসব শেষ হোক, তারপর নাহয় ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত

নিয়ো, আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে কি না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রেমি, তারপর ওর দৃষ্টি বদলে গেল। নতুন আলোয় দেখছে রানাকে। হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। বলল, 'ইউ আর আ রিয়েল জেন্টলম্যান, রানা। যুক্তি আছে তোমার কথায়, তবে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবু... তোমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে... অপেক্ষা করব আমি। গুড নাইট।'

'গুড নাইট, রেমি।' ঢোঁক গিলে পাল্টা সম্ভাষণ জানাল রানা।

হাসিমুখে বিদায় নিল রেমি। রানাও গিয়ে ঢুকল নিজের কামরায়। কাপড় বদলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ভেবেছিল ঘুম আসবে না, কিন্তু বালিশে মাথা ঠেকানোর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই তলিয়ে গেল ও অতল ঘুমে।

দশ

অ্যাক্রোপোলিসের ঢালু পথ ধরে উপরে উঠছে বিশালদেহী টমি কাভানো। সঙ্গে রয়েছে তিন সঙ্গী। এদের মধ্যে একজন হলো আন্তোনিয়ো, বাকি দু'জনকে শেষ মুহূর্তে যোগ করেছে মায়া, বোধহয় ভেবেছে ওদের দু'জনের পক্ষে মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ডকে কাবু করা সম্ভব না-ও হতে পারে। ব্যাপারটা একটু অপমানজনক হলেও আপত্তি করেনি টমি, দল বড় হলে ক্ষতি নেই কোনও। হাত নিশপিশ করছে তার। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাইরে

মুরল্যাণ্ড ওদেরকে যেভাবে পিটিয়েছিল... তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে।

ভোর ছ'টায় অ্যাথেন্সে পৌঁছেছে ওরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পরিচিত এক লোকাল সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিল, তার কাছ থেকে জোগাড় করেছে চারটে পিস্তল আর অ্যামিউনিশন। আটটা বাজার আগেই চলে এসেছে পার্থেননে। গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিনেছে টিকেট। এখন অ্যাক্রোপোলিসের চূড়ায় উঠছে শিকারের জন্য ফাঁদ পাতার উদ্দেশ্যে।

অনেকে ভাবে পার্থেনন আর অ্যাক্রোপোলিস বুঝি সমার্থক। বাস্তবে তা নয়। অ্যাক্রোপোলিস আসলে বিশাল একটা পাথুরে মালভূমি, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে অনেকগুলো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওগুলোরই একটা হলো পার্থেনন—গ্রিকদের প্রাচীন মন্দির, যেখানে উপাসনা করা হতো দেবী অ্যাথেনা-র। টমি জানে, এই ধবংসাবশেষ ওদের নেপলস নগরীর চেয়েও পুরনো; তবু কোনও ধরনের বিস্ময় বা মুগ্ধতা অনুভব করল না। দূর থেকে পুরো মালভূমিকে স্রেফ একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হলো তার। যে-পার্থেননকে নিয়ে এত মাতামাতি, সেটাও নিজের মহিমা হারিয়েছে। কাঠামোটা যে আজও ধসে পড়ে যায়নি, তা-ই আশ্চর্য।

ইতিমধ্যে কড়া রোদ উঠেছে, কোথাও ছায়া পাবার জায়গা নেই। আনমনে মাথা নাড়ল টমি, পরনের পোশাক নিয়ে আরেকটু মাথা ঘামানো উচিত ছিল। চারজনেই ফুলশার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরেছে, কোমরে গোঁজা পিস্তল লুকানোর জন্য তার উপর চাপিয়েছে ব্লেজার। পায়ে চামড়ার জুতো। গরমে প্রত্যেকে ঘামতে শুরু করেছে। অথচ আশপাশে যত টুরিস্ট দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই পরেছে শর্টস আর টি-শার্ট। পায়ে দিয়েছে স্যাণ্ডেল বা স্নিকার। সন্দেহ নেই, ভিড়ের মাঝে এক দেখাতেই ওদের

চারজনকে আলাদা করতে পারবে যে-কেউ।

কিন্তু এ-নিয়ে হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই এখন। যা হবার তা হয়ে গেছে। সঙ্গীদের কাছে ডেকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিল সে। দু'জন পজিশন নেবে এন্ট্রান্সের কাছে, বাকি দু'জন তাদের ব্যাকআপ হিসেবে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবে। মালভূমিতে উঠে আসার পথ ওই একটাই বলে মনে হয়েছে টমির কাছে। কাজেই ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছুতেই পার্থেননের মন্দিরে পৌঁছুতে পারবে না মাসুদ রানা বা তার সঙ্গীরা।

প্রোপিলেয়া-র দিকে অগ্রসর হবার সময় ভুরু কুঁচকে গেল টমির। ওটা একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি, যেটা ধরে অ্যাক্রোপোলিসের মূল অংশে পৌঁছুনো যায়। সিঁড়িতে টুরিস্টদের ছোটখাট একটা ভিড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা কী করে হয়? ওরাই তো সবার আগে ঢুকল অ্যাক্রোপোলিসের গেট দিয়ে! তা হলে সামনের গ্রুপটা এল কোত্থেকে?

ডানে তাকাতেই নতুন একদল টুরিস্টকে এগিয়ে আসতে দেখল টমি। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল নিজের ভুল। উপরে ওঠার রাস্তা আসলে একটা নয়, দুটো। কী কপাল... যেটা দিয়ে তাড়াতাড়ি ওঠা যায়, সেটা দিয়ে ওঠেনি ওরা। উঠেছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথটা ধরে! বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল সে। আরেকটু খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল।

ছবি দেখে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের চেহারা মনের ভিতর গেঁথে নিয়েছে ওরা। তাড়াতাড়ি ভিড়ের উপর নজর বোলাল টমি। নাহ্, এখানে নেই ওদের কেউ। দ্রুত নিজের প্ল্যানে সংশোধন করল। প্রোপিলেয়া-র সামনে পজিশন নিলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আশপাশে তাকাল বসবার মত একটা জায়গা পাবার আশায়। সারাদিন থাকতে হবে এখানে, দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। পছন্দসই একটা জায়গা পেল খানিক পরেই, তবে গেল না

ওখানে। সতর্কতা হিসেবে পার্থেননের সামনেটা দেখে আসা প্রয়োজন। বলা যায় না, রানা হয়তো এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে।

তিন সঙ্গীকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল টমি।

'এখানে সিন ক্রিয়েট করা চলবে না,' বলল সে। 'শিকারকে যদি স্পট করতে পারি, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে। বাইরে যাবার পর মুরল্যাণ্ড আর ড. হ্যাডলিকে রাস্তার ধারে গুলি করে ফেলে দেব। ক্লিয়ার? আর হ্যাঁ... ওই বজ্জাত মুরল্যাণ্ড কিন্তু আমার আর আন্তোনিয়োর শিকার, এ-কথা খেয়াল রেখো সবাই।'

'ওরা যদি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি না হয়?' জানতে চাইল আন্তোনিয়ো। 'যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে?'

'সেক্ষেত্রে এখানেই মরবে ওরা, আমরা ওদের জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়ব,' বলল টমি। 'বসের সে-রকমই হুকুম।'

হাসি ফুটল গুণ্ডাদের মুখে। হুকুমটা পছন্দ হয়েছে।

'আন্তোনিয়ো, তুমি আমার সঙ্গে চলো,' বলল টমি। 'পার্থেননের সামনে একবার চক্কর দিয়ে আসা দরকার। আর তোমরা...' বাকি দু'জনের দিকে তাকাল, 'এখানেই পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করো।'

দু'ভাগ হয়ে গেল দল। আন্তোনিয়োকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

সংক্ষিপ্ত পথটা ধরে উঠে আসায় বেশ দ্রুতই অ্যাক্রোপোলিসের মালভূমিতে পৌঁছেছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড; কিন্তু উপরে ওরাই প্রথম পা রাখেনি। পার্থেননের দিকে এগোতে গিয়ে বেশ কিছু শ্রমিকের দেখা পেল ওরা—গ্যান্ট্রি ক্রেইনের সাহায্যে বড় বড় মার্বেল-ব্লক সরাচ্ছে। রোববার ছুটির দিন, তারপরেও এদেরকে

কাজ করতে দেখে অবাক হলো না ওরা; আসার পথে এক গাইডের কাছে শুনেছে—সামনের জুনে কী যেন একটা অনুষ্ঠান হবে এখানে, তাই জোরেশোরে রেস্টোরেশনের কাজ চলছে।

রানা আর মুরল্যাণ্ড এই প্রথম এল অ্যাক্রোপোলিসে, তবে রেমির এটা তৃতীয় ভিজিট। তারপরেও ওদের মতই মুগ্ধ, অভিভূত হলো ও। কিছু কিছু দৃশ্য আসলে কখনোই পুরনো হয় না, হারায় না নিজের জাদু। বিশেষ করে পার্থেনন... সময়ের করাল থাবা, কিংবা আড়াই হাজার বছরের ধ্বংসযজ্ঞ... কিছুই ম্লান করতে পারেনি ওটার আভিজাত্য। আর্কিটেক্টরা বলেন, ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে নিখুঁত বিল্ডিং; তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত নেই রেমির। কলামগুলো পুরোপুরি সমান্তরাল নয়, কিছুটা সিগার-শেপের। এর ফলে এক ধরনের দৃষ্টি-বিভ্রম দেখা দেয়। মনে হয় যেন সমান্তরাল রেখাগুলোই হঠাৎ করে পরস্পরের দিকে বেঁকে গেছে। পুরোপুরি খাড়াও নয় ওগুলো, একটু হেলানো। হিসেব করে দেখা গেছে, কলামগুলোর দৈর্ঘ্য আকাশের দিকে এক মাইল বাড়ানো হলে ওগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করবে। এ-ধরনের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য হাল-জামানার কোথাও পাওয়া যাবে না।

রেমির মুগ্ধতা ওখানেই। কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষেরা তাদের কীর্তি দিয়ে আজও বিস্মিত করে চলেছে ওদের। কী অদ্ভুত এক ব্যাপার! রানা আর মুরল্যাণ্ডকে ঈর্ষা হলো ওর। এমন জিনিস প্রথমবার দেখার আনন্দই আলাদা।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রেমি। নুড়ি বিছানো পথে উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরে পা বেধে হোঁচট খেলো। পড়ে যাবার আগেই খপ্ করে ওকে ধরে ফেলল রানা।

'থ্যা... থ্যাঙ্কস!' বিব্রত কণ্ঠে বলল রেমি।

'সাবধানে হাঁটো,' নরম গলায় বলল রানা। 'পথটা ভীষণ উঁচু-নিচু। সবখানে পাথর বেরিয়ে আছে।'

'জানি। আগেও হোঁচট খেয়েছি। গতবার তো মুখ থুবড়ে পড়েই গিয়েছিলাম।'

'সে কী! তা হলে আজও এত অসাবধান কেন?'

'আসলে... এখানে এলেই অন্য জগতে হারিয়ে যাই আমি। রাস্তার দিকে আর মনোযোগ থাকে না।'

হাসল রানা। 'এতটা হারিয়ে যাওয়া ভাল নয়, ম্যাডাম!'

রেমিও হাসল। কৃতজ্ঞ বোধ করছে রানার প্রতি। গত রাতের ঘটনার পর ওদের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে না বলে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। সহজ আচরণ করছে রানা, যেন কাল কিছুই ঘটেনি ওদের মাঝে। ভালই হয়েছে তাতে, নতুন কোনও দুশ্চিন্তা আর চেপে বসছে না মাথায়।

মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। রেমি বলল, 'কী অদ্ভুত সুন্দর, দেখেছ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কত পুরনো এটা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭ সালে তৈরি হয়েছে পার্থেনন,' বলল রেমি। 'চারদিকের ভাস্কর্যগুলোও সেই আমলের। এখন সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু শুরুতে সবগুলোই ছিল রঙিন।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'সময়ের প্রভাবে রঙ নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু স্পেক্টোগ্রাফির মাধ্যমে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন আর্কিয়োলজিস্টরা।'

'এখান থেকে তো সব স্কাল্পচার নেয়া হয়নি ইংল্যাণ্ডে,' বলল রানা। 'কোথায় ওগুলো?'

'নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়ামে,' বলল রেমি। 'ওটা মালভূমির দক্ষিণ পাশে। পুরনো মিউজিয়ামটা ওইদিকে।' আঙুল তুলে পার্থেননের পশ্চিমে একটা ভাঙাচোরা বিল্ডিং দেখাল ও।

দরজা-জানালা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চারদিকে তারকাঁটার বেড়া।

'বন্ধ নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'বন্ধ এবং পরিত্যক্ত,' বলল রেমি। 'বড্ড ছোট ছিল ওটা। আর্টিফ্যাক্ট রাখবার মত প্রয়োজনীয় সুবিধেও ছিল না। তাই অত্যাধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সহ নতুন মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছে। এখন ওটা দেখিয়েই এলজিন মার্বলস্ ফেরত চাইছে গ্রিক সরকার। এতদিন ব্রিটিশরা যুক্তি দেখাচ্ছিল, এখানে রাখলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন সে-যুক্তি ধোপে টিকছে না।'

'হুম। বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে তা হলে!'

'তা তো বটেই। নতুন মিউজিয়ামটা বানানোই হয়েছে গ্রিকদের পাল্লা ভারী করবার জন্য।'

মন্দিরের পূর্ব দিকে চলে গেল ওরা। ওদিককার পেডিমেণ্ট পুরো নষ্ট হয়ে গেছে বলা চলে। কলামের উপরে কোনোমতে টিকে আছে ছাতের ভাঙাচোরা খানিকটা অংশ। একটাই মূর্তি দেখা যাচ্ছে ওখানে। হেলান দিয়ে বসে থাকা হেরাক্লিস... তবে ওটা রিপ্রোডাকশন। আসলটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থাকায় নতুন একটা বানিয়ে বসানো হয়েছে ওখানে, যাতে লোকে বুঝতে পারে মূর্তিসহ পেডিমেণ্টটা দেখতে কেমন ছিল।

মোট আটটা কলাম আছে এ-পাশে। হেরাক্লিসের মূর্তি রয়েছে বাম থেকে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কলামের মাঝামাঝি। ব্যাগ থেকে একটা প্রিণ্টআউট বের করল রানা। ল্যারি কিং পাঠিয়েছে ওটা—প্রাচীন আমলের অক্ষত পেডিমেণ্টের কাল্পনিক ডায়াগ্রাম। আফ্রোদিতির পা ওতে বাম থেকে সাত নম্বর কলামের উপর দেখা যাচ্ছে।

কাগজটা রেমির হাতে দিয়ে এবার জিয়োলেব বের করল রানা। রওনা হবার আগে স্টোমাকিয়োন পাজলের সাহায্যে

ক্যালিব্রেট করে এনেছে ওটা। ডায়ালের তিনটে কাঁটাই এখন ক'রোটার পজিশনে। আর্কিমিডিসের নির্দেশনা অনুসারে কাত করে ধরল ডিভাইসটা, মুখোমুখি হলো ইস্ট পেডিমেন্টের।

'মনে হয় বেশি কাছ থেকে ধরছ,' বলল রেমি। 'এখান থেকে জিয়োলেবের ডায়ালে পুরো পেডিমেন্ট কাভার করবে না। পিছাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল রানা। যেখানে পৌঁছুবার পর পেডিমেন্টের দু'প্রান্ত ডায়ালের সঙ্গে অ্যালাইন হয়ে গেল, সেখানে থামল।

'আরও পিছাও,' বলল রেমি। 'আমার ধারণা, জিনিসটা ওখানে রাখতে হবে।'

ঘাড় ফেরাতেই পাথরে তৈরি একটা বেদি দেখতে পেল রানা। মাটি থেকে চার ফুট উঁচু। সারফেসটা বৃত্তাকার। চলে গেল ওখানে। বেদির উপর জিয়োলেব খাড়া করে রাখল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে মিলিয়ে দেখল অ্যালাইনমেন্ট।

হ্যাঁ, এবার মিলেছে পুরোপুরি। শুধু দুই প্রান্ত নয়, পেডিমেন্টটা অক্ষত থাকলে এখন ওটার ডগাও জিয়োলেবের সঙ্গে এক লাইনে এসে যেত।

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। মুরল্যাণ্ডকে বলল, 'ববি, নোট নাও।' নব ঘোরাতে শুরু করল ও। একটা কাঁটা নিয়ে গেল হেরাক্লিসের আসন বরাবর। ডায়ালে দেখে নিল কাঁটার অ্যাঙ্গেল। 'বত্রিশ ডিগ্রি।'

নোটবুক বের করে টুকে ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'বত্রিশ ডিগ্রি।'

এবার অন্যপাশের নব ঘোরাল রানা। আফ্রোদিতির পা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নিয়ে গেল দ্বিতীয় কাঁটা। ডায়াল দেখল এরপর। 'একাত্তর ডিগ্রি।'

'একাত্তর ডিগ্রি।' পুনরাবৃত্তি করল মুরল্যাণ্ড।

জিয়োলেবটা আবার ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। রেমি একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ব্যস, এ-ই?'

'উঁহুঁ,' রানা বলল। 'এবার অ্যাঙ্গেলদুটো ম্যাপে বসাতে হবে।'

ব্যাগ থেকে নেপলসের ম্যাপ বের করল ও। বিছাল বেদির উপরে। আঙুল বুলিয়ে খুঁজে বের করল কাসল ডেলোভো আর কাসল সান্তেলমোর অবস্থান। ওগুলোকে কেন্দ্র করে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে আঁকল বত্রিশ ডিগ্রি আর একাত্তর ডিগ্রি নির্দেশক মোট চারটে রেখা। যেখানে ওগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করল সে-জায়গার নাম পড়ল।

'পিয়াৎজা স্যান গেতানো।' বলল ও। 'মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনোর জন্য ওখানকার কোনও একটা কুয়ো দিয়ে ঢুকতে হবে আমাদেরকে।'

'...যেটার গায়ে কাঁকড়ার ছবি থাকবে। রাইট?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'ঠিক ধরেছ?'

'সত্যি?' একটু বিস্ময় নিয়ে বলল রেমি। বিশ্বাসই করতে পারছে না, পার্থেননের কাজটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। 'এতই সহজ?'

'না, সহজ নয়,' আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সঙ্গীদের ছাড়িয়ে পিছনে আটকে গেছে ওর দৃষ্টি। 'সাবধান, নোড়ো না কেউ।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ববি, ওই লোকটাকে কি টুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে তোমার কাছে?'

একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। রুক্ষ চেহারার এক লোক চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে মন্দিরের

পানে। গায়ে কালো রঙের ব্লেজার আর ফুলপ্যান্ট—টুরিস্টের পোশাক এমন হয় না।

তিক্ত চেহারা নিয়ে রানার দিকে ফিরল মুরল্যাণ্ড। 'না, টুরিস্ট না। ব্যাটা একটা মাথামোটা ইটালিয়ান গুণ্ডা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাইরে যে-তিন গর্দভকে প্যাঁদানি দিয়েছিলাম, ও তাদেরই একজন।'

এগারো

ব্যস্ত চোখে টুরিস্টদের চেহারা দেখতে দেখতে এগোচ্ছে ইটালিয়ান গুণ্ডা। দেখামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে মুরল্যাণ্ড। নাকভাঙা ওই গরিলাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। নামটাও মনে আছে—টমি। হাবভাবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওদেরকেই খুঁজছে লোকটা; তবে এখনও দেখতে পায়নি।

'কুইক!' সঙ্গীদের তাড়া দিল রানা। একছুটে একটা ভাঙা দেয়ালের পিছনে গিয়ে লুকাল তিনজনে।

'কী করে জানল ওরা, আমরা এখানে আসব?' বিস্মিত গলায় বলল রেমি।

'ধারণা করছি কীর্তিটা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ড. ফিলবির,' বাঁকা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'ইংল্যাণ্ডে আমাদেরকে এক দফা বেচেছেন ভদ্রলোক, এখানে আবার বেচতে সমস্যা কোথায়?'

'মায়া সম্ভবত অ্যাথেন্স মিউজিয়াম থেকে রেপ্লিকা চুরির

খবরও পেয়েছে,' বলল রানা। 'সকালে দেখলাম টেলিভিশন আর পত্র-পত্রিকায় খুব হৈচৈ হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে ও।'

'লোকটা নিশ্চয়ই একা আসেনি,' অনুমান করল রেমি। 'আমরা ফিরব কী করে? চারদিকে ফাঁকা জায়গা... আমরা এখান থেকে বেরুলেই দেখে ফেলবে।'

'হুম! সমস্যা বটে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া কঠিনই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'যদি অনুমতি দাও তো এই অধম একটা আইডিয়া দিতে পারে।'

'নিশ্চয়ই!'

'ডিফেন্সের বদলে অফেন্সে চলে গেলে কেমন হয়? আমাদের উপর হামলা চালাবার আগে আমরাই ওর উপর হামলা চালাই না কেন? ওকে ধরে এনে দু'ঘা লাগালেই জানা যাবে আশপাশে আরও ক'জন-কোথায় ওঁত পেতে আছে।'

'মন্দ নয় বুদ্ধিটা। তবে তার জন্য ওকে সরিয়ে নিতে হবে সাধারণ টুরিস্টদের চোখের আড়ালে।'

'তা হলে ওর নাকের সামনে একটা মুলো ঝোলানো যাক।'

'মুলোটা সেক্ষেত্রে তোমাকেই হতে হচ্ছে, ববি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমাকে ও চেনে না।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে,' কপট রাগ দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি বানানো তোমার পুরনো অভ্যাস।'

দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে রেমি। 'তোমাদের প্ল্যানে পানি ঢালতে হচ্ছে বলে দুঃখিত,' বলে উঠল ও। 'লোকটা একা নয়। ওই দেখো।'

রানা আর মুরল্যাণ্ডও উঁকি দিল। প্রথম গুণ্ডার পঞ্চাশ গজ দূরে

আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে—নাকের তলায় সরু এক টুকরো গোঁফ, গায়ে একই ধরনের পোশাক। ভিড়ের মাঝে ঢুঁ মারছে সে।

'ওকেও চিনি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'লণ্ডনে দেখা আরেক গুণ্ডা, গরিলাটার দোস্ত।'

'হুমম... তা হলে দু'জনকে ঘায়েল করতে হবে,' বলল রানা। 'কঠিন কিছু না। দু'দিকে নজর রাখছে ওরা, পরস্পরের দিকে নয়। আলাদাভাবে ওদেরকে টার্গেট করলেই চলে।' মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল। 'গরিলাকেই প্রথমে ধোলাই দেয়া যাক, কী বলো?'

হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। 'একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ। কীভাবে এগোতে চাও?'

'পুরনো মিউজিয়ামের পিছনে নিয়ে যাও ওকে। আমি ওখানে ঘাপটি মেরে থাকব।'

'আর আমি?' জানতে চাইল রেমি।

'এখানেই থাকো।' ব্যাকপ্যাক থেকে সেলফোনের একটা বাড়তি ইয়ারপিস বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'তুমি আমাদের লুকআউট। গোঁফঅলাকে মিউজিয়ামের দিকে যেতে দেখলেই জানাবে।'

রানার নাম্বারে রিং করল রেমি, কানেকশন নিল। কানে গুঁজল ইয়ারপিস। 'ঠিক আছে।'

'তা হলে শুরু করা যাক,' মুরল্যাণ্ডকে বলল রানা।

ভাঙাচোরা দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় পুরনো মিউজিয়ামের দিকে যতখানি সম্ভব এগোল মুরল্যাণ্ড। তারপর বড় করে দম নিয়ে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটল কয়েক মিনিট, সেই সঙ্গে একটা চোখ রাখল পিছন দিকে। খানিক পরেই গরিলাকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখল, ওকে দেখতে পেয়েছে। সঙ্গীকে ডাকার জন্য ইতি-উতি তাকাল... তবে তাকে সে-সুযোগ দিল না মুরল্যাণ্ড। চট করে সরে গেল একটা দেয়ালের পিছনে।

ওকে হারাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল টমি, আন্তোনিয়োকে ডাকাডাকি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না।

নিজের পিছু পিছু গুণ্ডাকে বেশ কিছুদূর নিয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। আড়াল থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মাঝে সময় ব্যয় করল কিছুটা, রানাকে সময় দিল পজিশনে পৌঁছুবার। এরপর দ্রুত পা চালিয়ে পরিত্যক্ত মিউজিয়াম বিল্ডিঙের দিকে এগোল। পাশ ঘুরে চলে গেল ওটার পিছনে।

বিল্ডিঙের পিছনটা যেন ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। গার্বেজ ব্যাগের বিশাল এক স্তূপ দেখা যাচ্ছে ওখানে। পাশে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে একটা অচল ক্রেইন। মাটিতে একটা রেললাইন রয়েছে—পুরনো মিউজিয়ামের আর্টিফ্যাক্টগুলো এই রেললাইন ব্যবহার করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে নতুন মিউজিয়ামে। রেললাইনের উপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো ট্রলি। চারকোনা বড়-সড় একটা লোহার বাকেট বসানো আছে ওটার উপরে, সারা গায়ে মরিচা।

রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকল মুরল্যাণ্ড, দু'কান খাড়া করে রেখেছে। কিন্তু পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল না। টমির মতলব আঁচ করতে কষ্ট হলো না—নিশ্চয়ই বিল্ডিঙের অন্যপাশ ঘুরে আসছে সে। সামনে থেকে ওর পথরোধ করবে।

তা-ই হলো। ট্রলির কাছাকাছি পৌঁছুতেই গরিলাকে বিল্ডিঙের পাশ থেকে উদয় হতে দেখল মুরল্যাণ্ড। হাতে উদ্যত পিস্তল। ওকে দেখামাত্র গর্জে উঠল, 'থামো!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দু'হাত। মুখে অনাবিল হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখা হয়েছিল, তাই না? বিচির ব্যথাটা কি গেছে, নাকি এখনও আছে?'

'চুপ করো!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল টমি। পায়ে পায়ে

এগোতে শুরু করল ওর দিকে। হাতের পিস্তল একচুল নড়েনি।

'আহ্-হা! এত খেপছ কেন?' আবারও বলল মুরল্যাণ্ড। 'লণ্ডনের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। আসলে... ভেবেছিলাম তুমি বুঝি চাঁদা চাইতে আসছ!'

'চুপ করতে বলেছি তোমাকে!' হিসিয়ে উঠল টমি। ইতিমধ্যে গার্বেজ ব্যাগের স্তূপটা পেরিয়ে এসেছে সে।

আর তখুনি স্তূপের ভিতর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল রানা। বিদ্যুৎবেগে চলে গেল গরিলার পিছনে, হাতের ছোট্ট ছুরিটা ঠেকাল তার করোটিড আর্টারিতে।

'এবার তুমি চুপ করলেই ভাল করবে,' নরম গলায় বলল ও।

জমে গেল টমি। তিরতির করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট। এভাবে ফাঁদে পড়ায় গালমন্দ করছে নিজেকে।

'পিস্তলটা ফেলে দাও, বন্ধু,' বলল মুরল্যাণ্ড।

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল টমি। তার ঘাড়ের উপর ছুরিটা আরেকটু চেপে ধরল রানা। 'না ফেললে মরবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টমি। হাতের মুঠো আলগা করতে যাবে, এমন সময় রানার ইয়ারপিসে চিৎকার করে উঠল রেমি।

'রানা! বিপদ!!'

পরমুহূর্তে অ্যাক্রোপোলিসের মালভূমি প্রকম্পিত হলো গুলির আওয়াজে।

ভাঙা দেয়ালের পিছন থেকে সরু গোঁফঅলা আন্তোনিয়োর উপরে নজর রাখছে রেমি। কিছুটা সময় তাকে চোখে চোখে রাখল বটে, কিন্তু হারিয়ে ফেলল হঠাৎ।

চঞ্চল হয়ে উঠল রেমি। লোকটা কোন্‌দিকে গেছে জানতে হবে। রানা আর মুরল্যাণ্ডের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে সর্বনাশ। ঝুঁটি খুলে মাথার চুল ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে দিল ও।

সানগ্লাস পরাই আছে, ব্যাকপ্যাক থেকে টুপি বের করে পরে ফেলল মাথায়। চেহারা অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেল এতে, হঠাৎ দেখে কেউ ওকে চিনতে পারবে না।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রেমি। গোঁফঅলা গুণ্ডাকে শেষ যেখানে দেখেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে নজর বোলাল। নাহ্, নেই কোথাও লোকটা। গেল কোথায়? লোকের ভিড়ে মিশে যায়নি, গায়ের পোশাকের কারণে ভিড়ের ভিতরে লুকানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

মুরল্যাণ্ডকেও দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না ওর পিছু নেয়া বিশালদেহী লোকটাকেও। রানা তো আগেই উধাও হয়ে গেছে। অসহায় বোধ করল রেমি। ঝুঁকির কাজটা ওরা করছে, ওকে দেয়া হয়েছিল সহজ একটা দায়িত্ব। তাতেও বুঝি ব্যর্থ হলো?

অস্থির হয়ে উঠেছে রেমি, তারপরেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে চেষ্টা করল। কোথায় যেতে পারে লোকটা? পুরনো মিউজিয়ামের দিকে নজর চলে গেল ওর। ওখানে বিশালদেহীর জন্য ফাঁদ পেতেছে রানা আর মুরল্যাণ্ড, তাই ওদিকেই মনোযোগ দেয়া দরকার। দ্বিতীয় গুণ্ডা যদি ওখানে যাবার চেষ্টা করে, দেখতে পাবে।

ভিড় ঠেলে পরিত্যক্ত বিল্ডিংটার দিকে এগোল রেমি। কাছাকাছি যেতেই কেঁপে উঠল বুক। দেরি করে ফেলেছে... ওই তো, বিল্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে এগোচ্ছে লোকটা, হাতে পিস্তল। দেখতে দেখতে পিছনের কোনায় পৌঁছে গেল। দেয়ালের আড়াল থেকে তাকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখল রেমি, এরপরেই পিস্তল তুলল।

নিশ্চয়ই রানা আর মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পেয়েছে, আন্দাজ করল রেমি। গুলি করতে চলেছে ওদেরকে। রক্ত সরে গেল মুখ থেকে।

সেলফোনে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'রানা! বিপদ!!'
আর তখুনি ট্রিগার চাপল লোকটা।

রেমির সতর্কবাণী শুনতে পায়নি মুরল্যাণ্ড, শুনতে পাওয়ার কথাও নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে নড়ে উঠল ও। সেটাই জীবন বাঁচাল ওর। শরীরের মাত্র এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। ডাইভ দিল মাটিতে।

রানাও নড়ে উঠেছে ইনস্টিঙ্কটের বশে, কিন্তু সেটা ঠিক হয়নি। ঘাড়ের উপর থেকে ছুরি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল টমির শরীরে। পিস্তল আর ফেলল না সে, বরং মুঠো শক্ত করে দ্রুত ঘুরল, পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করল রানাকে। এক হাত তুলে সেই আঘাত ঠেকাল রানা। দু'জনের হাত বাড়ি খেলো, একই সঙ্গে ব্যথায় ককিয়ে উঠল ওরা।

রানার দিকে পিস্তল তাক করবার চেষ্টা করল টমি, কিন্তু থাবড়া দিয়ে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে দিল রানা। শরীরের সম্মুখভাগ অরক্ষিত হয়ে পড়ল গরিলার, গায়ের জোরে তার সোলার প্লেক্সাসে একটা ঘুসি বসাল রানা।

গুঙিয়ে উঠল লোকটা, এক হাতে পেট চেপে ধরে একটু ভাঁজ হয়ে গেল, আরেক হাতে ব্যস্ত হয়ে পিস্তল ফের তাক করবার চেষ্টা করছে। চেহারায় ব্যথা ও বিস্ময়, দুটোই ফুটে আছে। মরিয়া হয়ে গেছে রানা, কাজেই দেরি করল না। ঘুসিটা মেরেই চট্ করে এক পা ডানে সরল, ধাঁই করে আরেকটা হাঁকাল তার বাঁ চোয়ালে। ঠকাস করে জোর আওয়াজ উঠল, মাথা ঘুরে পড়ে গেল টমি। পুরো নয়, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে।

আবার এগোল রানা, পাশ থেকে সজোরে টমির পাঁজরে একটা লাথি মারল ও। মাটির উপর গড়িয়ে গেল লোকটা।

এতকিছুর পরেও হাত থেকে অস্ত্র ফেলেনি, ওটা কেড়ে নেবার জন্য এগোতে গিয়ে থমকে গেল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়েছে নড়াচড়া। ঘাড় ফেরাতেই বিল্ডিঙের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল দ্বিতীয় গুণ্ডাকে, ওকে গুলি করতে চলেছে।

শরীর শক্ত করে ফেলল রানা—গুলির আঘাত সহ্য করবার জন্য। তবে তার প্রয়োজন হলো না। মাটি থেকে ওকে লক্ষ্য করে বাঘের মত ঝাঁপ দিল মুরল্যাণ্ড, জাপটে ধরে আবার আছড়ে পড়ল মাটিতে। ওদের শরীরের উপর দিয়ে ছুটে গেল আন্তোনিয়োর লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

'এদিকে!' চাপা গলায় বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

হাণ্ড্রেড মিটার স্প্রিন্টের স্টার্টিঙের মত শরীর জাগাল দু'বন্ধু, এক ছুটে চলে এল রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলির পিছনে। আবারও গুলি করল আন্তোনিয়ো, তবে বুলেটগুলো মাথা কুটে মরল লোহার বাকেটের শরীরে।

খড়খড় করে উঠল রানার কানের ইয়ারপিস। রেমি উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল, 'রানা! কী হচ্ছে ওখানে?'

'এদিকে এসো না। গুলি করছে ওরা!'

'আমি তো মিউজিয়ামের পাশে।'

'কেন এসেছ এদিকে? পালাও... পালাও এখুনি!'

'ওহ্ গড! আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা!'

'দৌড়াও!'

গুলিবর্ষণ থেমে গেছে। ইটালিয়ানে চেঁচামেচি শুনতে পেল রানা। ঝুঁকি নিয়ে ট্রলির পিছন থেকে মাথা বের করল, দেখল গোঁফঅলাকে ছুটে চলে যেতে... নিশ্চয়ই রেমিকে ধরবার জন্য যাচ্ছে। টমি ইতিমধ্যে আঘাত সামলে নিয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল। চট্ করে মাথা টেনে নিল রানা।

'পরিস্থিতি গুরুতর,' মুরল্যাণ্ডকে বলল ও।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো মুরল্যাণ্ড। 'এভাবে পাশার ছক উল্টে যাবে ভাবিনি।'

'রেমি বিপদে পড়েছে, আমাদের সাহায্য দরকার ওর।'

'আমরা বুঝি বিপদে পড়িনি? কী করা যায় ভেবেছ কিছু?'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিল রানা। 'আপাতত এগুলোই আমাদের অস্ত্র।'

'পিস্তলের বিরুদ্ধে ঢিল? বলিহারি তোমার আইডিয়া!'

'ফাজলামি থামাও, ববি,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'পাথর নাও হাতে। আমি বললেই ছুঁড়তে শুরু করবে।'

রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে টমি। অযথাই একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে ট্রলি লক্ষ্য করে। খানিক পরেই খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। গাল দিয়ে উঠল সে। পকেট হাতড়াতে শুরু করল স্পেয়ার অ্যামিউনিশনের খোঁজে।

'এখন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

গড়ান দিয়ে ট্রলির পিছন থেকে বেরিয়ে এল দু'বন্ধু। একযোগে ছুঁড়ল হাতের পাথর। টমির শরীরের এখানে-সেখানে আঘাত হানল সেগুলো। একটা পাথর চাঁদির উপর ঠকাস করে পড়তেই ককিয়ে উঠল সে, বসে পড়ল আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে।

'ট্রলিতে ওঠো!' বন্ধুকে বলল রানা, মুরল্যাণ্ড লাফ দিয়ে তাতে চড়ে বসতেই ট্রলির উল্টোদিকে চলে গেল ও, কাঁধ লাগিয়ে সজোরে ঠেলতে শুরু করল ওটাকে। হ্যাণ্ডব্রেক ইতিমধ্যে রিলিজ করে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড, ফলে ঢালু ট্র্যাক ধরে সহজেই ঘুরতে লাগল চাকা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি পেয়ে গেল ট্রলি।

টমির ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল পিছন থেকে। ব্যস্ত হাতে পিস্তল রিলোড করছে সে। কিছুতেই পালাতে দেবে না দুই শিকারকে। তাকে পাত্তা না দিয়ে এক লাফে বাকেটের কিনার আঁকড়ে ধরল

রানা, শরীর জাগাল। মুরল্যাণ্ড ওকে টেনে তুলল ট্রলিতে। সোজা হয়ে ঘাড় ফেরাল ও। দৌড়াতে শুরু করেছে টমি, তবে ট্রলির তুলনায় তার গতি অনেক কম। চোখের পলকে পরিত্যক্ত বিল্ডিঙের পিছন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাঁক নিয়ে ট্রলি এবার ছুটল অ্যাক্রোপোলিসের দক্ষিণ প্রান্ত লক্ষ্য করে।

মালভূমির উপর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে পর্যটকের দল। পাগলের মত ছুটছে তারা নিরাপত্তার সন্ধানে। একই দশা শ্রমিকদেরও। প্রোপিলেয়া-র সামনে বিশাল এক জটলার সৃষ্টি হয়েছে। হুড়োহুড়ি করছে সবাই... কে কার আগে বেরোতে পারে।

রেমির খোঁজে ব্যগ্র দৃষ্টি বোলাল রানা, যদিও জানে ভিড়ের মাঝে ওকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। খানিক পরেই অবশ্য দেখতে পেল ওকে—ভিড়ের মাঝে নয়, প্যাণ্ডিয়নের স্যাঙ্কচুয়ারির ধ্বংসাবশেষের কাছে। সশস্ত্র গুণ্ডার ধাওয়া খেয়ে ওদিকে চলে গেছে ও। প্রমাদ গুনল রানা, গোঁফঅলা লোকটা একা নয়, আরও দু'জন লেগেছে রেমির পিছনে। এরা সম্ভবত এন্ট্রান্সের কাছাকাছি ছিল, গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে। সবার হাতে শোভা পাচ্ছে পিস্তল।

টমি অনেক পিছনে পড়ে গেছে, ওদিক থেকে আপাতত বিপদের আশঙ্কা নেই, তাই হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ধরল রানা। ট্র্যাকের উপরে ফুলকি ছিটিয়ে থমকে দাঁড়াল ট্রলি। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে এক লাফে নেমে পড়ল রানা।

'ড. হ্যাডলিকে দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু কীভাবে ওঁকে গাড্ডা থেকে বের করে আনা যায় বুঝতে পারছি না। ওঁর পিছনে তিনটা পিস্তল... কিন্তু আমাদের হাত খালি।'

'কেন, আগের প্ল্যানটা কী দোষ করল?' সোজাসাপ্টা বলল রানা। 'এ-কথা বোলো না যে, ঢিল ছুঁড়ে কাজ হয়নি।'

'আবার ঢিল ছুঁড়বে?' চোখ কপালে তুলল মুরল্যাণ্ড। 'যাহ্! ঠাট্টা করছ।'

'ঠাট্টা না, সত্যিই ঢিল ছুঁড়ব,' বলল রানা। 'তবে আকারে একটু বড়।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গ্যান্ট্রি ক্রেইনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ক্রেইন অপারেটর আর ওয়ার্কাররা পালিয়ে গেছে ওটা চালু রেখে—কেইবলের সাহায্যে ওটার বাহুতে ঝুলছে বিশাল এক মার্বেল পাথরের চাঁই। মুরল্যাণ্ডও দেখল ওটা। হাসি ফুটল তার মুখে।

'হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা লাগসই অস্ত্র খুঁজে বের করেছ।'

ছুটে গিয়ে ক্রেইনের অপারেটর'স্ বক্সে উঠে পড়ল দু'জনে। কণ্ট্রোল প্যানেলের উপর নজর বোলাল রানা, ছ'টা লিভার দেখা যাচ্ছে। মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'অপারেট করতে পারবে?'

'আবার জিজ্ঞেস করে!' অপারেটরের আসনে বসে পড়ল মুরল্যাণ্ড। প্যানেলের উপরে নাচতে শুরু করল তার হাত। 'চুপচাপ মজা দেখো।'

ট্র্যাকের উপর দিয়ে পুরো ক্রেইনকে প্যাণ্ডিয়নের স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে নিয়ে গেল সে। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিভার নিয়ে। বিকট আওয়াজ তুলে ঘুরতে শুরু করল ক্রেইনের বিশাল আর্ম। ততক্ষণে রেমিকে একটা দেয়ালের কাছে কোণঠাসা করে ফেলেছে গুণ্ডারা, ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিনদিক থেকে। পিছনে আওয়াজ হতেই চমকে গিয়ে ঘাড় ফেরাল তারা।

অতিকায় পেণ্ডুলামের মত মার্বেল-ব্লকটাকে দোলাল মুরল্যাণ্ড। সরবার সময় পেল না শীর্ণদেহী এক গুণ্ডা, সজোরে তাকে আঘাত করল ব্লকটা, গলফ বলের মত উড়িয়ে দিল। বাতাস কেটে ত্রিশ ফুট দূরে আছড়ে পড়ল লোকটা, শরীরের একপাশের সমস্ত হাড় ভেঙে গেছে। অস্ফুট আর্তনাদ করেই নেতিয়ে পড়ল সে।

হতভম্ব চোখে অপারেটর'স্ বক্সের দিকে তাকাল রেমি। প্লেক্সিগ্লাসের উল্টোপাশে দেখা যাচ্ছে রানা আর মুরল্যাণ্ডের হাসিমাখা চেহারা, হাত নাড়ছে ওকে উদ্দেশ করে।

আন্তোনিয়োও চমকে গেছে, তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে। পজিশন বদলে গুলি করল অপারেটর'স্ বক্সের দিকে। নির্দয় ভঙ্গিতে এবার তার দিকে মার্বেল-ব্লক দোলাল মুরল্যাণ্ড। ঝাঁপ দিয়ে ওটার সামনে থেকে সরে গেল সে। স্যাঙ্কচুয়ারির নড়বড়ে দেয়ালে গিয়ে আঘাত হানল ব্লক, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধসে পড়ল ওটা। রেমিকে চিৎকার করে হাত নাড়তে দেখল রানা—চরম বিপদের মাঝেও জেগে উঠেছে ওর আর্কিয়োলজিস্ট সত্তা, ওদেরকে মানা করছে এখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে। রানাও বুঝল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

'থামো, ববি,' মুরল্যাণ্ডের কাঁধে হাত রাখল ও। 'এখানকার কোনোকিছু নষ্ট করা চলবে না।'

'কথাটা ওদেরকে বোঝাতে পারো কিনা দেখো,' টিকে থাকা দুই গুণ্ডার দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। কাভার খুঁজে নিয়ে ইতস্তত গুলি ছুঁড়ছে দু'জনে। যদিও খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। 'খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুক, তাতে বেশ ভালই হয়।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই। এমনিতেই যথেষ্ট চমকে দেয়া গেছে ওদের। বাকি কাজ সারবে এটা।'

ব্যাকপ্যাক ঘেঁটে একটা স্মোক গ্রেনেড বের করল রানা। দুটো কিনেছিল গতকাল—একটা অ্যাথেন্সের মিউজিয়ামে ব্যবহার করেছিল, অন্যটা রয়ে গেছে ব্যাগের ভিতরে।

দেরি করল না, বক্সের দরজা খুলে শরীরের একাংশ বের করল ও। পিন খুলে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল গুণ্ডাদের মাঝখানে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিস্ফোরণ ঘটল, ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে

গেল চারপাশ। টপাটপ ক্রেইন থেকে লাফিয়ে নামল রানা ও মুরল্যাণ্ড। ধোঁয়ার মাঝে হাতড়ে রেমিকে খুঁজে বের করল ওরা। তখুনি আবার গুলি করল আন্তোনিয়ো ও তার সঙ্গী। কিছু দেখতে না পেলেও আন্দাজের উপর নির্ভর করে ফায়ার করছে ওরা।

মাটিতে বসে পড়ল রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। ওদের উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা বুলেট। আশপাশ দিয়ে গেল আরও কিছু।

'এবার কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'এন্ট্রান্সের দিকে ঝেড়ে দৌড় দেবে?'

'তাতে লাভ হবে না,' বলল রানা। 'ওখানে যে-রকম জটলা দেখেছি... বের হতে পারব না। আটকা পড়ে যাব।'

'তা হলে?'

'আরেকটা প্ল্যান আছে আমার, তবে ওটা খানিকটা পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।'

'অসুবিধে কী,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'গত দু'দিন থেকে তো পাগলামিই করে বেড়াচ্ছি আমরা।'

গুঙিয়ে উঠল রেমি। 'আবার কী করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'দেখতেই পাবে। এসো আমার সঙ্গে।'

ধোঁয়া ভেদ করে করে ছুট লাগাল রানা। ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। মালভূমির পূর্ব প্রান্ত বেশি দূরে নয়, ওখানে পৌঁছে গেল দু'মিনিটের মধ্যে। জায়গাটা পাহাড়ি ব্লাফের মত। নিচু একটা রেলিং আছে, ওটার গোড়া থেকে কয়েকশো ফুট নেমে গেছে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল।

'এখান দিয়ে নামবে?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'কীভাবে? আমাদের সঙ্গে ক্লাইম্বিং গিয়ার নেই।'

'ক্লাইম্ব করব না,' বলল রানা। 'আমরা শর্টকাট ব্যবহার করব।'

কয়েক ফুট দূরেই রয়েছে উঁচু একটা ইলেকট্রিক পোল।

সম্প্রতি বসানো হয়েছে ওটা। রেস্টোরেশনের কাজে ব্যবহারের জন্য নীচ থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ আসছে মোটা চারটে লাইনের মাধ্যমে। ত্রিশ ডিগ্রি কোণে লাইনগুলো ঢালু হয়ে চলে গেছে দু'মাইল দূরে। ওগুলোর দিকে ইশারা করল রানা।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'সত্যিই পাগল হয়ে গেছ তুমি। ইলেকট্রিকের লাইন বেয়ে নীচে নামবে? তারে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে শক খেয়ে মরব আমরা!'

'ইনসুলেটেড লাইন,' বলল রানা। 'শক খাবার ভয় নেই। তা ছাড়া তার বাইতেও যাচ্ছি না আমরা। স্লাইড করে নামব।'

সঙ্গীদেরকে প্রতিবাদ করবার সুযোগ দিল না ও। ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল পোলের পাশে। মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কারদের কাজের সুবিধের জন্য পোলের গায়ে লোহার ধাপ লাগানো আছে, সেগুলো বেয়ে খুব দ্রুত উপরে উঠে গেল তিনজনে। তারের কাছে পৌঁছে থামল। ততক্ষণে ওদেরকে দেখে ফেলেছে গুণ্ডারা। নতুন করে ছুটে এল গুলি।

এক টানে কোমর থেকে প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলল রানা। ইলেকট্রিকের তারের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আবার লাগিয়ে ফেলল হুক। লুপে পরিণত হলো ওটা।

'আহ্হ্!' হঠাৎ কাতরে উঠল মুরল্যাণ্ড। একটা গুলি ওর উরু স্পর্শ করে গেছে। বন্ধুর উদ্দেশে চেঁচাল, 'জলদি করো, রানা। নইলে মোরব্বা হয়ে যাব।'

বেল্ট ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ওর ওজনে ঢালু তার ধরে পিছলাতে শুরু করল জিনিসটা। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল গতি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একই পদ্ধতিতে ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড। শাঁই শাঁই করে মালভূমির কিনার পেরিয়ে নীচের দিকে ছুটে গেল তিনটে দেহ।

দৌড়ে ব্লাফের কিনারায় এল আন্তোনিয়ো ও তার সঙ্গী।

কয়েক মিনিট পর টমিও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। বৃথাই রানাদের উদ্দেশে শেষ কয়েকটা বুলেট অপচয় করল তিনজনে।

প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে রানা ও তার সঙ্গীরা। কানের পাশে শোঁ শোঁ করে বাতাসের চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই... ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চোখ খুলে রাখা দায়। কষ্ট করে সামনে তাকাল রানা। নীচে চলে এসেছে ওরা। একতলা একটা বিল্ডিঙের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ছেড়ে দিল হাত। ঝুপ করে নামল ছাতে। ভীষণ ঝাঁকি খেলো গোটা শরীর, গতির কারণে গড়ান দিয়ে কিছুদূর চলে গেল ও। পড়ে রইল ওভাবেই। বেশ ব্যথা পেয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রেমি আর মুরল্যাণ্ডও নামল। একই ভঙ্গিতে গড়ান খেয়ে রানার গায়ে ধাক্কা খেলো দু'জনে। কিছুটা সময় নিস্তেজ পড়ে রইল তিনটে দেহ।

খানিক পরে ককিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বাবা রে... মরে গেছি!'

আস্তে আস্তে উঠে বসল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ সবাই? কোথাও লাগেনি তো?'

'আবার জিজ্ঞেস করে!' মুরল্যাণ্ডও উঠল। 'সারা শরীর টনটন করছে, আর তুমি কিনা...'

'সিরিয়াস ইনজুরির কথা বলছি। আহত হওনি তো?'

দেখা গেল কেটে-ছড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছু হয়নি কারোই। স্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো। হাতে সময় নেই, এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

বারো

আইপডে মেটালিকার গানের সঙ্গে গুনগুন করে সুর মেলাচ্ছে রেনফিল্ড, তবে তার হাত থেমে নেই। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের কন্টেইনারে ডেটোনেটর সেট করায় ব্যস্ত সে। কাজের সময় গান শোনা তার অভ্যাস। দ্রুত লয়ের হেভি মেটাল মিউজিক তার কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়।

গ্যারেট আর কাটনার ইয়োরোপে চলে যাওয়ায় এ-মুহূর্তে বেনসন ছাড়া আর কেউ নেই তার সঙ্গে। সে আবার বেসবলের পাগল। সুযোগ পেলেই খেলার বিভিন্ন রেকর্ড, স্ট্যাটিসটিক্স, খেলোয়াড় আর দল নিয়ে বকবক শুরু করে দেয়। কিছুতেই আর থামতে চায় না। মাথা ধরিয়ে দেয় একেবারে। অগত্যা তাকে এড়িয়ে চলছে রেনফিল্ড। কাজের সময় হোক, বা অবসর... আইপড-টাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বেনসনকে বাদ দিলে পরিবেশটা খুব একটা অপছন্দ নয় রেনফিল্ডের। ওয়্যারহাউসে এয়ার-কন্ডিশনিঙের ব্যবস্থা নেই, তবে উঁচু ছাতের কারণে তাপ ঠিকমত পৌঁছায় না নীচে। কাজের জায়গাটুকু মোটামুটি ঠাণ্ডা থাকে। এক্সপ্লোসিভ নিয়েও চিন্তার কিছু নেই, ওগুলো যথেষ্ট স্টেবল। আগুন, সংঘর্ষ, বা বৈদ্যুতিক চার্জ... কোনোকিছুতেই বিস্ফোরণ ঘটবে না। তাই নিশ্চিন্ত মনে একটানা কাজ করে চলেছে সে—খাওয়া আর ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে।

পঞ্চাশ গ্যালন কন্টেইনারের ঢাকনা বন্ধ করল রেনফিল্ড। ইশারা পেয়ে ওর দিকে একটা হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে এগিয়ে এল বেনসন—ওটার সাহায্যে ড্রামগুলো সরাচ্ছে ওরা।

'কোথায় রাখব এটাকে?' বেনসন জানতে চাইল।

ওয়্যারহাউসের অভ্যন্তরে নজর বোলাল রেনফিল্ড। পুরো সীমানা জুড়ে পঞ্চাশ ফুট অন্তর অন্তর একই রকম অনেকগুলো ড্রাম সাজিয়েছে ওরা—ওয়ায়্যারের সংযোগ দেয়া হয়েছে সবক'টায়। খালি জায়গা বলতে বন্দিশালার দু'পাশের দেয়াল, বাকি সব কাভার হয়ে গেছে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কামরার পাশে রাখো,' বলল সে। 'বাইরের দেয়াল ঘেঁষে রাখবে।'

ড্রাম নাড়াচাড়ায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বেনসন, এক ঝটকায় কার্টে তুলে ফেলল নতুন ড্রামটা। ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল। রেনফিল্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরেকটা ড্রাম নিয়ে—এটাই শেষ।

বাইনারি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে পুরো ওয়্যারহাউস উড়িয়ে দেবার আইডিয়াটা ওর-ই। ওরা চলে যাবার পর এখান থেকে পুলিশ বা এফবিআই কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না। প্রস্তাবটার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হয়নি গ্যারেটের—যে-ধরনের অপরাধ ওরা ঘটাতে চলেছে, তাতে কোনও প্রমাণ রাখা চলে না। তাই রাজি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিস্ফোরকের সেটআপের দিকে তাকাল রেনফিল্ড। এমনভাবে ড্রামগুলো বসানো হয়েছে, যাতে বিস্ফোরণের পর পুরো ওয়্যারহাউস ধুলোয় মিশে যায়। বাড়তি তিন ড্রাম গ্যাসোলিনও রেখেছে সে—কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আরও একটা কাজ সেরেছে রেনফিল্ড, সেটা বাইনারি

এক্সপ্লোসিভ তৈরির চেয়ে শতগুণ কঠিন ছিল। রেডিও-অ্যাকটিভ মেটেরিয়ালের সাহায্যে আরও বড় একটা বোমা বানাতে হয়েছে তাকে। কাজটা করতে হয়েছে হ্যাজম্যাট সুট পরে, নইলে রেডিয়েশনে নিজেই অক্কা পেত। যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল ওতে, তবে শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়েছে সব। গ্যারেটের ধারণা, এসবের পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য জানা নেই রেনফিল্ডের; তবে যতটা বোকা দেখায়, ততটা নয় তার বোমা-বিশেষজ্ঞ।

দু'দিন আগেই গ্যারেটের কম্পিউটার হ্যাক করেছে রেনফিল্ড, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছে আর্কিমিডিস কোডেক্সের অনূদিত কপি; পড়ে ফেলেছে ওটা। চুরি করে গ্যারেটের ব্যাগেও উঁকি দিয়েছে সে, দেখে ফেলেছে নিরেট সোনায় গড়া হাতটা। ফলে কোনও কিছুই এখন আর অজানা নয় তার। রেনফিল্ড জানে, রাজা মাইডাসের অতুল গুপ্তধন উদ্ধার করতে চলেছে তার নিয়োগকর্তা। পারিশ্রমিক হিসেবে যে-দুই মিলিয়ন ডলার তাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গ্যারেট, সেটা এখন নিতান্তই সামান্য বলে ঠেকছে তার কাছে।

শেষ ড্রামে বাইনারি এক্সপ্লোসিভ ঢালতে ঢালতে চিন্তায় ডুবে গেল রেনফিল্ড। না, এত অল্পে সন্তুষ্ট হবার প্রশ্নই ওঠে না। পুরো অপারেশনে তার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। উদ্ধার করা সোনার দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলতে চলেছে গ্যারেট, ফলে বিলিয়নেয়ার নয়... ট্রিলিয়নেয়ার হয়ে যাবে সে। ও কেন বঞ্চিত হবে, কোন্ দুঃখে মাত্র দুই মিলিয়ন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে সে?

ঘাড় ফিরিয়ে *উইলবিক্স কনস্ট্রাকশন*-এর ছাপ্পড় মারা ট্রাকটার দিকে তাকাল রেনফিল্ড। গর্বের হাসি হাসল। তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হতে চলেছে ওটা। ওই ট্রাকই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত করবে তাকে। অগাস্ট রেনফিল্ডকে সারা দুনিয়া চিনবে সেই লোক হিসেবে, যে মহাপরাক্রমশালী

আমেরিকার সুপারপাওয়ার চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছিল। দুঃখ একটাই—তার এই অর্জনের স্বীকৃতি সরাসরি ভোগ করা সম্ভব হবে না। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য কৃতিত্বটা চাপাতে হবে অন্যের ঘাড়ে।

মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর আইডিয়া গ্যারেটের। চরমপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ করা হয়, এমন দু'জন মুসলিম ছাত্রকে সেই কারণেই কিডন্যাপ করে এনেছে ওরা। এমনভাবে ঘটনা সাজানো হবে, যাতে মনে হয় আল-কায়েদার ছত্রছায়ায় ওরাই ঘটিয়েছে বিস্ফোরণটা। সওডাস্ট বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভারকে সেজন্যেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ আর এফবিআই-এর কাছে সাক্ষ্য দেবে সে—দু'জন মুসলিম টেরোরিস্ট হাইজ্যাক করেছে তার ট্রাক... যেটা ব্যবহার করা হয়েছে নাশকতার কাজে। মুখোশ পরে আরব উচ্চারণে কথা বলে তাকে চমৎকারভাবে ধোঁকা দিয়ে এসেছে গ্যারেট আর বেনসন। আগামীতে ওয়্যারহাউসের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া যাবে ছাত্রদুটির উপস্থিতির চিহ্ন। আর তাদের ছিন্নভিন্ন লাশ আবিষ্কৃত হবে বিস্ফোরিত ট্রাকের ভিতরে।

মুখের হাসি বিস্তৃত হলো রেনফিল্ডের। নিখুঁত ছক সাজানো হয়েছে। কেউ ভাবতেই পারবে না, কাণ্ডটা ওরা ঘটিয়েছে। সমস্ত দোষ চাপবে মুসলিম দুই যুবকের উপর। নতুন করে দু'চারটে মুসলিম দেশের উপর হয়তো হামলাও চালানো হবে। তাতে কী? রেনফিল্ড ও তার সহকর্মীরা তখন পছন্দসই কোনও দ্বীপরাষ্ট্রে বসে উপভোগ করবে সফল অপারেশনের পুরস্কার। রাজার হালে জীবন কাটাবে ওরা... নির্ভয়ে।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির কথা ভাবল রেনফিল্ড। ওদের গোমর শুধু এরাই ফাঁস করে দিতে পারে। তবে সেটা ঠেকানো এমন কোনও কঠিন কাজ নয়। সময়মত দু'জনের

খুলিতে একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই হবে। এরপর পায়ে পাথর বেঁধে লাশদুটো ফেলে দিতে হবে পটোম্যাক নদীতে, যাতে গোটা অপারেশনের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কেউ খুঁজে না পায়।

কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আবারও মৃদু হতাশা ভর করল রেনফিল্ডের মাঝে। এত বড় একটা সাফল্য... অথচ তার নাম জানবে না কেউ? ছোটখাট কোনও চিহ্ন দিয়ে রাখা যায় না? এখন না হোক, দু'চার বছর পরে যেটার রেফারেন্স দিয়ে নিজের কৃতিত্ব দাবি করা যাবে? তখন যথেষ্ট বড়লোক এবং ক্ষমতাবান হয়ে যাবে সে, বিপদের ভয় থাকবে না। কেউ টিকিটিও ছুঁতে পারবে না তার। তলে তলে অনেকে হয়তো ঘৃণা করবে তাকে, গালমন্দ করবে... কিন্তু দুনিয়ার বহু জায়গায়, বিশেষ করে আমেরিকা-বিদ্বেষীর মাঝে তাকে যে বীরের মর্যাদা দেয়া হবে, তাতে সন্দেহ নেই। জলজ্যান্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হবে সে।

ট্রাক-বোমাটার দিকে যতবারই তাকায়, গর্বে বুক ফুলে ওঠে রেনফিল্ডের। সত্যিই চমৎকার এক ডিজাইন হয়েছে ওটা। পাঁচশো পাউণ্ড বাইনারি এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে তিনশো গ্যালন গ্যাসোলিনের তলায়। ওগুলো চাপা পড়ে আছে অতি-দাহ্য ষাট হাজার পাউণ্ড সওডাস্ট, অর্থাৎ কাঠের গুঁড়োর নীচে। বিশেষ একটা সীসার কেইসে ভরে স্ট্রনটিয়ামও রাখা হয়েছে ওগুলোর সঙ্গে। বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মেটেরিয়ালটা মিশে যাবে সওডাস্টের সঙ্গে, জিনিসটা পরিণত হবে রেডিও-অ্যাকটিভ অ্যাশ... মানে তেজস্ক্রিয় ছাইয়ে। বাতাসে ভেসে গিয়ে মাইলের পর মাইল এলাকা বিষাক্ত করে তুলবে এই ছাই।

আক্রান্ত এলাকার বিল্ডিংগুলোর এয়ার-হ্যাণ্ডলিং ইউনিট এর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেবে। ওগুলোর কল্যাণে প্রতিটা দালানের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়বে ছাইয়ের কণা, আক্ষরিক অর্থেই দালানগুলোকে করে তুলবে একটা করে মৃত্যুফাঁদ। এমন

তেজস্ক্রিয়তা কোনও ভাবেই দূর করা সম্ভব নয়, বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া গতি থাকবে না আর। আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে দূর-দূরান্তে পালিয়ে যাবে মানুষ।

ইতিমধ্যেই সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। ট্রাক নিয়ে আগামীকাল বেরিয়ে পড়বে রেনফিল্ড আর বেনসন। গ্যারেট ওদের অ্যাকাউন্টে পারিশ্রমিকের টাকা জমা করে দিলে পূর্ব-নির্ধারিত লোকেশনে ট্রাকটা পার্ক করবে ওরা। তারপর দ্রুত কেটে পড়বে। দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘটাবে বিস্ফোরণ।

সোমবার নাগাদ পুরোপুরি বদলে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা। ধ্বংস হয়ে যাবে স্টক মার্কেট। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এই অর্থনৈতিক চালিকা-কেন্দ্র যখন অচল হয়ে পড়বে, মুখ থুবড়ে পড়বে জাতীয় অর্থনীতি। রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে লক্ষ-কোটি ডলার। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এই বিপর্যয়ের পর মানুষ তাদের পুঁজি বাঁচাবার জন্য ছুটবে বিনিময়যোগ্য নিরেট সামগ্রীর পিছনে। আর দুনিয়ায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিনিময়-সামগ্রী একটাই—সোনা! ওই সোনাই কিনতে চাইবে সবাই, ফলে চরম চাহিদার মুখে রকেটের মত উর্ধ্বগতি পাবে সোনার দাম।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রেনফিল্ড। জেমস বণ্ডের ভিলেন গোল্ডফিঙ্গার সঠিক পদ্ধতিই খুঁজে বের করেছিল আমেরিকার পায়ে কুড়াল মারার জন্য—নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে তেজস্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল মার্কিন সোনার সবচেয়ে বড় মজুদ। তবে লোকেশন বাছাইয়ে সামান্য ভুল ছিল তার। কেন্টাকির ফোর্ট নক্সে হামলা করেছিল সে। ওখানকার সোনার মজুদ আসলে আমেরিকার সবচেয়ে বড় মজুদ নয়। আসল মজুদ রয়েছে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে... ওখানে দুনিয়ার দশ শতাংশ স্বর্ণ সংরক্ষিত আছে বলে ধারণা করা হয়। দামের ওঠানামার

গড়পড়তা হিসেব মাথায় রাখলে... ওখানে রয়েছে প্রায় তিনশো বিলিয়ন ডলারের সোনা!

কিন্তু আগামীকালের পর ওই সোনার চার আনা দামও থাকবে না। রেনফিল্ডের বোমা গোল্ডফিঙ্গারের প্ল্যানকে সত্যি করে তুলবে! মাটির আশি ফুট নীচে রাখা ওই সোনা এয়ার-সার্কুলেশন সিস্টেমের কল্যাণে ছেয়ে যাবে রেডিও-অ্যাকটিভ ছাইয়ে। পুরো মজুদ হয়ে পড়বে তেজস্ক্রিয়... ব্যবহারের অনুপযোগী!

অনেক চিন্তাভাবনা করে বাছাই করা হয়েছে এই লোকেশন। নিউইয়র্কের ফিনানশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট—ওখানে অল্প কয়েক বর্গমাইলের ভিতর রয়েছে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর নিউ ইয়র্ক স্টক একচেঞ্জ-সহ অসংখ্য ইনভেস্টমেন্ট ও ব্রোকারেজ ফার্ম। সোজা কথায় গোটা আমেরিকার অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু এই জায়গা। ওখানেই ফাটানো হবে বোমা।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেনফিল্ডের। আর মাত্র একটা দিন... তারপরেই বদলে যাবে সব। যে-সরকার আর সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা নিয়ে বাঁচছে সে, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়া যাবে তার বিরুদ্ধে। নিজেকে অমিত শক্তিশালী মনে হলো তার। চব্বিশ ঘণ্টা পরেই রিমোট কন্ট্রোলের বাটনে একটা চাপ দিয়ে লোয়ার ম্যানহাটনকে ধ্বংস করে দেবে সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি আর প্রগতির প্রতীককে পরিণত করবে স্রেফ এক পরিত্যক্ত বন্ধ্যাভূমিতে!

ধ্বংসের নেশায় উন্মাদের মত হেসে উঠল রেনফিল্ড।

তেরো

ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায়, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে নুমার এগজিকিউটিভ জেট। আর এক ঘণ্টা পরেই পৌঁছে যাবে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে। প্যাসেঞ্জার কেবিনে বসে, নুমার সিকিওর্ড ভিডিও চ্যানেলে ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। শেষ মুহূর্তের আলোচনা চলছে, ল্যারি কিং-কে নিয়ে ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে নিজেই যাবেন রেডক্লিফ। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে যদি সত্যি সত্যি মুক্তি দেয় গ্যারেটের লোকেরা, তাঁকে নিয়ে আসবেন। অবশ্য তেমন সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

'এফবিআই-কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই,' তাঁকে বলল রানা। 'ওরা কাজের চেয়ে অকাজ বেশি করে। শুধু আপনারা দু'জনই গেলে ভাল হয়।'

'প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বললেন রেডক্লিফ। 'আমি ভাবছিলাম, এফবিআইয়ের সাহায্য নিয়ে ফাঁদ পাতব। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে যারা নিয়ে আসবে, তাদেরকে আটক করব।'

'ভুলেও ও-কাজ করতে যাবেন না। ওরা যদি ফাঁদের গন্ধ পায়, অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেলকে খুন করবে নির্ঘাত। এমন ঝুঁকি নেয়া চলে না। তারচেয়ে ওদের কথামত কাজ করা যাক।

লোকগুলো পালিয়ে গেলে তেমন কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে না, অন্তত হোস্টেজদের তো ফিরে পাচ্ছেন! আমাদের আসল টার্গেট গ্যারেট, ওকে সামাল দেবার জন্য আমি আর ববি আছি।'

'তোমাদের ব্যাপারেই আসলে আমি বেশি দুশ্চিন্তা করছি। একাকী যাচ্ছ... ইটালিয়ান পুলিশের সাহায্য নিতে পারো না?'

'*ক্যারাবিনিয়ারি* কিছু করবে বলে মনে হয় না। আমাদের পাওয়া ইনফরমেশন বলছে, ইটালিতে গ্যারেট কোনও অপরাধ করেনি।'

'যদি বিপদে পড়ো?'

'পড়ব, তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যে ব্যাকআপও থাকবে। পার্থেননের ঘটনায় বিশাল একটা শিক্ষা হয়ে গেছে। ভাবছি আমার এজেন্সির দু'একজন অপারেটরকে সঙ্গে নেব।'

'গ্রিসেই সেটা করা উচিত ছিল।'

'তখন তো কল্পনাই করিনি, অ্যাক্রোপোলিস পর্যন্ত আমাদেরকে ধাওয়া করতে পারে মায়ার লোকেরা।'

'বেটি যথেষ্ট একরোখা, স্বীকার করতেই হচ্ছে,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'একরোখামি করবে না কেন?' বললেন রেডক্লিফ। 'কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনা পাবার লোভ যে-কাউকেই পাগল করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। আমি সে-কারণেই ভয় পাচ্ছি, রানা। ওই সোনার জন্য রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে দ্বিধা করবে না মায়া লরেঞ্জো... আর আমার ধারণা তোমরা ওর হিটলিস্টের শুরুর দিকে রয়েছ।'

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'পরিস্থিতি এমনিতেই জটিল। তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে স্ট্রনটিয়াম। গ্যারেট ওটা দিয়ে কী ঘটাতে চাইছে, জানি না আমরা। ওকে আটকানোটা একটা প্রায়োরিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে কিন্তু আমরা কেউই শিয়োর না,'

বললেন রেডক্লিফ। 'গোপনে খোঁজখবর নিচ্ছি আমি, এখন পর্যন্ত স্ট্রনটিয়ামের কোনও অবৈধ বা বৈধ শিপমেন্টের ইনফরমেশন পাইনি।'

'তারমানে এই নয় যে, জিনিসটা গ্যারেটের হাতে নেই। শিয়োর না হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সতর্ক করতেন না আমাদের।'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করলেন রেডক্লিফ। 'কিন্তু কীভাবে গ্যারেটকে আটকাবে বলে ভাবছ তোমরা?'

'পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর ওই আউটডোর কনসার্টে যাব আমি আর রেমি,' বলল রানা। 'জায়গাটা নেপলস ওয়াটারফ্রন্টের পাশে। প্রচুর দর্শক থাকবে ওখানে, সে-কারণেই দেখা করবার জন্য জায়গাটা বেছে নিয়েছে গ্যারেট। ঝামেলা দেখা দিলে ভিড়ের মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সটকে পড়তে পারবে। তবে সেই সুযোগ পাবে না সে।'

'রোমে পৌঁছেই রানা এজেন্সির অপারেটরদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে রানা,' যোগ করল মুরল্যাণ্ড। 'আলাদাভাবে নেপলসে যাব আমরা, পিয়াৎজা-র কাছাকাছি ঘাপটি মেরে থাকব... গ্যারেটের চোখের আড়ালে। রানার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমাদের, ওর সিগনাল পেলেই ঝটিকা হামলা চালিয়ে গ্যারেটকে আটক করব।'

'একই প্ল্যান গ্যারেটের মাথাতেও থাকতে পারে,' বললেন রেডক্লিফ। 'জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে তোমাদের লোকেশন ও জানতে পারছে। কনসার্টে যাবার আগেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে আটক করতে পারে।'

'সেটা আমিও ভেবেছি,' বলল রানা। 'তাই ট্র্যাকারটা জিয়োলেব থেকে খুলে ফেলেছি আমি। ওটা ববির কাছে থাকবে। গ্যারেট যদি আগেভাগে হামলা চালায়, আমাকে বা রেমিকে পাবে

না। ববিরও ভয় নেই, ওকে রক্ষা করবে আমার অপারেটররা।'

'আর ও যদি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি না দেয়?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র অসহায় বোধ করল রানা। আড়চোখে তাকাল রেমির দিকে—ওরও একই দশা।

'দুঃখিত, মি. রেডক্লিফ,' বলল রানা। 'এ-মুহূর্তে দ্বিতীয় কোনও প্ল্যান নেই আমার। যে-কোনও মূল্যে গ্যারেটকে বাগে পেতে হবে, নইলে...'

কথাটা শেষ করল না ও। তবে এর গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হলো না মি. রেডক্লিফের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এগিয়ে যাও। আমার শুভকামনা রইল। সাবধানে থেকো।'

'আপনিও।'

'গুড বাই।'

স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। সুইচ টিপে ওটা বন্ধ করে দিল রানা।

'একটা ড্রিঙ্ক দরকার আমার।' সিট থেকে উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। 'তোমাদের কিছু লাগবে?'

মাথা নাড়ল রানা ও রেমি। মুরল্যাণ্ড চলে গেল বিমানের পিছনদিকে। সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদল রানা।

'কী ভাবছ?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'তেমন কিছু না,' চোখ না খুলেই বলল রানা। 'প্ল্যানের খুঁটিনাটি যাচাই করে নিচ্ছি।'

'কাজ হবে ওতে? সন্দিহান গলায় বলল রেমি। 'সহজে ধরা দেবার পাত্র বলে তো মনে হয় না গ্যারেটকে। পাল্টা কোনও ফন্দি যে ও আঁটছে না, তা জানছ কী করে?'

'ফন্দি আঁটছে, তাতে সন্দেহ নেই।' সোজা হয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও উপায় নেই। দর

কষাকষির মত কিছুই নেই আমাদের হাতে।'

'জিয়োলেবটা আছে। ওটার সাহায্যে আমরা নিজেরাই মাইডাসের চেম্বার খুঁজে বের করি না কেন? চেম্বারটা আমাদের দখলে এসে গেলে ও আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।'

'অত সময় নেই আমাদের হাতে। আজ রাতেই দেখা করতে হবে গ্যারেটের সঙ্গে। ওকে ধাপ্পা দিয়েও কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

গুম মেরে গেল রেমি।

নরম গলায় রানা বলল, 'আজ রাতে তোমার না গেলেও চলে। আমি একাই সামলাতে পারব গ্যারেটকে। ববি আর আমার এজেন্সির অপারেটররা তো থাকছেই।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল রেমি। 'তোমরা ওদিকে ঝুঁকি নেবে, আর আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? তা হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। তোমার যা মর্জি।' সিটে আবার হেলান দিল ও।

'রানা!' খানিক পর মৃদুস্বরে ডাকল রেমি।

'কী?'

'কী মনে হয় তোমার... সত্যিই কি আজ রাতে র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ছেড়ে দেবে গ্যারেট?'

'ছাড়বে,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'নিজ থেকে ছাড়তে না চাইলে ওকে আমরা বাধ্য করব!'

নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। সেদিকে তাকিয়ে রেমির নিজেরই ভয় ভয় করে উঠল। বুঝল, রানাকে চিনতে ভুল হয়েছিল ওর। শান্ত, নম্র, ভদ্র মানুষটির ভিতরে লুকিয়ে আছে নির্মম আরেকটি সত্তা—তা ও বুঝতেই পারেনি। গ্যারেটের জন্য এক অর্থে মায়াই হলো ওর। ভুল মানুষের সঙ্গে লাগতে গেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, রানা তাকে কিছুতেই রেহাই

দেবে না। ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মনের বোঝা হঠাৎ করেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল রেমির। র‍্যাচেলকে ফিরে পাবে কি না জানে না; কিন্তু গ্যারেট যে তার অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পাবে, তা ভেবে ভাল লাগছে।

রানার পাশের সিটে শরীর এলিয়ে দিল ও। চোখ মুদল স্বস্তি নিয়ে।

চোদ্দ

প্রকোষ্ঠের দরজার ফোকর খুলে গেল, শোনা গেল হ্যাণ্ডকাফের ধাতব ঝনঝনানি। এরপরেই ভেসে এল বেনসনের কণ্ঠ।

'উঠে পড়ুন, অ্যাডমিরাল! আজকের ভিডিও করবার সময় হয়ে গেছে।'

ফোকর দিয়ে ভিতরে ছুঁড়ে দেয়া হলো দুই জোড়া হ্যাণ্ডকাফ। বিছানায় ধীরে ধীরে উঠে বসলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। দুর্বল বোধ করছেন। গত দু'দিনে মাত্র দু'বার খেতে দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাই বলে দমে যাননি তিনি, আজ একটা এস্পার ওস্পার করেই ফেলবেন।

সন্দেহ নেই, যা করতে চাইছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক; কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সাফল্য নির্ভর করছে প্রতিপক্ষকে কতটা চমকে দিতে পারেন, তার ওপর। একটামাত্র সুবিধা আছে তাঁর—কিডন্যাপাররা তাঁকে অথর্ব এক বৃদ্ধ বলে ভাবছে। তিনি যে

কিছু করে বসতে পারেন, তা ভাবছেই না। গত চারদিনে ওদের এ-মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁর কাছে। দেখা যাক ওদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেয়া যায় কি না।

চারদিনের না-কামানো দাড়িতে হাত বোলালেন তিনি। কুটকুট করছে গাল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেননি এই ক'দিন, তবে আশা করছেন গাল-টাল ভেঙে চোখ গর্তে বসে গেছে। চেহারা যত হতশ্রী দেখায়, ততই ভাল—ওরা তাঁকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবে।

ঝুঁকে মেঝে থেকে হ্যাণ্ডকাফগুলো তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল। প্রকোষ্ঠ থেকে বের হবার আগে প্রতিদিন একই রুটিন—পা আর হাতে পরে নিতে হয় হ্যাণ্ডকাফ। এরপর দরজা খোলে বেনসন, হাতে থাকে বৈদ্যুতিক টেযার; ওকে দেখিয়ে নিতে হয় কাফগুলো ঠিকমত আটকেছেন কি না। সন্তুষ্ট হবার পর তাঁকে প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে বেনসন।

এই রুটিনে আজ সামান্য কারসাজি করবেন বলে ঠিক করেছেন হ্যামিলটন। বন্দি করার সময় তাঁর সবকিছুই কেড়ে নিয়েছে ওরা, কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস রয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে। শার্টের কলারের ভিতরে এক টুকরো সরু প্লাস্টিক স্টে। ওটা আসলে শার্টেরই অংশ—কলারকে শক্ত রাখবার জন্য সেলাইয়ের সময় ঢুকিয়ে দিয়েছে দর্জি। সেলাই খুলে জিনিসটা বের করে এনেছেন তিনি, সময় নিয়ে বার বার ভাঁজ করে ও-থেকে সরু দুটি টুকরো ভেঙে নিয়েছেন। ওগুলোই অ্যাডমিরালের গোপন অস্ত্র।

হ্যাণ্ডকাফ পরবার সময় তাঁর উপর নজর রাখে না বেনসন, এই সুযোগটাই কাজে লাগালেন তিনি। দ্রুত কাফদুটোর চাবির ফুটোয় ঢোকালেন প্লাস্টিকের টুকরোগুলো। এমনভাবে সেট করলেন, যাতে হাত-পায়ে এঁটে নেবার পরেও কাফের খোলা অংশটা ভিতরের খাঁজে ঠিকমত না বসে। ঝটকা দিলেই খুলে

যাবে ওগুলো, তবে হঠাৎ দেখায় ধোঁকাটা বুঝবার উপায় নেই।

'আমি রেডি,' খানিক পরে গলা চড়িয়ে জানালেন অ্যাডমিরাল।

দরজা খুলল বেনসন, হাতে উদ্যত টেযার। 'হাত-পা দেখান।'

দেখালেন অ্যাডমিরাল। কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না বেনসন, শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। 'ঠিক আছে, বেরোন।'

সাবধানে পা ফেললেন হ্যামিলটন। ঝাঁকি, অথবা পায়ের টান খেয়ে হ্যাণ্ডকাফ খুলে গেলে সব শেষ। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ নজর বুলালেন চারপাশে। ওয়্যারহাউসের চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো ড্রাম বসানো হয়েছে। নানান রঙের ওয়ায়্যার লাগানো হয়েছে ওগুলোর সঙ্গে। দূরে একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে কী নিয়ে যেন কাজ করছে রেনফিল্ড, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গতকাল গ্যারেট আর কাটনারকে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যেতে দেখেছেন তিনি, ওরা বোধহয় আর ফেরেনি। খুশি হলেন অ্যাডমিরাল, এমনটাই তো চাই!

দেয়ালের পাশে রাখা চেয়ারে তাঁকে বসাল বেনসন। কোলের উপর রাখল দৈনিক পত্রিকা, তারপর ট্রাইপডে রাখা ভিডিও ক্যামেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিল ছেড়ে উঠল না রেনফিল্ড, আজ বেনসন একাই ভিডিও করবে।

ক্যামেরার লাল বাতি জ্বলে উঠল। জুম করে পত্রিকার প্রথম পাতার ছবি তুলল বেনসন, তারপর লেন্স তাক করল অ্যাডমিরালের মুখের দিকে। নাম জানতে চাইল।

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।'

'আপনি কেমন আছেন, অ্যাডমিরাল?'

'সুস্থ। আমার উপর কোনও অত্যাচার করা হয়নি।'

'গুড!' ক্যামেরা অফ্ করে দিল বেনসন। 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! এবার উঠুন। আপনাকে কামরায় পৌঁছে দিয়ে মেয়েটাকে আনতে হবে।'

নড়লেন না অ্যাডমিরাল।

'কী হলো?' অধৈর্য গলায় বলল বেনসন। 'উঠছেন না কেন?'

'ওই খুপরির মত কামরা আমার ভাল লাগে না,' বললেন হ্যামিলটন। 'আমি ওখানে ফিরছি না।'

'কী বললেন?' ভুরু কোঁচকাল বেনসন। 'আপনার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? ভালয় ভালয় উঠুন বলছি! নইলে...'

'পারলে ওঠাও!' চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন হ্যামিলটন।

ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল বেনসন। তারপরেই হিংস্র হয়ে উঠল তার চেহারা। 'মামদোবাজি? অ্যাঁ? এমন শক দেব...'

'কচু দেবে!'

আর সহ্য হলো না বেনসনের। কোমর থেকে খুলে আনল টেযার। এগিয়ে গেল অবাধ্য অ্যাডমিরালের দিকে। তাকে কাছে আসার সুযোগ দিলেন হ্যামিলটন, তারপরেই ঝটকা দিলেন হাত। ঝনঝন আওয়াজ তুলে হ্যাণ্ডকাফ খসে পড়ল মেঝেতে।

চমকে উঠল বেনসন, তবে ততক্ষণে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে সে—পৌঁছে গেছে অ্যাডমিরালের নাগালের মধ্যে। সাপের মত ছোবল দিল হ্যামিলটনের হাত। বজ্রমুষ্টিতে বেনসনের কবজি চেপে ধরলেন তিনি। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গায়ের জোরে হাতটা নামিয়ে দিলেন, টেযারের মাথা ঠেকালেন তার উরুতে, টিপে দিলেন সুইচ।

ভয়ানক এক ঝাঁকি খেলো বেনসন। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পায়ের কাফ খুলে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল। হাত থেকে কেড়ে নিলেন টেযারটা। ঝটকা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল বেনসন,

পারল না। লোকটার বুকে টেযার ঠেকিয়ে আবারও সুইচ টিপলেন তিনি।

আগের চেয়েও তীব্রভাবে ঝাঁকি খেলো বেনসনের দেহ। অসাড় হয়ে পড়ল। এবার রেনফিল্ডের দিকে নজর দিলেন অ্যাডমিরাল।

কানে আইপডের হেডফোন থাকায় সঙ্গীর আর্তনাদ শুনতে পায়নি বোমা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু চোখের কোনায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কোমরে গোঁজা রিভলবারের দিকে চলে গেল তার হাত।

হ্যামিলটনও কম যান না। ছোঁ মেরে বেনসনের কোমর থেকে পিস্তল তুলে নিলেন তিনি, গড়ান দিয়ে নেমে গেলেন তার শরীরের উপর থেকে। শোয়া অবস্থাতেই ট্রিগার চাপলেন। তবে তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তাঁর গুলি।

ধাক্কা দিয়ে টেবিল কাত করে ফেলল রেনফিল্ড, এক লাফে আশ্রয় নিল তার পিছনে। আবারও গুলি চালালেন হ্যামিলটন, টেবিলের পুরু কাঠ রক্ষা করল তাকে। এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় নড়ে উঠল বেনসন। শরীরের পাশে পড়ে থাকা টেযারটা কুড়িয়ে ঝাঁপ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে।

নির্দয় ভঙ্গিতে ট্রিগার চাপলেন অ্যাডমিরাল। শূন্যেই যেন একটা ধাক্কা খেলো বেনসন, আছড়ে পড়ল মেঝেতে। বুলেট তার খুলির একপাশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে লাশের কাছে গেলেন অ্যাডমিরাল। পকেট হাতড়ে বের করে নিলেন বেনসনের সেলফোন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগালেন বন্দিশালা লক্ষ্য করে। ওখানে ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুরু করেছে র‍্যাচেল আর দুই মুসলিম বন্দি। গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেছে ওরা।

অ্যাডমিরালের পিছনে আচমকা গর্জে উঠল রেনফিল্ডের

রিভলবার। পায়ে একটা টান অনুভব করলেন তিনি। বুলেট তার ঊরু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে সামলালেন নিজেকে। মেঝেতে রক্তের রেখা ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ঢুকলেন নিজের প্রকোষ্ঠে। আটকে দিলেন দরজা। আশা করছেন রিভলবারের গুলি প্রকোষ্ঠের দেয়াল বা দরজা ভেদ করতে পারবে না। তা-ই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। রেনফিল্ডের পরের গুলিগুলো মাথা কুটে মরল প্রকোষ্ঠের চারপাশে। পাল্টা গুলি চালালেন না অ্যাডমিরাল, অ্যামিউনিশন বাঁচাতে চাইছেন।

পায়ের ক্ষতের দিকে তাকাবার সাহস পেলেন না তিনি, কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বের করলেন বেনসনের সেলফোন। রেডক্লিফ বা ল্যারি কিঙের নাম্বার মনে পড়ছে না, তাই ডায়াল করলেন নাইন-ওয়ান-ওয়ান... মানে পুলিশ ইমার্জেন্সিতে।

দুটো রিং হতেই শোনা গেল নারীকণ্ঠ। 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান ইমার্জেন্সি। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন... ডিরেক্টর অভ নুমা,' দাঁতে দাঁত চেপে নিজের পরিচয় দিলেন অ্যাডমিরাল। পায়ের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। 'টেরোরিস্টরা কিডন্যাপ করেছে আমাকে। প্লিজ... সাহায্য দরকার আমার।'

'আপনার লোকেশন বলুন, স্যর,' তটস্থ হয়ে উঠল অপারেটর।

'লোকেশন জানি না। সেলফোনের সিগনাল ট্র্যাক করো।'

'ঠিক আছে, স্যর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক পাঠাচ্ছি আপনাকে উদ্ধারের জন্য। কিডন্যাপাররা ক'জন, তা কি বলতে পারেন?'

'দু'জন ছিল, একজনকে আমি খতম করেছি। অন্যজন আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। প্লিজ, তাড়াতাড়ি করো।'

কথা শেষ হতে না হতেই আবার গুলির আওয়াজ হলো। অপারেটর আঁতকে উঠল, 'ওহ্ গড! গোলাগুলি হচ্ছে নাকি, স্যর?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি লোক পাঠাতে বলছি। লোকেশনটা পেলে?'

'একটু অপেক্ষা করুন, স্যর।'

'হারি আপ, ড্যামিট!'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা বিরাজ করল। এরপর উত্তেজিত গলায় অপারেটর জানাল, 'পেয়েছি, স্যর। পাঁচশো ঊনত্রিশ, বিজনেস পার্কওয়ে, হ্যাগার্সটাউন।'

'কোন্ স্টেট?'

'মেরিল্যাণ্ড, স্যর। আই-সেভেন্টি আর আই-এইটি ওয়ানের ইন্টারসেকশনের কাছাকাছি। স্টেট আর লোকাল পুলিশে খবর চলে গেছে। খুব শীঘ্রি ওরা পৌঁছে যাবে।'

খুশি হতে পারলেন না অ্যাডমিরাল। পেনসিলভ্যানিয়া আর ভার্জিনিয়ার মাঝামাঝি রয়েছেন তিনি। আই-সেভেন্টি হাইওয়ে ধরে ওয়াশিংটন, আর আই-এইটি ওয়ান ধরে ফিলাডেলফিয়া হয়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাওয়া যায়। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রেনফিল্ড তার রেডিওলজিক্যাল বোমা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারবে অন্তত ডজনখানেক বড় শহরে।

সমস্যা এই একটাই নয়। ওয়্যারহাউসের ভিতরে বসানো ড্রামগুলো নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল। ওয়ায়্যার দেখেই বুঝে গেছেন, ওগুলোয় কোনও ধরনের বিস্ফোরক বসানো হয়েছে... নিশ্চয়ই ওয়্যারহাউস ধ্বংস করে সমস্ত আলামত নষ্ট করবার প্ল্যান করেছে ওরা। পুলিশ আসার আগেই রেনফিল্ড ওগুলো ফাটিয়ে দিতে পারে।

গুলিবর্ষণে বিরতি পড়েছে, কী করছে লোকটা? কষ্টেসৃষ্টে উঠে

দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। ঝুঁকি নিয়ে দরজার ফোকর দিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। রেনফিল্ডকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন। মৃদু গুঞ্জন করে খুলতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দরজা। যা ভয় করেছিলেন, তা-ই ঘটতে চলেছে। পালিয়ে যাচ্ছে রেনফিল্ড।

ট্রাকের গিয়ারে হাত রেখে ডোর মেকানিজমকে অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছে রেনফিল্ড। বড়ই আস্তে খুলছে দরজা। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চমকে উঠল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, হাতে উদ্যত পিস্তল। যে-করেই হোক ওকে ঠেকাবেন বলে পণ করেছেন যেন।

তাড়াহুড়ো করে সিটের উপর রাখা রিভলবারের দিকে হাত বাড়াল রেনফিল্ড, আর তখুনি গুলি করলেন তিনি। প্রথম দুটো দরজায় লাগল, তৃতীয়টা জানালার কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়ল ড্রাইভিং ক্যাবে। নেহাত নিচু হয়ে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেল রেনফিল্ড।

দাঁতে দাঁত পিষে ঝট্ করে উঠে বসল সে। ভাঙা জানালা দিয়ে হাত বের করে রিটার্ন ফায়ার করল। ছুটন্ত অবস্থায় আধ পাক ঘুরে গেলেন অ্যাডমিরাল, বুকের একপাশে আঘাত হেনেছে রেনফিল্ডের গুলি। দড়াম করে আছড়ে পড়লেন ওয়্যারহাউসের মেঝেতে। হাত থেকে ছুটে চলে গেল পিস্তল।

আঘাতটা কতখানি গুরুতর, বুঝতে পারল না রেনফিল্ড। দ্বিতীয়বার গুলি করবারও সময় পেল না। ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে গেছে, দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ। বেনসনের সেলফোন থেকে নিশ্চয়ই ওদেরকে খবর দিয়েছেন হ্যামিলটন।

গাল দিয়ে উঠল রেনফিল্ড। হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে অ্যাকসেলারেটর চাপল, ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। যে-দিক

থেকে পুলিশ আসছে, তার উল্টোদিকের রাস্তা ধরে ফুল স্পিডে ছোটাল বাহনকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে উঠে এল বিজনেস পার্কওয়েতে। শঙ্কা নিয়ে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল... কিন্তু না, কেউ পিছু নেয়নি তার।

গতি কমিয়ে আনল রেনফিল্ড, অযথা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঠিক হবে না। রাস্তার দু'পাশে মেরিল্যাণ্ডের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া—ছোটবড় হাজারো কারখানায় কাজ করছে অসংখ্য মানুষ। চায় না ওদের কেউ আলাদাভাবে নজর দিক ওর ট্রাকের প্রতি। একটু পরেই উল্টোদিক থেকে দুটো পুলিশ কার সাইরেন বাজিয়ে পেরিয়ে গেল ওকে। ওয়্যারহাউসের দিকে যাচ্ছে। হাসি ফুটল রেনফিল্ডের ঠোঁটে, ব্যাটারা কল্পনাই করতে পারেনি ওদের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে শিকার।

হাসিটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কত বড় সর্বনাশ হয়েছে, তা ভাবতে গিয়ে দমে গেল রেনফিল্ড। ওদের প্ল্যানের দফারফা হয়ে গেছে। দুই মুসলিম ছাত্র... যাদের উপর বিস্ফোরণের দায় চাপানোর কথা ছিল... যাদের লাশ পাওয়া যাবার কথা ছিল ট্রাকের ধ্বংসাবশেষে... তারা রয়ে গেছে ওয়্যারহাউসে। রয়ে গেছে র‍্যাচেল হ্যাডলিও। অ্যাডমিরাল যদি মরেও গিয়ে থাকেন, ওই তিনজনের কাছ থেকে ফাঁস হয়ে যাবে রেনফিল্ডের চেহারার বর্ণনা। এবং দেরি না করে পুলিশ লাগবে তার পিছনে।

সত্যিই কি তাই? আচমকা যেন হাজার পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল রেনফিল্ডের মাথার ভিতর—পকেটে রাখা রিমোট কন্ট্রোলের কথা মনে পড়ে গেছে। সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলবার চাবিকাঠি তো এখনও রয়েছে তার কাছে! প্ল্যানটাও পুরোপুরি পণ্ড হয়নি। ট্রাক নিয়ে পালিয়ে এসেছে সে, এখনও বোমা ফাটিয়ে লোয়ার ম্যানহাটনকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা সম্ভব। দোষ চাপাবার জন্য কোনও মুসলমানের লাশ নেই তো কী হয়েছে,

এমনিতেই কি আমেরিকান সরকার আল-কায়েদাকে দুষবে না?

মনে মনে ওয়্যারহাউসের সঙ্গে নিজের দূরত্ব হিসেব করল রেনফিল্ড। তিন মাইলের বেশি হবে না। ওর রিমোট কন্ট্রোল পাঁচ মাইল পর্যন্ত কাজ করে। নিশ্চিন্ত মনে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল সে। টিপে দিল বাটন।

অনেক দূরে কোথাও যেন বজ্রপাত হলো। রিয়ারভিউ মিররে আকাশের বুকে লাফ দিয়ে একটা আগুনের গোলা উঠে আসতে দেখল সে। মন ভরে গেল অদ্ভুত এক আনন্দে। ব্যস, কেল্লা ফতে। পুলিশ আর কিছুতেই ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাবে না। ওয়্যারহাউসের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে ওখানে ওর উপস্থিতি এবং কাজের সমস্ত চিহ্ন।

গ্রিনক্যাস্‌ল পাইকে মোড় নিল রেনফিল্ড, এখান থেকে ইন্টারস্টেটের দূরত্ব মাত্র এক মাইল। দেড় মিনিটের মাথায় আই-এইটি ওয়ানে উঠে এল সে। রওনা হয়ে গেল নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে।

পনেরো

নেপলস্‌, ইটালি। রাত আটটা।

ভিয়া নভেরো-র একটা আউটডোর ক্যাফে-তে বসে আছে গ্যারেট আর কাটনার। ডিনার সারছে। খাওয়াশেষে ল্যাপটপ অন্‌ করল গ্যারেট, চেক করল জিয়োলেবের জিপিএস ট্র্যাকার। বিকেল তিনটায় শহরে পৌঁছেছে রানা ও তার সঙ্গীরা, একটা

হোটেলে উঠেছে। ট্র্যাকার এই মুহূর্তে মুভমেন্ট নির্দেশ করছে—তারমানে রাত ন'টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষার জন্য রওনা হয়েছে ওরা।

সন্তুষ্ট হয়ে কফির কাপে চুমুক দিল গ্যারেট। সবকিছু ঠিকমতই এগোচ্ছে। অপ্রত্যাশিত কোনও ঝামেলা দেখা না দিলে রাত পোহাবার আগেই মাইডাসের গুপ্তধন পেয়ে যাবে সে, অধিকারী হবে মাইডাস টাচের। দিব্যচোখে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে গ্যারেট, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি।

বেরসিকের মত এ-সময় বেজে উঠল সেলফোন। নাম্বার চেক করল গ্যারেট। রেনফিল্ড ফোন করেছে। কল রিসিভ করে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'কী ব্যাপার, রেনফিল্ড? এত ঢিলেমি কেন? আজকের ভিডিওটা কোথায়?' ত্রিশ মিনিট আগেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির ডেইলি ভিডিও পৌঁছুনোর কথা ছিল তার ইমেইলে।

'ভিডিও?' ওপাশ থেকে বলে উঠল রেনফিল্ড, গলা অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তার। 'জিসাস! ভিডিও নিয়ে ভাববার সময় আছে?'

বোমা-বিশেষজ্ঞের কণ্ঠ ছাপিয়ে বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে গ্যারেট। নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে ফোন করেছে রেনফিল্ড। কেন? কোনও ঝামেলা হয়েছে?

'কোথায় তুমি?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'ট্রাক নিয়ে নিউ জার্সির দিকে যাচ্ছি। গোলমাল দেখা দিয়েছিল, ওয়্যারহাউসটা শিডিউলের আগেই উড়িয়ে দিতে হয়েছে। বেনসন মারা গেছে।'

'হোয়াট দ্য...' থমকে গেল গ্যারেট। 'কী হয়েছিল?'

'সব বেনসনের দোষ,' বলে সংক্ষেপে ওয়্যারহাউসের ঘটনা বর্ণনা করল রেনফিল্ড। শেষে যোগ করল, 'অ্যাডমিরালকে গুলি

করে পালিয়ে এসেছি আমি। নইলে পুলিশের হাতে ধরা পড়তাম।'

'বাকি বন্দিরা?'

'ওয়্যারহাউসের সঙ্গে উড়ে গেছে, কোনও সন্দেহ নেই। অ্যাডমিরালও নির্ঘাত মারা পড়েছে—গুলিতে না হলেও বিস্ফোরণে।'

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে গ্যারেটের। সঙ্গীদেরকে বার বার সাবধান করে দিয়েছিল বুড়ো অ্যাডমিরালের ব্যাপারে, তার কথা না শোনায় বিশাল এক খেসারত দিতে হয়েছে বেনসনকে। সমস্যা সেটা নয়... আসল সমস্যা হলো, ওর বোকামির জন্য গ্যারেটের সাজানো-গোছানো পরিকল্পনা ওলোটপালোট হতে বসেছে। সান্ত্বনা একটাই—নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেছে রেনফিল্ড। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।

'ট্রাকের খবর বলো,' বলল গ্যারেট। 'তোমার প্রিপারেশন শেষ করতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ,' জানাল রেনফিল্ড। 'বোমাটা রেডি। ট্রেইলারের ভিতরে, সওডাস্টের তলায় লুকানো আছে ওটা।'

'গুড। গাড়িটা কোথায় পার্ক করতে হবে, তা জানো নিশ্চয়ই?'

তুমি চাইছ কাজটা আমি একাই সারি? মাথা ঠিক আছে তোমার?'

'রেনফিল্ড,' বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল গ্যারেট, 'অপারেশনের শেষ পর্যায়ে আছি আমরা, সফল হতে চলেছি। এ-অবস্থায় ঝামেলা কোরো না। ট্রাক নিয়ে জায়গামত চলে যাও। আমার ফোন পেলেই টাইমার চালু করবে।'

রেনফিল্ডও তা-ই চায়, কিন্তু নিজের আখের গুছিয়ে নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। গ্যারেটের উপর চাপ

সৃষ্টি করবার এটাই মোক্ষম সময়। তাই গোঁয়ারের মত সে বলল, 'অসম্ভব! আমাকে বোকা ভেবেছ? তলে তলে কী করছ তুমি, তা আমার জানা আছে। মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজতে গেছ তো? আমি তার ভাগ চাই।'

মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে গ্যারেটের। কোনোমতে জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ চাই মানে?'

'মানে হচ্ছে, আমাকে ছাড়া তুমি অচল। পুরো প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যাবে। কাজেই বাকিদের মত দু'মিলিয়ন ডলারে আমি সন্তুষ্ট নই। বিশ মিলিয়ন চাই!'

গ্যারেটের হাতের মুঠোর চাপে মড়মড় করে উঠল সেলফোনের খোলস। রেনফিল্ডকে খুন করবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এ-ও ঠিক, লোকটাকে ছাড়া চলবে না তার। স্ট্রনটিয়াম বোমা ফাটিয়ে আমেরিকার গোল্ড ডিপোজিটরি বিষাক্ত করে না তুললে সৃষ্টি হবে না সোনার চাহিদা। মাইডাস টাচ দিয়ে ও যদি নতুন করে সোনা বানাতে থাকে, তা হলে চালান বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব-বাজারে উল্টো দাম পড়ে যাবে সোনার। রাতারাতি বিলিওনেয়ার হবার খায়েশ আর পূর্ণ হবে না কিছুতেই।

অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। রাগ চেপে গ্যারেট বলল, 'বেশ, বিশ মিলিয়নই পাবে। কিন্তু কাজটা ঠিকমত হওয়া চাই।'

'একা বোমা ফাটাতে পারব না আমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল রেনফিল্ড। 'তোমাকেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'কী!' চিৎকার করে উঠল গ্যারেট। একটু জোরেই চেঁচিয়ে ফেলেছে, আশপাশের প্রত্যেকটা মানুষ চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল। গলা নামাতে বাধ্য হলো সে। নিচু স্বরে জানতে চাইল, 'আমাকে কেন থাকতে হবে?'

'নিজ চোখে মাইডাস টাচের ক্ষমতা দেখতে চাই আমি,' বলল

রেনফিল্ড। 'জিনিসটা যদি কাজ না করে, তা হলে বোমা ফাটিয়ে নিজের পায়ে কুড়োল মারতে রাজি নই কিছুতেই।'

মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল গ্যারেটের। বাড়তি টাকা চাওয়া এক কথা... কিন্তু শুয়োরটা যা করছে, তা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছু না। আজ পর্যন্ত এত বড় ধৃষ্টতা কেউ করেনি তার সঙ্গে। কসম কাটল মনে মনে—রেনফিল্ডকে বিশ মিলিয়ন ডলার দেবে ঠিকই, কিন্তু সে-টাকা ভোগ করবার মত আয়ু দেবে না তাকে।

'ঠিক আছে,' বলল গ্যারেট। 'আগামীকাল তা হলে ফিরে আসব আমি।'

'বাই দ্য ওয়ে,' গা জ্বালানো ভঙ্গিতে বলল রেনফিল্ড, 'দেখা হবার পর আমাকে আবার খুন করার চেষ্টা কোরো না। ডিটোনেটরে গোপন কোড দিয়ে রেখেছি... আমার কিছু হয়ে গেলে বোমাটা তুমি কিছুতেই আর ফাটাতে পারবে না।'

দাঁত কিড়মিড় করল গ্যারেট। শয়তানটা এত চালু, তা তো আগে বুঝতেই পারেনি। 'নিশ্চিন্ত থাকো, কিচ্ছু করব না আমি। তুমি তৈরি থেকো। এদিককার কাজ শেষ হলেই তোমাকে ফোন করব।'

লাইন কেটে দিয়ে থম মেরে গেল সে। ইচ্ছে করছে ক্যাফের ভিতর তাণ্ডব জুড়ে দেয়—উল্টে ফেলে চেয়ার-টেবিল, ভাঙচুর করে বাসন-কোসন, কিংবা চড়-থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় ওয়েইটার, বাবুর্চি আর কাস্টোমারদের গালে। তা হলে যদি রাগ একটু কমে! কিন্তু এ-মুহূর্তে সিন-ক্রিয়েট করতে পারবে না সে। অগত্যা বসে বসে ফোঁস ফোঁস করা ছাড়া গতি নেই।

বসের চেহারা দেখেই ঝামেলার আভাস পেয়ে গেছে কাটনার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, বস?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি মারা গেছে,'

গম্ভীর গলায় বলল গ্যারেট। 'গোলাগুলি হয়েছে ওয়্যারহাউসে।'

'বেনসন?'

'অ্যাডমিরালের হাতে খুন হয়েছে গর্দভটা।'

শঙ্কার মেঘ ঘনাল কাটনারের চোখে। ওদের পুরো প্ল্যানের উপর এই ঘটনার প্রভাব কী হতে পারে, তা বুঝতে পারছে না। চিন্তিত গলায় বলল, 'এখন তা হলে কী করব আমরা? অ্যাডমিরালের আজকের ভিডিও না দেখালে মাসুদ রানা বিগড়ে যাবে স্রেফ।'

জিপিএস ট্র্যাকারের সিগনাল আবার চেক করল গ্যারেট। ভিয়া ডন বসকো পেরিয়ে এসেছে ওটা। ঠিকমত যদি এগোয়, তা হলে দশ মিনিটের ভিতর পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোয় পৌঁছে যাবে। সেলফোন বের করে ডায়াল করল সে—রানা নয়, রেমির নাম্বারে। বোঝা দরকার, ওরা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির মৃত্যুর খবর পেয়ে গেছে কি না।

'ইয়েস?' রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল রেমির গলা।

'জিয়োলেবটা সঙ্গে আছে তোমাদের?' সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।'

'গুড। রানার সঙ্গে কথা বলব। ফোনটা ওকে দাও।'

কয়েক মুহূর্ত পর রানার গলা শোনা গেল। 'বলো, শুনছি।'

'তোমাদের খোঁজখবর নেবার জন্য ফোন করলাম,' হালকা গলায় বলল গ্যারেট। 'সময়মত হাজির হচ্ছ তো?'

'সেটা সময় এলেই দেখবে। আজকের ভিডিও কোথায়?'

স্বস্তি অনুভব করল গ্যারেট। রানার কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, এখনও আমেরিকা থেকে কোনও দুঃসংবাদ আসেনি ওর কাছে। বলল, 'চিন্তা কোরো না। দেখা হবার আগেই ওটা পাঠাব তোমার ই-মেইলে। তবে তার আগে শিয়োর হতে চাই, জিয়োলেবটা

তোমাদের সঙ্গে আছে কি না। ড. হ্যাডলির ফোনটা ওটার পাশে রেখে ছবি তোলো—যাতে আমার নাম্বার আর সময় পরিষ্কার দেখা যায় ছবিতে। তারপর ছবিটা আমার নাম্বারে এমএমএস করে পাঠাও।'

প্রতিবাদ করল না রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর জানাল, 'পাঠিয়েছি।'

ভাইব্রেশন হলো গ্যারেটের ফোনে। মাল্টিমিডিয়া মেসেজ এসেছে। ওটা খুলতেই দেখতে পেল ছবিটা। জিয়োলেবের পাশে রেমির ফোন, তাতে ওর নাম্বার ফুটে আছে।

'খুশি?' চাঁছাছোলা গলায় জানতে চাইল রানা।

'খুবই,' বলল গ্যারেট। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার ফোন করব আমি, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের খুঁটিনাটি জানিয়ে দেব তখন। ভিডিওদুটোও তখনই পাঠাব।'

'ওগুলো না পেলে আমরাও দেখা করব না,' জানিয়ে দিল রানা।

'পাবে, নিশ্চিন্ত থাকো।' লাইন কেটে দিয়ে কাটনারের দিকে ফিরল গ্যারেট। 'এখনও কিছু জানে না ওরা। তারপরেও আমাদের শিডিউলটা এগিয়ে আনা দরকার, তা হলে কোনও ঝুঁকি থাকে না।'

'তুমি শিয়োর?' ভুরু কোঁচকাল কাটনার।

'রেনফিল্ড আর বেনসন সব গুবলেট করে দিয়েছে। দেরি করলে পুরো ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে। না, রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না। ফোনটা করো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করল কাটনার। গ্যারেট তাকে একটা নাম্বার দিয়েছে, রিং করল ওটায়। অন্যপাশ থেকে সাড়া পেতেই বলল, 'গুড ইভনিং। আমি মায়া লরেঞ্জোর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কে আপনি?' ওপাশ থেকে জানতে চাওয়া হলো।

'একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। অ্যান্থনি গ্যারেটের খোঁজ দিতে চাই।'

বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটল গ্যারেটের ঠোঁটে। মাছ এবার বড়শিতে ঠোকর দিতে বাধ্য। কাটনারের দিকে ঝুঁকল সে, মায়া কী বলে শুনতে চায়।

'দিস ইজ মায়া লরেঞ্জো।' এক মিনিটের মাথায় খালাতো বোনের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল গ্যারেট।

'শুনলাম আপনি অ্যান্থনি গ্যারেটকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন,' কাটনার বলল।

'ভুল শোনোনি। তুমি তার খোঁজ জানো?'

'না। তবে এমন একজনকে চিনি, যাকে ধরলে সহজেই গ্যারেটের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। লোকটার নাম ববি মুরল্যাণ্ড।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। এরপর মায়া জিজ্ঞেস করল, 'বেশ। কোথায় পাওয়া যাবে এই ববি মুরল্যাণ্ডকে?'

'এই মুহূর্তে পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোয় যাচ্ছে সে।'

'একা?'

'না। ওর সঙ্গে লোক আছে।'

'ওকে খুঁজে পাব কী করে?'

'মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা জিপিএস ট্র্যাকার আছে,' বলল কাটনার। গ্যারেটের ইশারা পেয়ে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস বলে দিল। 'ওখান থেকে ওর লোকেশন জানতে পারবেন আপনি।'

'কীভাবে জানছি ব্যাপারটা একটা ফাঁদ নয়?' সন্দিহান গলায় বলল মায়া। 'তোমার পরিচয় কী?'

'পরিচয়ে কী এসে-যায়?' বলল কাটনার। 'যা বলার বলে দিয়েছি আমি। পছন্দ না হলে আমার কথা অগ্রাহ্য করুন। গুডবাই।' লাইন কেটে দিয়ে গ্যারেটের দিকে ফিরল। 'কী মনে হয়? ও কি টোপটা নেবে?'

'এমন টোপ ফিরিয়ে দেয়া কঠিন,' বলল গ্যারেট। 'নিশ্চিন্ত থাকো, মুরল্যাণ্ডের পিছনে ওরা যাবেই।'

'ওর যদি কিছু হয়ে যায়?'

'হলেই ভাল। আপদ দূর হবে আমাদের।'

সন্তোষের সুর গ্যারেটের গলায়। মাসুদ রানার ব্যাকআপের দফারফা করে দেয়া গেছে। স্রেফ কপালজোরে সম্ভব হয়েছে কাজটা।

ট্র্যাকারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করছিল না গ্যারেট, ঘণ্টাখানেক আগে তাই কাটনারকে পাঠিয়েছিল রানারা সত্যিই নেপলসে এসেছে কি না দেখে আসার জন্য। ট্র্যাকারের সিগনাল ফলো করে হোটেলের রেস্টুরেণ্টে ববি মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পায় সে, অচেনা চারজন লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে শলা-পরামর্শ করছিল। রানা বা রেমি ছিল না আশপাশে। খবরটা শুনে সন্দিহান হয়ে ওঠে গ্যারেট। ট্র্যাকারের সিগনাল মুরল্যাণ্ডের দিকে নির্দেশ করবে কেন? অচেনা লোকগুলোই বা কে?

একটু ভাবনাচিন্তা করতেই আসল ঘটনা বুঝে ফেলে সে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির খবর জানা আছে তার, নিশ্চয়ই সেখান থেকে ওকে কবজা করবার জন্য লোক জোগাড় করেছে রানা। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্র্যাকারের হদিসও পেয়ে গেছে সে, ওটা মুরল্যাণ্ডের কাছে রেখেছে তাকে ধোঁকা দেবার জন্য। কৌশলটা টের পেয়ে বিকল্প প্ল্যান আঁটে গ্যারেট। ঠিক করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার। মায়াকে মুরল্যাণ্ডের পিছনে সে-কারণেই লাগিয়ে দিয়েছে। ওদিকে ব্যস্ত থাকুক প্রিয় বোনটি, এই সুযোগে নিজের কাজ সেরে নেবে ও।

ওয়েইটার বিল নিয়ে এসেছে, ওয়ালেট খুলে খাবারের দাম মিটিয়ে দিল গ্যারেট। কাটনারকে বলল, 'চলো। যাবার সময় হয়েছে।'

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোল দু'জনে।

উত্তেজনা অনুভব করছে গ্যারেট—প্রতিটা অপারেশনে নামবার আগে যা হয়। এই উত্তেজনার সঙ্গে নার্ভাসনেসের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে পরিকল্পনার প্রতিটা খুঁটিনাটি খাপে খাপে বসে যাবার আনন্দের। এবারের প্ল্যানে সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সাফল্যের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তার। আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা যা ঘটতে পারে, তা সবই তার নখদর্পণে। প্রতিপক্ষের শক্তি, ক্ষমতা আর পরিকল্পনার কিছুই তার অজানা নেই।

আর এ-জন্যে রেমি হ্যাডলিকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়!

ষোল

কৃত্রিম আলোয় ঝলমল করছে নেপলসের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ... *পালাৎজো রিয়াল*। সপ্তদশ শতাব্দীতে বারবান-রা তৈরি করেছে এই প্রাসাদ, এখন ওটা প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শনীয় স্থান। গাড়ি থেকে নেমে ওদিকে এগিয়ে চলেছে মুরল্যাণ্ড। সঙ্গে রয়েছে রানা এজেন্সির চারজন অপারেটর, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এজেন্সির নেপলস্ শাখা-প্রধান গোলাম কিবরিয়া। সবাই গম্ভীর হয়ে আছে, কথা বলছে না কেউ।

পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর উপর নজর রাখবার জন্য পালাৎজো রিয়াল একেবারে আদর্শ জায়গা। সুবিধাজনক

পজিশনে অপেক্ষা করবে ওরা, গ্যারেট উদয় হলেই ওদেরকে সঙ্কেত দেবে রানা—এমনটাই ঠিক করা হয়েছে। সঙ্কেত পেয়ে দু'জন অপারেটর নিয়ে পিয়াৎজায় ঢুকবে মুরল্যাণ্ড, বাকি দু'জন পিছনে থাকবে অযাচিত ঝামেলা সামাল দেবার জন্য। আশা করা যায়, ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে গ্যারেটকে আটক করতে অসুবিধে হবে না।

এদিককার খুঁটিনাটি খুব ভাল চেনে কিবরিয়া, আমবার্তো গ্যালারিয়ার ভিতর দিয়ে শর্টকাটে নিয়ে চলল দলকে। বিশাল এক ক্রসের আকারে তৈরি করা হয়েছে এই ইনডোর শপিং প্লাজা, একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। মন বিক্ষিপ্ত থাকলেও প্লাজার সৌন্দর্য মুগ্ধ করল মুরল্যাণ্ডকে। কাঁচ আর লোহার ল্যাটিসওঅর্কে তৈরি ১৮৪ ফুট উঁচু ছাতটা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। ওখান দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ এসে আলোকিত করেছে ভিতরটা।

রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় থাকলেও প্লাজায় ক্রেতার সংখ্যা নগণ্য। দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, সবাই এসেছে বাইরের কনসার্টে যোগ দেবার জন্য। স্থানীয় দুটি বিখ্যাত ব্যাণ্ড রাতভর গান পরিবেশন করবে আজ।

খানিক পরেই প্লাজার উল্টোপাশের পোর্টিকোয় বেরিয়ে এল দলটা। পেভমেন্টে পা রাখতে না রাখতে উদয় হলো দুটো হালকা নীল-রঙা পুলিশ কার, ব্রেক কষে থামল ওদের সামনে। ঝটপট চারজন ইউনিফর্মধারী পুলিশ নামল গাড়ি থেকে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, তাক করল ওদের দিকে। থমকে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড ও তার সঙ্গীরা।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' চেঁচিয়ে উঠল এক পুলিশ, হাবভাবে তাকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে। শার্টের হাতায় সার্জেন্টের র‍্যাঙ্ক।

'কোনও সমস্যা, অফিসার?' ইটালিয়ানে জানতে চাইল

কিবরিয়া। আড়চোখে আশপাশে তাকাল, কৌতূহলী লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার।

'তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে,' বলল সার্জেন্ট। 'ফেলে দাও ওগুলো। তারপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

'অস্ত্রগুলোর পারমিট আছে আমাদের সঙ্গে...'

'কথা কম!' গর্জে উঠল সার্জেন্ট। 'আগে অস্ত্র ফেলো। পারমিট আছে কি নেই, সেটা পরে দেখা যাবে।'

পরামর্শের আশায় মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল কিবরিয়া।

'ওদের কথা মেনে নেয়াই বোধহয় ভাল,' অবাক হলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশের সঙ্গে গোলমাল করে লাভ হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল কিবরিয়া, দেখাদেখি বাকিরাও। পেভমেন্টের উপর ছুঁড়ে ফেলল ওগুলো। তারপর দু'হাত তুলে দাঁড়াল।

ধাক্কা দিয়ে ওদের পাঁচজনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশের গাড়ির কাছে। বনেটের উপর দু'হাত মেলে, পা ফাঁক করে দাঁড় করানো হলো। দক্ষ হাতে এরপর করা হলো শরীরতল্লাশি। অস্ত্র আগেই ফেলে দিয়েছে, এবার ওয়ালেট আর কাগজপত্র সহ যা যা ছিল, সব কেড়ে নেয়া হলো। মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে জিপিএস-এর ট্র্যাকার আর সেলফোনও নিয়ে নিল পুলিশেরা।

অস্ত্রগুলো ইতিমধ্যে কুড়িয়ে নেয়া হয়েছে, এবার চার অপারেটরকে হাতকড়া পরিয়ে দুই গাড়িতে ঠেলাধাক্কা দিয়ে তুলল পুলিশেরা। দরজা আটকে দিল। পেভমেন্টে একা রয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

'আমি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ও।

এক গাল হাসল সার্জেন্ট। ইংরেজিতে বলল, 'আপনার

বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, সেনিয়র। মানে... যদি এই এলাকায় আর ঘোরাফেরা না করেন আর কী! যে-পথে এসেছেন, সে-পথে ফিরে যান।' ইশারা করল পিছনের প্লাজার দিকে।

বিস্ময় বোধ করল মুরল্যাণ্ড। অস্ত্র ওর কাছেও ছিল... পাঁচটার ভিতর ওটাই বরং ছিল পারমিট-বিহীন। তা হলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন?

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' ধমকে উঠল সার্জেন্ট। 'যান!'

উপায়ান্তর না দেখে উল্টো ঘুরল মুরল্যাণ্ড। হাঁটতে শুরু করল। প্লাজায় ও না-ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল পুলিশেরা, তারপর সাইরেন বাজিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে মুরল্যাণ্ডের। গোলমাল হয়ে গেছে... কোথাও বড় ধরনের কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে! ভেস্তে গেছে ওদের পরিকল্পনা। অস্ত্র নেই, লোক নেই... গ্যারেটকে আর কিছুতেই আটকানো সম্ভব নয়। দ্রুত পা চালাল ও, যে-করে হোক, একটা ফোন করে সাবধান করে দিতে হবে রানাকে।

প্লাজার মাঝামাঝি পৌঁছুতেই চোখের কোণে পরিচিত একটা অবয়ব দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড—দুটো দোকানের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল ও। লোকটা আর কেউ নয়... ওর পুরনো 'বন্ধু' টমি কাভানো!

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল মুরল্যাণ্ড। যেভাবেই হোক, ওর খোঁজ পেয়ে গেছে মায়া লরেঞ্জো। পোষা পুলিশ পাঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে রানা এজেন্সির অপারেটরদের। এখন নিজের গুণ্ডাকে পাঠিয়েছে ওকে তুলে নিয়ে যেতে!

বামদিক থেকে আরেকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুরল্যাণ্ড। সামনে-পিছনেও উদয় হয়েছে দু'জন করে গুণ্ডা।

'বাহ্, আমার পরামর্শ দেখছি গ্রহণ করেছ!' টমির দিকে ফিরে হাসিমুখে বলল ও। 'সত্যি সত্যি এবার বাড়তি লোক নিয়ে এসেছ!'

ঠাট্টা-মশকরায় প্রভাবিত হলো না টমি। কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো। নইলে...' কথাটা অসমাপ্ত রাখল হুমকির ওজন বাড়াবার জন্য।

'বললেই কি যখন-তখন যাওয়া যায়? আমার হাতে অনেক কাজ।' লোকগুলো এখনও অস্ত্র বের করেনি দেখে সাহস পাচ্ছে মুরল্যাণ্ড। সম্ভবত ওকে খুন করবার নির্দেশ পায়নি এরা, জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

'ঝামেলা করতে চাইছ?' দাঁতমুখ খিঁচাল টমি। 'তা হলে ঝামেলাই উপহার দেব আমরা। অ্যাই, ধর্ শালাকে!'

সবাই মিলে হামলা চালানোই এ-পরিস্থিতিতে উত্তম। শিকারকে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে পারলে অনায়াসে কাবু করা যায়। কিন্তু তা না করে মাত্র দু'জন এগোল মুরল্যাণ্ডের দিকে। হাসি পেল ওর। ওরা বোকামি করলে ওর কী করার আছে?

লোকদুটো নাগালে পৌঁছুতেই এক পায়ে লাথি ছুঁড়ল ও। থুতনিতে সেই আঘাত নিয়ে ছিটকে পড়ল এক গুণ্ডা, অন্যজন ঘুসি ছুঁড়ল মুরল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করে। একটু নিচু হয়ে তাকে ফাঁকি দিল ও। তারপর হাত মুঠো করে সজোরে ঘুসি মারল তার অরক্ষিত উরুসন্ধিতে। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

সোজা হয়ে টমির দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কেমন দেখালাম, বলো তো?'

আঁতে যেন বিছুটির ঘষা লেগেছে, বাকি তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল টমি, 'হাঁ করে দেখছিস কী? খতম কর্ শালাকে!'

হুঙ্কার ছেড়ে মুরল্যাণ্ডের দিকে ছুটে এল তিন গুণ্ডা। ঘুরে তাদের মুখোমুখি হলো ও। বামের লোকটাকে বেছে নিল প্রথম টার্গেট হিসেবে। কাছে আসতেই গলায় প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল লোকটা, তার দিকে না তাকিয়ে পাঁই করে ঘুরল মুরল্যাণ্ড। হাতের উল্টোপিঠের মার লাগাল পাশের জনের কানের উপরে। আধপাক ঘুরে গেল সে। তৃতীয়জন এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

দু'পা পিছিয়ে ব্যালান্স রক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। লোকটা ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছে, কনুইয়ের গুঁতোয় গুঁড়িয়ে দিল তার নাক। প্রথমজন ওঠার চেষ্টা করতেই লাথি হাঁকাল। এরপর ইস্পাতকঠিন হাতে চেপে ধরল দ্বিতীয় গুণ্ডার গলা। মুঠো পাকিয়ে তাকে ঘুসি মারতে যাবে, এমন সময় পিছনে ক্লিক জাতীয় একটা শব্দ শুনে জমে গেল। ভাঁজ করা ব্যাটন প্রসারিত করবার শব্দ ওটা।

ঘাড় ফেরাতেই টমিকে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড, ওর পিছনে চলে এসেছে সে। হাতে উঁচু করে ধরেছে ব্যাটন। ঠেকাবার আগেই ওটা নেমে এল মাথার উপর। তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণে আরেকটা বাড়ি পড়ল ঘাড়ে, ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল ও।

আঘাত সামলে বাকিরাও এগোল মুরল্যাণ্ডের দিকে। শুরু হলো বৃষ্টির মত কিল-ঘুসি আর লাথি। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ককাল মুরল্যাণ্ড, তারপর হারিয়ে গেল ব্যথা-বেদনার অনুভূতি। অনেক চেষ্টা করেও খোলা রাখতে পারল না চোখদুটো।

দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে।

পর পর তিনবার ডায়াল করেও মুরল্যাণ্ডের ফোনে কানেকশন পেল না রানা। চিন্তায় পড়ে গেল ও। ফোন বন্ধ করে রাখার কথা নয় মুরল্যাণ্ডের। নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে দু'জনে, আধঘণ্টা

আগেও ওর সঙ্গে কথা হয়েছে রানার।

পিয়াৎজা দেল প্লেবিসিতোর পশ্চিম পাশে, স্যান ফ্রান্সেসকো ডি পাওলা চার্চের ভিতরে বসে আছে ও আর রেমি। চার্চটা মিউজিক স্টেজের পিছনে, চত্বর থেকে দেখা যায় না। আপাতত ওখানে আশ্রয় নিয়েছে ওরা, সময় হলে গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরুবে। ট্র্যাকারের সিগনাল অনুসরণ করে লোকটা যদি তার আগেই হামলা চালিয়ে বসে মুরল্যাণ্ডের উপর, তা হলে চুপিসারে সটকেও পড়া যাবে।

কিবরিয়ার টিমের সঙ্গে মুরল্যাণ্ডের দেখা করিয়ে দিয়ে বিকেলেই বেরিয়ে পড়েছিল রানা আর রেমি। পার্থেনন থেকে পাওয়া ট্রায়াঙ্গুলেশন ডেটা অনুসারে খুঁজেছে নির্দিষ্ট কুয়োটা। নুমার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ল্যারি কিং সাহায্য করেছে ওদেরকে। সুপার-কম্পিউটার ভিনাসের সাহায্যে নেপলস্ সংক্রান্ত পুরনো বিভিন্ন নথি বিশ্লেষণ করেছে, সে, যত ধরনের কালচারাল রেফারেন্স পেয়েছে সব ঘেঁটে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য চারটে কুয়োর লোকেশন ই-মেইল করে পাঠিয়েছিল রানাকে। ওগুলোর খোঁজেই বেরিয়েছিল ও আর রেমি।

একে একে চারটে কুয়োই দেখেছে ওরা। কাঁকড়ার ছবি বা প্রতীক নেই কোনোটাতেই, তবে একটা কুয়োর ভিতরদিকে খোদাই করা কয়েকটা বিন্দু পাওয়া গেছে... তলায় একটা গ্রিক হরফ—*আলফা।* জিনিসটা অদ্ভুত লেগেছিল রানার কাছে, ছবি তুলে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখেছে। ফলাফল আশাপ্রদ। বিন্দুগুলো আসলে *ক্যান্সার কন্সটেলেশন,* বা কর্কট রাশির তারকামণ্ডলের কনফিগারেশন। আলফা দিয়ে যে আর্কিমিডিসের নামের আদ্যক্ষর বোঝানো হয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। এর মানে পরিষ্কার—কুয়োটা পেয়ে গেছে ওরা। সুসংবাদটা দেবার জন্য আধঘণ্টা আগে ফোন করেছিল রানা, তখনই শেষবার কথা

হয়েছে মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে।

'কী হয়েছে?' রানার কপালে ভাঁজ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ববির ফোন বন্ধ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে না? হয়তো যেখানে পজিশন নিয়েছে, সেখানে সিগনাল দুর্বল।'

'উঁহুঁ। অমন কিছু হলে লোকেশন বদলাবে ও, যোগাযোগ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না।'

'তা হলে?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু লক্ষণ বেশি সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

কিবরিয়ার নাম্বারে ডায়াল করল ও। সাড়া নেই। সন্দেহ গাঢ় হওয়ায় টিমের বাকি তিন সদস্যের নাম্বারেও চেষ্টা করে দেখল। লাভ হলো না। কপালের ভাঁজ গাঢ় হয়ে উঠল ওর। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে না। মুরল্যাণ্ডকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু ওদের তো সতর্ক থাকার কথা! হামলা করা হলেও পাঁচ-পাঁচজন সশস্ত্র লোককে চোখের পলকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। অন্তত একটা ফোন তো করতে পারত ওরা।

সেলফোনের ইন্টারনেট ব্রাউজার অন্ করল রানা। জিপিএস ট্র্যাকারের ওয়েবসাইট চেক করল। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, পালাৎজো রিয়ালের পজিশন দেখাচ্ছে না ওটা!

'কোথায় ওরা?' পাশ থেকে উঁকি দিল রেমি।

'মুভ করছে,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ট্র্যাকারের রিডিং যদি ঠিক থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে ববি পিয়াৎজা ছেড়ে শহরের উত্তরদিকে রওনা দিয়েছে।'

'কী!' চমকে উঠল রেমি। 'কেন?'

'জানি না। কোথাও গড়বড় হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'আমরা তা হলে কী করব?'

'ববির কী হয়েছে, তা না জেনে গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু র‍্যাচেল...' প্রতিবাদ করতে গেল রেমি।

ওকে থামিয়ে দিল রানা বলল, 'কিচ্ছু হবে না ওর। অপারেশনের শেষ পর্যায়ে এসে চরম কিছু ঘটাবার ঝুঁকি নেবে না গ্যারেট। আমাদেরকে হাতে রাখা ওর জন্যে খুব জরুরি।'

'তা হলে কি ববিকে খুঁজতে যাব আমরা?'

'আমরা না, শুধু আমি।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়। একা থাকলেই বরং দ্রুত মুভ করতে পারব আমি। ট্র্যাকারটাকে ফলো করব, বোঝার চেষ্টা করব পরিস্থিতি। যদি সম্ভব হয়, ববি আর আমার অপারেটরদের উদ্ধার করব।'

'আমি কী করব?'

'কিচ্ছু না। লুকিয়ে থাকতে হবে তোমাকে... গ্যারেট যাতে কিছুতেই খোঁজ না পায় তোমার।'

'লুকোচুরি পছন্দ নয় আমার, রানা,' অভিযোগের সুরে বলল রেমি।

'পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা নিরাপত্তার,' বলল রানা। 'জিয়োলেবটা সঙ্গে নিচ্ছি না, ওটা তোমার জিম্মায় থাকবে। গ্যারেটের হাতে জিনিসটা পড়তে দেয়া যাবে না কিছুতেই। আমার এজেন্সির একটা সেফহাউসে রেখে যাব তোমাকে। দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি না ফিরে আসি, মি. রেডক্লিফকে ফোন করবে। সাহায্য নেবে তাঁর। আর যা-ই করো, কোনও অবস্থাতেই একাকী দেখা করতে যেয়ো না গ্যারেটের সঙ্গে। ক্লিয়ার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। 'বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পছন্দ

হচ্ছে না।'

'পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই।' কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝোলাল রানা। 'চলো।'

চার্চের সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জনে। চত্বরের সীমানা ঘেঁষে চলে গেছে সরু ওয়াকওয়ে, ওখানে নেমে চারপাশ দেখে নিল রানা। কনসার্ট দেখবার জন্য প্রচুর দর্শক এসেছে, ওদের প্রতি মনোযোগ নেই কারও। এই ভিড়ের মাঝে নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন। গ্যারেট ওদেরকে স্পট করতে পারবে বলে মনে হয় না, তবু সতর্ক পদক্ষেপে এগোল রানা। উত্তর দিকের পার্কিং লটে রেখে এসেছে ওদের গাড়ি, সেদিকে যাচ্ছে।

লটের সীমানায় পৌঁছুতেই একটা পিলারের পিছন থেকে ঢোলা প্যান্ট আর কালো টি-শার্ট পরা একজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল সে। লোকটার হাতে একটা ভাঁজ করা জ্যাকেট রয়েছে, হাতটা তাক করে রাখা হয়েছে ওদের দিকে। নিশ্চয়ই গ্যারেটের লোক!

থমকে দাঁড়াল রানা। রেমিকে সতর্ক করবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ওর পিঠে ঠেকানো হলো একটা পিস্তল। জমে গেল ও।

'তাড়াতাড়ি এসে গেছ তুমি, রানা,' কানের কাছে শোনা গেল বাস্তুনি গ্যারেটের হাসিমাখা কণ্ঠ।

'তুমিও,' নীরস গলায় বলল রানা।

'প্ল্যানে একটু রদবদল করতে বাধ্য হয়েছি। বাই দ্য ওয়ে... কিছু করতে যেয়ো না। আমার বন্ধু কাটনারের জ্যাকেটের তলায় আরেকটা পিস্তল আছে।'

'সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছি।'

মুক্ত হাতে রানার শরীরতল্লাশি করল গ্যারেট, কোমর থেকে

কেড়ে নিল পিস্তল—অস্ত্রটা কিবরিয়ার কাছ থেকে ধার করে এনেছিল রানা।

'তোমাদের ফোনগুলো দাও,' হুকুম দিল গ্যারেট।

পকেটে হাত ঢোকাল রানা, আর তখুনি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গেল রেমি। চেষ্টা করল গ্যারেটকে ঘুসি মারতে। খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল রানা।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো!' কড়া গলায় বলল ও। 'নইলে খামোকা খুন হয়ে যাবে।'

'খুন আমরা এমনিতেও হব, রানা,' ফুঁসে উঠল রেমি।

'আমার তা মনে হয় না। খুন করতে চাইলে এতক্ষণে করে ফেলতে পারত।'

'ও ঠিকই বলেছে, ডার্লিং,' বলে উঠল গ্যারেট। কয়েক পা পিছিয়ে গেছে সে, এতক্ষণে তাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। কাটনারের মত সে-ও হাতের উপর একটা কোট ভাঁজ করে রেখেছে, তার তলায় লুকিয়ে রেখেছে মুঠোয় ধরা পিস্তল। 'মাথা গরম না করে ফোনদুটো দিয়ে দাও।'

'খবরদার! আমাকে ডার্লিং বলবে না।'

'কী বলব তা হলে? ইয়োর হাইনেস?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল গ্যারেট।

কথা বাড়াবার প্রবৃত্তি হলো না রানার। নিজের আর রেমির ফোনদুটো বাড়িয়ে ধরল। এগিয়ে এসে ওগুলো নিল গ্যারেট, তারপর কংক্রিটের উপর আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল সেটদুটো।

'ব্যস, এখন আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না আমাদের,' বলল সে। রানার দিকে তাকাল। 'ব্যাকপ্যাকটা দাও। জিয়োলেবটা ভিতরে আছে নিশ্চয়ই।'

'ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না,' কাঠখোট্টা গলায়

বলল রানা।

'ব্যাগটা হাতে পেলেই খুশি হব আমি,' প্রত্যুত্তর দিল গ্যারেট। 'নিজ থেকে দেবে, নাকি তোমার হাঁটুতে গুলি করে জিনিসটা কেড়ে নিতে হবে?'

নিঃশব্দে ব্যাকপ্যাক বাড়িয়ে ধরল রানা। ওটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে গ্যারেট বলল, 'চমৎকার! এবার হাঁটতে শুরু করো।'

'কোন্‌দিকে?'

পিস্তলের ইশারা করল গ্যারেট। 'ওদিকে। আমার গাড়িটা ওখানে রেখেছি।'

রেমির হাত ধরে পা বাড়াল রানা। ওদের পিছনে রইল গ্যারেট আর কাটনার।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে কী!' অবাক হবার ভান করল গ্যারেট। 'আমি নেব কেন? তোমরাই বরং নিয়ে যাবে আমাকে। চুক্তির কথা ভুলে গেছ? টানেলে ঢোকার রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দেবে তোমরা।'

'তার বিনিময়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি দেবারও কথা ছিল। তা তোমরা দাওনি। কাজেই আমাদের তরফ থেকে কোনও সাহায্য পাবার আশা কোরো না। আর্কিমিডিসের ওই কুয়োর খোঁজ কিছুতেই তোমাকে দেব না আমরা।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল গ্যারেট। 'নিজেকে খুব চালাক ভাবছ, রানা? শুনে খুশি হবে, কুয়োটার লোকেশন আমার জানা আছে। পিয়াৎজা স্যান গেতানোয়... স্যান ম্যাগিয়োর গির্জা, তাই না? ওখানে কুয়োটা খুঁজে পেয়েছ তোমরা। ড. হ্যাডলি বলেছে আমাকে!'

চমকে উঠল রানা। আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ভাগ্যক্রমে ওদেরকে খুঁজে পায়নি গ্যারেট, জানত ওরা গির্জায়

আশ্রয় নিয়েছে। সে-কারণেই গির্জা থেকে বেরিয়ে যে-পথে পার্কিং লটে ঢুকতে হয়, সেখানে ফাঁদ পেতেছিল। ওদের সঙ্গে ট্র্যাকার ছিল না, তারপরেও লোকেশন ফাঁস হবার উপায় একটাই—রেমি বেঈমানী করেছে! সব বলে দিয়েছে গ্যারেটকে! ওদের প্ল্যান, কুয়োর লোকেশন... স-অ-ব! ওর কারণেই উধাও হয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড আর কিবরিয়ার টিম।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেমির দিকে। 'তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি,' থমথমে গলায় বলল ও। 'এ-ই কি তার প্রতিদান?'

'কী!' হতভম্ব চেহারা হয়েছে রেমির। 'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। 'তুমি কি ভাবছ আমি এই শয়তানটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি?'

কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'নইলে ও আমাদের খুঁজে পেল কী করে?'

'তা আমি কীভাবে জানব? তোমার মত আমিও ওর হাতে বন্দি। আমার বোনকেও ও কিডন্যাপ করেছে!'

রেমির কথায় প্রভাবিত হলো না রানা। র‍্যাচেল হ্যাডলির অপহরণ স্রেফ একটা সাজানো ঘটনা হতে বাধা কোথায়? রেমিকে দলে ভেড়ানোর জন্যই হয়তো নাটকটা করা হয়েছে।

'তোমার ধারণাই ঠিক, রানা,' ওর মনের কথা পড়তে পেরে বলল গ্যারেট। 'রেমি এতদিন আমার ইনফরম্যাণ্ট হিসেবে কাজ করেছে। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপের খবর নিয়মিত আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে ও। আজ ওকে তোমার সঙ্গে আটক করলাম কেন, এটা ভেবে হয়তো অবাক হচ্ছ। ব্যাপার হয়েছে কী... লোভী হয়ে উঠেছে ও। ন্যায্য ভাগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দাবি করতে শুরু করেছে। দু'মুখো সাপ কোথাকার... এক্ষুনি ওকে খুন করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ওর প্রফেশনাল এক্সপার্টিজের প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি বলে...'

'চুপ করো, বাস্টার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি। 'ওর কথায় কান দিয়ো না, রানা। ও একটা মিথ্যাবাদী!'

'তা-ই?' বাঁকা সুরে বলল গ্যারেট। 'তা হলে তুমিই বলো, রানা... তোমরা যে ইংল্যাণ্ডে মায়ার সঙ্গে দেখা করেছিলে, তা কী করে জানি আমি? কী করে জানি যে, ওকে ধাওয়া করে মিউনিখে গিয়েছিলে? গতকাল অ্যাথেন্স মিউজিয়াম থেকে একটা রেপ্লিকা চুরি করেছ তোমরা, আজ সকালে গিয়েছিলে পার্থেননে... এসব খবর আমার কাছে পৌঁছুল কীভাবে?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির।

রানা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'এসবের কোনও ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে? জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে আমাদের লণ্ডন, মিউনিখ আর অ্যাথেন্স ট্রিপের খবর হয়তো পেয়েছে গ্যারেট; কিন্তু পার্থেননের খবর পেল কীভাবে? ট্র্যাকারটা তখন আমরা সঙ্গে নিইনি। ওটা আমার এজেন্সির একজন অপারেটর নুমার জেটে পৌঁছে দিয়েছিল।'

কোনও কথা জোগাল না রেমির মুখে।

গ্যারেটের দিকে ফিরল রানা। 'ববি কোথায়?'

'বেঁচে আছে না মরে গেছে... আমি ঠিক জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'ওটা মায়া বলতে পারবে।'

'মায়ার হাতে ধরিয়ে দিয়েছ ওকে?'

'আপদ বিদায় করেছি, সেইসঙ্গে মায়াকে ব্যস্ত রাখার একটা উপায়ও বলতে পারো,' গর্বের সুর ফুটল গ্যারেটের গলায়। 'এক ঢিলে দুই পাখি... ইম্প্রেসিভ, কী বলো?'

'আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'ভাল আছেন উনি,' অম্লানবদনে মিথ্যে বলল গ্যারেট। '...এখন পর্যন্ত।'

বিশ্বাস করল না রানা। 'আমি ওঁকে দেখতে চাই। আজকের

ভিডিও কোথায়?'

'ভিডিও দিয়ে কী করবে? ধুয়ে পানি খাবে? কথা দিচ্ছি, গুপ্তধন পাবার পর ভদ্রলোককে ছেড়ে দেব আমি। এ-নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি কোরো না।'

'কুয়োর লোকেশন তো পেয়েই গেছ। এখন আর আমাকে কী দরকার?'

'দরকার আছে, মাই ডিয়ার রানা। কোডেক্সের কয়েকটা পাতা তুমি দেখোনি। ওগুলোর কপি বা অনুবাদ আমি দিইনি তোমাকে। জিয়োলেব ব্যবহার করে কীভাবে চেম্বারটায় পৌঁছুতে হবে, তার নির্দেশনা আছে পাতাগুলোয়। অলরেডি প্রমাণ হয়ে গেছে, ডিভাইসটার ব্যবহার তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব তোমাকে ছাড়া চলছে না আমার।'

'আমি যদি রাজি না হই?'

'তা হলে তোমাকে ছাড়াই মাইডাসের সমাধি খুঁজতে হবে আমাকে। তবে যাবার আগে তোমাদের দু'জনকে খুন করে রেখে যাব। কোন্‌টা তোমার পছন্দ?'

'ও ভয় দেখাচ্ছে,' বলল রেমি। 'ওর কথায় কান দিয়ো না।'

ওকে কোনও গুরুত্ব দিল না রানা, মনে মনে যাচাই করল পরিস্থিতি। মরতে ভয় পায় না ও, কিন্তু মরে গেলে কোনও লাভ হচ্ছে না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। স্ট্রনটিয়ামের বোমা নিয়ে গ্যারেট কী প্ল্যান এঁটেছে, সেটাও জানতে পারছে না... পারছে না তাকে ঠেকাতে। তার চেয়ে লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে আয়ু বাড়িয়ে নেয়া যাক। একটা না একটা সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে পাশার ছক উল্টে দেবার। সেটাই চাই ওর।

'মাইডাসের সোনা না দেখে মরলে বিরাট একটা আক্ষেপ থেকে যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'চলো, তোমার সঙ্গেই যাব আমি।'

'উত্তম সিদ্ধান্ত,' মাথা ঝোঁকাল গ্যারেট। 'তা হলে হাঁটো।'

পার্ক করা একটা ফিয়াট সেডানের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো রানা আর রেমিকে। গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে দুটো বেল্ট বের করল কাটনার।

'হাত তোলো,' দুই বন্দিকে নির্দেশ দিল গ্যারেট।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী এগুলো?'

'স্টান বেল্ট,' বলল গ্যারেট। 'জেলখানায় ব্যবহার করা হয়—উশৃঙ্খল কয়েদিদের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য। তোমাদেরকেও সে-কারণেই পরানো হচ্ছে। টানেলে যখন ঢুকব, তখন পরিবেশ এতটা খোলামেলা থাকবে না। একে অন্ধকার, তার ওপর আবার ছোট্ট জায়গা... তোমাদের নাগালের ভিতর যদি থাকি, দুষ্ট বুদ্ধি খেলতে পারে তোমাদের মাথায়। হয়তো পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। দূরে থাকলেও বিপদ—তোমরা চেষ্টা করবে পালিয়ে যাবার। ওসব সামাল দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা। তোমাদের নাগালের বাইরে থাকতে পারব, কিন্তু দূর থেকেও কন্ট্রোল করতে পারব তোমাদের।'

দুই রঙের দুটো বেল্ট পরানো হলো বন্দিদের—রানাকে লাল, রেমিকে নীল। গ্যারেট পরল দুটো ওয়েস্টব্যাণ্ড, তাতে স্টান বেল্টের বাটন লাগানো। বেল্টের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাটনদুটোও লাল-নীল রঙের।

আশাবাদী হয়ে উঠল রানা। স্টান বেল্ট পরাবার মানেই হচ্ছে ওদেরকে টানেলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেবে গ্যারেট। ওর চোখ এড়িয়ে বেল্টটা কোনোমতে খুলে ফেলতে পারলেই হয়, তখন পাল্টা আঘাত হানা যাবে শত্রুর উপর।

বেল্টদুটো যথেষ্ট টাইট হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখল কাটনার। তারপর একটা চাবি দিয়ে আটকে দিল বাকলের তালা। বাকল তো নয়, তাসের প্যাকেট আকৃতির চারকোনা একেকটা

বাক্স ওগুলো। বেল্ট আর বাকলের চাপে হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। বুঝল, কসরত করে ওটার ভিতর থেকে বের হতে পারবে না।

ফিয়াটের পিছনের দরজা খুলে ধরেছে গ্যারেট। বলল, 'উঠে পড়ো।'

দ্বিরুক্তি না করে ব্যাকসিটে চড়ে বসল রানা আর রেমি। সঙ্গীকে নিয়ে গ্যারেট উঠল সামনে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল কাটনার। গিয়ার দিয়ে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে।

'পিছন থেকে হামলা চালাতে যেয়ো না,' গ্যারেট সাবধান করে দিল রানা আর রেমিকে। 'বেল্টদুটোয় সামান্য মডিফিকেশন করেছে আমার এক বন্ধু। ডান-বাম করতে গেলে ইলেকট্রিক শক খাবে না, স্রেফ মারা পড়বে।'

'মানে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'মানে হচ্ছে, ওগুলো এখন আর স্টান বেল্ট নয়... এক্সপ্লোসিভ বেল্ট! ভিতরে তিন আউন্স করে সি-ফোর বসানো হয়েছে শেপ-চার্জ হিসেবে। বিশাল কোনও বিস্ফোরণ ঘটবে না, তবে আমি যদি বেল্টের বাটন টিপি, কোমর থেকে স্রেফ দু'টুকরো হয়ে যাবে তোমরা। টানেলের ভিতরে তোমরা যদি টানা দশ সেকেণ্ডের বেশি আমার চোখের আড়ালে থাকো, তা-ই ঘটবে।'

সতেরো

চেতনা ফিরে পেতেই সারা শরীরে নরকযন্ত্রণা অনুভব করল

মুরল্যাণ্ড, যেন দুরমুজ দিয়ে পেটানো হয়েছে ওকে। ব্যাটনের আঘাতে আলু গজিয়েছে মাথায়, ফুলে গেছে ঘাড়ের রগ; বুক-পিঠে লাথি-গুঁতোর প্রচণ্ড ব্যথা। পাঁজরের হাড়গোড় ভেঙেছে কি না কে জানে। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। চারদিকে মানুষের উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে একাধিক কণ্ঠস্বর... কিন্তু কথাগুলো যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। ঝাপসা চোখে লোকগুলোকে দেখাচ্ছে প্রেতাত্মার মত।

হঠাৎ শরীর ঝাঁকি খেতেই ঘোর কেটে গেল ওর, পরিষ্কার হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। একটা গাড়ির ব্যাকসিটে বসে আছে ও, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দু'পাশে বসে আছে দু'জন গুণ্ডা। কালসিটে পড়া চোয়াল ডলছে একজন; অন্যজন মালিশ করছে তলপেট। খুশি হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। মার ওরাও কম খায়নি। সামনে তাকাল। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার, পাশে বসে উদাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে টমি। জানালার পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে সরে যাচ্ছে গাছ, ল্যাম্পপোস্ট। শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

পিছনে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল টমি। বলল, 'ঘুম তা হলে ভাঙল?'

'না ভেঙে উপায় আছে?' মুখ বাঁকিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমাদের গায়ের দুর্গন্ধে মরা মানুষও জেগে উঠবে। মৃগী রোগীকে স্মেলিং সল্টের বদলে তোমাদের গন্ধ শোঁকালেই চলে।'

'গলাবাজি কমেনি দেখছি!' থমথমে হয়ে উঠল টমির চেহারা। 'মনে হচ্ছে তোমাকে আরেক দফা ধোলাই দিতে হবে।'

'সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোক নিয়ে অমন বীরত্ব সবাই দেখাতে পারে,' পিত্তি জ্বালানো সুর মুরল্যাণ্ডের গলায়। 'হাতটা খুলে দাও, তারপর দেখো কে কাকে ধোলাই দেয়।'

'খামোশ!' কথায় না পেরে চেঁচিয়ে উঠল টমি। 'আর একটা কথাও নয়। চুপ করে বসে থাকো, নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

'হুম! এমনিতে অবশ্য রাজার হালেই রেখেছ আমাকে।'

দাঁত কিড়মিড় করল টমি। আর কিছু না বলে সোজা হলো সিটের উপর। তার একটু পরেই বিশাল একটা গেটের সামনে থামল গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করবার পর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলে গেল পাল্লা। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে প্রাসাদোপম একটা ভিলার দিকে এগিয়ে চলল গাড়ি। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে থামল।

গুণ্ডারা নেমে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে মুরল্যাণ্ডকেও নামাল। ঠেলাধাক্কা দিয়ে ঢোকাল বাড়ির ভিতরে। ফয়েই পেরুতেই একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেটা ধরে দোতলায় তোলা হলো ওকে। নিয়ে যাওয়া হলো সাগরমুখী বিশাল এক ব্যালকনিতে।

রেলিঙের ধারে, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মায়া লরেঞ্জো; ধীরে ধীরে ঘুরল ওর দিকে। জার্মেনিতে গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের বাইরে এক পলকের জন্য তাকে দেখেছে মুরল্যাণ্ড, তাই বলে চিনতে অসুবিধে হলো না। এমন রূপসীকে সহজে ভোলা সম্ভব নয়। মুখোমুখি হয়ে মুগ্ধতা আরও বাড়ল। চুল তো নয়, যেন জলপ্রপাতের ধারা। চোখদুটি টানা টানা, যদিও দৃষ্টিতে শীতলতা ছাড়া আর কিছু নেই। ভরাট বুক, সরু কোমর আর লম্বা পা, নিঃসন্দেহে অপূর্ব দেহের গঠন। চেহারাও মাদক-মাখা। লাইট জ্বললেও ব্যালকনির অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি, আলো-ছায়ার মাঝে রহস্যময়ীর মত লাগছে তাকে। অন্য কোথাও দেখা হলে নির্ঘাত মুরল্যাণ্ড ওকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাইত।

মুরল্যাণ্ডকে দেখে এক টুকরো হাসি ফুটল মায়ার ঠোঁটে।

'আমার ছোট্ট কুটিরে স্বাগতম, মি. মুরল্যাণ্ড।'

'ধন্যবাদ,' চেহারায় বিতৃষ্ণা ফোটাল মুরল্যাণ্ড, 'তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, দাওয়াতের জন্য একটা কার্ড পাঠানোই যথেষ্ট ছিল... এসকর্ট পাঠাবার প্রয়োজন ছিল না।'

'লণ্ডনে সে-চেষ্টা করা হয়েছিল, তুমি রাজি হওনি।'

পিছনে দাঁড়ানো টমি ও তার সঙ্গীদের দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'আসলে... বদখত লোকগুলো যে তোমার মত এমন অপূর্ব সুন্দরীর পাঠানো হতে পারে, তা বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল টমি।

হেসে উঠল মায়া। 'তুমি বড়ই রসিক লোক, মি. মুরল্যাণ্ড। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। লেট আস বি ফ্রেণ্ডস্। ববি বলে ডাকলে কিছু মনে করবে না তো?'

'করব। এভাবে হাত-পা বেঁধে কি বন্ধুত্ব হয়?'

'টমি, ওর হাত খুলে দাও,' নির্দেশ দিল মায়া। 'ওর জন্য একটু স্কচও নিয়ে এসো।'

'অশেষ তোমার দয়া!' খোঁচা মারা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। বাঁধন খুলে যেতেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, অনুমতির তোয়াক্কা করল না। মায়াও ওর মুখোমুখি এসে বসল।

'এখন ভাল লাগছে তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ,' হাতের কবজি ডলতে ডলতে বলল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশ পাঠিয়ে আমার বন্ধুদের সরিয়ে নেবার আইডিয়াটা ভাল ছিল। ওরা এখন কোথায়?'

'ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মায়া। 'একটা রাত জেলে কাটাবে ওরা, কাল সকালে আবার ছাড়া পেয়ে যাবে। আমার কাজের জন্য সময়টা যথেষ্ট।'

'কী কাজ?'

'অ্যান্থনি গ্যারেটকে খুঁজছি আমি,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল

মায়া। 'তুমি জানো, ও কোথায়?'

'জানার সুযোগ পাইনি,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'দোষটা তোমার।'

'মানে?'

'ওর খোঁজ পাবার আগেই তোমার গুণ্ডারা আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে। একটু যদি ধৈর্য ধরতে, তা হলে শুধু আমাকে নয়, গ্যারেটকেও পেয়ে যেতে তোমরা।'

ড্রিঙ্কস নিয়ে এসেছে টমি। মুরল্যাণ্ডের সামনে নামিয়ে রাখল।

'থ্যাঙ্কস, টমি।' গ্লাস থেকে এক টুকরো বরফ তুলে নিয়ে মাথার ফুলে ওঠা জায়গায় ঘষল মুরল্যাণ্ড। তারপর চুমুক দিল স্কচে।

'যে করেই হোক, গ্যারেটকে আমার চাই,' বলল মায়া। 'তুমি ওকে খুঁজে বের করতে পারবে?'

'কোন্ দুঃখে তোমাকে সাহায্য করতে যাব, বলতে পারো?' মুখ বাঁকল মুরল্যাণ্ড।

'কারণ, কথা না শুনলে আমার লোকেরা এক্ষুণি তোমাকে ব্যালকনি থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেবে,' কঠিন গলায় বলল মায়া।

'অকাট্য যুক্তি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পেলাম না। গ্যারেটের খোঁজ বের করতে পারবে?'

'রানার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'ওর নাম্বার বলো।'

ওতে কোনও ক্ষতি দেখল না ববি, তাই বলে দিল রানার সেলফোন নাম্বার। কয়েক দফা চেষ্টা করে মায়া জানাল, 'ফোনটা বন্ধ।'

এর অর্থ ভাল হতে পারে না। চিন্তিত গলায় মুরল্যাণ্ড বলল, 'নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে রানা। গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করবার কথা

ওর আর রেমির।'

'মাইডাসের সমাধি খুঁজতে গেছে ওরা?'

'তেমনটাই আমার সন্দেহ।'

'জায়গাটা কোথায়, তা জানো?'

'আইডিয়া করতে পারি।'

'তা হলে চলো, আমাদের দেখিয়ে দেবে।'

'তার আগে আমি কিছু গ্যারান্টি চাই।'

'একটাই গ্যারান্টি এ-মুহূর্তে দিতে পারি,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল মায়া, 'কথামত কাজ না করলে মরবার গ্যারান্টি। মৃত্যুটাও হবে অত্যন্ত কষ্টকর।'

'অপ্রয়োজনীয় গ্যারান্টি,' নির্বিকার রইল মুরল্যাণ্ড। 'আমার অন্য কিছু চাই। শুনেছি তোমরা... মানে, মাফিয়ারা এক কথার মানুষ। কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি করলে সেটার বরখেলাপ করো না। তাই একটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি...'

খুব যে আশা করে কথাটা বলা, তা নয়। মায়ার মত ক্রিমিনালের উপর ভরসা করা স্রেফ বোকামি, কথা দিলেই সেটা রাখবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কোনও ধরনের দর কষাকষি ছাড়া তার কথায় নাচতে রাজি নয় মুরল্যাণ্ড।

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মায়ার গলা।

'মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি—আমাকে, রানাকে আর রেমিকে। তোমার মরা মায়ের নামে শপথ করো, গুপ্তধন আর গ্যারেটকে পাবার পর তুমি আমাদেরকে ছেড়ে দেবে।'

'আমার মা বেঁচে আছেন,' রসকষহীন গলায় বলল মায়া। 'এখান থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে তাঁর বাড়ি।'

'নিকটাত্মীয়দের মাঝে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মৃত? তার নামেই নাহয় শপথ করো!'

'গ্যারেটের সঙ্গে এতদিন কাজ করেছ তোমরা,' মায়া বলল।

'কী করে বুঝব, আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য তোমাকে এখানে টোপ হিসেবে পাঠায়নি ও?'

'আমরা কেউই স্বেচ্ছায় সাহায্য করছি না গ্যারেটকে। আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছে ও।'

'তা-ই? প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'ইন্টারনেট কানেকশন-সহ একটা কম্পিউটার পেলেই দেখিয়ে দিতে পারি।'

তুড়ি বাজাল মায়া। কয়েক মিনিট পরেই একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে এল নিরো। রানার ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খুলে মায়াকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের দুটো ভিডিও দেখাল মুরল্যাণ্ড।

'কারা এরা?' জানতে চাইল মায়া।

'প্রথমজন আমার বস আর রানার অতি শ্রদ্ধেয় গুরুজন, মেয়েটা রেমির বোন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কেন গ্যারেটের কথায় মাইডাসের চেম্বার খুঁজছি আমরা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মায়া। 'বেশ, মানলাম তোমার কথা। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে পাবার পর আমি যদি তোমাদের ছেড়ে দিই, তখন তোমরা মুখ বন্ধ রাখবে... এর নিশ্চয়তা কী?'

'কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি তো আমাদেরকে কোনও প্রমাণ নিয়ে যেতে দেবে না।'

একটু ভাবল মায়া। 'ঠিক আছে, তা হলে আমার মৃত স্বামীর নামে শপথ করছি, তোমাদেরকে আমি খুন করব না। তবে তার আগে আমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া চাই। গ্যারেটকে ধরিয়ে দেবে তোমরা, চেম্বারটাও খুঁজে দেবে।'

'প্রতিশ্রুতিটা আরেকটু পরিষ্কার করে নিলে খুশি হই,' চাঁছাছোলা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'বুঝলাম তুমি আমাদেরকে খুন করবে না... কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার পথে আমরা তো

দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারি!'

হাসল মায়া। 'তুমি অত্যন্ত চালু লোক, ববি। বেশ, কথা দিলাম... নিরাপদে এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারবে তোমরা। কোনও ক্ষতি হবে না তোমাদের।'

'ব্যস, ওতেই হবে।' উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। জানে, কথার মর্যাদা রাখবে না মায়া; কিন্তু বেঁচে থাকার মেয়াদ যতটা বাড়িয়ে নিতে পারে, ততই বাড়বে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা—পালাবার সুযোগ খুঁজে নিতে পারবে ও। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

মায়াও উঠল। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পিয়াৎজা স্যান গেতানো-য়,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটা চার্চে যেতে হবে আমাদের।'

আঠারো

কোমরের বেল্টটায় সত্যিই এক্সপ্লোসিভ আছে কি না জানে না রানা, তবে কারিগরি দিক থেকে কোনও খুঁত নেই ওটায়। এমনভাবে শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে, কোনও অ্যাক্রোব্যাটের পক্ষেও কোমর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ওটা খোলা সম্ভব নয়। ছুরি-টুরি পেলেও খুব একটা লাভ হবে না—হেভি-ডিউটি নাইলনের তৈরি বেল্টটা কাটতে প্রচুর সময় লাগবে... তা ছাড়া কোনও ধরনের গ্যাপ না থাকায় ছুরির পোঁচ লেগে বেল্টের পাশাপাশি গায়ের

চামড়াও কেটে যাবে নির্ঘাত। ক্ল্যাম্প আর কি-রিলিজ মেকানিজমটা পরখ করে দেখেছে ও—ওটার হাউজিঙের ভিতরে রয়েছে এক্সপ্লোসিভ। কারিগরি ফলিয়ে তালা খুলতে গেলে এক্সপ্লোসিভ ফেটে যেতে পারে।

এমনিতে অবশ্য সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। জিনিসটা অত্যন্ত স্টেবল—সংঘর্ষ... এমনকী গুলির আঘাতেও বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা নেই। সিনেমায় গুলি করে সি-ফোর বিস্ফোরণের যে-সব কাহিনি দেখানো হয়, তা একেবারেই কল্পিত।

ঘাড় ফিরিয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা। বেল্টের কারণে ঠিকমত বসতে পারছে না মেয়েটা, চেহারায় অস্বস্তি ও বিষাদ... দুটোই ফুটে রয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বিধায় ভুগতে শুরু করেছে রানা—ভাবছে গ্যারেটের কথায় বিশ্বাস করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। মানুষ চিনতে সাধারণত এত বড় ভুল হয় না ওর। রেমিকে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতিনী বলে মানতে চাইছে না মন।

যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা খুঁজছে রানা। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের খবর জানে গ্যারেট... রেমির মাধ্যমে যদি না পেয়ে থাকে, তা হলে কীভাবে পেয়েছে? লণ্ডন আর মিউনিখের খবর জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে পেতে পারে... কিন্তু পার্থেনন? ওখানে তো ট্র্যাকার ছিল না ওদের সঙ্গে। নাকি ছিল?

আচমকা চিন্তাটা বিদ্যুৎচমকের মত খেলে গেল রানার মাথায়—গ্যারেট ওদের সেলফোন নষ্ট করে দিয়েছে! কেন? ওগুলো সঙ্গে থাকলেই বা কী আসত-যেত? নিছক সতর্কতা, নাকি আরও কিছু? ওর মনে পড়ে গেল, রেমির ফোনটা শুরু থেকেই রয়েছে ওদের সঙ্গে। রানারটা ইংল্যাণ্ডের এস্টেটে পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল... কিন্তু রেমিরটা নয়। ওটার ভিতরে হয়তো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল আরেকটা জিপিএস ট্র্যাকার। গ্যারেট

অত্যন্ত সাবধানী লোক—ব্যাকআপ হিসেবে দ্বিতীয় একটা ট্র্যাকারের ব্যবহার তার কাছে আশাই করা যায়।

ব্যাপারটা শিয়োর হবার উপায় নেই, তাও রানার মনে হলো ভুল আন্দাজ করেনি ও। রেমি সত্যিই নির্দোষ। গ্যারেট সম্ভবত ওদের মাঝে অবিশ্বাস আর সন্দেহ সৃষ্টি করে ফায়দা লুটবার জন্য ওকে বিশ্বাসঘাতিনী হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে। এভাবেই ওদেরকে বশে রাখবার প্ল্যান করেছে সে। আপাতত তাতে তাল দিয়ে যাবে বলে ঠিক করল রানা।

পিয়াৎজা স্যান গেতানোর দু'ব্লক দূরে একটা নির্জন লটে গাড়ি পার্ক করল কাটনার। এরপর চারজনে হাঁটতে শুরু করল গির্জার দিকে। সামনে রানা আর রেমি, পিছনে অস্ত্র হাতে গ্যারেট আর কাটনার। রাত বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি-ঘোড়া আর পথচারীর সংখ্যাও নগণ্য। ব্যস্তভাবে সবাই ছুটছে বাড়ির পথে, ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

খানিক পরেই *নাপোলি সোতারানিয়া*-র সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রানার, বিকেলেও দেখেছে। ওটা একটা ট্যুর সার্ভিস—পর্যটকদের নেপলসের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, এমনকী আণ্ডারগ্রাউণ্ডেও ঘোরাতে নিয়ে যায়। বিকেলে ওদের অফিসে থেমে একজন গাইডের সঙ্গে কথা বলেছে রানা। তার কাছ থেকে শুনেছে, নেপলস নগরীর তলায় জালের মত বিছিয়ে থাকা টানেল আর চেম্বারগুলোর ব্যাপারে কোথাও কোনও ডিটেইলড্ ইনফরমেশন নেই। সাবওয়ে আর স্ট্রাকচারাল ফাউণ্ডেশনের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রায়ই নিত্য-নতুন টানেলের সন্ধান পায় ওয়ার্কাররা। আর্কিয়োলজিস্টদের ধারণা, এখনও অন্তত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ টানেল অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। ওখানে কী আছে না আছে, সে-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। স্যান

ম্যাগিয়োর চার্চের তলার টানেলের বিষয়ে রানা আলাদাভাবে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু গাইড বলেছে—ওখানে কেউ কখনও নেমেছে বলে জানা নেই তার। জায়গাটা টানেল নেটওয়ার্কের অবহেলিত অংশে পড়েছে।

পিয়াৎজার চত্বরে পৌঁছে গেল চারজনে। খোলা জায়গার একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্যান ম্যাগিয়োর চার্চের প্রাচীন কাঠামো—বয়স একশো বছরের বেশি। সদর দরজাটা চত্বরের ঠিক পাশে। আর্কিয়োলজিকাল এক্সক্যাভেশনের একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে চার্চের বাইরে—মাটির তলায় নাকি প্রাচীন এক গ্রিক বাজারের নির্দশন পাওয়া গেছে, আধা-সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করছে।

ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের জন্য চার্চের দরজা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে, কোনও ঝামেলা ছাড়াই ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা ও তার সঙ্গীরা। চ্যাপেল পুরোপুরি ফাঁকা, রাতের বেলা ধর্মকর্মে বোধহয় আগ্রহী নয় নেপলসবাসীরা। শুধু একজন প্রিস্ট সামনের সারিতে বসে গুনগুন করে বাইবেল পাঠ করছেন।

কনফেশন বুথের সারি পেরিয়ে এল রানারা, চ্যাপেলের পাশের একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল গির্জার ইনার কোর্টইয়ার্ডে। এখানেও কেউ নেই। আঙিনার ঠিক মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা কুয়োমুখ। কাঠের একটা ফ্রেম রয়েছে ওটার উপর... সেইসঙ্গে দড়ি আর কপিকল। আগের আমলে দড়িতে বালতি বেঁধে নামিয়ে দেয়া হতো নীচে, অ্যাকোয়াডাক্ট দিয়ে পানি তুলে আনা হতো উপরে। এখন অবশ্য পানি নেই তলায়, সব শুকনো খটখটে। প্রাচীন কাঠামোটা রয়ে গেছে অতীতের সাক্ষী হয়ে।

'কর্কটের চিহ্নটা কোথায়?' জানতে চাইল গ্যারেট।

কুয়োর কিনারে চলে গেল রানা। একটু ঝুঁকে দেখিয়ে দিল

চিহ্নটা। চারকোনা একটা বক্সের ভিতরে খোদাই করা কয়েকটা বিন্দু—ককর্ট নক্ষত্রমণ্ডলের কনফিগারেশন। তলায় খোদাই করা হয়েছে *আলফা* অক্ষরটা। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ওটা দেখে নিল গ্যারেট।

'কংগ্রাচুলেশন্স, রানা!' হাসি ফুটল তার মুখে। 'কামাল করে দিয়েছ তুমি। সত্যি বলতে কী, শুরুতে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল আমার মনে—দু'হাজার বছরের পুরনো ধাঁধা মাত্র চারদিনে তোমরা ভেদ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু তুমি একটা জিনিয়াস... আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছ।'

লোকটার টুঁটি চেপে ধরার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। বিতৃষ্ণামাখা গলায় বলল, 'থাক, অত প্রশংসা না করলেও চলবে।'

'কাজ অবশ্য শেষ হয়নি। নীচে নামতে হবে আমাদের।'

'ঝাঁপ দাও না কেন কুয়োর ভিতরে? যদি আপত্তি না থাকে তো আমিই ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ফেলে দিতে পারি।'

'ঠাট্টা করছ?' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো গ্যারেটের। 'করো, কোনও অসুবিধে নেই। আমার মুড খুবই ভাল, কিছু মনে করব না। কাটনার!' সঙ্গীর দিকে ফিরল সে।

সঙ্গে একটা ডাফল ব্যাগ এনেছে কাটনার। গ্যারেটের ইশারা পেয়ে ওটা মাটিতে নামাল। চেইন খুলে বের করে আনল দড়ির কয়েল আর ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট। ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওগুলো নিয়ে। কুয়োর ফ্রেমের সঙ্গে দড়ি বেঁধে নেমে গেল কয়েক ফুট, তারপর হাতুড়ির সাহায্যে দেয়ালে একটা পিটন ঢোকাল, ওটার সঙ্গে আটকাল ডি-রিং। রিং গলিয়ে দড়ির কয়েলটা নীচে ফেলে দিল। টানাটানি করে দেখে নিল, পিটন ওদের ওজন নিতে পারবে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল উপরে।

'সব রেডি,' রিপোর্ট দিল কাটনার। 'এবার নামা যেতে

পারে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'গিয়ার দাও সবাইকে।'

হ্যাণ্ডগ্লাভস্, হারনেস আর বাতিসহ হেডব্যাণ্ড বিতরণ করা হলো সবার মাঝে। তাড়াতাড়ি সেগুলো পরে রেডি হয়ে গেল ওরা। এবার নামার পালা। পিঠে ডাফল ব্যাগ ঝুলিয়ে কুয়োর ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল কাটনার। রানা আর রেমিকে তার পিছু নিতে ইশারা করল গ্যারেট।

কুয়োর কিনারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। রেমি ঢোঁক গিলছে দেখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা?'

'আমি কোনোদিন দড়ি বাইনি,' বলল রেমি।

'কাজটা কঠিন কিছু না,' রানা সাহস জোগাল ওকে। দড়ির সঙ্গে রেমির হারনেস আটকাতে আটকাতে বলল, 'ওজনের কারণে এমনিতেই নীচের দিকে পিছলাবে তুমি, গতিটা কন্ট্রোল করবে এই ব্রেক রোপের সাহায্যে।' কৌশলটা দেখিয়ে দিল।

'যদি হাত পিছলায়?' ভয় কাটছে না রেমির।

'হারনেসটা তোমাকে বাঁচাবে, পড়ে যেতে দেবে না। কিচ্ছু ভেবো না, আমি তোমার নীচে থাকব... সাহায্য করব তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, রানা!' বলল রেমি। 'বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু গ্যারেটকে...'

'ওসব নিয়ে সুযোগ হলে পরে কথা বলা যাবে,' ওকে বাধা দিল রানা। 'এখন চলো।'

দড়ি ধরে কুয়োর ভিতর ঝুলে পড়ল ও। কয়েক মুহূর্ত পর রেমিও অনুসরণ করল ওকে। কুয়োটা বেশ গভীর—অন্তত দেড়শো ফুটের কম নয়, আন্দাজ করল রানা। তলায় পৌঁছুতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। মাটিতে পা ঠেকতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, রেমি নাগালের মধ্যে পৌঁছুলে ওকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনল সাবধানে।

একটু পর গ্যারেটও নেমে এল। হেডব্যাণ্ডে লাগানো ল্যাম্পগুলো জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে, চারদিকে আলো ফেলা হলো। বিশাল একটা চেম্বারে নেমে এসেছে ওরা, ছাতটা প্রায় তিনতলা উঁচু। দেয়ালগুলোয় হাতুড়ি-বাটালের চিহ্ন ফুটে আছে আজও। চারদিকে বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, চেম্বারের মেঝের চেয়ে ওগুলো অন্তত পনেরো ফুট উঁচুতে। বোঝা গেল, চেম্বারটা আসলে এক ধরনের রিজার্ভয়ার... অ্যাকোয়াডাক্টের পানি এসে জমা হতো এখানে, যাতে কুয়ো দিয়ে সহজে তোলা যায়। এখন অবশ্য পুরো জায়গাই খটখটে শুকনো। বদ্ধ একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। চারদিকে আঁধারের রাজত্ব। সুড়ঙ্গগুলো কোন্‌দিকে কতদূর গেছে, বলা মুশকিল।

'এবার কোন্ পথে যাব?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'জানি না,' রানা বলল। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্সের পরের সূত্রগুলো থাকার কথা। ওই পাতাগুলো তুমি আমাদের দাওনি।'

'এখন দেব।'

কাটনারের ডাফল ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল গ্যারেট। ভিতর থেকে বের করল কোডেক্সের অনুবাদ, মূল কোডেক্সের ফটোকপিও রয়েছে সঙ্গে। ওগুলো তুলে দিল রেমির হাতে।

'কাজে নেমে পড়ো,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কোডেক্সের পাতা উল্টাতে শুরু করল রেমি। কাটনারকে নির্দেশ দিল গ্যারেট, 'আশপাশে একটা চক্কর দিয়ে দেখে এসো। আমি চাই না আচমকা আমাদের ঘাড়ের উপর কেউ লাফিয়ে পড়ুক।'

পিস্তল বাগিয়ে ধরে চলে গেল কাটনার।

নীরবতায় কাটল কয়েক মিনিট। এরপর রানা বলল, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, গ্যারেট। মাইডাস চেম্বারের

যে-বর্ণনা পেয়েছি আমরা, তাতে অন্তত একশো টন সোনা থাকার কথা। মায়া আগামীকাল টানেলে হানা দেবার আগেই এত সোনা তুমি আর কাটনার কীভাবে বের করে নেবে বলে ভাবছ?'

মুখ বাঁকাল গ্যারেট। 'সোনা কে চায়? তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি চাই মাইডাস টাচ... যত খুশি সোনা তৈরি করবার ক্ষমতা! একশো কেন, তখন চাইলে এক হাজার টন সোনা বানাতে পারব।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। স্পর্শ দিয়ে সোনা বানাবে? এ অসম্ভব।'

একটু যেন বিরক্ত হলো গ্যারেট। বলল, 'তোমার ধারণা আমি মরীচিকার পিছনে ছুটছি? বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই মাইডাস টাচের?'

'আমার জানামতে নেই।'

'তা হলে ভুল জানো তুমি। এক্সট্রিমোফাইল-এর নাম শুনেছ?'

'না। কী ওটা?'

'এক ধরনের মাইক্রো-অর্গানিজম, চরম বিরূপ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে, যে-পরিবেশে অন্য কোনও জীবের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। সাধারণত আণ্ডারওয়াটার ভলক্যানিক ভেন্টের আশপাশে... সাগরের তলায় পাওয়া যায় এদের; অথবা পাওয়া যায় ইয়েলোস্টোন পার্কের মত অ্যাসিডিক হট স্প্রিংসে। এদের আরেকটা নাম আছে—*আর্কেয়া*। ধাতু মেশানো প্রাকৃতিক পানি খায় এরা, বর্জ্য হিসেবে সেই ধাতুকে নিরেট আকারে নিঃসরণ করে। দুনিয়ার বহু কোম্পানি তাই এসব মাইক্রোবের বসতি মাইনিং করবার চেষ্টা করছে।'

এবার মনে পড়ল রানার—নুমার একটা সেমিনারে এ-বিষয়ে আলোচনা শুনেছিল ও। ভলক্যানিক ভেন্টের আশপাশে নাকি বিভিন্ন দামি ধাতুর নিরেট কণা পাওয়া যায়—এক ধরনের

মাইক্রোবের কারণে তৈরি হয় ওগুলো। 'তোমার ধারণা, এর সঙ্গে মাইডাস টাচের সম্পর্ক আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে গত বিশ বছর ধরে গবেষণা করছি আমি... এবং এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য থিয়োরি বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। আমার ধারণা, রাজা মাইডাসের শরীরে বাসা বেঁধেছিল আর্কেয়া মাইক্রোব—হতে পারে কোনও হট স্প্রিংসে গোসল করবার কারণে। এক ধরনের স্কিন ডিজিজ বলতে পারো একে। তবে বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকায় তার নিজের কোনও ক্ষতি হয়নি এতে। বরং ওগুলো তাকে দিয়েছিল অদ্ভুত সেই ক্ষমতা—যে কোনও জিনিসকে স্বর্ণে পরিণত করবার ক্ষমতা!'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'মাইডাস যে-জিনিসই ধরত, সেটাই আক্রান্ত হতো ওই মাইক্রোবে। সিমবায়োসিসের মাধ্যমে সাবজেক্টের সমস্ত কোষে বাসা বাঁধত ওটা। এরপর যদি সোনার দ্রবণ-অলা পানিতে ভেজানো হয় আক্রান্ত জিনিসটা, ওই মাইক্রোব স্বর্ণকণা শুষতে শুরু করবে। বায়ো-কেমিকাল বিক্রিয়ার কারণে এক পর্যায়ে পুরো জিনিসটাই সোনায় রূপান্তরিত হবে। ভাল করে ভেবে দেখো, ব্যাখ্যাটা কিন্তু অবাস্তব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুমি তা হলে ওই মাইক্রোব খুঁজছ? রাজা মাইডাস আজ থেকে অন্তত তিন হাজার বছর আগে মারা গেছে। কেন ভাবছ মাইক্রোবগুলো এখনও টিকে আছে?'

'টিকে যে আছে, তার প্রমাণ আমি নিজ চোখে দেখেছি,' জোর গলায় বলল গ্যারেট। 'ছোটবেলায় মায়ার সঙ্গে যখন ওই চেম্বারে ঢুকেছিলাম, আমাদের চোখের সামনে একটা লোক সোনায় পরিণত হয়েছিল!'

মায়ার মুখে শোনা গল্পটা মনে পড়ে গেল রানার। মাইডাসের

কফিনে হাত ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল ড্রাগ-ডিলার লোকটা, হাতের চামড়া লাল হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে সেটা মাইক্রোবের সংক্রমণ। এরপর গরম পানি ভরা পুলের মধ্যে পড়ে যায় সে, সোনায় পরিণত হয়। ওই পানিতে সম্ভবত দ্রবীভূত সোনা ছিল।

যুক্তি আছে গ্যারেটের কথায়, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। শুরুতে তাকে যতটা পাগল মনে হয়েছিল, এখন আর তা হচ্ছে না।

'উপযুক্ত পরিবেশে আর্কেয়া মাইক্রোব অনির্দিষ্টকাল ডরম্যাণ্ট থাকতে পারে,' বলে চলেছে গ্যারেট। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, সমাধির ভিতরে সে-ধরনের পরিবেশ পেয়েছে ওরা।'

'তারপরেও... তিন হাজার বছর কম সময় নয়, হোক তা একটা মাইক্রো-অর্গানিজমের জন্য,' বলল রানা। 'চেম্বারের ভিতরে একটা হট পুল আছে বলে শুনেছি মায়ার মুখে। সোনা তৈরির রহস্য যে ওই পানিতে লুকানো নেই, তা কী করে বুঝছ? পুলের পানিতে বিশেষ কোনও উপকরণ থাকতে পারে না? ওটাই হয়তো সোনা তৈরি করছে!'

'সেটা পরীক্ষা করবারও উপায় আছে আমার কাছে,' বলল গ্যারেট। 'টেস্টটিউবে দু'রকম পানি নিয়ে এসেছি আমি—একটাতে সাগরের নোনা জল, অন্যটায় গলানো সোনার অ্যাসিডিক মিশ্রণ। মাইডাস টাচের ব্যাপারে আমার থিয়োরি যদি ভুল না হয়, তা হলে হট পুলের প্রয়োজন নেই, টেস্টটিউবের পানিতেও স্যাম্পল ভিজিয়ে সোনা বানাতে পারব আমরা।'

'সাগরের পানি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওটা দিয়ে টেস্ট করবার দরকার কী?'

হাসল গ্যারেট। 'ওটাই তো আমার কপাল বদলে দেবে, রানা! সাগরের পানিতে সোনার কণা থাকে, এ-কথা জানো না?

আর্কেয়া মাইক্রোবের সাহায্যে ওখান থেকেই তো সবচেয়ে বেশি সোনা পাব আমি!'

'পরিমাণটা খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'সাগরের পানিতে সোনার অনুপাত অত্যন্ত কম।'

'কম? একটু হিসেব করে দেখবে নাকি? দুনিয়ার সবগুলো সাগরের আয়তন একত্র করলে দাঁড়ায় এক বিলিয়ন বর্গকিলোমিটার... কিংবা তারও বেশি। সাগরের পানিতে দ্রবীভূত সোনার পরিমাণ হলো প্রতি ট্রিলিয়নে তেরো ভাগ। তা হলে সবমিলিয়ে কত সোনা আছে ওখানে?'

হিসাবটা মনে মনে করতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। কেন মাইডাসের সমাধি থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনা সরাতে আগ্রহী নয় গ্যারেট, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামগ্রিক বিচারে ওটা আসলে কিছুই নয়... কারণ সাগর থেকে সোনা সংগ্রহ করতে চাইছে সে। আর সারা দুনিয়ার সাগরে যে-পরিমাণ সোনা রয়েছে, তার মূল্য পঁচিশ ট্রিলিয়ন ডলার!

উনিশ

হাসবে না কাঁদবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট হাওয়ার্ড কার্টার। হ্যাগার্সটাউনের শেরিফের অফিসে, খুপরির মত এক ইন্টারোগেশন রুমে বসে আছে সে; জেরা করছে মুসলিম যুবক মুহাম্মদ ফাত্তাহ্-কে। অবিশ্বাস্য এক

গল্প ফেঁদে বসেছে এই ফাত্তাহ্, এর আগে কোনও ক্রিমিনালের মাঝে এমন উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখেনি কার্টার। আনমনে মাথা নাড়ল সে, তার পার্টনার জোনাথন জেনকিন্সের কী অবস্থা কে জানে। পাশের কামরায় আরহাম বিন মুসা নামে আরেক যুবককে ইন্টারোগেট করছে সে। আশা করল ওখান থেকে আসল ঘটনা জানা যাবে। ফাত্তাহ্-র গল্পের তো কোনও মাথামুণ্ডু পাওয়া যাচ্ছে না!

বিরক্ত মুখে কফির মগে চুমুক দিল কার্টার। বিশজন এজেন্ট নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে পাগলের মত ছুটে আসতে হয়েছে তাকে হ্যাগার্সটাউনে—এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্টে নাকি টেরোরিস্ট অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছে। অকুস্থলে পৌঁছে দেখল, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে একটা ওয়্যারহাউস। তল্লাশি চালিয়ে কংক্রিটের একটা রিটেইনিং ওয়ালের পিছন থেকে ফাত্তাহ্ আর আরহামকে আবিষ্কার করেছে ওরা, সঙ্গে ছিল এক আমেরিকান তরুণী আর গুলিবিদ্ধ আরেক বৃদ্ধ। আহত মানুষটির পরিচয় পেয়ে চমকে উঠেছিল কার্টার—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর! এঁকেই তো গত কয়েকদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা! কীভাবে ভদ্রলোক হ্যাগার্সটাউনে পৌঁছুলেন, জানা সম্ভব হয়নি। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ছিল তাঁর, হেলিকপ্টারে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটালে।

উদ্ধারকৃত তরুণী র‍্যাচেল হ্যাডলিকেও পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে—টানা চারদিন বন্দিত্বের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। এই মেয়েটিও অপহৃত হয়েছিল বলে ইনফরমেশন আছে কার্টারের কাছে। ইনফরমেশন নেই শুধু ফাত্তাহ্ বা আরহামের ব্যাপারে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি, ফলে পুরো ঘটনায় দুই মুসলিম যুবকের ভূমিকা

সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে কার্টারের ধারণা, এরা ভিকটিম নয়; অপহরণ ও বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। ওদেরকে জেরা করে সেটাই স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছে সে। কিন্তু ফাত্তাহ্ তাকে অদ্ভুত এক গল্প শোনাতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপর কফির মগ নামিয়ে রাখল কার্টার, চোখ রাখল সাসপেক্টের চোখে। 'তার মানে, মি. ফাত্তাহ্,' বলল সে, 'তুমি বলতে চাইছ, সাতসকালে দরজা ভেঙে মুখোশধারী দু'জন লোক ঢুকে পড়েছিল তোমার ঘরে? অস্ত্রের মুখে কিডন্যাপ করেছিল তোমাকে?'

'আল্লাহ্‌র কসম, ঠিক তা-ই ঘটেছে,' বলল ফাত্তাহ্।

অস্বস্তি বোধ করল কার্টার। টেরোরিস্টদের মাঝে যে-ধরনের ঔদ্ধত্য লক্ষ করা যায়, তা এই যুবকের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে সে। সত্যি কথা বলছে, নাকি ব্যাপারটা অভিনয়?

'বাড়ি কোথায় তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি সৌদি আরবের মানুষ,' জানাল ফাত্তাহ্। 'ইউনিভার্সিটি অভ মেরিল্যাণ্ডে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিঙের উপর পিএইচডি করছি।'

'তা-ই? কিডন্যাপারদের সম্পর্কে বলো। কে ছিল ওরা?'

'আ... আমি জানি না। মুখোশ পরেছিল ওরা। আমার মাথাও ঢেকে দিয়েছিল কালো কাপড় দিয়ে। হাত-পা বেঁধে তুলেছিল একটা ভ্যানের পিছনে। আমার পরে আরহামকে তুলে আনে।'

'ওকে তুমি আগে থেকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। কলেজ পার্কের একই মসজিদে নামাজ পড়ি আমরা।'

'বন্ধু?'

'ঠিক তা না। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাতে যতটুকু পরিচয় হয়, ততটুকুই।'

'হুম! ঠিক আছে, ধরে নিলাম সত্যি কথা বলছ তুমি। তোমাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসা হয়েছিল হ্যাগার্সটাউনের ওই ওয়্যারহাউসে। তারপর কী ঘটল?'

'বলার মত কিছু না। পাশাপাশি দুটো কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল আমাদের। পানি আর শুকনো খাবার ছাড়া কিছুই দেয়া হয়নি দুটো দিন। কামরা থেকে বাইরেটা দেখাও যেত না। ফলে কী ঘটছে না ঘটছে... অথবা কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।'

'খাবার কে দিত? তার চেহারা দেখোনি?'

'না। মুখোশ পরে আসত লোকটা।'

ফাত্তাহ্-র কথা বিশ্বাস করতে পারছে না কার্টার। বাঁকা সুরে বলল, 'দু-দুটো দিন এমনি এমনি বন্দি করে রাখল তোমাদের? খোঁজ নিয়েছি আমি—তোমাদের জন্য মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি। তা হলে কেন কিডন্যাপ করেছিল? আটকেই বা রেখেছিল কেন?'

'আমি কী করে বলব?' একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল ফাত্তাহ্। 'অযথা আমাকে বিরক্ত করছেন আপনি। বললাম তো, আমার কিছুই জানা নেই। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো কিডন্যাপারদের করুন।'

'কিডন্যাপার?' টেবিলে রাখা একটা ফোল্ডার খুলল কার্টার। ভিতর থেকে বের করল আগুনে পোড়া একটা লাশের ছবি। ফাত্তাহ্‌কে দেখাল সেটা। 'তোমরা ছাড়া শুধু এই একটা লোক ছিল ওখানে। কে ও? তোমাদের পার্টনার?'

গলায় উঠে আসা বমি বহু কষ্টে দমন করল ফাত্তাহ্। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না। বিশ্বাস করুন, আমরা এসবের কিছুই জানি না।'

'আমার দিকে তাকাও, ফাত্তাহ্!' গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল কার্টারের। 'তোমরা যেদিন উধাও হয়ে গিয়েছিলে, সেদিনই

তোমাদের ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি এলাকায় একটা ট্রাক হাইজ্যাকিঙের শিকার হয়। ড্রাইভারের নাম টেরেন্স ম্যালকম... সে আমাদের জানিয়েছে, মুখোশপরা দু'জন আরব তাকে জঙ্গলে নিয়ে যায়; গুলি করে পালায় তার ট্রাক নিয়ে। এ-ব্যাপারে কিছু জানা আছে তোমার?'

দু'চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ফাত্তাহ্-র। 'আপনি ভাবছেন কাজটা আমি আর আরহাম ঘটিয়েছি?'

'ভাবলে দোষ দিতে পারো? ট্রাক হাইজ্যাক হলো, আর তোমরাও উধাও হয়ে গেলে... ব্যাপারটা রহস্যজনক না?'

'আ... আপনি ভুল করছেন। আমরা নির্দোষ!'

'নির্দোষ? তা হলে চারদিন আগে অপহৃত দু'জন ভিকটিমকে তোমাদের সঙ্গে পাওয়া গেল কেন? বলছ তোমরাও কিডন্যাপ হয়েছিলে... কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? আমার খটকাগুলো বুঝতে পারছ তো? অসঙ্গতিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

'না,' অসহায় গলায় বলল ফাত্তাহ্। 'আমি শুধু যা ঘটেছে তা-ই বলতে পারি আপনাকে।'

'বেশ, তা হলে আজকের ঘটনাটা আরেকবার শোনাও।'

'আমাকে কিছু খেতে দিতে পারেন? খুব খিদে পেয়েছে।'

'আগে তোমার গল্প শুনি, তারপর নাহয় খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। শুরু করো।'

এক চুমুক পানি খেয়ে পুরনো কাহিনির পুনরাবৃত্তি করল ফাত্তাহ্, 'ক'টা বাজে তখন, জানি না। নিজের কুঠুরিতে ঘুমাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ জেগে উঠলাম গোলমালের আওয়াজ পেয়ে। হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছিলাম, মেঝেতে যেন আছড়ে পড়ছিল চেয়ার-টেবিল... তারপর শুরু হলো গোলাগুলি। মনে হচ্ছিল দু'দিক থেকে গুলি বিনিময় করছিল দুটো পক্ষ।'

'ক'বার গুলি হয়েছে?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কার্টার।

'গুনিনি। তবে দশ-বারো রাউণ্ডের কম নয়।'

'হুম। তারপর?'

'একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম—ভারী ইঞ্জিন... ট্রাক সম্ভবত। দাঁড়ান... হ্যাঁ, ট্রাকই। প্রথমদিন যখন আমাদেরকে ওয়্যারহাউসে ঢোকানো হলো, তখন এক পলকের জন্য একটা ট্রাক দেখেছিলাম ভিতরে। ওটাই স্টার্ট দিয়েছিল কেউ।'

'ট্রাকটা দেখতে কেমন? বর্ণনা দিতে পারবে?'

'উমম... যদ্দূর মনে পড়ছে, ড্রাইভিং ক্যাবটা ছিল নীল, আর পিছনের ট্রেইলার ছিল রূপালি রঙের।'

'টেরেন্স ম্যালকমের ট্রাক,' বলল কার্টার। 'বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। তা হলে তুমি কেন বললে ওটার ব্যাপারে কিছু জানো না?'

'ওটাই যে হাইজ্যাক হয়েছে, তা তো জানতাম না আমি।'

'ঠিক আছে। এরপর কী ঘটল?'

'ট্রাকটা চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম আমি। তার আগে শেষবারের মত কয়েকটা গুলি হলো। তার খানিক পরে কুঠুরির বাইরে গোঙানির শব্দ পেলাম আমি, মনে হলো হামাগুড়ি দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে। কয়েক মিনিট পর দরজার তালা খুলে দেয়া হলো। পাল্লা সরাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বুড়ো ভদ্রলোককে পড়ে থাকতে দেখলাম, তিনিই মুক্ত করেছেন আমাকে।'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন,' বলল কার্টার। 'কোনও কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

'খুব সামান্য। আমাকে তিনি বললেন, ওয়্যারহাউসে বোমা পাতা হয়েছে, আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'এক্সপ্লোসিভগুলো কি তখনই দেখলে?'

'হ্যাঁ। দেশে থাকতে অয়েল-ফিল্ডে কাজ করেছি আমি, বিস্ফোরক সম্পর্কে মোটামুটি ভাল জ্ঞান আছে। ব্যারেলগুলো

দেখেই বুঝতে পারি কী ঘটতে চলেছে। অ্যাডমিরালের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তাই মুক্ত করি আরহাম আর ওই মেয়েটাকে, চারজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ওয়্যারহাউস থেকে। আহত, দুর্বল অবস্থায় খুব বেশিদূর যাওয়ার উপায় ছিল না, তাই বিল্ডিংটার পাশেই একটা রিটেইনিং ওয়াল দেখতে পেয়ে ওটার পিছনে আশ্রয় নিই; জানতাম ওটা শকওয়েভ ঠেকাতে পারবে। আমরা ওখানে পৌঁছুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরিত হলো ওয়্যারহাউস। আরেকটু দেরি করলেই নির্ঘাত মারা যেতাম।'

'ইন্টারেস্টিং গল্প, ফাত্তাহ্,' হালকা গলায় বলল কার্টার। 'নিজেকে দেখছি একেবারে হিরো বানিয়ে ছেড়েছ! কী মনে হয়, পাশের কামরায় তোমার দোস্ত আরহামও কি একই গল্প বলছে?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় জবাব দিল ফাত্তাহ্। 'কারণ এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা!'

দরজায় টোকা পড়ায় ঘাড় ফেরাল কার্টার। এজেন্ট জেনকিন্স উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। ওকে বলল, 'একটু বাইরে আসতে পারবে?'

'তুমি একটু অপেক্ষা করো, ফাত্তাহ্,' বলে উঠে দাঁড়াল কার্টার। 'আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। তারপর আবার কথা হবে।'

ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল সে। করিডোরে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে জেনকিন্স। ওকে দেখতে পেয়ে বলল, 'অদ্ভুত এক গল্প শোনাচ্ছে আমার সাসপেক্ট।'

'আমারটাও,' বলল কার্টার। 'ওকে নাকি মুখোশপরা দু'জন লোক কিডন্যাপ করেছিল, বন্দি করে রেখেছিল ওয়্যারহাউসে। তারপর আবার বোমা মেরে খুন করবার চেষ্টা করেছে। কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছে ওরা।'

'আমিও একই গল্প শুনে এলাম,' বলল জেনকিন্স।

ভুরু কোঁচকাল কার্টার। 'তা-ই? কোনও পার্থক্য নেই?'

মাথা নাড়ল জেনকিন্স। 'কী মনে হয় তোমার? ওদের কথা কি সত্যি হতে পারে? ওরা যা বলছে, তা এতই অদ্ভুত যে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের ধোঁকা দিতে চাইলে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোনও কাহিনি সাজাতে পারত। তা করেনি কেন? তা ছাড়া... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কিডন্যাপিঙের পিছনে অ্যান্থনি গ্যারেট নামে একজনের হাত আছে বলে জানানো হয়েছে আমাদের। মুসলিম দু'জন টেরোরিস্ট এর সঙ্গে জড়াবে কীভাবে?'

'সরি, এসব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আমি শুধু এভিডেন্স ফলো করছি।'

'এর ভিতর একটা সেটআপের গন্ধ পাচ্ছি আমি, কার্টার। আসল কিডন্যাপাররা হয়তো এ-দু'জনের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে।'

'তা হলে ওয়্যারহাউসে বোমা ফাটাল কেন? কাঠের গুঁড়ো-ভর্তি একটা ট্রাকই বা হাইজ্যাক করেছে কেন? উঁহুঁ, কী যেন মিলছে না। সাধারণ কিডন্যাপিং নয়, এর মধ্যে আরও বড় কোনও প্যাঁচ আছে।'

'নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম,' বলল জেনকিন্স। 'কিন্তু ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলতে রাজি হলেন না। আমাদের ডিরেক্টরের সঙ্গে নাকি সরাসরি কথা বলবেন। কী যেন লুকাচ্ছেন ভদ্রলোক।'

বাইরে থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ। সেই সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ। তাড়াহুড়ো করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল কার্টার আর জেনকিন্স, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—সাদা রঙের অনেকগুলো ভ্যান আর ট্রাক ছুটে যাচ্ছে শেরিফস্ অফিসের সামনে দিয়ে। গাড়ির আরোহীদের সবার পরনে রূপালি রেডিয়েশন সুট।

হ্যাগার্সটাউনের শেরিফ দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ধারে। তার

দিকে এগিয়ে গেল ওরা। কার্টার বলল, 'এক্সকিউজ মি, শেরিফ। এরা কারা? কোথায় যাচ্ছে?'

'অ্যাটমিক কমিশনের লোক—ডিকন্টামিনেশন টিম,' জানালেন শেরিফ। 'আমার কাছে ওই ওয়্যারহাউসটার লোকেশন জানতে চাইল।'

চমকে উঠল কার্টার আর জেনকিন্স। ওখানে ডিকন্টামিনেশন টিম যাচ্ছে কেন? ওদের কাজ তো রেডিয়েশন সুইপ করা। তা হলে কি...

তিক্ত চেহারা নিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরল জেনকিন্স। 'তোমার কথাই ঠিক, কার্টার। ভিতরে ভিতরে অনেক বড় কিছু একটা ঘটছে। আমাদেরকে জানানো হয়নি সেটা।'

বিশ

রিজার্ভয়ারের মেঝেতে বসে জিয়োলেব আর আর্কিমিডিস কোডেক্সের অনুবাদ নিয়ে কাজ করছে রানা আর রেমি। একজন পড়ছে, অন্যজন নোটবুকে টুকে নিচ্ছে জরুরি তথ্যগুলো। একটু দূরে বসে ওদের কাজ দেখছে গ্যারেট। ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে উঠছে সে, যদিও ধৈর্য হারানো উচিত হচ্ছে না তার, সেটা বুঝতে পারছে। কোডেক্সের তিনটে পাতা এই প্রথম দেখছে রানা আর রেমি, সতর্কতার জন্য ওগুলো আগে ওদের কাছে সরবরাহ করেনি গ্যারেট, যাতে ওকে ফেলে গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে না পারে

ওরা। আনকোরা এই পাতাগুলো পড়ে, জিয়োলেবের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশ করে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুবার সূত্র খুঁজতে হচ্ছে ওদেরকে। সময় লাগাটাই স্বাভাবিক।

মনোযোগ ফেরাবার জন্য চারদিকে নজর বোলাল গ্যারেট, পায়চারি করতে করতে দেখল অ্যাকোয়াডাক্টের দেয়াল। জমাট বাঁধা ভলক্যানিক টাফ, বা ছাইভস্ম খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে সুড়ঙ্গগুলো। এ-জিনিস দিয়েই নেপলস্ নগরীর গোড়াপত্তনের সময় বাড়িঘর বানাত প্রথমদিককার গ্রিক অভিবাসীরা। শহরে পানি সরবরাহের জন্য অ্যাকোয়াডাক্ট তৈরির আইডিয়াটাও তাদেরই। বিল্ডিং মেটেরিয়াল হিসেবে এই ভলক্যানিক টাফের তুলনা হয় না, তাই আজও দু'হাজার বছরের পুরনো বাড়িঘর টিকে আছে সারা নেপলস্ জুড়ে।

ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল গ্যারেটের, যখন মা-বাবার সঙ্গে এখানে প্রথম বেড়াতে এসেছিল। মায়ার সঙ্গে তখনই বন্ধুত্ব হয়েছিল ওর, দু'জনে ঘুরে বেড়াত নেপলসের প্রাচীনতম পরিত্যক্ত জায়গাগুলোয়। ভয়-ডর বলতে কিছু ছিল না ওদের, যে-জায়গা যত বিপজ্জনক দেখাত, সেইখানে যেতে ততই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠত ওরা। দুঃসাহসী সেই মনোভাবের কারণেই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল ওরা, তাড়া খেয়েছিল দুই অপরাধীর, খোঁজ পেয়েছিল মাইডাস চেম্বারের।

চোখ পিটপিট করল গ্যারেট। রিজার্ভয়ার থেকে বেরুবার জন্য চারটে টানেল দেখতে পাচ্ছে, সিঁড়ি ধরে উঠতে হয় ওগুলোয়; সবগুলোর তলায় একটা করে গ্রিক হরফ খোদাই করে রাখা হয়েছে—*বিটা, ল্যামডা, সিগমা আর মিউ।* জিয়োলেবের মাধ্যমে বের করে নিতে হবে এর মধ্যে কোন্‌টা ধরে এগোতে হবে ওদেরকে।

ঘাড় ফেরাল গ্যারেট। 'হলো তোমাদের?'

'চেষ্টা করছি,' ওর দিকে না তাকিয়ে বলল রানা। 'কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান কোরো না।'

একটু যেন অপমানিত হলো গ্যারেট। কড়া গলায় বলল, 'যা করবার তাড়াতাড়ি করো। যদি বুঝি ইচ্ছে করে দেরি করছ তোমরা, তা হলে স্টান বেল্টের বাটন টিপতে দেরি করব না।'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, গ্যারেট,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'অযথা হুমকি-ধমকি দেয়ার কোনও দরকার নেই।'

'তা ছাড়া কোডেক্সের হারানো পাতাগুলো এই প্রথম দেখছি আমরা,' যোগ করল রেমি। 'ডিকোড করতে সময় লাগতেই পারে।'

'হাতে বেশি সময় নেই আমাদের,' বলল গ্যারেট।

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'কারণ খুব শীঘ্রি মায়াকে এখানে আশা করছি আমি। যে-করেই হোক, ববি মুরল্যাণ্ডের পেট থেকে এখানকার খবর বের করে নেবে ও। তারপর ছুটে আসবে গুপ্তধনের খোঁজে।'

'তা হলে ববিকে ওর হাতে ধরিয়ে দিলে কেন? ব্যাপারটা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত হয়ে গেল না?'

'মাই ডিয়ার রানা,' এক গাল হাসল গ্যারেট, 'আমি চাই মায়া এখানে আসুক। ওর সঙ্গে কিছু হিসাব-নিকাশ বাকি রয়ে গেছে আমার। নিশ্চিত থাকো, আমার পিছু নিয়ে ও যদি অ্যাকোয়াডাক্টে ঢোকে, এখান থেকে আর কোনোদিনই বেরুতে পারবে না। ওর জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ রেখে যাব আমি।'

'কী ধরনের সারপ্রাইজ?'

'বিচ্ছিরি ধরনের। আর কথা নয়। কাজ শেষ করো।'

চকিতের জন্য রানার চোখে ক্রোধ ফুটতে দেখল গ্যারেট, ওর দৃষ্টির সামনে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল সে। নিজেকে অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল রানা, মন দিল জিয়োলেবের দিকে।

ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, পরিষ্কার বুঝল গ্যারেট। তার অস্তিত্বের জন্য বিরাট এক ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এই বাঙালি যুবক। রিস্ট ডিটোনেটরের উপর হাত বোলাল গ্যারেট, কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল।

ডিভাইস আর কোডেক্সের অনুবাদ নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানা আর রেমি। জটিল এক গাণিতিক সমীকরণ পেয়েছে ওরা কোডেক্সের মাঝে, নোটবুক খুলে সেটার সমাধান করবার চেষ্টা করছে রানা। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করছে রেমিকে, কোডেক্স থেকে তার জবাব খুঁজে বের করছে রেমি।

দশ মিনিট পর নোটবুক বন্ধ করল রানা, জিয়োলেব নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'যা খুঁজছিলে, তা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। ওর মনের ভিতর কী চলছে, চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

'আমাকে খুলে বলো।'

'বললেও বুঝবে না। ক্যালকুলেশনটা অত্যন্ত জটিল।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আসলে আমাকে বলতে চাইছ না, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ,' নিরাসক্ত গলায় বলল রানা। 'সবকিছু যদি এখনই বলে দিই, তা হলে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তোমার কাছে।'

হাসল গ্যারেট। 'ভেরি স্মার্ট, রানা। ঠিক আছে, বলতে না চাইলে জোরাজুরি করব না। তুমিই পথ দেখাও। কিন্তু কোন্‌দিকে যাচ্ছ না যাচ্ছ, সেটা খেয়াল রাখব আমি। যদি একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে শুরু করি, কিংবা বুঝতে পারি যে অযথা সময় নষ্ট করছ তুমি... সেক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন দেখব না আমি। ক্লিয়ার?'

'ক্লিয়ার।'

'গুড। তা হলে পথ দেখাও। এখান থেকে কোন্ টানেল ধরে বেরুব আমরা?'

চারদিকে নজর বোলাল রানা, তারপর আঙুল তুলে দেখাল সিগমা চিহ্ন দেয়া টানেলটা।

'ওই যে,' বলল ও। 'ওটা।'

'তুমি শিয়োর?' দ্বিধা ফুটল গ্যারেটের গলায়। ওটাই সবচেয়ে ছোট টানেল, মুখটা চওড়ায় তিন ফুটের বেশি নয়।

'আর্কিমিডিস ওটার কথাই বলেছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'বেশ, এগোও। প্রথমে তুমি, তারপর ড. হ্যাডলি। আমি আর কাটনার পিছনে থাকব।'

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল চারজনে, ঢুকে পড়ল টানেলে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। বদ্ধ জায়গা, চারদিক থেকে চেপে আছে দেয়াল। রেমি ছাড়া বাকি সবাই ক্রমাগত ঘষা খাচ্ছে কাঁধে আর পিঠে। অন্ধকারও যেন কয়েক গুণ গাঢ় হয়ে উঠেছে, হেডল্যাম্পের আলো তার বিরুদ্ধে লড়াই করে পেরে উঠছে না।

এক সারিতে এগোচ্ছে চারজনে। সবার পিছনে গ্যারেট। টানেলে ঢুকেই পকেট থেকে একটা চিউয়িং গাম বের করল ও, গামটা মুখে চালান করে দিয়ে র‍্যাপারটা দলামোচা করে ফেলে দিল টানেলের মেঝেতে। সহজেই ওটা খুঁজে পাবে মায়া, বুঝতে পারবে কোন্ পথে যাচ্ছে ওরা। পা দেবে ফাঁদে।

মোটামুটি চল্লিশ ফুট এগোনোর পর বড়-সড় একটা গুহায় বেরিয়ে এল ওরা। আকার-আয়তনে রিজার্ভয়ারের চেয়ে সামান্য বড়। উল্টোদিকে দেয়ালে নতুন তিনটে টানেল দেখা গেল, তবে ওগুলোর মুখে চিহ্ন দেয়া নেই।

'এখানে মার্কিং নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল কাটনার।

'আর থাকবে না,' বলল রানা। 'এখান থেকে জিয়োলেবের

সাহায্যে পথ খুঁজে নিতে হবে আমাদের।'

ডিভাইসটা মুখের সামনে তুলল ও। একে একে সবগুলো নব ঘোরাল। কাঁটাগুলো নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেলে পৌঁছুলে রিডিঙের সঙ্গে চারপাশ মেলাল। তারপর একদম ডানদিকের টানেল দেখিয়ে বলল, 'এবার ওইটা ধরে এগোতে হবে।'

জিয়োলেবের গুরুত্ব এতক্ষণে ধরতে পারল গ্যারেট। বহুকাল আগে, সাইরাকিউজের রাজা হেরনের গুপ্তচর যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল এখানকার আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলগুলোয়, নিশ্চয়ই জিয়োলেব ব্যবহার করছিল ম্যাপিং করবার জন্য। ওভাবেই মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছুবার নির্দেশনা রেখে গেছে। কুয়া আর প্রথম টানেলের মার্কিং করেছিল শুধুমাত্র স্টার্টিং পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য। আর কোথাও কোনও চিহ্ন দেয়নি, তা হলে শত্রুরা সহজেই সমাধিটা খুঁজে বের করে ফেলত।

'এগোও তোমরা,' সঙ্গীদের বলল গ্যারেট। 'আমি একটু পরে আসছি।'

রানা, রেমি আর কাটনার টানেলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলে হাঁটু গেড়ে বসল সে। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল ছোট একটা ন্যাপস্যাক—জিনিসটা রেনফিল্ডকে দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছে। দেখতে সাধারণ মনে হবে, কিন্তু ভিতরে রয়েছে দশ পাউণ্ডের ফসফরাস গ্রেনেড। চেইনের সঙ্গে সেট করা হয়েছে ডিটোনেটর।

ন্যাপস্যাকটা গুহার এক কোণে রেখে টানেলের দিকে এগোল গ্যারেট। সন্দেহ নেই, ওকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে মায়া। ন্যাপস্যাকটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলী করে তুলবে তাকে—দেখতে চাইবে ওটার ভিতরে কী ফেলে গেছে গ্যারেট। চেইন টানতেই ঘটবে বিস্ফোরণ, পুরো গুহায় ছড়িয়ে পড়বে জ্বলন্ত ফসফরাস। জ্বলে-পুড়ে মরবে মায়া ও তার সঙ্গীরা।

মুচকি হাসি ফুটল গ্যারেটের ঠোঁটে। ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে, বাঁচার কোনও উপায় নেই *প্রিয়* বোনটির। একটাই শুধু দুঃখ, মরার আগে বেচারির চেহারাটা নিজ চোখে দেখতে পাবে না সে।

নুমা হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন।

ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল ল্যারি কিং। বলল, 'গাড়ি রেডি, মি. রেডক্লিফ। চলুন রওনা হই।'

'অ্যাডমিরালের কী খবর?' ডেস্ক ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'এখনও অপারেশন থিয়েটারে,' বলল ল্যারি। 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, কিন্তু এখুনি ভালমন্দ কিছু বলতে রাজি হলেন না তিনি। হাসপাতালেই তো যাচ্ছি, সামনাসামনি কথা বললে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন রেডক্লিফ। অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালালেন, করিডোর পেরিয়ে উঠলেন এলিভেটরে।

'ডিকন্টামিনেশন টিম কিছু বের করতে পেরেছে?' কথা চালিয়ে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ওয়্যারহাউসের ধ্বংসাবশেষে রেডিয়েশনের আলামত পাওয়া গেছে, তবে ওখানে সত্যি সত্যি স্ট্রনটিয়াম ছিল কি না, তা বোঝা যায়নি,' বললেন রেডক্লিফ। 'এখনও কাজ করছে ওরা।'

'রানাকে খবরটা দেয়া দরকার,' বলল ল্যারি। 'যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'রানা, ববি বা ড. হ্যাডলি... কেউই ফোন ধরছে না। রানা এজেন্সির নেপলস্ ব্রাঞ্চে ফোন করেছিলাম, ওরাও কিছু বলতে পারল না।'

'ববির সঙ্গে তো ওদের ব্রাঞ্চ চিফের থাকার কথা।'

'সে আর এক কাহিনি। ব্রাঞ্চ চিফ-সহ যে-চারজনকে সঙ্গে

নিয়েছিল ববি, ওদের সবাই অ্যারেস্ট হয়েছে পুলিশের হাতে।'

এই খবর ল্যারির জন্য নতুন। বিস্মিত গলায় বলল, 'বলেন কী! কেন অ্যারেস্ট হলো? ববিই বা কোথায়?'

'জানি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু থানার লোকেরা কোনও তথ্য দিতে নারাজ। রানা এজেন্সির সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের কথা বললাম, ওদেরকেও নাকি ব্রাঞ্চ-চিফ কিবরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না পুলিশ। সকালে লইয়ার নিয়ে যেতে বলেছে।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না? দেখা করতে বাধা দেবে কেন?'

'নিশ্চয়ই সবাইকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে কেউ। ইটালিয়ান পুলিশে দুর্নীতিবাজ লোকজনের অভাব নেই, নিশ্চয়ই টাকা খাইয়েছে কেউ ওদের।'

'কে করতে পারে এ-কাজ? অ্যান্থনি গ্যারেট, নাকি মায়া লরেঞ্জো?'

'যে-ই হোক, প্ল্যানটা বেশ ভালই এঁটেছে। রানা আর ববির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিছুতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির খবর পৌঁছুতে পারছি না ওদের কাছে। তুমি তো জিপিএস ট্রান্সমিটারের সিগনাল ট্র্যাক করছিলে। কিছু বের করতে পেরেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল ল্যারি। 'গত কয়েক ঘণ্টা থেকে স্থির হয়ে আছে সিগনাল। কো-অর্ডিনেটস্ বলছে, ওটা নেপলসের একটা পুলিশ স্টেশনে। শুরুতে একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ট্র্যাকারটা থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।'

'...কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে ববিকে,' যোগ করলেন রেডক্লিফ। 'লক্ষণ একদম ভাল ঠেকছে না, ল্যারি। আমার তো মনে হচ্ছে ওরা সবাই ধরা পড়েছে মায়া কিংবা গ্যারেটের হাতে।'

'বোধহয় ঠিকই ধরেছেন,' একমত হলো ল্যারি। 'ওদের ফোন-টোন সব কেড়ে নেয়া হয়েছে, যাতে আমরা যোগাযোগ

করতে না পারি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর ড. হ্যাডলির বোনের খবর পেলে তো ওরা আর কথা শুনবে না গ্যারেটের।'

হতাশায় মাথা দোলালেন রেডক্লিফ। কিচ্ছু করার নেই তাঁদের।

কিছুই না!

একুশ

গির্জার কোর্টইয়ার্ডে, কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মায়া আর মুরল্যাণ্ড। কয়েক মিনিট আগে এখানে পৌঁছেছে ওরা। কুয়োয় উঁকি দিতেই দেখতে পেয়েছে পিটন আর ডি-ক্ল্যাম্পের সাহায্যে লাগানো দড়িটা। এর অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি—রানা আর রেমিকে নিয়ে গ্যারেট ইতিমধ্যে নেমে গেছে নীচে।

সঙ্গে চারজন লোক এনেছে মায়া—নিরোর নেতৃত্বে টমি ও আন্তোনিয়ো-সহ পিকো নামে আরও একজন। অস্ত্র হিসেবে মাউন্টেড ফ্ল্যাশলাইট-সহ সাব-মেশিনগান বহন করছে সবাই। নিরো আর টমিকে ইতিমধ্যে নীচে নামিয়েছে মায়া, এবার মুরল্যাণ্ডকে ইশারা করল।

র‍্যাপেলিঙে এমনিতে বেশ অভ্যস্ত মুরল্যাণ্ড, কিন্তু গ্যালারিয়ার মার খাওয়ার কারণে এখনও ও দুর্বল। দড়ি ধরে নামতে রীতিমত কষ্টই হলো বলা চলে। দু-দু'বার হাত ফস্কে যেতে বসেছিল, কোনোমতে বিপদ এড়িয়েছে। নীচের চেম্বারে যখন পা রাখল,

তখন থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। ধপ করে মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য হলো ও।

খানিক পরে বাকি দুই সঙ্গীকে নিয়ে মায়াও নেমে এল। আলো ফেলে চারপাশ দেখল ও। তারপর মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে গেছে ওরা?'

'আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'এখানে নামার পর জিয়োলেবের সাহায্যে পথ খুঁজে নেবার কথা। আমাদের সঙ্গে তো ওটা নেই!'

'হুম।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল মায়া। 'ভালমত তল্লাশি চালাও। ওদের কোনও না কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল চার গুণ্ডা। প্লাস্টিকের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাশলাইট দেয়া হয়েছে মুরল্যাণ্ডকে, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়, ওটা নিয়ে ও-ও দেখতে শুরু করল চারপাশ। চেম্বারের এককোণে, দলা পাকানো ছোট্ট এক টুকরো কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। কাছে গিয়ে কুড়িয়ে নিল ওটা। ভাঁজ খুলতে না খুলতে কাগজটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল মায়া।

'আমাকে দাও!'

সাধারণ কাগজ নয়, জিনিসটা একটা চিরকুট। গুটি গুটি হরফে দুটো শব্দ লেখা। কয়েক মুহূর্ত লেখাটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল মায়া, তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ডের হাতে। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারছ?'

চোখ পিট পিট করল মুরল্যাণ্ড। রানার হাতের লেখা চিনতে পারছে, নিশ্চয়ই গ্যারেটের চোখ এড়িয়ে চিরকুটটা ফেলে গেছে ও। ওতে লেখা:

ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড।

কপালে ভাঁজ পড়ল মুরল্যাণ্ডের। সন্দেহ নেই, মেসেজটা ওর জন্যই রেখে গেছে রানা। সঙ্গে মায়ার লোকেরা থাকবে, সেটাও

সম্ভবত জানত। সে-কারণে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে রেখে গেছে মেসেজ। কিন্তু সমস্যা হলো, এর অর্থ বুঝতে পারছে না ও। ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড... কী বলতে চাইছে রানা। আইসল্যাণ্ডে কয়েকবারই গেছে ওরা, সেসব ফ্লাইটে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

'কই, কিছু বলছ না কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে তাড়া লাগাল মায়া।

'সরি,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'এর অর্থ জানা নেই আমার। কাগজটা জঞ্জালও হতে পারে। নেপলসের সঙ্গে আইসল্যাণ্ডের তো কোনও সম্পর্ক নেই।'

তীক্ষ্ণ চোখে মুরল্যাণ্ডের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মায়া, বোঝার চেষ্টা করল ও মিথ্যে বলছে কি না। কিন্তু অভিব্যক্তিতে কোনও খুঁত দেখতে পেল না। পাবার কথাও নয়। সত্যি কথাই বলেছে মুরল্যাণ্ড—চিরকুটের অর্থ আসলেই জানে না ও। অগত্যা শ্রাগ করে অন্যদিকে চলে গেল মায়া।

ও কেন এত মরিয়া হয়ে উঠেছে, তা ঠিক বুঝতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। হতে পারে মাইডাসের সমাধি ওর সারাজীবনের স্বপ্ন, সোনার লোভকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। তারপরেও একজন মাফিয়া নেত্রী স্রেফ আবেগ বা জেদের বশে গুপ্তধনের পিছনে এভাবে ছুটবে—কথাটা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। সঙ্গে এত কম লোক এনেছে কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। মায়া তো চাইলে তার গুণ্ডা-পাণ্ডার একটা আর্মি নিয়ে এখানে হানা দিতে পারত। তবে কি বিশ্বস্ত লোকের অভাব পড়েছে তার? একটা কারণেই সেটা ঘটতে পারে—ক্যামোরায় ওর অবস্থান যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। রহস্য সম্ভবত ওটাই। এই গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজের পুরনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরে পেতে চাইছে মেয়েটা। আফটার অল, যার হাতে টাকা, তার হাতেই যে সমস্ত ক্ষমতা... এ-কথা কে না জানে।

টমির গলা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল মুরল্যাণ্ড। উঁচু গলায় মায়াকে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে সে।

'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মায়া।

হাতের মুঠো খুলে রূপালি রঙের একটা র‍্যাপার দেখাল টমি—চিউয়িং গামের। ভাঁজ খুলে শুঁকল মায়া, এখনও মিন্টের গন্ধ লেগে আছে।

'জিনিসটা তাজা, নিশ্চয়ই গ্যারেট বা ওর সঙ্গের কেউ ফেলে গেছে,' বলল সে। টমির দিকে তাকাল। 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখাল টমি। 'ওই টানেলের ভিতরে।'

'হুম... মনে হচ্ছে ওটার ভিতরেই ঢুকেছে ওরা।' ডাক দিয়ে সবাইকে একত্র করল মায়া। জানিয়ে দিল পরিকল্পনা। 'এক সারিতে এগোব আমরা। আন্তোনিয়ো সবার সামনে থাকবে। সামনে যদি কোনও গুহা বা চেম্বার পাওয়া যায়, ও একা আগে বেরুবে। চেক করে দেখবে কেউ অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছে কি না। ও ক্লিয়ারেন্স দিলে তবেই আমরা বেরুব। পরিষ্কার?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'গুড। মুভ করো তা হলে।'

টানেলের দিকে এগোল গুণ্ডারা। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করল মায়া।

'তোমার ওই আন্তোনিয়োকে বোকা বলব, নাকি সাহসী... ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওকে যে কোরবানি দিতে চাইছ, তা কি ও বুঝতে পারছে না?'

'বোকামিও নয়, সাহসিকতাও নয়,' গর্ব ফুটল মায়ার কণ্ঠে। 'এ হলো প্রশ্নহীন আনুগত্য। আমার মুখের কথায় প্রাণ দিতে পারে ওরা।'

'তা হলে বলব ওদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। নইলে তোমার

মত মহিলার জন্য কেউ জীবন দিতে পারে না।'

খোঁচাটা জায়গামত লেগেছে, রাগে লাল হয়ে উঠল মায়ার মুখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মুখের লাগাম টানো, সেনিয়র। নইলে এই টানেল থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না।'

'কী!' অবাক হবার ভান করল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ভাবছিলে? জানতাম না তো!'

'চোপ!' গর্জে উঠল মায়া। 'নিরো, এ বড্ড বকবক করছে। একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।'

যেন নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দেবার জন্যই মুরল্যাণ্ডের তলপেটে ঝেড়ে একটা ঘুসি বসাল নিরো। দম আটকে এল মুরল্যাণ্ডের। খাবি খেতে খেতে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। কলার ধরে ওকে টেনে তুলল নিরো। বলল, 'হাঁটো, সেনিয়র। মুখ দিয়ে আর একটা শব্দও যেন না বেরোয়।'

'সেক্ষেত্রে পেটে না মেরে মুখে মারা উচিত ছিল,' ককাতে ককাতে বলল মুরল্যাণ্ড।

হতাশা ফুটল নিরোর চেহারায়—এ দেখি কিছুতেই থামে না! কথা না বাড়িয়ে তাই মুরল্যাণ্ডের পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা দিল সে। এগোতে বাধ্য করল।

টানেলের সামনে পৌঁছে গেছে সবাই। আন্তোনিয়ো আগে ঢুকল, তারপর ঢুকল আরও নিরো আর পিকো। মায়ার পিছু পিছু এরপর ঢোকানো হলো মুরল্যাণ্ডকে। সবশেষে রইল টমি। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ছয় জনের দলটা।

অন্যপ্রান্তের গুহায় পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। টানেলের মুখ দেখতে পেয়েই সবাইকে থামতে বলল আন্তোনিয়ো, তারপর নিজে বেরিয়ে গেল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখে নিল গুহার চারদিকটা। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসতে বলল সঙ্গীদের।

একে একে গুহায় পা রাখল সবাই। মায়া নির্দেশ দিল,

'ছড়িয়ে পড়ো। আর কোনও চিহ্ন আছে কি না দেখো।'

টমি রয়ে গেল মুরল্যাণ্ডের পাহারায়, বাকি তিন গুণ্ডা নেমে পড়ল তল্লাশিতে। গুহার এক কোণে পড়ে থাকা ন্যাপস্যাকটা আবিষ্কৃত হলো কয়েক মিনিট পরেই। এক সঙ্গীকে নিয়ে আন্তোনিয়ো এগিয়ে গেল জিনিসটা পরীক্ষা করবার জন্য। আর তখুনি বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল মুরল্যাণ্ডের মাথায়—পরিষ্কার হয়ে গেল রানার রেখে যাওয়া মেসেজটা।

ফ্লাইট টু আইসল্যাণ্ড... হ্যাঁ, আইসল্যাণ্ডের ফ্লাইটই ছিল ওটা, কিন্তু সাধারণ ফ্লাইট ছিল না বলে এতক্ষণ মাথায় আসেনি। কয়েক বছর আগের কথা, গ্রিনল্যাণ্ডে একটা এক্সপিডিশনে গিয়েছিল ও আর রানা—সার্ভেয়ার্স সোসাইটি অভ আমেরিকার হয়ে। ওদের সঙ্গে ছিল রাশান আবহাওয়াবিদদের একটি দল, সেই সঙ্গে জিয়ো-রিসার্চ নামে একটি জার্মান গবেষণাধর্মী সংগঠন। যৌথ অভিযানে নেমেছিল সবাই। পরে জানা গেল, জার্মানরা আসলে বৈজ্ঞানিক কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি, গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা পুরনো ঘাঁটি খুঁজে বের করে সেখানে নিজেদের কুকীর্তির প্রমাণ ধ্বংস করে দেবার জন্য। ওরা ব্যাপারটা টের পেতে শুরু করায় দুর্ঘটনার নাটক সাজায় জিয়ো-রিসার্চ। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে সবাইকে গায়ের জোরে একটা বিমানে তুলে রওনা করিয়ে দেয় আইসল্যাণ্ডের উদ্দেশে। কিন্তু কাউকেই জীবন নিয়ে ফিরতে দেবার ইচ্ছে ছিল না ওদের, বিমান মাঝ-আকাশে থাকতেই কার্গো হোল্ডে পাতা একটা বোমা আবিষ্কার করে রানা ও মুরল্যাণ্ড। বিমানটা পরে ক্র্যাশ করে গ্রিনল্যাণ্ডের বরফে ছাওয়া বিরান প্রান্তরে। সেখান থেকে কীভাবে ওরা উদ্ধার পেল, কীভাবেই বা শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিল... সে আর এক কাহিনি*।

চকিতে সব মনে পড়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। ওদের

---

*মৃত্যুশীতল স্পর্শ দ্রষ্টব্য।

আইসল্যাণ্ডগামী ফ্লাইটে বোমা পেতেছিল শত্রুরা, সেটাই বোঝাতে চাইছে রানা। তারমানে এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে। বোমা অথবা কোনও ধরনের বুবি ট্র্যাপ রেখে গেছে গ্যারেট। আন্তোনিয়ো ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ন্যাপস্যাকের পাশে, টানতে শুরু করেছে চেইন। সেদিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'না! থামো!'

ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। চেইনে টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটল। আন্তোনিয়ো ও পিকো মারা পড়ল তৎক্ষণাৎ। নিরো একটু দূরে ছিল, ছিটকে পড়ে গিয়ে কাশতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভয়ানক আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

ইনস্টিঙ্কটের বশে মায়াকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিয়েছিল মুরল্যাণ্ড, ওখান থেকে মুখ তুলে তাকাল। হলদেটে ধোঁয়া ঘিরে ধরেছে মাফিয়া নেত্রীর সহচর নিরোকে, বাতাসে ভর দিয়ে সেই ধোঁয়া ভেসে আসছে ওদের দিকে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা এমনিতেই একটু অন্যরকম লেগেছে ওর কাছে, সেই সঙ্গে আলোর আধিক্য আর হলুদ ধোঁয়া দেখে বুঝে ফেলল কীসের কবলে পড়েছে।

ফসফরাস!

এক লাফে উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। টান দিয়ে দাঁড় করালো মায়াকে। ওদের দেখাদেখি মাটিতে ডাইভ দিয়েছিল টমি, সে-ও উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে মুরল্যাণ্ড চেঁচাল, 'গেট ব্যাক! কুইক! ওই ধোঁয়া বিষাক্ত!'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মায়া। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। কথা বলে সময় নষ্ট করল না মুরল্যাণ্ড, ফসফরাসের কুয়াশা ওদের নাগাল পেলে নিশ্চিত মৃত্যু। পাঁজাকোলা করে মায়াকে তুলে নিল ও। যে-টানেল ধরে এসেছে, সেটার ভিতরে ছুঁড়ে দিল তাকে। নিজেও ঢুকল।

'মুভ, বোকা মেয়ে কোথাকার! মুভ!'

এতক্ষণে কাজ করল মায়ার মাথা। পাগলের মত হামাগুড়ি দিতে শুরু করল সে। ওর পিছু পিছু এগোল মুরল্যাণ্ড আর টমি। রিজার্ভয়ারের চেম্বারে পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু রেহাই পেল না। খোলা চামড়ায় জ্বলুনি অনুভব করতেই আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। টানেল ধরে এখানেও আসছে ফসফরাস মেশানো ধোঁয়া।

'ওদিকে! কুইক!' তাড়া লাগাল ও।

পাশের আরেকটা টানেলে ঢুকে পড়ল তিনজনে। এটা তুলনামূলকভাবে বড়। কুঁজো হয়ে ছুট লাগানো গেল। আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে মিনিটপাঁচেক দৌড়াবার পর মাঝারি এক প্রকোষ্ঠে পৌঁছুল ওরা। দম নেবার জন্য থামল ওখানে।

ব্যস্ত চোখে পিছনটা দেখল মুরল্যাণ্ড। না, ধোঁয়া আর আসছে না এদিকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপাতত আমরা নিরাপদ,' বলল ও। 'আশা করি কুয়ো দিয়ে চিমনির মত বেরিয়ে যাবে ধোঁয়া।'

'যদি না বেরোয়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল টমি। 'যদি এদিকেও চলে আসে?'

'তা হলে আরও ভিতরদিকে সরে যাব আমরা।'

'গড ড্যাম ইট!' গাল দিয়ে উঠল মায়া। 'কী ছিল ওটা?'

'ফসফরাস বোমা—অ্যান্থনি গ্যারেটের সৌজন্যে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার ছেলেরা বোকার মত ফাটিয়ে দিয়েছে ওটা।'

'ওরা মারা গেছে?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল মায়ার।

'না মরলেও মৃত্যু কামনা করছে। ফসফরাসের মত দাহ্য পদার্থ আর নেই। চামড়া-মাংসকে কাবাবের মত সেদ্ধ করে ফেলে। স্পেশাল ফোর্সে থাকতে এ-ধরনের বোমা ব্যবহার করেছি আমি। আমরা একে বলতাম শেক অ্যাণ্ড বেক অপারেশন।'

দাঁতে দাঁত পিষল মায়া। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ক্রোধ। 'আমরা এখন কী করব?'

'কিছুই করার নেই... অন্তত ধোঁয়াটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। গ্যাস মাস্ক থাকলেও কাজ হতো না। ফসফরাস তোমার গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলবে, আগুন ধরিয়ে দেবে জামা-কাপড়ে। অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'কতক্ষণ?'

'বলা মুশকিল। দশ মিনিট লাগতে পারে, আবার এক ঘণ্টা লাগাও বিচিত্র নয়। কুয়ো দিয়ে কতক্ষণে বেরোয় সমস্ত ধোঁয়া, তার উপর নির্ভর করছে সবকিছু।'

ইটালিয়ানে খিস্তি করে উঠল টমি। গ্যারেটের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে। কসম কাটল, ওকে বাগে পেলে জ্যান্ত চামড়া ছিলে নেবে।

'বাই দ্য ওয়ে,' মুরল্যাণ্ডকে বলল মায়া। 'ধন্যবাদ।'

'কীসের জন্য?'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছ বলে। আমি সত্যিই খুব অবাক হয়েছি। সুযোগটা নিলে না কেন? ওই অবস্থায় আমাকে ফেলে পালিয়ে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল।'

'বিচ্ছিরি একটা বদভ্যাস বলতে পারো,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'সুন্দরী মেয়েদের মৃত্যু সহ্য করতে পারি না আমি।'

'তা-ই?' পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে হেসে উঠল মায়া।

মুরল্যাণ্ডও হাসল, তবে তাতে প্রাণ রইল না। ঠাট্টা করলেও ও জানে, মায়া কথাটা ভুল বলেনি। মস্ত বড় এক সুযোগ হারিয়েছে ও। হয়তো অমানবিক হতো... তারপরেও মায়া আর টমিকে জীবন্ত দগ্ধ হতে দেয়াটাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ।

বাইশ

রানার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা, অথচ ঘড়ির হিসেবে সময় পেরিয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা! ভূ-গর্ভের একঘেয়ে, প্রাণহীন পরিবেশ এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করছে সবার মাঝে—টেনে টেনে লম্বা করছে সময়কে। এ আসলে তাড়না—মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে পড়ার তাড়না। অবচেতন মন বলতে চাইছে—যথেষ্ট তো হলো, এবার বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে! জোর করে সেই তাড়না অগ্রাহ্য করছে রানা।

আধঘণ্টা হলো দূর থেকে বজ্রপাতের মত একটা চাপা আওয়াজ পেয়েছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে গ্যারেটের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখেছে রানা—পিছনে রেখে আসা বোমাটা বিস্ফোরিত হয়েছে। শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও, ববি ওর মেসেজটা বুঝতে পেরেছে কি না কে জানে। গ্যারেটের মুখে সারপ্রাইজের কথা শুনেই আন্দাজ করেছিল, নিশ্চয়ই বোমা পেতে রাখার প্ল্যান করেছে লোকটা। ঝুঁকি নিয়ে তাই এক টুকরো কাগজে মেসেজ লিখে ফেলে এসেছিল ও। তাতে কতখানি কাজ হয়েছে বলা মুশকিল। মুরল্যাণ্ড যদি ওর ইশারা ধরতে পারে, তা হলে তো বোমাটা ফাটার কথা নয়!

মাথা থেকে দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে সামনে মনোযোগ দিল রানা। প্রথম প্যাসেজটাই শুধু সংকীর্ণ ছিল, এরপর থেকে বেশ চওড়া হয়ে এসেছে সব টানেল। একসঙ্গে এগোতে পারছে চারজনে।

গ্যারেটকে খানিক পর পর দেয়ালে খড়িমাটি দিয়ে দাগ দিতে দেখেছে ও—কোন্ পথে ফিরতে হবে, তা চিহ্নিত করে রাখছে। বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে, ভাবছে অনুসরণ করবার জন্য বেঁচে নেই মায়া, তাই দাগ দিতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগছে না। রানাও তাতে খুশি। ওর বিশ্বাস, বেঁচে আছে মুরল্যাণ্ড। তার মানে এই দাগগুলো দেখেই ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে সে।

পথ খুঁজে নিতে কষ্ট হচ্ছে না রানার। এক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা ব্যবহার করেছেন গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিস, সেটা সমাধান করার পর কাজটা বেশ সহজ হয়ে গেছে। জিয়োলেবের সাহায্যে একের পর এক টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণ করছে ও, সেই অনুসারে এগিয়ে চলেছে টানেল নেটওয়ার্কের গভীর থেকে গভীরতর অংশে।

খানিক পর পর একটা করে ইন্টারসেকশনে পৌঁছুচ্ছে ওরা, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে তিন থেকে পাঁচটা করে সুড়ঙ্গমুখ, ওখান থেকে সঠিক সুড়ঙ্গটা বেছে নিতে হয়। পদ্ধতিটা সহজ—জিয়োলেবের প্রথম নবটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরায় রানা, ইন্টারসেকশনে যে-ক'টা ওপেনিং রয়েছে, সে-ক'ঘর নড়ায় ডায়ালের প্রথম কাঁটা; এরপর দ্বিতীয় নবটা উল্টোদিকে একই পরিমাণ ঘোরাতে হয় ওকে। দুটো নব ঘোরানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৃতীয় কাঁটাটাও ঘোরে। ডিভাইস উল্টে সেটা কোন্‌দিক নির্দেশ করছে তা দেখে নিলেই পাওয়া যায় সুড়ঙ্গটা।

হাঁটতে হাঁটতে রেমির দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে রানা। নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, একবারও কথা বলেনি। চেহারায় ফুটে রয়েছে বেদনার ছাপ। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়—নিশ্চয়ই রানা ওকে অবিশ্বাস করছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছে। ও যে গ্যারেটের দোসর নয়, এ-ব্যাপারে রানা মোটামুটি নিশ্চিত। শুরুতে অন্যায় রাগ দেখিয়ে ফেলায় কিছুটা লজ্জিতও

বটে। ক্ষমা চাইতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু এখন তার সময় নয়। গ্যারেট ওর আর রেমির মাঝে অবিশ্বাসের দেয়াল তুলে সুবিধা পেতে চাইছে, এবং এ-মুহূর্তে লোকটাকে তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে ভেবে খুশি থাকতে দিচ্ছে রানা। যত বেশি খুশি আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে প্রতিপক্ষ, ততই তার সতর্কতায় ঢিল পড়বে... রানাকে সুযোগ করে দেবে পাল্টা আঘাত হানার। তক্কে তক্কে থাকছে ও।

একে একে ন'টা ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এসেছে ওরা। দশ নম্বরে পৌঁছে একটু থামল রানা। জায়গাটা অন্যগুলোর মত নয়। হঠাৎ করেই দু'ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। বামেরটা উঠে গেছে উপরদিকে, ডানেরটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচে। শুরু থেকে মোটামুটি এক লেভেলেই হাঁটছে ওরা, ওঠানামা বলতে গেলে করতেই হয়নি। এই প্রথম উপর-নীচে যাওয়ার পথ দেখতে পাচ্ছে। বামের সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে উপরদিকে আলো ফেলল রানা। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে ওটা। ইঁটের দেয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এগোবার পথ।

'কী ব্যাপার, থামলে কেন?' পিছন থেকে বিরক্ত গলায় জানতে চাইল গ্যারেট।

কথাটা না শোনার ভান করে রেমিকে কাছে ডাকল রানা। দেয়ালটা দেখাল।

'ইঁটগুলো দেখছ?' বলল ও। 'কত পুরনো হতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

'আকার-আকৃতি আর রঙ যদি বিবেচনা করি,' বলল রেমি, 'দু'হাজার বছরের কম নয়।'

এগিয়ে এসে গ্যারেটও উঁকি দিল। বলল, 'মনে হচ্ছে উপর থেকে টানেল নেটওয়ার্কে নামার সহজ কোনও পথ। ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যাতে মাইডাসের সমাধি কেউ খুঁজে না

পায়।'

'তা হলে যে-পথে এলাম আমরা, সেটাও বন্ধ করেনি কেন?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা।

'আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'ইউ আর দ্য এক্সপার্টস্। তোমরাই বলো।'

'এর সঙ্গে মাইডাসের কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে,' রেমি বলল। 'মোমফলকে বলা হয়েছে, রাজা হেরনের গুপ্তচরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল রোমান-দুর্গে ঢোকার বিকল্প পথ খুঁজে বের করবার জন্য। এটা সেই পথ হতে পারে। রোমানরা আন্দাজ করেছিল এখান দিয়ে হামলা হতে পারে, তাই আগেভাগেই হয়তো বন্ধ করে দিয়েছিল রাস্তাটা।'

'মোদ্দা কথা হলো, এটা সারফেসে ওঠার পথ,' বলল গ্যারেট। 'মাইডাসের সমাধি ওখানে নেই। কাজেই এই প্যাসেজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' স্বীকার করল রানা।

ডানের সুড়ঙ্গ ধরে আবার এগোল চারজনে। মেঝে বেশ ঢালু, পা হড়কে যেতে চায়। সাবধানে নামল ওরা। প্রায় দুইশ' ফুট যাওয়ার পর বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠে—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পঁচিশ ফুটের বেশি নয়। এক প্রান্তে মেঝে নেই, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা পানি-ভর্তি পুল। ছ'ফুট চওড়া। মাঝামাঝি জায়গায় পাথরে গড়া একটা প্রাকৃতিক ফুটব্রিজও রয়েছে—পানির উপর দিয়ে গেছে ওটা, মিশেছে ওপাশের নিরেট দেয়ালের গায়ে। চারদিকে নজর বোলাল রানা, কিন্তু প্রকোষ্ঠ থেকে বের হবার দ্বিতীয় কোনও পথ দেখতে পেল না।

'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস!' রাগী গলায় বলল গ্যারেট। 'ভুল জায়গায় আমাদের নিয়ে এসেছ তুমি, রানা। এখান থেকে সামনে এগোবার কোনও রাস্তা নেই!'

'ভুল করিনি আমি,' বলল রানা। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্স আর জিয়োলেবের রিডিং অনুসরণ করেছি। ওগুলোই এখানে নিয়ে এসেছে আমাদের।'

'তা হলে বদ্ধ কুঠুরিতে পৌঁছুলাম কেন?' দাঁত কিড়মিড় করল গ্যারেট। রিস্ট ডিটোনেটরে একটা আঙুল ঠেকাল সে। 'জলদি কিছু একটা করো, নইলে ধরে নেব এতক্ষণ আমাকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি... সময় নষ্ট করেছ।'

'অযথা মাথা গরম করছ তুমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি নিজেও এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আঙুলটা সরাও। আমাকে বা রেমিকে খুন করলে কোনও লাভ হবে না তোমার, বরং তীরে এসে তরী ডুববে।'

'পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। যা করার এর ভিতর করো। নইলে তুমি মরবে! আগেই বলেছি, দু'জনকে প্রয়োজন নেই আমার। একজন হলেই চলে।'

শ্রাগ করে প্রকোষ্ঠের ভিতরটা জরিপ করল রানা। ফুটব্রিজটা বেখাপ্পা ঠেকছে। দেখে মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক, কিন্তু সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চাইছে না। পজিশন দেখে মনে হচ্ছে অনেক হিসেব-নিকেশ করে বসানো হয়েছে ওটা... প্রাকৃতিক হলে পজিশন এত নিখুঁত হতো না। কিন্তু পার হয়ে তো যাবার কোনও জায়গা নেই! ওপাশটা দেয়ালে মিশেছে!

সন্দিহান হয়ে উঠেছে রানা। ব্রিজে উঠে দেয়ালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। প্রায়-অদৃশ্য একটা ফাটল আবিষ্কার করল ও—মেঝে থেকে ছ'ফুট উঁচুতে। নখ দিয়ে দেয়ালের একটা অংশ খুঁটতেই ভুরু কুঁচকে গেল। এতক্ষণ ভেবেছিল ওটা ভলক্যানিক টাফের তৈরি, আসলে তা নয়। প্রকোষ্ঠের বাকি দেয়ালের সঙ্গে চেহারা মেলাবার জন্য প্লাস্টারের মত পাতলা এক পরত টাফ মাখানো হয়েছে কেবল। নখের খোঁচায় একটা অংশের চলটা উঠে

গেছে, সেখানে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তলার সাদাটে পাথর।

পাথরে খোঁচা দিল রানা। কিছুই হলো না, বরং আঁচড় পড়ল ওর নখের গায়ে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে জিয়োলেব ব্যবহার করল ও। দেয়ালের দিকে মুখ করে মাত্র এক ঘর ঘোরাল প্রথম কাঁটাদুটো। তারপর চেক করল পিছনের ডায়াল। তৃতীয় কাঁটা পুলের দিকে নির্দেশ করছে।

'কিছু পেলে?' রানার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

জবাব না দিয়ে পুলের কিনারে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পানিতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে এদিক-সেদিক নাড়ল একটু। স্বচ্ছ পানি ভেদ করে বেশ কিছুদূর চলে গেল আলো। হঠাৎ ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—রহস্যটা ধরে ফেলেছে। শ্রদ্ধাও জাগল দু'হাজার বছরের পুরনো ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি—এমন দুর্দান্ত কৌশল যার-তার মাথায় আসবে না।

'কিছু বলছ না কেন?' এগিয়ে এল রেমি। দুশ্চিন্তায় মুখ লুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে ওর। পালা করে তাকাচ্ছে রানা আর গ্যারেটের দিকে।

দেয়ালের চূলটা ওঠা জায়গাটার দিকে ইশারা করল রানা। রেমিকে বলল, 'পাথরটা চেক করে দেখো।'

ফুটব্রিজে উঠে পাথরে আঙুল ঘষল রেমি। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'কী করছ তোমরা?' অধৈর্য গলায় জানতে চাইল গ্যারেট।

রানার দিকে তাকাল রেমি। 'এটা কি ঝামাপাথর?' বলল ও। 'মানে... যে-জিনিস দিয়ে পায়ের তলা ঘষে মানুষ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক ধরেছ। পামিস... মানে, ঝামাপাথরই বটে। এই পাথরের নব্বুই পার্সেন্টই যে বাতাস, তা জানো?'

'তাতে কী এসে-যায়?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'স্ট্রাকচারের ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের কারণে পামিস-ই দুনিয়ার একমাত্র পাথর, যেটা পানিতে ভাসতে পারে,' বলল রানা। 'আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্টি হয় এ জিনিস। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই পাথরের তৈরি ভেলায় ভেসে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী—এশিয়া থেকে মাইগ্রেট করেছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়।'

'লেকচার ছেড়ে আসল কথা বলো,' বিরক্ত হয়ে উঠেছে গ্যারেট। 'আমাদের এখানে ওই ভাসমান পাথরের কী ভূমিকা?'

'দেয়ালের ওই অংশটা পামিসের তৈরি,' ওকে দেখাল রানা। 'পুলের পানিতে ভাসছে ওটা। বোঝা না যাবার জন্য পামিসের উপর ভলক্যানিক টাফের প্লাস্টার করা হয়েছে। তুমি নিজেই দেখো।'

'ভাসমান দেয়াল?' দ্বিধা ফুটল গ্যারেটের চেহারায়। 'তা কী করে সম্ভব?'

'আইডিয়াটা জিনিয়াস, তবে মেকানিজমটা সে-তুলনায় যথেষ্ট সিম্পল,' বলল রানা। 'পামিসের ইঁট গেঁথে তৈরি করা হয়েছে দরজার মত একটা পাল্লা, চারপাশের দেয়ালে খাঁজ কেটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওটা। এরপর পানি ভরা হয়েছে পুলে। ভাসতে ভাসতে উপরদিকে উঠে এসেছে পাল্লাটা, বন্ধ করে দিয়েছে ওপাশে যাবার ফোকর।'

'সোজা কথায় এটা একটা গুপ্তদরজা,' যোগ করল রেমি। 'পুরনো আমলের রাজ-সমাধিগুলোর প্রবেশপথ বিভিন্ন পন্থায় লুকিয়ে রাখা হতো, যাতে কবর-চোরেরা ভিতরে ঢুকে কোনও কিছু চুরি করতে না পারে। এখানেও তা-ই করা হয়েছে। মিশরের ফারাও সম্রাটদের সমাধিতেও এ-ধরনের বহু গুপ্তপথের নিদর্শন পাওয়া গেছে।'

'জাস্ট আ মিনিট,' ওকে বাধা দিল গ্যারেট। 'বিশ বছর আগে আমি আর মায়া যখন মাইডাসের চেম্বারে ঢুকেছিলাম, তখন তো কোনও গুপ্তপথ ব্যবহার করতে হয়নি! দেয়ালের কোনও গোপন দরজা খুলতে হয়নি আমাদের।'

'আমার ধারণা, এই পুলটা বদ্ধ-জলাশয় নয়,' বলল রানা। 'বাইরের কোনও ঝর্ণার পানি এসে ভরাট রাখছে এটাকে। তোমরা যে-বার এসেছিলে, সে-বার হয়তো খরা চলছিল... শুকিয়ে গিয়েছিল ঝর্ণা। পুলের পানির লেভেল নেমে যাওয়ায় দেয়ালটাও নেমে গিয়েছিল, তাই দরজাটা খোলা পেয়েছিলে তোমরা।'

চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল গ্যারেট। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। ঢালু একটা টানেল ধরে নেমে এসেছিলাম আমরা। গোল্ডেন চেম্বারে ঢোকার আগে পাথরের ফুটব্রিজ ধরে একটা গর্ত পেরুতে হয়েছিল।' নতুন চোখে এবার চারদিকে তাকাল সে। 'এটা সেই জায়গা!'

'দ্যাটস্ গ্রেট, বস!' খুশি খুশি গলায় বলল কাটনার। 'জায়গামত তো তা হলে পৌঁছেই গেছি।'

'এখনও নয়,' বলল গ্যারেট। 'দরজাটা খুলতে হবে।'

'সাঁতার কেটে তলা দিয়ে চলে যাওয়া যায় না?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তা হলে তো দরজা রাখা অর্থহীন। পুলের যেটুকু অংশ দরজার পিছনে, সেটার সারফেস নিশ্চয়ই কংক্রিট বা পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।'

'দরজা খোলার উপায় কী?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'পানি সরাবার জন্য নিশ্চয়ই কোনও ধরনের লিভার বা সুইচ আছে। পুলের পানি নেমে গেলে দরজাটাও নেমে যাবে, খুলে যাবে প্রবেশপথ। দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটা চক্কর দিল রানা। ভাল করে দেখল প্রতিটা দেয়াল। কিন্তু লুকানো কোনও মেকানিজমের চিহ্ন দেখল

না। পুলের পাশে ফিরে এল ও। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে জিনিসটা পানির তলায়। কোনও ধরনের প্লাগ—বাথটাব বা বেসিনে যেমন থাকে। খুলে দিলে পানি বেরিয়ে যাবে।'

'কে খুলবে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কাটনার।

'আমিই যেতে পারি। কিন্তু তার আগে বেল্টটা খুলে দাও। চাই না পানিতে ভিজে শর্ট-সার্কিট হোক ওটায়। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'না, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল গ্যারেট। 'নীচে যে এস্কেপ রুট নেই, তার কী গ্যারান্টি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা হলে তোমরাই যাও।'

'উঁহুঁ, আমরা নই। যাবে ড. হ্যাডলি। কাটনার, ওঁর বেল্ট খুলে দাও।'

ওজর-আপত্তি কিছুই করল না রেমি, কথাটা শুনে একটু রাগী ভঙ্গিতে গ্যারেটের দিকে তাকাল কেবল। কাটনার ওর বেল্ট খুলে দিলে ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো। কষ্ট হচ্ছে ওর—গ্যারেটের রটানো মিথ্যে অপবাদ শোনার পর থেকে ওর সঙ্গে অদৃশ্য এক দূরত্ব বজায় রাখছে রানা। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না। কুয়োয় নামার আগে ক্ষণিকের জন্য ওকে একটু নরম হতে দেখেছিল রেমি, কিন্তু তারপর থেকে যেন পাথরের একটা খোলসে ঢুকে পড়েছে অদ্ভুত মানুষটা। ওর ভুল না ভাঙাতে পেরে অস্থির লাগছে ওর। কিন্তু কীভাবে ভাঙাবে বুঝতে পারছে না। গ্যারেট কীভাবে ওদের সমস্ত পদক্ষেপের খবর পেল, সেটা সত্যিই একটা রহস্য। সেই রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত রানার সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবু কিছু একটা না বললেই নয়।

বড় করে শ্বাস নিল রেমি। বলল, 'রানা, আমি তোমার সঙ্গে বেঈমানী করিনি। আমার বোনকে সত্যিই কিডন্যাপ করেছে

গ্যারেট। তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাইনি।'

'এ-মুহূর্তে মায়াকান্না না কাঁদলেই কি নয়?' রুক্ষ গলায় বলল রানা।

অপমানে লাল হতে গিয়েও থমকে গেল রেমি। রানা চোখ টিপছে। অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করল ও। যেভাবেই হোক, রানা বুঝতে পেরেছে ও নির্দোষ। এখনও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে স্রেফ গ্যারেটকে ধোঁকা দেবার জন্য। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রেমি।

ওদের সঙ্কেত-বিনিময় বুঝতে পারেনি গ্যারেট। এগিয়ে এসে রেমির হাতে একটা টর্চলাইট তুলে দিল সে। বলল, 'যাও। টর্চটা ওয়াটারপ্রুফ নয়, বেশিক্ষণ টিকবে না। উপর থেকেও আলো ধরব আমরা।'

'নীচে কোনোকিছুতে হাত লাগিয়ো না,' বলল রানা। 'প্রথমে শুধু দেখবে। কী পেলে না পেলে সেটা উপরে এসে জানিয়ো আমাকে।'

'কী খুঁজব আমি?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'প্লাগ বা লিভার জাতীয় কিছু একটা থাকবে ওখানে।'

মাটিতে বসে পড়ল রেমি। জুতো-মোজা খুলে ফেলল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পা ছোঁয়াল পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ও—পানি ভীষণ ঠাণ্ডা।

'সময় নষ্ট করছ কেন?' ধমকে উঠল গ্যারেট। পিছন থেকে ধাক্কা দিল রেমিকে।

তাল হারিয়ে ঝপাস করে হিমশীতল পানিতে পড়ল রেমি। ডুবে গেল ক্ষণিকের জন্য, তারপরেই পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে ওর। গ্যারেটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

'গাল দিচ্ছ কেন?' হাসল গ্যারেট। 'ঠাণ্ডা পানিতে নামার সময় সরাসরি ঝাঁপ দেয়াই তো নিয়ম!'

আরেক দফা গালি দিল রেমি। তারপর বলল, 'টর্চ দাও!'

মাটি থেকে লাইটটা কুড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিল কাটনার। গ্যারেট একটা ফ্ল্যাশলাইট নিল, আলো জ্বেলে ওটা তাক করল পানির দিকে। রানাও নিজের ফ্ল্যাশলাইট একইভাবে তাক করেছে। নীচে তাকাল রেমি, পুলের তলা আলোকিত হয়ে উঠেছে... তবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওখানকার। পানি বেশ গভীর।

সাঁতারু হিসেবে মন্দ নয় রেমি, কাজেই ঘাবড়াবার কিছু দেখল না। বড় করে শ্বাস নিয়ে ডুব দিল ও, রওনা হলো পুলের তলায়। টর্চটা ইতিমধ্যে জ্বেলে নিয়েছে, আলো ফেলল দেয়ালে। উপরের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই, পুলটা ভলক্যানিক টাফ খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে।

দশ ফুট নামার পরে গুপ্তদরজার তলা দেখতে পেল ও। পুলের মেঝে থেকে ছ'ফুট উপরে ভাসছে ওটা। রানার কথাই ঠিক, দেয়ালে খাঁজ আছে, দরজাটা সেই খাঁজ ধরে ওঠে নামে। আশপাশটা আলো ফেলে ভালমত দেখল রেমি। রানা আর গ্যারেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বরাবর একেবারে তলদেশের কাছাকাছি কালচে একটা অবয়ব ফুটে আছে। সাঁতার কেটে ওখানে চলে গেল ও।

চারকোনা একটা ফোকর—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছ'ফুট; তিনফুট গভীর। কালের প্রবাহে শ্যাওলা আর জলজ আগাছায় প্রায় বুজে এসেছে, তার মাঝ থেকে মাথা বের করে রেখেছে একটা পাথুরে লিভার। লিভারের পাশেই রয়েছে একটা চ্যাপ্টা গোল ডিস্ক—আকারে ভলিবলের সমান। খাঁজের ভিতর বসে আছে ডিস্কটা, সরে যাবার মত জায়গা রয়েছে সেই খাঁজে। সন্দেহ নেই,

এটাই পুলের কন্ট্রোল ভালভ।

দম ফুরিয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে সারফেসে ভেসে উঠল রেমি।

'পেয়েছ?' সাগ্রহে জানতে চাইল গ্যারেট।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। ফোকরটার বর্ণনা দিল।

'হুম, বেশ সিম্পল মেকানিজম বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা। 'লিভার টানলে ডিস্কটা সরে যাবে। পানি তখন বেরিয়ে যাবে ড্রেন ধরে।'

'আমি কি তা হলে টানব লিভারটা?'

'হ্যাঁ। তবে সাবধানে থেকো। ড্রেনের মুখ খুলে গেলে ভীষণ একটা টান দেবে পানি; তার ভিতর যেন আটকে না পড়ো।'

'ঠিক আছে।'

দম নিয়ে আবার ডুব দিল রেমি। দ্রুত পা ছুঁড়ে সরাসরি চলে গেল ফোকরের সামনে। টর্চটা কয়েক সেকেণ্ড পরেই মিটমিট করে নিভে গেল, তবে তার আগেই লিভার ধরে ফেলেছে ও। পুলের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ওটা টানতে শুরু করল।

এক ইঞ্চি নড়ল লিভার, সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পানিতে আলোড়ন অনুভব করল রেমি, ফোকরের দিকে প্রবাহের সূচনা হয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবারও লিভার টানল ও, নিয়ে এল একেবারে শেষ প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা শব্দ করে সরে গেল ডিস্ক। চোখের পলকে শুরু হলো তাণ্ডব, যেন উন্মাদ হয়ে উঠল পানি। তুমুল আক্রোশ নিয়ে ছুটে এল ফোকরের দিকে।

রানা সতর্ক করেছিল, তারপরেও স্রোতের এত শক্তি হতে পারে, তা কল্পনা করেনি রেমি। পিঠের উপর প্রবল ধাক্কা অনুভব করল ও, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেহটা চলে যেতে চাইল ফোকরের ভিতরে। কোনোমতে পুলের মেঝেতে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল

রেমি, সরে যেতে চাইল পানির প্রবাহ থেকে। পুরোপুরি সফল হলো না। শরীরের বেশিরভাগ ফোকরের উপরে উঠে এল বটে, কিন্তু ওই অবস্থায় দেয়ালে আছড়ে পড়ল ও। আতঙ্কিত হয়ে টের পেল, দেহের নিম্নাংশ আটকা পড়ে গেছে স্রোতের ভিতর। প্রচণ্ড এক টান খেয়ে একটা পা চলে গেছে ড্রেনের মুখে... ঢুকে যেতে চাইছে ভিতরে।

যুদ্ধ শুরু করল রেমি। দেয়াল আঁকড়ে উঠে এল কয়েক ইঞ্চি। ড্রেনের মুখ থেকে পা সরে এল বটে, কিন্তু পানির চাপে পিনগাঁথা প্রজাপতির মত দেয়ালে লেপ্টে রইল দেহ। বহু চেষ্টা করেও মুক্ত করতে পারল না নিজেকে।

মৃত্যুভয়ে শরীর অসাড় হয়ে এল ওর। পুল খালি হতে কতটা সময় লাগবে জানে না, কিন্তু ফুরিয়ে আসছে ওর দম। ডুবে মরতে চলেছে ও! বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। আর তখুনি উপর থেকে কী যেন ঝপাস করে পড়ল পানিতে। কয়েক মুহূর্ত পর কেউ হাত ধরল ওর, টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে এল রেমি। স্রোতের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতেই দেয়াল থেকে সরে এল শরীর, জাপটে ধরে ওকে নিয়ে সারফেসে ভেসে উঠল উদ্ধারকর্তা। দু'জোড়া হাত এবার খামচে ধরল ওদেরকে। টেনে তুলল পুল থেকে।

কাশতে কাশতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেমি। ভেজা শরীরে ওর পাশে বসে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়... মাসুদ রানা! ওর কোমরে এক্সপ্লোসিভ বেল্টটা এখনও লাগানো আছে দেখে চমকে উঠল।

'ও...ওটা নিয়ে তুমি ঝাঁপ দিয়েছ পানিতে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'যদি শর্ট সার্কিট হতো?'

'এমন লোক নিয়ে কাজ করা মুশকিল,' বিরক্ত গলায় বলল

গ্যারেট। ভেজা হাত প্যান্টে মুছছে সে। 'এভাবে ঝুঁকি নেয় কেউ? তাও আবার এমন এক মেয়ের জন্য, যে তোমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে?'

'যা-ই করে থাকুক,' শান্ত স্বরে বলল রানা, 'তার জন্য মৃত্যু প্রাপ্য হতে পারে না ওর।'

'ও! তুমি তা হলে মানবতার পূজারী?' খোঁচা মারা সুরে বলল গ্যারেট। 'আমার জন্যে সুসংবাদ!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা!' বলেই রানাকে জাপটে ধরল রেমি। মুখ গুঁজল বুকে।

'ঢলাঢলি বন্ধ করো!' কর্কশ গলায় বলল গ্যারেট। রেমির বেল্টটা ছুঁড়ে দিল। 'পরে ফেলো এটা। খবরদার, কোনও চালাকি নয়।' পিস্তল বেরিয়ে এসেছে তার হাতে।

বেল্টটা রেমির হাতে তুলে দিল রানা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তৈরি থেকো। প্রথম সুযোগেই ওদের উপর হামলা করব আমরা।'

উঠে দাঁড়াল দু'জনে। রেমির বেল্ট পরা হতেই এক ঝলক গরম বাতাস বয়ে গেল, যেন আভেনের দরজা খুলেছে কেউ। এক সঙ্গে ঘাড় ফেরাল সবাই। গুপ্তদরজাটা নেমে যেতে শুরু করেছে, ওখানে দেখা যাচ্ছে হলদে আভা। ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভ্যাপসা, গরম বাতাস।

দশ মিনিটের মধ্যে পুরোপুরি খালি হয়ে গেল পুল, উন্মুক্ত হয়ে গেল প্রবেশপথ। পিস্তলের ইশারায় রানা আর রেমিকে এগোবার নির্দেশ দিল গ্যারেট। হাত ধরাধরি করে ফুটব্রিজে উঠল ওরা, প্রবেশপথের ফোকর পেরিয়ে পা রাখল চওড়া একটা পাথুরে চাতালে। ব্যালকনির মত ওটা ঝুলে আছে অতিকায় এক গুহার উপরে।

দম আটকে এল সবার, অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য ভেসে উঠেছে

চোখের সামনে। সোনালি আভায় ঝলমল করছে গুহা—সবখান থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কারণ মেঝে, দেয়াল, ছাত... সবকিছুই সোনায় মোড়া!

সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, রাজা মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছে গেছে ওরা।

তেইশ

মুগ্ধ চোখে গোল্ডেন চেম্বারের দিকে তাকিয়ে আছে চার দর্শক, ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেছে সবকিছু। সোনালি গুহা আর তার ভিতরের আবছায়া পরিবেশ যেন জাদু করেছে ওদেরকে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছে অন্য কোনও জগতে। অকল্পনীয় এক দৃশ্য—গুহার ভিতরের প্রতিটি সারফেস, প্রতিটি বস্তু... এমনকী প্রবেশপথের চারপাশে শ্যাওলার স্তর পর্যন্ত সবকিছুই সোনায় গড়া।

ডাফল ব্যাগ থেকে শক্তিশালী দুটো হ্যালোজেন ল্যাম্প বের করল কাটনার। ব্যালকনির উপরে এমনভাবে সেট করল, যাতে পুরো গুহা আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক বিস্ময় কেটে গেলে সেই আলোয় গুহার অভ্যন্তর জরিপ করল রানা। পাথুরে চাতালটা একশো ফুট লম্বা এবং পঞ্চাশ ফুট চওড়া। ব্যালকনি হিসেবে কাজ করছে ওটা, কিনারে সোনায় গড়া রেলিং লাগানো আছে। আকার-আকৃতি দেখে মনে হলো, ভলক্যানিক টাফের অতিকায়

এক পিণ্ড খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে এই চেম্বার। ব্যালকনির দশ ফুট নীচে রয়েছে গুহার মূল মেঝে, সিঁড়ি ধরে নামতে হয় ওখানে। ঠিক মাঝখানটায় শোভা পাচ্ছে চারকোনা পেডেস্টালের উপর দাঁড়ানো কিশোরীর মূর্তি—ঠিক যেমনটা শুনেছে গ্যারেট আর মায়ার মুখে। ডান হাত নেই মূর্তিটার। পেডেস্টালের গায়ে খোদাই করে গ্রিক হরফে কী সব যেন লেখা।

বুদ্‌বুদ্‌ ফাটার আওয়াজ পেয়ে দৃষ্টি ঘোরাল রানা। গুহার একপাশে, বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে রয়েছে একটা হট পুল। ভূগর্ভ থেকে উঠে আসছে পানি, টগবগ করে ফুটছে। নেপলসের খুব কাছেই রয়েছে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি; রানা আন্দাজ করল, সেই আগ্নেয়গিরি উত্তপ্ত লাভা বইছে এই চেম্বারের গভীর দিয়ে। হট পুলের পানি ওটার সাহায্যে গরম হচ্ছে। গুহার ভিতরে ভ্যাপসা আবহাওয়া বিরাজ করছে, ক্রমাগত ঘামছে ওরা, বাতাসে ভাসছে পুল থেকে উঠে আসা তপ্ত বাষ্প। দরজা বন্ধ অবস্থায় ভিতরটা নিঃসন্দেহে আভেনের মত গরম হয়ে থাকে।

আবার চোখ ফেরাল রানা, এবার তাকাল হট পুলের পাশে। পানি থেকে কয়েক ফুট দূরে দ্বিতীয় একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল, ওটা উঠে গেছে সোনায় গড়া বিশাল এক টেরাসে। এন্ট্রান্স ব্যালকনির মত রেলিং নেই ওখানে, ফলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা সোনার কফিন, গায়ে হাজারো কারুকাজ। মূর্তি ছাড়া সমাধির ভিতরে আর কোনও সোনা-দানা নেই, কাজেই রানা ধরে নিল রাজা মাইডাস তার পরকালের প্রাচুর্যের জন্য এই চেম্বারটাকেই যথেষ্ট ভেবেছিলেন।

যা দেখার তা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখে নিল রানা, তারপর মন দিল আসল কাজে। টানেলে নামার পর থেকেই মাথা ঘামিয়ে চলেছে ও, কীভাবে গ্যারেট আর কাটনারকে ঘায়েল করা যায়। অতর্কিত হামলা চালানোটাই একমাত্র পথ বলে মনে

হচ্ছিল, কিন্তু কোনও সুযোগ পাচ্ছিল না। সারাক্ষণ ওর আর রেমির উপরে কড়া নজর রেখেছে প্রতিপক্ষ, বেচাল দেখলেই গুলি করত, কিংবা ডিটোনেটর চেপে ফাটিয়ে দিত কোমরের এক্সপ্লোসিভ বেল্ট।

কিন্তু এই প্রথমবারের মত মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়েছে দুই দুর্বৃত্তের। গোল্ডেন চেম্বারের অপার্থিব দৃশ্য সম্মোহিত করে ফেলেছে ওদের, ভুলে গেছে দুই বন্দির উপর নজর রাখবার কথা। এর অপেক্ষাতেই ছিল রানা।

গুহায় ঢোকার সময় সামান্য কৌশল খাটিয়েছে ও—রেমিকে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, যাতে ভিতরের দৃশ্য দেখবার জন্য ওদের দু'পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয় গ্যারেট আর কাটনার। পরিবেশ-পরিস্থিতি সবই অনুকূলে, কাজেই দেরি না করে অ্যাকশনে গেল ও।

প্রথমেই বাম হাতের ধাক্কায় রেমিকে পিছিয়ে দিল ও। এরপর বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরে ডানহাতে ধরা জিয়োলেব দিয়ে সজোরে আঘাত হানল কাটনারের হাতে। ককিয়ে উঠল লোকটা, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল ব্যালকনির একদিকে। ইন্সটিঙ্কটের বশে রানার দিকে ঘুরতেই বুক বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি খেলো, তাল হারিয়ে উল্টে পড়ল ব্যালকনির পাশের সিঁড়িতে। গড়াতে গড়াতে রওনা হলো নীচে।

রানা ওসব দেখছে না, কাটনারকে লাথি মেরেই গ্যারেটের দিকে ঘুরল ও। একই ভঙ্গিতে জিয়োলেব দিয়ে আঘাত হানার চেষ্টা করল লোকটার হাতে। তবে একটু সময় পাওয়ায় তৈরি হয়ে গেছে গ্যারেট, শরীর ঘুরিয়ে পিঠের উপর নিল আঘাতটা। একই সঙ্গে বগলের তলা দিয়ে তাক করল পিস্তল, ট্রিগার চাপল রানাকে লক্ষ্য করে।

বদ্ধ জায়গায় কানফাটা আওয়াজ হলো। রানার শরীর ঘেঁষে

বেরিয়ে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট, তাড়াহুড়োয় নিশানা করতে পারেনি গ্যারেট। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, গ্যারেটকে জাপটে ধরে পড়ে গেল মেঝেতে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। পিস্তল তাক করে আবার গুলি করতে চাইল গ্যারেট, কিন্তু রানার এক থাবায় ওটা উড়ে চলে গেল আরেকদিকে। গ্যারেটকে মাটির চাতালের উপর এক হাতে চেপে ধরল ও, অন্যহাতে খামচি দিল তার কবজিতে, ভেলক্রো স্ট্র্যাপের বাঁধন খুলে একটানে তুলে আনল একটা ডিটোনেটর বসানো ওয়েস্টব্যাণ্ড। ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ব্যালকনির বাইরে।

তখুনি ঝটকা দিল গ্যারেট, তাল হারিয়ে তার গায়ের উপর থেকে পড়ে গেল রানা। সাপের মত পিছলে কয়েক হাত দূরে চলে গেল গ্যারেট, ওঠার চেষ্টা করল না, তার বদলে হাত নিয়ে গেল কবজিতে বাঁধা দ্বিতীয় ওয়েস্টব্যাণ্ডের দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, আতঙ্কিত চোখে তাকাল ডেটোনেটরের দিকে—নীল রঙ ওটার... তারমানে মরতে চলেছে রেমি!

গ্যারেটকে লক্ষ্য করে মরিয়ার মত ঝাঁপ দিল ও, কিন্তু সফল হলো না। ওকে নাগালে পেয়েই মাটিতে থেকে জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ল গ্যারেট। রানার বুকে লাগল সেই লাথি। প্রচণ্ড ব্যথায় নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, ছিটকে গেল পিছনে... রেলিঙের দিকে। ওখানে ধাক্কা খেয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ হেলে পড়ল পিছনদিকে। শত চেষ্টাতেও ব্যালান্স রাখতে পারল না, রেলিং টপকে দশ ফুট নীচে পড়ে গেল ও।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

আছড়ে-পিছড়ে উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। খিস্তি করে ডিটোনেটরের বাটন স্পর্শ করল সে। রানা-রেমির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, ওদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানে নেই। এ-অবস্থায় একটাই পথ দেখল রেমি—ছুটে

গিয়ে এক লাফে চড়ে বসল গ্যারেটের পিঠে। চার হাত-পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরল তাকে।

'চাপো বাটন,' হিসিয়ে উঠল ও। 'আমরা দু'জনেই মরি!'

ক্রুদ্ধ গর্জন করল গ্যারেট। কনুই চালাল রেমিকে আঘাত করবার জন্য, তবে আঘাতটা জুতসই হলো না। শরীর ঝাঁকাতে শুরু করল এবার, চেষ্টা করল বিচ্ছু মেয়েটাকে ফেলে দেবার। হাত-পায়ের বাঁধন আরও শক্ত করে ফেলল রেমি, পড়ে গেলেই মরণ। নিজের বাম হাতের ভাঁজে গ্যারেটের গলা আটকাল ও, ডান হাতের সবগুলো নখ বসিয়ে দিল লোকটার মুখে। সর্বশক্তিতে আঁচড় কাটছে।

আর্তনাদ করে উঠল গ্যারেট। রেমির একটা নখ তার বাম চোখ গেলে দিয়েছে। গলার উপর হাতের চাপেও হাঁসফাঁস করছে সে, শ্বাসনালী ভেঙে যাবার উপক্রম। ইচ্ছে করে উল্টোদিকে হোঁচট খেলো, শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে পড়ল রেমির উপরে। ককিয়ে উঠল মেয়েটা। হাতের বাঁধন ক্ষণিকের জন্য আলগা হলো, তবে ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার আগেই আবারও নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। শক্ত করে ফেলল বাঁধন। এবার শুধু এক হাতের উপর নির্ভর করছে না, ডান হাতে টেনে ধরেছে নিজের বাম হাত—সর্বশক্তিতে চাপ দিচ্ছে গলার উপরে।

দাপাদাপি শুরু করল গ্যারেট, সেইসঙ্গে গড়াগড়ি। রেমির নাজুক শরীরের উপর বারবার চাপাচ্ছে ওজন। ব্যথায় একেক বার কাতরে উঠল রেমি, কিন্তু ছাড়ল না গ্যারেটকে। সন্দেহ নেই, দু'জনের মধ্যে একজন মরতে চলেছে। কিন্তু কে মরবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।

দশ ফুট নীচের মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল রানা। পতনের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল বুক থেকে। কট্ করে উঠল

পাঁজর... সম্ভবত চিড় ধরেছে এক বা একাধিক হাড়ে। কপাল ভাল যে মাথা ফাটেনি। আচ্ছন্নের মত কয়েক মুহূর্ত পড়ে রইল নীচে।

নড়াচড়ার শক্তি ফিরে পেতেই মুখ তুলল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। সিঁড়ির গোড়া থেকে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কাটনার, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুট লাগিয়েছে গুহার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্ণমূর্তির দিকে। পেডেস্টালের গোড়ায় চোখ চলে গেল ওর। গ্যারেটের ওয়েস্টব্যাণ্ড পড়ে আছে ওখানে, ওটার গায়ে জ্বলজ্বল করছে লাল বোতাম—রানার কোমরে জড়ানো এক্সপ্লোসিভ বেল্টের রিমোট ডিটোনেটর!

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। পাঁজরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে ও-ও ছুটল মূর্তির দিকে। কাটনারকে নাগালের মধ্যে পেতেই রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডাইভ দিল, জাপটে ধরল কোমর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাটনার, নাক-মুখ ঠুকে গেল মেঝেতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, পরক্ষণে পা ছুঁড়ল। পেটের একপাশে লাথি খেলেও তাকে ছাড়ল না রানা, বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। সাপের মত শরীর মোচড়াল কাটনার, মেঝের উপর বুক ঘষটে এগোতে থাকল পড়ে থাকা ডেটোনেটরের দিকে। বুঝে গেল রানা, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কাটনারের গায়ে ষাঁড়ের জোর, রানাকেও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে মূর্তির পেডেস্টালের দিকে।

মরিয়া হয়ে কাটনারের প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, লোকটাকে ওখানে এক্সপ্লোসিভ বেল্টের চাবি রাখতে দেখেছে, পকেট হাতড়ে আলগোছে তুলে আনল রিংটা। পরক্ষণে ভাঙা পাঁজরের উপর একটা লাথি খেলো ও। গুঙিয়ে উঠল, বাধ্য হলো হাতের বাঁধন ঢিল করতে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কাটনার, কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে, ফের ছুট লাগাল

ডেটোনেটরের উদ্দেশে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল রানা। ত্রস্ত হাতে বেল্টের কি-হোলে চাবি ঢোকাল, এক মোচড়ে খুলে ফেলল ক্ল্যাম্পের তালা। বেল্টটা হাতে নিতেই মূর্তির গোড়ায় পৌঁছুতে দেখল কাটনারকে। নিচু হয়ে ওয়েস্টব্যাণ্ডকে কুড়িয়ে নিল সে, সোজা হতে হতে টিপে দিল ডেটোনেটরের বাটন। ক্রূর হাসি হেসে ঘুরতে শুরু করল রানার দিকে, কিন্তু সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মুছে গেল সেই হাসি।

বাটন চাপার আগেই বেল্টটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে রানা!

বিস্ফোরণে উড়ে গেল কাটনারের মাথা। ফুলঝুরির মত ছিটকে পড়ল রক্তমাংস। ধড়হীন দেহটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপরেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল সোনালি মেঝেতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ি ধরে ছুটল ব্যালকনিতে। উপরে উঠতেই রেমিকে দেখতে পেল—গ্যারেটকে পিছন থেকে জাপটে ধরে পড়ে আছে মেঝেতে। অস্ফুট গোঙানি বেরুচ্ছে গ্যারেটের মুখ দিয়ে, দৃষ্টি বিস্ফারিত। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে তার।

আঁতকে উঠল রানা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল রেমির দিকে, টেনে-হিঁচড়ে ওকে সরিয়ে আনল। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যেন খুন সওয়ার হয়েছে, গ্যারেট ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

'ছাড়ো আমাকে!' রানার বাঁধনের ভিতর হাত-পা ছুঁড়ল রেমি। 'ওকে আমি শেষ করে দেব!'

'শান্ত হও!' কড়া গলায় বলল রানা। 'গ্যারেটকে আমার দরকার আমাদের। ও মরে গেলে র‍্যাচেলের খোঁজ পাবে না।'

স্থির হয়ে গেল রেমি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সরি, আমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' অনেকটাই শান্ত দেখাচ্ছে এখন ওকে।

'ইটস্ ওকে,' সহজ গলায় বলল রানা। 'ওর মত একটা পিশাচকে বাগে পেলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

রেমিকে ছেড়ে দিয়ে গ্যারেটের দিকে এগোল ও। চিত করল তাকে। কোনাকুনিভাবে চারটে গভীর আঁচড়ের দাগ ফুটে আছে মুখে, বাম চোখটার দফারফা হয়ে গেছে। লোকটার হাত থেকে দ্বিতীয় ওয়েস্টব্যাণ্ডটা খুলে নিল ও, তারপর চেক করল পালস।

ইতস্তত করল রেমি, 'ও...ও কি...'

'না, মরেনি,' বলল রানা। 'দম ফেলছে এখনও। তবে খবর হয়ে গেছে ওর।' ঘাড় ফেরাল ও। 'দেখিয়েছ বটে, ম্যাডাম! ব্রাভো!'

'দূর! কী যে বলো না!' একটু যেন লজ্জা পেল রেমি। 'কাটনার কোথায়?' বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলেও নীচে কী ঘটেছে দেখতে পায়নি ও।

'খতম,' সংক্ষেপে বলল রানা। খুলে দিল রেমির বেল্ট। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে এতক্ষণ মচকানো পাঁজরের ব্যথা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু উত্তেজনা কেটে যাওয়ায় ফিরে আসছে ওটা। বেল্টটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ককিয়ে উঠল।

'তুমি আহত?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল রেমি।

'তেমন কিছু না,' ওকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সামান্য চোট।'

'আমরা এখন কী করব?'

'অপেক্ষা করব গ্যারেটের জ্ঞান ফেরার জন্য। তারপর জেনে নেব অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে ও কোথায় আটকে রেখেছে... সেইসঙ্গে স্ট্রনটিয়াম নিয়ে ওর প্ল্যানটা কী।'

'যদি বলতে না চায়?'

মাথা ঘোরাল রানা। ওর দৃষ্টি চলে গেল হট পুলে টগবগ করতে থাকা পানির দিকে। 'তা হলে ওই ফুটন্ত পানিতে সাঁতার কাটতে হবে ওকে,' নিষ্ঠুর গলায় বলল ও।

চব্বিশ

গ্যারেটের অজ্ঞান দেহটা টেনে-হিঁচড়ে ব্যালকনি থেকে নামিয়ে আনল রানা। কাজটা সহজ হলো না—পাঁজরের ব্যথাটা ভোগাতে শুরু করেছে ওকে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা সহ্য করল ও। শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়, মানসিক দিক থেকেও সহনশীলতা দেখাতে হলো ওকে। গ্যারেটের দিকে তাকালেই রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়, ইচ্ছে করছে দম না বেরুনো পর্যন্ত পিশাচটাকে পায়ের তলায় পিষতে। কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলির কথা ভেবে নিরস্ত রাখতে হলো নিজেকে।

'ওহ্ গড!' নীচে পৌঁছুতেই আঁতকে উঠল রেমি, কাটনারের বীভৎস লাশটা চোখে পড়েছে।

'তাকিয়ো না ওটার দিকে,' বলল রানা। 'কাটনারের ডাফল ব্যাগটা উপরে রয়ে গেছে। ওটা নিয়ে এসো। সঙ্গে ওদের পিস্তলগুলোও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রেমি। রানা বসে পড়ল গ্যারেটের পাশে। আপাতদৃষ্টিতে বিপদ কেটে গেলেও কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়নি মায়া। লোকজন নিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে এসে হাজির হবে এখানে। চলে যাওয়ারও উপায় নেই, পথে দেখা হয়ে যেতে পারে ওর সঙ্গে। যা-ই ঘটুক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার—দর কষাকষির

মত কিচ্ছু নেই ওদের হাতে। রানা আর রেমিকে দেখামাত্র খুন করবে মায়া। মুরল্যাণ্ডও ওর হাতে বন্দি। সবমিলিয়ে রীতিমত নাজুক অবস্থায় রয়েছে ওরা।

মাথা গরম করল না রানা। যখনকারটা তখন দেখা যাবে। আপাতত হাতের কাজে মন দেয়া দরকার। কাটনারের বুট থেকে জুতোর ফিতা খুলে নিল ও, সেগুলো দিয়ে বেঁধে ফেলল গ্যারেটের দুই হাত। এরপর শরীরতল্লাশি করে বের করে নিল নিজের জিনিসপত্র। একটা সেলফোন পাওয়া গেল গ্যারেটের পকেটে, তবে মাটির তলায় সিগনাল পাচ্ছে না ওটা। পেলেও খুব একটা লাভ হতো না। পাসওয়ার্ডের সাহায্যে ফোনটা লক্ করে রেখেছে গ্যারেট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। সুযোগ পেলে ল্যারি কিং-কে দেবে। গ্যারেটের ফোন চেক করলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবে অপহৃত দুই বন্দি এবং চোরাই স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে।

ব্যাগ আর পিস্তল নিয়ে ফিরে এসেছে রেমি, ওগুলো তুলে দিল রানার হাতে। গ্যারেটের বেল্টে ঝোলানো পানির ক্যান্টিন খুলে নিল রানা, নিজে দু'চুমুক খেয়ে বাড়িয়ে ধরল রেমির দিকে। তারপর চেইন খুলে উঁকি দিল ডাফল ব্যাগের ভিতরে।

'আচ্ছা,' পানির ক্যান্টিনটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রেমি, 'তুমি কী করে বুঝলে, গ্যারেট আমার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে?'

'দুটো কারণে খটকা লেগেছিল আমার,' মুখ না তুলেই বলল রানা। 'প্রথমত... পিয়াৎজা দেল প্লেসিবিতোয় আমাদেরকে যেভাবে ফাঁদে ফেলল ও, সেটা স্বাভাবিক ছিল না। স্যান ম্যাগিয়োর গির্জা থেকে সরাসরি ওখানে গিয়েছিলাম আমরা... এবং পুরোটা সময় আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। কাজেই আমার চোখ এড়িয়ে ওকে খবর দেবার সুযোগ ছিল না তোমার।'

'হুম। কিন্তু সঠিক কুয়োটা যে স্যান ম্যাগিয়োরে, সেটা কী করে জানল?'

'সিম্পল। শেষ লোকেশনটাই সঠিক লোকেশন হতে বাধ্য, নইলে আরও কয়েক জায়গায় যেতাম আমরা, তাই না? কিন্তু স্যান ম্যাগিয়োর গির্জার পর আর কোথাও যাইনি আমরা, কাজেই ও বুঝে নিয়েছে কোথায় কুয়োটা হতে পারে।'

'কিন্তু আমাদের লোকেশন ও জানল কী করে? ট্র্যাকারটা তো ববির কাছে ছিল!'

'ওটাই ছিল আমার দ্বিতীয় খটকা। ভেবে দেখলাম, আরেকটা ট্র্যাকার না থাকলে আমাদেরকে ট্র্যাক করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। যেভাবে তোমার-আমার ফোন ভেঙে ফেলল, তাতে আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না... ট্র্যাকারটা তোমার ফোনেই লুকানো ছিল। ও চায়নি ওই ট্র্যাকারের সিগনাল ফলো করে আর কেউ পিছু নিক আমাদের।'

'আমার ফোন? তোমারটা নয় কেন? তোমারটাও তো ভেঙেছে।'

'ওটা ছিল ধোঁকা দেবার একটা কৌশল। শুধু তোমার ফোন ভাঙলে আমি তখুনি সন্দেহ করতাম ওকে। আমাদের ভিতর আর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারত না ও। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার ফোনটা মায়ার এস্টেট থেকে পালাবার সময় পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। শুরু থেকে অক্ষত আছে কেবল তোমারটা। কাজেই ট্র্যাকার লুকানো থাকলে ওটার ভিতরে থাকবে। আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ায় এ-ব্যাপারে পুরোপুরি শিয়োর হয়ে গেলাম। মনে আছে, আজ সন্ধ্যায় একটা ছবি তুলিয়েছে ও আমাকে দিয়ে—জিয়োলেব আর তোমার ফোনটা পাশাপাশি রেখে? আমাদের লোকেশন সম্পর্কে শিয়োর হতে চেয়েছিল ও... চেয়েছিল জিয়োলেবটা আমাদের সঙ্গে আছে কি না

সেটা জানতে। তা হলে ছবি তোলার সময় তোমার ফোনটা পাশে রাখতে বলল কেন? যদি তারিখ আর সময়ের ব্যাপারে শিয়োর হতে চাইত, তা হলে তো আরও অনেক উপায় ছিল! এর পিছনে একটাই যুক্তি দেখলাম—জিয়োলেবের ট্র্যাকার আর তোমার ফোনের ট্র্যাকার... দুটোর রিডিং মিলিয়ে দেখতে চাইছিল ও।'

'কিন্তু আমার ফোনে ট্র্যাকার এল কোত্থেকে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রেমি।

'নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে ওটা বসানো হয়েছে,' অনুমান করল রানা। 'ভেবে দেখো, গত কয়েকদিনে কখনও কি ফোনটা হাতছাড়া হয়েছিল তোমার?'

সচকিত হলো রেমি। 'হ্যাঁ! গত সপ্তাহে... একটা রেস্টুরেন্টে! লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম, খাওয়া শেষে ব্যাগে হাত দিয়ে দেখি ফোনটা নেই। খানিক পরে পাশের টেবিলে বসা এক লোক ওটা ফেরত দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল ফোনটা নাকি ব্যাগ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।'

'পড়েনি, ও-ই সরিয়েছিল। ট্র্যাকার ঢুকিয়ে আবার ফেরত দিয়েছে তোমাকে,' বলল রানা। 'বড়ই ধুরন্ধর লোক এই গ্যারেট। জিয়োলেবের ভিতরে ট্র্যাকার বসিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তোমার ফোনেও একটা বসিয়েছে। সেটার সাহায্যে নজর রেখেছে আমাদের উপর, পরে আবার শত্রুতা বাধাতে চেয়েছে তোমার-আমার মধ্যে। আমি নিজেও শুরুতে ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম। দুর্ব্যবহার করে থাকলে তার জন্য আমি দুঃখিত, রেমি।'

'দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই,' হাসল রেমি। 'তুমি যে অন্ধের মত গ্যারেটের কথা বিশ্বাস করে বসে থাকোনি, তাতেই আমি খুশি।'

ডাফল ব্যাগটা আবার ফাঁক করল রানা। উপরের কয়েকটা

জিনিস সরাতেই ভুরু কুঁচকে গেল ওর। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের তিনটা ক্যানিস্টার দেখতে পাচ্ছে—টাইমিং ডিভাইস-সহ। পুরো গুহা ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই কাজশেষে তা-ই করতে চেয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ খুঁজে না পায় সমাধিটা।

ডাফল ব্যাগে আর কিছু দেখার নেই। এবার গ্যারেটের ব্যাকপ্যাক চেক করল রানা। সোনার হাতটা পাওয়া গেল ওটার ভিতরে, সেইসঙ্গে একটা চামড়ার পাউচ। পাউচের ভিতরে রয়েছে হলদে হয়ে আসা একটা পাণ্ডুলিপি। আর্কিমিডিসের কোডেক্স।

'হাত দিয়ো না ওটায়,' বলে উঠল রেমি। 'জিনিসটা দু'হাজার বছরের পুরনো, খুবই নাজুক। গ্যারেট এরই মধ্যে কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে কে জানে, আর কিছু হতে দেয়া যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাউচটা একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। বের করে আনল ব্যাকপ্যাকের বাকি জিনিসগুলো। দুটো পানির বোতল পেল; লেবেল সাঁটা আছে—একটার গায়ে *সি-ওয়াটার*, অন্যটার গায়ে *অ্যাসিডিক মিকচার*। দু'জোড়া রাবারের হ্যাণ্ডগ্লাভও রয়েছে ওখানে। সেই সঙ্গে আছে প্লাস্টিকের একটা খালি কন্টেইনার, আর একটা ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার।

'একেবারে অবিবেচক নয় দেখছি,' ক্যামেরাটা নেড়েচেড়ে বলল রানা। 'এখানকার ভিডিও করে রাখতে চেয়েছিল গ্যারেট। বোধহয় নিজের সবচেয়ে বড় সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে।' রেমির হাতে তুলে দিল ওটা। 'ফিল্মিং শুরু করো।'

'কেন?'

'ইটালিয়ান অথোরিটিকে দেখাবার জন্য। আমরা যখন ফিরে গিয়ে সব জানাব ওদেরকে, নিশ্চয়ই প্রমাণ দেখতে চাইবে।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল রেমি। 'তবে আমি ক্যামেরার সামনে থাকতে অভ্যস্ত, পিছনে নই। ভুলভাল হয়ে গেলে দোষ দিয়ো

না।'

চেম্বারের একপাশে চলে গেল ও। ক্যামেরা অন্ করে সমাধির অভ্যন্তরের ছবি তুলতে শুরু করল। রানা এগিয়ে গেল গ্যারেটের দিকে, চাপড় মারল তার দু'গালে। কয়েক চাপড় খাওয়ার পরেই নড়তে শুরু করল গ্যারেট। পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল রানা। একটা পিস্তল কোমরে গুঁজল, অন্যটা তাক করল ধুরন্ধর লোকটার দিকে।

জ্ঞান ফিরল গ্যারেটের। জুতোর ফিতা দিয়ে বাঁধা হাতদুটো সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল মুখের উপরে—বাম চোখ এবং তার আশপাশের মাংস ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। কাতরে উঠে বলল, 'আমার চোখ! ওহ্ গড! কী করেছ তোমরা?'

'নিজের দোষে কানা হয়েছ তুমি,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ো।'

'আ... আমি আহত!'

'ওটুকু জখমে কিচ্ছু হয় না মানুষের। ওঠো বলছি! নইলে বাকি চোখটাও গেলে দেব।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল গ্যারেট। আহত চোখটা চেপে ধরে থাকল দু'হাতে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?'

'আমার ধারণা সেটা তুমি খুব ভাল করেই জানো। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি কোথায়?'

'বলে দিলেই তুমি আমাকে খুন করবে!'

'না বললে আরও খারাপ দশা করব।'

ঠোঁট কামড়াল গ্যারেট। কী করবে বুঝতে পারছে না। তাকে রেহাই দেবার জন্যই বুঝি দূর থেকে কথা বলে উঠল রেমি। ক্যামেরায় স্বর্ণমূর্তির ভিডিও করছিল ও।

'মাই গড!' নিখাদ বিস্ময় বেরুল ওর মুখ দিয়ে।

গ্যারেটের উপর থেকে চোখ ফেরাল না রানা, পিস্তলও সরাল

না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'প্যাডেস্টালের লেখাগুলো পড়তে পারছি আমি, রানা,' বলল রেমি। 'এখানে রাজা মাইডাসের পুরো কাহিনি লিখে রাখা হয়েছে! জীবনবৃত্তান্ত, সোনালি স্পর্শ... স-অ-ব! ইটস্ আনবিলিভেবল, রানা। মূর্তিটা সত্যিই তাঁর মেয়ে!'

'মেয়ের আদলে মূর্তি বানিয়েছে বলছ?'

'মেয়ের আদলে মূর্তি নয়, রানা। মূর্তিটাই তাঁর মেয়ে! এখানে লিখেছে, রোগে ভুগে অকালে মারা গিয়েছিল রাজকন্যা; রাজা মাইডাস তখন লাশটাকে নিজের স্পর্শ দিয়ে সোনায় পরিণত করেন—অনন্তকাল সংরক্ষণের জন্য!'

কৌতূহল আর দমাতে পারল না রানা। পিস্তলটা গ্যারেটের দিকে তাক করে রেখেই একটু পিছিয়ে এল, যাতে ভালমত দেখতে পায় মূর্তিটা। মায়া কিংবা গ্যারেট বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই ওটা আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। অল্পবয়েসী এক কিশোরীর মূর্তি—নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় ফুটে আছে বেদনার ছাপ। পরনে একটা আলখাল্লা, সেটাও সম্পূর্ণ সোনায় গড়া। ডান হাতটা কবজি থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।

'সবকিছু ডকুমেন্ট করো,' রেমিকে বলল ও। 'চেম্বার, মূর্তি, কফিন... সব।'

'এদিককার ভিডিও করে ফেলেছি,' জানাল রেমি। 'এখন কি তা হলে কফিনের ছবি তুলতে যাব?'

'একা যেয়ো না, জায়গাটা রিস্কি। আমিও যাব।' গ্যারেটকে পিস্তলের ইশারা করল রানা। 'তুমিও চলো। এক নজর দেখে নাও তোমার স্বপ্নের রাজাকে। তারপর একসঙ্গে বসে খোশগল্প করব আমরা।' বন্দিকে চোখের সামনে রাখাই ওর আসল উদ্দেশ্য।

দু'হাত বাঁধা থাকায় উঠে দাঁড়াতে বেশ কষ্টই হলো

গ্যারেটের, কিন্তু কোনও সাহায্য পেল না রানা বা রেমির কাছ থেকে। তাকে সামনে রেখে কফিনের টেরাসের দিকে এগোল ওরা। উপরে ওঠার সিঁড়িটার কাছে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল, গায়ের পোশাক পচে-গলে ফালি ফালি হয়ে গেছে। খুলির একটা অংশ ফাটা।

মায়ার মুখে শোনা গল্পটা মনে পড়ে গেল রানার। দু'জন ড্রাগ ডিলার ধাওয়া করেছিল ওকে আর গ্যারেটকে। পার্টনারের হাতে খুন হয়েছিল প্রথমজন—মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়েছিল তার। এ নিশ্চয়ই সেই লোকটার কঙ্কাল। নিশ্চিত হবার জন্য গ্যারেটকে জিজ্ঞেস করতেই সায় পাওয়া গেল।

'দ্বিতীয়জন কোথায়?' প্রশ্ন করল রানা।

হাত তুলে হট পুলটা দেখাল গ্যারেট। কিনারে গিয়ে উঁকি দিল রানা আর রেমি। টগবগ করতে থাকা পানির মাঝ দিয়ে দেখতে পেল দেহটা—মাইডাসের মেয়ের মত নিখুঁত আরেকটা স্বর্ণমূর্তি... পড়ে আছে পুলের তলায়।

'উপরের লোকটাও সোনা হলো না কেন?' একটু বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল রেমি।

'কারণ মাইডাসের স্পর্শ পায়নি ও, পুলের পানিতেও ভেজেনি ওর শরীর,' বলল রানা। 'বরং এখানকার টেম্পারেচারের কারণে লাশটা পচে গেছে খুব দ্রুত।'

'তা হলে দেয়ালগুলো কীভাবে সোনায় পরিণত হলো?'

'খুব সহজ,' বলে উঠল গ্যারেট। 'মরার আগে সবখানে হাতের স্পর্শ লাগিয়েছিল রাজা মাইডাস, তারপর পুলের পানি স্প্রে করেছিল।'

ব্যাখ্যাটা একেবারে অপছন্দ হলো না রানার। বলল, 'বোধহয় ঠিকই আন্দাজ করেছ। খুব শীঘ্রি এর প্রমাণ পাব আমরা। চলো।'

সিঁড়ি ধরে টেরাসে উঠে এল তিনজনে। গ্যারেটকে দেয়ালের

কাছাকাছি পাঠিয়ে দিল রানা, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল।

'হাতদুটো উপরে তুলে রেখো,' যোগ করল ও। 'সাবধান করে দিচ্ছি, উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখলেই আমি গুলি চালাব।'

বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশটা মেনে নিল গ্যারেট। বসে পড়ল নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। বাম চোখটা পুরোপুরি বুজে গেছে তার, রেমির খামচিতে রক্তাক্ত চেহারাটা বীভৎস দেখাচ্ছে। হাবভাবে মনে হলো পরাজয় মেনে নিয়েছে।

কফিনের দিকে এবার মনোযোগ দিল রানা। টেরাসের কিনারে, তিনফুট উঁচু একটা সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মের উপর রাখা হয়েছে ওটা। তলায় টগবগ করছে হট পুলের গরম পানি। ডালায় হাত বোলাল ও, স্পর্শটা কেমন যেন অন্যরকম লাগল। একটু চাপ দিল রানা—অবাক ব্যাপার, নিরেট সোনা যতটা শক্ত হওয়া উচিত, তা নয়! বরং চাপ খাওয়া অংশটা যেন একটু দেবে গেল! পকেট নাইফ বের করে খুঁচিয়ে দেখল জায়গাটা। সোনা সরে গিয়ে বেরিয়ে এল বিবর্ণ কাঠ! কফিনটা আসলে নিরেট সোনায় গড়া নয়, স্রেফ সোনার প্রলেপ মাখা!

'কী হয়েছে?' কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল রেমি।

জবাব না দিয়ে সোনার খানিকটা পরত চেঁছে নিল রানা। পরীক্ষা করল ওটা। গলানো সোনার প্রলেপ নয় ওটা, এক ধরনের শ্যাওলা... সোনায় রূপান্তরিত শ্যাওলা। প্রবেশপথের দেয়ালে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে সোনার বিস্তার, সেখানেও একই রকম শ্যাওলা দেখেছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে এবার রেমির দিকে তাকাল ও। বলল, 'মাইডাস টাচের একটা বড় খুঁত আবিষ্কার করেছি। জড় পদার্থকে সোনা বানাতে পারে না ওটা। পারে শুধু জৈব কোষকে। এই দেখো, কফিনের উপরে শ্যাওলার প্রলেপ দিয়ে তারপর সোনা বানানো হয়েছে।'

'তারমানে গুহার দেয়াল, মেঝে বা ওই প্যাডেস্টাল... কোনোটাই সোনার তৈরি নয়?' বিভ্রান্ত দেখাল রেমিকে।

'উঁহুঁ। সবখানে একই কাজ করা হয়েছে,' বলল রানা। 'মায়া আর গ্যারেট খামোকাই এত কষ্ট করেছে চেম্বারটা আবিষ্কারের জন্য। এখানে সত্যিকার সোনার স্টক বলতে আছে শুধু ওই রাজকন্যা আর ড্রাগ ডিলারের লাশ।' গ্যারেটের দিকে তাকাল ও। 'হিসেবে মস্ত ভুল করেছ তোমরা।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল গ্যারেট। 'এখানে মাইডাস টাচ আছে। ওটাই আসল। ওটা হাতে পেলে সোনা বানাবার মত জীব-জন্তু বা উদ্ভিদের অভাব হবে না।'

'ব্যাপারটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখা দরকার,' বলল রেমি।

'অবশ্যই!' গ্যারেটের ব্যাকপ্যাক থেকে রাবারের গ্লাভগুলো বের করে নিল রানা। একজোড়া বাড়িয়ে ধরল রেমির দিকে। 'সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদের, যাতে পুলের তলার লোকটার মত পরিণতি না হয়।'

গ্লাভ পরে ফেলল ওরা। এরপর কফিনের ডালাটা তুলে ফেলল রানা। উঁকি দিল ভিতরে।

শুকিয়ে মমি হয়ে যাওয়া একটা লাশ শুয়ে আছে কফিনে। হাড়ের উপর লেপ্টে গেছে চামড়া, বেরিয়ে আছে দাঁতের সারি। ভয় জাগানো চেহারা। পরনে পুরনো আমলের রেশমি রাজপোশাক, কালের প্রবাহে রঙ হারিয়েছে। মাথায় রয়েছে দামি পাথর বসানো একটা স্বর্ণের রাজমুকুট। বাম হাতটা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে বুকের উপর, কিন্তু ডান হাতটা অবহেলায় পড়ে আছে একপাশে। কেন, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। লাশের দু'হাতের আঙুলেই রয়েছে বহুমূল্য অনেকগুলো আংটি। পুলের তলার লোকটা নিশ্চয়ই আংটিগুলো খুলে নেবার চেষ্টা করছিল,

কিন্তু তার আগেই রাজার হাতের সঙ্গে নিজের হাতের ছোঁয়া লেগে যায় তার। আক্রান্ত হয় আর্কেয়া মাইক্রোবে।

'আছে? রাজা মাইডাস কি আছে কফিনে?' সাগ্রহে জানতে চাইল গ্যারেট।

মুখ ঘোরাল রানা। 'হ্যাঁ। সশরীরে এবং বহাল তবিয়তে।'

'লোকটার অধ্যাবসায় এবং একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারছি না,' বলল রেমি। 'পুরো গুহার সারফেসে শ্যাওলা গজানো, তারপর আবার সেগুলোকে সোনায় পরিণত করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক সময় লেগেছে। লোক লাগিয়ে এসব করাতে পারেনি, নিজেকেই করতে হয়েছে সব। ডিটারমিনেশন বোধহয় একেই বলে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রানা। 'মৃত্যুর কথাই ভাবতে চায় না লোকে, অথচ রাজা মাইডাস নিজের শেষ নিদ্রার জায়গা নিজ হাতে তৈরি করেছেন! মারা যাওয়ার পর কীভাবে তাঁকে এখানে রাখতে হবে, সেটাও নিশ্চয়ই বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি, কোনও সন্দেহ নেই।'

কিছুটা সময়ের জন্য নীরব হয়ে গেল সবাই।

একটু পর গলা খাঁকারি দিল রানা। 'পরীক্ষাটা করে ফেলা যাক, কী বলো?'

ব্যাগ থেকে পানির বোতলদুটো বের করল ও। স্যাম্পল হিসেবে জৈব কোষ প্রয়োজন, গুহার ভিতরে চোখ বোলাতেই পেয়ে গেল তা। টেরাস থেকে নেমে কঙ্কালের গায়ে লেগে থাকা কাপড়ের দুটো টুকরো ছিঁড়ে নিল ও। ব্যাকটেরিয়া-সহ লাশের উচ্ছিষ্ট রয়েছে ওতে।

উপরে ফিরে এসে কফিনের ভিতরে ঝুঁকল রানা। মাইডাসের হাতে ভাল করে ঘষল কাপড়দুটো। রেমি ইতিমধ্যে পানির বোতলদুটো খুলে ফেলেছে, একটা বোতল হাতে নিল ও।

'ক্যামেরা অন্ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। রানার দিকে ক্যামেরা তাক করে রেখেছে ও।

'তা হলে শুরু করা যাক।'

একে একে বোতলদুটোর পানিতে কাপড় ভেজাল ও। প্রথম কয়েক মিনিট কিছুই ঘটল না, তারপরেই ধীরে ধীরে রঙ বদলাতে শুরু করল ওগুলো। সারফেসে গুটি গুটি হয়ে পড়তে শুরু করল সোনালি পরত। সি-ওয়াটারের চেয়ে অ্যাসিডিক মিকচারের কাপড়টা বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—কারণ ওটায় দ্রবীভূত সোনার পরিমাণ বেশি। খানিক পরেই দুটো টুকরোই পুরোপুরি সোনালি হয়ে গেল।

'মাই গড!' ফিসফিসিয়ে বলল রেমি। 'ইটস্ ওয়ার্কিং, রানা!'

'অবিশ্বাস্য!' বলল রানা। আর কোনও শব্দ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

টুকরোদুটো বোতল থেকে বের করে নিল ও। প্লাস্টিকের কন্টেইনারে ঢোকাল। ফিরে গিয়ে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষকে দেখাবে।

রেমি বলল, 'মাইডাসের শরীর থেকেও একটা স্যাম্পল নিয়ে যাওয়া দরকার। বলা তো যায় না... এখানে যদি আর ফিরতে না পারি?'

'কী স্যাম্পল নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা হাত নিলে কেমন হয়?'

'লাশটা বিকৃত করবে?'

'বিকৃত হবার কিছু নেই। শুকনো লাশ, কবজির জয়েন্ট থেকে একটা হাত খুলে নিতে অসুবিধে হবে না। পরে যখন পুরো লাশটা উদ্ধার করা হবে, তখন আবার জোড়া দেয়া যাবে হাতটা।'

আপত্তির কিছু দেখল না রানা। শুধু কাপড়ের টুকরো দেখলে

মাইডাস টাচের কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। একটা হাত থাকলে সুবিধে হয়। মাথা ঝাঁকিয়ে কফিনের দিকে আবার এগিয়ে গেল ও। সাবধানে জয়েন্ট থেকে ছাড়িয়ে নিল রাজা মাইডাসের ডান হাত। কাপড়ের টুকরোদুটোর সঙ্গে ওটাও ঢুকিয়ে ফেলল কন্টেইনারে। এরপর হাতের গ্লাভ খুলে ফেলল, তারপর আটকাল কন্টেইনারের ঢাকনা।

পুরো জিনিসটা হাতে নিয়ে গ্যারেটকে দেখাল ও। বলল, 'এর জন্যেই এসেছিলে তুমি, তাই না? এত কাছে পৌঁছেও ব্যর্থ হয়েছ... ভাবতে কেমন লাগছে?'

'এখনও ব্যর্থ হইনি আমি,' নিরাসক্ত গলায় বলল গ্যারেট। 'তুরুপের তাস এখনও আমার হাতে—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি। ওদের খোঁজ দেবার বিনিময়ে কন্টেইনারটা আদায় করে নেব আমি।'

'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ তুমি, গ্যারেট। ওদের খোঁজ তুমি এমনিতেই দেবে—কোনও কিছু ছাড়াই। নইলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না এখান থেকে।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল গ্যারেট। 'বড্ড ভুল করলে আমার প্রস্তাব মেনে না নিয়ে। এখন আর রাজি হবারও উপায় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তা-ই? কেন?'

মুচকি হেসে পিছনদিকে ইশারা করল গ্যারেট। ওদিকে তাকাতেই চমকে উঠল রানা। এন্ট্রান্সের ব্যালকনিতে অস্ত্রহাতে উদয় হয়েছে মায়া লরেঞ্জো।

গর্জে উঠল তার হাতের সাবমেশিনগান!

পঁচিশ

রেমিকে জাপটে ধরে ডাইভ দিল রানা, সরে গেল মেশিনগানের অঝোর বর্ষণের সামনে থেকে। আশ্রয় নিল মাইডাসের কফিনের পিছনে। লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে টেরাসের মেঝে আর পিছনের দেয়ালে মাথা কুটল বুলেটের ধারা। গ্যারেটও সটান শুয়ে পড়েছে, তবে তার দিকে গুলি করা হয়নি। ধুরন্ধর ভাইটিকে জ্যান্ত কবজা করতে চায় মায়া, দিতে চায় ভয়ঙ্কর শাস্তি। গুলি খেয়ে মরলে মৃত্যুটা বড্ড আরামের হয়ে যায় তার জন্য।

রানার হাতে চলে এসেছে গ্যারেটের পিস্তল। কিন্তু পাল্টা গুলি ছুঁড়তে গিয়ে নিরস্ত করল নিজেকে। কফিনের পিছন থেকে মাথা বের করতেই দেখতে পেয়েছে মুরল্যাণ্ডকে। তাকে মানব-ঢাল বানিয়ে মায়ার পিছু পিছু ব্যালকনিতে উদয় হয়েছে টমি। গুলি করলে মুরল্যাণ্ডের গায়ে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়বার পর ক্ষান্ত দিল মায়া। চোখ বোলাল গুহার অভ্যন্তরে। বহু বছর আগে যেমন দেখেছিল, ঠিক তেমনই আছে সমাধিটা—কিশোরী মূর্তির গোড়ায় পড়ে থাকা মুণ্ডুহীন লাশটা বাদ দিলে আর কী।

গ্যারেট বুঝতে পেরেছে, এখুনি তাকে খুন করা হবে না। তাই সাহস করে আবার উঠে বসেছে সে, হাত নাড়ল মায়ার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তার ক্ষত-বিক্ষত মুখ, আর হাতদুটো বাঁধা

দেখে হাসি ফুটল মাফিয়া নেত্রীর ঠোঁটে।

'ব্রাভো, রানা!' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'চেম্বারটা তো খুঁজে বের করেছই, গ্যারেটকেও দেখছি আটকে ফেলেছ। আমার কাজটা সহজ করে দেয়ায় ধন্যবাদ।'

'সেজন্যেই বুঝি বুলেট উপহার দিচ্ছ?' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল রানা।

'অবাক হচ্ছ? গত কয়েকদিনে আমাকে যে-পরিমাণ ভুগিয়েছ, তাতে আর কিছু আশা করেছিলে?'

'যদি বলি, ওসবের কোনও কিছুই আমরা স্বেচ্ছায় করিনি? গ্যারেট আমাদেরকে বাধ্য করেছিল?'

'জানি। ববি আমাকে বলেছে। কিন্তু দুঃখিত, এখানকার গুপ্তধন কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি নই আমি। তা ছাড়া তোমরা বড্ড নীতিপরায়ণ। এখান থেকে বেরুতে দিলেই সোজা চলে যাবে ইটালিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে। ওদেরকে জানিয়ে দেবে গোল্ডেন চেম্বারের খবর। আমি তা হতে দিতে পারি না।'

'ধরে নিচ্ছি মত পাল্টানোর কোনও সম্ভাবনা নেই তোমার?'

'কারেক্ট, রানা। মরতে হবে তোমাদের সবাইকে।'

'অযথা খুনোখুনি করে কোনও লাভ নেই, মায়া,' বলে উঠল গ্যারেট। 'এখান থেকে যা পাবে বলে আশা করছ, তার কিছুই আসলে নেই।'

মুখ বাঁকাল মায়া। 'আমার চাহিদা অল্প,' বাঁকা সুরে বলল সে। 'দু'চার বিলিয়ন ডলারের সোনা পেলেই আমি খুশি।'

'বিলিয়ন নয়, মিলিয়নে হিসাব করতে হবে তোমাকে।'

'ফাজলামি করছ? এত সোনা... তার দাম এত কম?'

'আমি সিরিয়াস। বিশ্বাস না হলে আশপাশের কোনও একটা দেয়াল খুঁচিয়ে দেখো। সোনা দিয়ে গড়া হয়নি এই সমাধি, সোনার প্রলেপ মাখানো হয়েছে। তার পরিমাণ খুব বেশি নয়।'

ভুরু কুঁচকে গেল মায়ার। ঘাড় ফেরাল টমির দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল ইটালিয়ান গুণ্ডা, কী বলবে ভেবে পেল না। অগত্যা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল মায়া। মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে খোঁচা লাগাল দেয়ালের গায়ে।

'ববি,' সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার ওয়ার্নিংটা বুঝতে পেরেছিলাম। তবে মায়ার তিন সাগরেদ তার আগেই পটল তুলেছে গ্যারেটের বোমায়। এখন এই অকাল কুষ্মাণ্ড টমি ছাড়া আর কেউ নেই ওর সঙ্গে।'

'চোপ!' গর্জে উঠল টমি।

তবে ততক্ষণে কাজ হয়ে গেছে মুরল্যাণ্ডের। রানাকে জানিয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষের সংখ্যা। আশার আলো দেখতে পেল রানা। মাত্র দু'জন শত্রু... একটু কৌশল খাটাতে পারলে ওদেরকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু কী সেই কৌশল?

দেয়াল দেখা হয়ে গেছে মায়ার। থমথমে চেহারা নিয়ে ফিরে এল ব্যালকনির কিনারায়। গ্যারেট বলল, 'প্রমাণ পেলে আমার কথার?'

'তাতে কোনও সমস্যা নেই,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল মায়া। 'মূর্তিটা তো নিরেট সোনার তৈরি।'

'কতই বা ওজন হবে ওটার? দুইশ' পাউণ্ড? তিনশো পাউণ্ড?' হাসল গ্যারেট। 'ওটা বেচে বড়জোর বিশ মিলিয়ন ইউরো পাবে তুমি। তাতে এই অপারেশনের খরচও উঠবে না।

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল মায়া। গ্যারেট ভুল বলেনি। লণ্ডনের অকশন থেকে মোমফলক, সেই সঙ্গে নেপলসে হেলথ মিনিস্ট্রির বিল্ডিং কেনা বাবদ প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে ওর। এ ছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাপাতি তো আছেই। লাগামছাড়া ব্যয় করেছে ও, ভেবেছিল গোল্ডেন চেম্বার খুঁজে পেলে সব

সুদে-আসলে পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। কিছু তো পাচ্ছেই না, বরং খরচগুলো গলার ফাঁস হতে চলেছে। এমনিতেই যথেষ্ট টানাটানির মধ্যে ছিল ও, এবার পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে মোড় নেবে।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, মায়া,' বলল গ্যারেট। 'আফটার অল, তুমি আমার আত্মীয়... ছোটবেলার বন্ধু! যদি শত্রুতা ভুলে গিয়ে হাত মেলাও, তা হলে তোমার যত টাকা দরকার সব আমি দেব।'

'কোত্থেকে দেবে? এখানে তো সোনা নেই।'

'সোনা নেই, কিন্তু মাইডাস টাচ আছে। ওটা দিয়ে যত খুশি সোনা বানানো সম্ভব।'

'তা হলে আর হাত মেলাব কেন? তোমাদেরকে খুন করে আমিই ওটা নিয়ে নিতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে মস্ত ভুল করবে। সোনা শুধু তৈরি করলেই চলবে না, বিক্রিও করতে হবে। আর হঠাৎ করে যদি বিপুল পরিমাণ সোনা বাজারে ছাড়ো, সোনার দাম পড়ে যাবে।'

'সেটা কি তোমার বেলায় ঘটবে না?'

'না। কারণ একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছি আমি। সোনার দাম তো কমবেই না, বরং চাহিদা আরও বাড়বে। দামও হাঁকতে পারব আমি যত খুশি। কিন্তু আমাকে যদি খুন করো, প্ল্যানটা জানতে পারবে না তুমি। তারচেয়ে হাত মেলাও... যোগ দাও আমার সঙ্গে।'

পরামর্শের আশায় টমির দিকে তাকাল মায়া। সে বলল, 'ওর কথায় যুক্তি আছে, বস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সোজা হলো মায়া। 'ঠিক আছে, গ্যারেট। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

গ্যারেট তার জবাব দেবার আগেই রানা চড়া গলায় বলল,

'একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, মায়া। মাইডাস টাচ এ-মুহূর্তে গ্যারেটের কবজায় নেই, রয়েছে আমার হাতে। তোমাদের এই চুক্তির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি আমি। কফিনটা কোথায়, তা দেখেছ? আমি ধাক্কা দিলেই ওটা পড়ে যাবে হট পুলে। ফুটন্ত পানিতে নষ্ট হয়ে যাবে রাজা মাইডাসের লাশ। সোনা তো দূরের কথা, এক আউন্স ধুলোও তখন বানাতে পারবে না তোমরা।'

'ওই কাজ করে দেখো,' গর্জে উঠল মায়া, 'তোমার বন্ধু ববি সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে। তোমরাও বাঁচবে না।'

'এমনিতেও আমাদের খুনই করতে চাইছ তুমি। কাজেই ওসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই।'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'চুক্তিতে আমাদেরকেও শামিল করে নাও। বড়লোক হতে আপত্তি নেই আমাদের।'

'তুমি? মাসুদ রানা? আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছ? বিশ্বাস করি না!'

'বিশ্বাস না করলে সব হারাবে। হয় রাজি হও, নয় দিলাম আমি ধাক্কা!' হুমকিটা বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য কফিনের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল রানা। নড়ে উঠল ওটা।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল মায়া। 'ঠিক আছে, রানা। তোমাদেরকেও সঙ্গে নেব আমরা। কিন্তু মাইডাস টাচ যে সত্যিই কাজ করে, তার প্রমাণ দেখতে চাই।'

'বেশ। নীচে নেমে এসো... নিরস্ত্র অবস্থায়। রেমি তোমার কাছে স্যাম্পলটা নিয়ে যাবে। খবরদার, কোনও চালাকি করতে যেয়ো না। তা হলে গ্যারেটকে খুন করব আমি, কফিনটা ঠেলে ফেলে দেব পানিতে। তখন কেউ কিছুই পাবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি। ঠিক আছে, আসছি আমি। কিন্তু তোমাদেরকেও সতর্ক করে দিচ্ছি—মনের ভিতরে কোনও কুমতলব থাকলে সেটা ঝেড়ে ফেলো। নইলে একে একে তোমাদের সবাইকে খুন করব আমি।'

'গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মত একই হুমকি বার বার দেবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্তে চলে এসো।'

সাবমেশিনগান নামিয়ে ফেলল মায়া, ঠেস দিয়ে রাখল দেয়ালের সঙ্গে। নীচে রওনা হবার আগে টমির সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো তার। বুঝিয়ে দিল, রানার কথামত কাজ করবার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রথম সুযোগেই যেন খুন করে বেয়াদব বাঙালি ও তার সঙ্গীদের। ইশারা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল টমি।

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল মায়া। রেমিও প্লাস্টিকের কন্টেইনার হাতে বেরিয়ে এল কফিনের পিছন থেকে। অস্ত্র তাক করে ওদেরকে কাভার দিচ্ছে টমি আর রানা। হট পুলের পাশে মিলিত হলো দু'জনে।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল মায়া।

'মাইডাসের হাত,' বলল রেমি। 'যে-জিনিস সোনায় পরিণত করতে চাও, তা ওটার সঙ্গে ঘষে হট পুলের পানিতে ভেজাতে হবে। আর হ্যাঁ, স্যাম্পলটা জড় পদার্থ হলে চলবে না। জৈব কোষ থাকতে হবে ওতে।'

'অমন স্যাম্পল কোথায় পাব?'

কঙ্কালের দিকে ইঙ্গিত করল রেমি। 'আমরা ওখান থেকে দু'টুকরো কাপড় নিয়ে পরীক্ষা করেছি।'

'হুম। কন্টেইনার নামিয়ে রাখো,' বলল মায়া। 'তারপর পিছিয়ে যাও।'

নির্দেশ পালন করল রেমি। মেঝেতে কন্টেইনার রেখে

পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'গ্লাভদুটোও দাও ওকে,' টেরাসের উপর থেকে বলল রানা। 'খালি হাতে টেস্ট করতে গেলে নিজেই সোনা হয়ে যাবে।'

নিজের গ্লাভদুটো কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছিল রেমি, সাবধানে সেখান থেকে খুলে কন্টেইনারের উপরে নামিয়ে রাখল। তারপর পিছিয়ে গেল আবার। অস্থির হয়ে উঠেছে মায়া, সতর্কতার ধার ধারল না। রেমি পিছিয়ে যেতেই ছোঁ মেরে তুলে নিল গ্লাভজোড়া, পরে ফেলল হাতে। কন্টেইনারটা তুলবার জন্য ঝুঁকতে গিয়েই থমকে গেল সে, দু'হাতের আঙুলে জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে। ঝট্ করে রেমির দিকে তাকাল, মেয়েটার চেহারা দেখে বুঝে ফেলল, ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাকে!

মায়ার অস্থিরতাকেই কাজে লাগিয়েছে রানা। নীচে আসার আগে রেমির গ্লাভজোড়ার ডগা ঘষে দিয়েছে মাইডাসের বিচ্ছিন্ন হাতে। কন্টেইনারের উপরে গ্লাভজোড়া নামিয়ে রাখার সময় ওই জায়গাটা স্পর্শ করেনি রেমি, কিন্তু সেগুলো পরবার সময় তাড়াহুড়োয় গ্লাভের সবখানেই হাত লাগিয়ে ফেলেছে মায়া। আক্রান্ত হয়েছে মাইক্রোবের ইনফেকশনে।

ত্রস্ত ভঙ্গিতে গ্লাভজোড়া খুলে ফেলল ও, ভয়ার্ত চোখে তাকাল নিজের হাতের দিকে। হাতের তালু আর উল্টোপিঠের চামড়া লাল হতে শুরু করেছে, অসহ্য জ্বলুনি সেখানে। দাঁতে দাঁত পিষে রেমির দিকে তাকাল মায়া। গাল দিয়ে উঠল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

'কী হয়েছে, বস?' ব্যালকনি থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল টমি।

'খুন করো!' চিৎকার করল মায়া। 'খুন করো সবাইকে!'

রেমির দিকে ঘুরে গেল টমির সাবমেশিনগানের ব্যারেল। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। ট্রিগার চাপল টমি, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটগুলো চলে গেল ছাতের দিকে। শুরু হলো

হাতাহাতি লড়াই।

মুরল্যাণ্ডের ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা বসাল টমি, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ওকে। কিন্তু দু'পা পিছিয়েই নিজেকে সামলে নিল মুরল্যাণ্ড। টমি তার সাবমেশিনগান সিধে করবার আগেই ডাইভ দিল ও। ওর চওড়া কাঁধের ডানদিক দড়াম করে আঘাত হানল ইটালিয়ান গুণ্ডার পেটে। ভুশ্ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল টমির হাঁ করা মুখ থেকে। কুঁজো হয়ে গেল সে। সোজা হয়ে তার চোয়ালে হাঁটু চালাল মুরল্যাণ্ড, পরক্ষণে একটা কারাতে চপ বসাল হাতের কবজিতে। টমির হাত থেকে খসে পড়ল সাবমেশিনগান। লাথি মেরে অস্ত্রটা সিঁড়ির দিকে পাঠিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড। সিঁড়ির ধাপের সঙ্গে খটমট শব্দ তুলে নীচে রওনা হয়ে গেল ওটা।

অস্ত্র হারিয়ে মনে হলো খেপে গেছে টমি। ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ডের উপর, ঘুসি মারল ওর তলপেটে। সর্বশক্তিতে মেরেছে, দম আটকে এল মুরল্যাণ্ডের। আঘাত সামলে নেবার আগেই দ্বিতীয় ঘুসিটা খেলো পাঁজরের ডানপাশে। ছিটকে গিয়ে রেলিঙের সঙ্গে বাড়ি খেলো ও। পড়েই যাচ্ছিল, রেলিং খামচে ধরে ঠেকাল নিজেকে। আর তখুনি তৃতীয় ঘুসিটা ছুটে আসতে দেখল মুখ লক্ষ্য করে। মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল ও, পুরোপুরি সফল হলো না। কপালের একপাশে লাগল ঘুসি, বোঁ করে উঠল মাথা। তাই বলে পরাস্ত হলো না মুরল্যাণ্ড, ঘুসি খেয়েই ঘুরতে শুরু করল, ওই অবস্থায় ধরে ফেলল টমির হাত। পুরোপুরি যখন ঘুরে গেল তখন হাতটা চলে এসেছে ওর কাঁধের উপরে, টমিও চলে এসেছে ওর পিঠে। শরীরটা সামনে বাঁকিয়ে হালকা একটা টান দিতেই পুরোপুরি শূন্যে উঠে গেল ইটালিয়ান গুণ্ডা। রেলিঙের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলল মুরল্যাণ্ড।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল টমি, কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল

সেই আর্তনাদ। রেলিঙের উপর ঘাড় দিয়ে পড়েছে সে। মড়াৎ করে একটা শব্দ হলো, বেমক্কাভাবে হেলে গেল মাথাটা। ঘাড় ভেঙে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ধপাস করে রেলিঙের গোড়ায় আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা হলো মুরল্যাণ্ড। নীচে মায়ার সঙ্গে গোলাগুলি চলছে রানার। ওর সাহায্য প্রয়োজন। মায়া তার সাবমেশিনগানটা প্রবেশপথের পাশে ঠেস দিয়ে রেখে গেছে, ওটা কুড়িয়ে নিল ও, সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে গেল নীচে।

রেমি ইতিমধ্যে টেরাসের সিঁড়ি ধরে রানার দিকে ছুট লাগিয়েছে। জ্যাকেটের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করল মায়া, গুলি করবার চেষ্টা করল ওকে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল রানার পিস্তল। মাটিতে ঝাঁপ দিল মায়া, ক্রল করে চলে গেল রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তির পিছনে। ওখান থেকে গুলি করল রানার উদ্দেশে।

টেরাসের উপরে পৌঁছে গেছে রেমি, এক টানে ওকে কফিনের পিছনে নিয়ে এল রানা। 'মাথা নামিয়ে রাখো!' বলল ও।

বাধ্য মেয়ের মত মেঝেতে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল রেমি। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, কোনোকিছু দেখতে চাইছে না আর। কানের উপর চলছে রানা আর মায়ার গুলি বিনিময়ের অত্যাচার। হঠাৎ সচকিত হলো ও। পায়ের কাছে নড়ে উঠেছে কী যেন। চোখ খুলে ঘাড় ফেরাল, চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গোলমালের সুযোগ নিয়েছে গ্যারেট, রুক্ষ দেয়ালের গায়ে ঘষাঘষি করে ছিঁড়ে ফেলেছে হাতের বাঁধন, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে ওদের পিছনে। রেমি চোখ খুলতেই ঝাঁপ দিল।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল রেমি, তবে দেরি করে ফেলেছে ও।

প্রতিক্রিয়া দেখাবার আগেই রানার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল গ্যারেট। সামনের দিকে হুমড়ি খেলো রানা। প্রতিরোধ গড়বার আগেই ওর চুল মুঠো করে ধরল গ্যারেট, কপালটা সজোরে ঠুকে দিল কফিনের সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মের গায়ে। চোখের সামনে লাল-নীল তারা দেখল রানা, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য চলৎশক্তি হারাল। সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে ওর কোমর থেকে দ্বিতীয় পিস্তলটা তুলে নিল গ্যারেট। তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড এক থাবড়া খেলো রেমি, ছিটকে পড়ল একপাশে।

পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। পিস্তল খাড়া করে এক রাউণ্ড ফাঁকা গুলি করল, তারপর অস্ত্রটা তাক করল রানার দিকে। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা আর অস্ত্রহাতে তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। থমথমে গলায় নির্দেশ দিল, 'আর্মস্ ফেলে দাও, রানা।'

কপালের উপরে একটা আলু গজাতে শুরু করেছে রানার। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল ও। পিস্তল ছুঁড়ে দিল গ্যারেটের পায়ের কাছে। ওটা কুড়িয়ে নিল গ্যারেট। গলা চড়িয়ে বলল, 'গোলাগুলি বন্ধ করো, মায়া। রানা এখন আমার কবজায়।'

কয়েক মুহূর্ত কোনও জবাব পাওয়া গেল না। অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণায় কথা বলার শক্তি হারিয়েছে মায়া, মনে হচ্ছে যেন শরীরের শিরা-উপশিরায় উত্তপ্ত, তরল লাভা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ডান হাতটা ইতিমধ্যে পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে। বাম হাতে কোনোমতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে স্রেফ আক্রোশের বশে। রানাকে খুন করতে চায় ও!

'মায়া!' একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকল গ্যারেট। 'শুনতে পাচ্ছ? রানাকে আটক করেছি আমি।'

'খুব ভাল,' এবার কথা বলল মায়া। 'ওর খুলিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দাও আমার পক্ষ থেকে।'

'খবরদার, গ্যারেট!' সিঁড়ির গোড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'রানার কিছু হলে তুমি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে

পারবে না।' হাতের সাবমেশিনগান থেকে ফাঁকা একটা গুলি ছুঁড়ল ও।

উঁকি দিয়ে মুরল্যাণ্ডকে দেখল গ্যারেট। তারপর বলল, 'হুম! দেখা যাচ্ছে সুবিধা-অসুবিধার পাল্লা সবারই সমান।' গলা চড়াল, 'মায়া! মি. মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে কিছু করতে পারবে? তা হলে নিশ্চিন্তে রানাকে পরপারে পাঠাতে পারি।'

'দুঃখিত, গ্যারেট,' বলল মায়া। 'আমি মরতে বসেছি। কিচ্ছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গ্যারেট। মুরল্যাণ্ডের উদ্দেশে বলল, 'মি. মুরল্যাণ্ড, খামোকা খুনোখুনি করে কারও কোনও লাভ হবে না। তারচেয়ে এসো বন্ধু হয়ে যাই। তোমাদের সঙ্গে মাইডাস টাচ ভাগাভাগি করতে রাজি আছি আমি।'

'ছুঁচো জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনোকিছু ভাগাভাগি করি না আমরা,' সাফ সাফ জানিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

'আমাকে তা হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছ তুমি,' রাগী গলায় বলল গ্যারেট। ঝুঁকে মেঝে থেকে নিজের ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল সে, পিঠে ঝোলাল। তারপর হাত ঢোকাল কাটনারের ডাফল ব্যাগটার ভিতরে, বের করে আনল টাইমিং ডিভাইস-সহ বাইনারি এক্সপ্লোসিভের ক্যানিস্টারগুলো। 'এটা কী, তা কি তুমি জানো, রানা?'

'হ্যাঁ,' শান্তস্বরে বলল রানা। গ্যারেটের চালটা বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেছে।

'তা হলে এটা ফাটলে কী ঘটবে, তাও নিশ্চয়ই জানো?'

'পুরো গুহা ধসে পড়বে।'

'রাইট। এখন তা হলে ভেবে দেখো কী করবে। একটা কথা জেনে রেখো, আমি যদি এখান থেকে বেরুতে না পারি, তা হলে তোমরাও পারবে না। আমাদের সবার কবর হবে এখানে।'

'তোমাকে ঠেকাবার জন্য মরতে আপত্তি নেই আমার। ববিও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।'

'আর ড. হ্যাডলি?' রেমির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল গ্যারেট। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না ও মরবার জন্য প্রস্তুত। পারবে তুমি ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে?'

থমকে গেল রানা। ভুল বলেনি গ্যারেট, নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য রেমিকে মরতে দিতে পারবে না ও।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে মুখের হাসি বিস্তৃত হলো ধুরন্ধর লোকটার। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, রানা। যদি পারো তো ঠেকাও।'

সতর্ক পদক্ষেপে কফিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেট। পায়ে পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে।

'ওকে যেতে দাও, ববি,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ওর হাতে বোমা আছে।'

দ্বিধায় ভুগল মুরল্যাণ্ড। 'সত্যিই যেতে দিচ্ছ?'

'আপাতত আর কিছু করার নেই। ওর সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করব আমরা।'

হট পুলের সামনে একটু থামল গ্যারেট। ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলে নিল প্লাস্টিকের কন্টেইনারটা। তারপর আবার পা বাড়াল ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে একবার চোখ বোলাল স্বর্ণমূর্তির দিকে—প্যাডেস্টালের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে মায়ার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ, মেঝেতে শুয়ে আছে সে, শ্বাস ফেলছে কষ্টেসৃষ্টে। হাত-মুখের উন্মুক্ত চামড়ায় দেখা দিয়েছে লালচে ঘা।

গ্যারেটের ইশারায় সিঁড়ির কাছ থেকে সরে গেল মুরল্যাণ্ড, চলে এল চেম্বারের মাঝখানে। রানা আর রেমিও নেমে এসেছে টেরাস থেকে, মুরল্যাণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালকনিতে উঠে

গেল গ্যারেট, ঘুরে দাঁড়াল ওদের দিকে।

'সময়টা চমৎকার কাটল, বন্ধুরা,' গা জ্বালানো সুরে বলল সে। 'বিদায় নিতে একটু খারাপই লাগছে।'

'ইটস্ নট ওভার, গ্যারেট,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে এখনও হিসাব-নিকাশ শেষ হয়নি আমাদের।'

'হয়েছে, রানা,' বলল গ্যারেট। 'কারণ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি আজ বিকেলে মারা গেছে। তোমরাও মরবে খুব শীঘ্রি। ইউ সি... শত্রুর শেষ রাখি না আমি।'

'না!' বোনের মৃত্যুসংবাদ শুনে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

রানা আর ববিও থমকে গেছে। যাঁর জন্য এত বিপদ, এত ঝুঁকি আর এত বাধা পাড়ি দিল ওরা... যার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করল... তিনিই আর নেই? বুকের ভিতরে তোলপাড় অনুভব করল রানা, যেন আপন পিতাকে হারিয়েছে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। গ্যারেটকে এর মূল্য চুকাতে হবে। ও নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করাবে তাকে। ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও, যা ঘটে ঘটুক, আর পরোয়া করছে না।

কিন্তু কয়েক পা যেতেই উপর থেকে কী যেন উড়ে এসে পড়ল ওদের পিছনে। ঘাড় ফেরাতেই চমকে উঠল—বাইনারি এক্সপ্লোসিভের বোমা! টাইমার চালু করে নীচে ছুঁড়ে দিয়েছে গ্যারেট! ডিজিটাল ডিসপ্লে-তে জ্বলজ্বল করছে কাউন্টডাউন—দশ... নয়... আট...

'গেট ডাউন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রেমিকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিল মুরল্যাণ্ড। রানা ছোঁ মেরে তুলে নিল বোমাটা। ছুঁড়ে মারল হট পুলে। তারপর নিজেও ডাইভ দিল।

টুপ করে ফুটন্ত পানিতে ডুবে গেল বোমা, কয়েক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো। ভূমিকম্পের ঢেউ বয়ে গেল গোল্ডেন চেম্বারে।

কেঁপে উঠল মেঝে, দেয়াল আর ছাত-সহ সবকিছু। যেন আর্তনাদ করে উঠল সমাধির গোটা কাঠামো। কাত হয়ে আছড়ে পড়ল রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাতের একটা অংশ। মাথায় কীসের যেন আঘাত পেল রানা, তারপর সব ছেয়ে গেল অন্ধকারে।

ছাব্বিশ

জ্ঞান ফেরার পরে মাথার ভিতরটা শূন্য মনে হলো রানার। তাণ্ডব থেমে গেলেও কানের পর্দায় দামামা বাজছে ওর। কয়েক মুহূর্ত মনে করতে পারল না কোথায় আছে বা কী ঘটেছে। তারপরেই সচেতন হয়ে উঠল ও। মাথা তুলে তাকাল চারপাশে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এতকিছুর পরেও ব্যালকনিতে বসানো হ্যালোজেন ল্যাম্পদুটো জ্বলছে। পরিষ্কার দেখা গেল সবকিছু।

অসংখ্য ফাটল ধরেছে গুহার দেয়াল আর ছাতে। বেশ কিছু জায়গা ধসে পড়েছে; তবে কপাল ভাল, বড় কোনও পাথরখণ্ড আছড়ে পড়েনি ওর আশপাশে। ছোটখাট কিছু টুকরো ছিটকে এসেছে এদিকে, অমন একটা টুকরোর আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছে মেঝের। হট পুলের ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটায় শকওয়েভের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা গেছে মেঝের উপর দিয়ে। চৌচির হয়ে গেছে সোনালি প্রলেপ মাখানো সারফেস—কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও বা

ভেঙেচুরে দেবে গেছে নীচে।

গা ঝাড়া দিয়ে শরীরের উপর থেকে পাথর আর ধুলোবালি সরাল রানা, উঠে বসল। তাড়াতাড়ি বন্ধুদের খোঁজে নজর বোলাল আশপাশে। কয়েক গজ দূরেই পাওয়া গেল মুরল্যাণ্ড আর রেমিকে। দু'জনেই বেহুঁশ।

হামাগুড়ি দিয়ে রেমির কাছে গেল রানা। চিত করল ওকে। কপালের একপাশ রক্তে ভেজা রেমির। ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা—পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে গেছে। আঘাতটা কতখানি সিরিয়াস, বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি নিজের শার্ট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাল রানা, বেঁধে দিল রেমির কপাল।

আস্তে আস্তে চোখ মেলল রেমি। দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমরা বেঁচে আছি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ক্... কীভাবে...'

'কীভাবে বেঁচে গেলাম? বোমাটা হট পুলের ভিতরে ফেটেছে বলে। উপরে ফাটলে আমরা কিমা হয়ে যেতাম। গুহাটাও ধসে পড়ত মাথার উপরে। ব্যস, আর কথা বোলো না। তুমি আহত, বিশ্রাম নাও। আমি ববিকে দেখে আসছি।'

কাত হয়ে পড়ে আছে মুরল্যাণ্ড। তবে শরীরে বড় কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। পাশে বসে তার গালে চাপড় দিল রানা। 'ববি! ওঠো!'

আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে শরীর মোচড়াল মুরল্যাণ্ড। চোখ খুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'মরে গিয়েও তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই দেখছি! কোথায় বেহেশতি হুর-পরীরা ঘুম ভাঙাবে, তা না, এক ব্যাটা...'

হেসে ফেলল রানা। 'সরি, এখনও বেহেশতে পৌঁছাওনি। দুনিয়াতেই রয়ে গেছ। ওঠো।'

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল মুরল্যাণ্ড। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আওয়াজ কীসের?'

রানার শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ও-ও শুনতে পেল শব্দটা। পানির ছলাৎছল... ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মেঝের ফাটল দিয়ে দ্রুত বেগে উঠে আসছে গরম পানি। এতদিন হটপুলে জমা হতো, কিন্তু এখন উপরে পৌঁছাবার আরও রাস্তা খুলে যাওয়ায় উঠে এসে ভরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে গুহাটাকে।

'শিট!' বলে উঠল রানা। 'এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। কুইক!'

'কোথায়?'

পাথুরে টেরাসটাই কাছে, ওটার দিকে ইশারা করল রানা। তাড়াতাড়ি রেমিকে তুলে ফেলল পাঁজাকোলা করে। ছুট লাগাল মুরল্যাণ্ডের পিছু পিছু। সিঁড়ির গোড়ায় থই থই করছে পানি, ছপ ছপ করে পা ফেলে জায়গাটা পেরুল ওরা। পায়ের তলায় ফোঁসফোঁসানির আওয়াজ পেল রানা, সিঁড়ি ধরে টেরাসে ওঠার পরে তাকাল পায়ের দিকে। পুড়ে গলে যেতে শুরু করেছে জুতোর সোল। মুরল্যাণ্ডের জুতোরও একই অবস্থা।

'অ্যাসিড,' বলল রানা। 'পানিতে অ্যাসিডের পরিমাণ খুবই বেশি।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'খানিক পরে জুতোর দশা আমাদেরও হবে, দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। দ্রুত গুহার ভিতরটা ভরিয়ে দিচ্ছে অ্যাসিড মেশানো উত্তপ্ত পানি। টেরাস ডুবিয়ে দিতে খুব বেশি সময় নেবে না।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো রেমি। নীচে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। 'আমরা কি ডুবে যাব?'

'তার আগে পুড়ব,' তিক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, একটা বুদ্ধি বের করো। এভাবে মরতে আপত্তি আছে আমার।'

ব্যালকনির দিকে তাকাল রানা। এণ্ট্রান্সের দরজাটা এখনও নামানো। বন্ধ করে যায়নি গ্যারেট। প্রয়োজন হবে বলে ভাবেইনি বোধহয়।

'ওখানে পৌঁছুতে পারলে বেঁচে যাব আমরা,' বলল ও। 'বেরিয়ে যেতে পারব গুহা থেকে।'

'কীভাবে?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যালকনির সিঁড়িটা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেছে, উপরে ওঠার কোনও উপায় নেই।'

আসলেই তাই। বিশাল গুহার উপরে পাথরের এক চাঁইয়ের মত ঝুলছে ব্যালকনিটা। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা, তারপরেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। ঝট্ করে ফিরল মুরল্যাণ্ডের দিকে।

'ববি, ডাফল ব্যাগের ভিতরে দড়ির একটা বাণ্ডিল দেখেছি। ওটা নিয়ে এসো।'

দ্বিরুক্তি না করে দড়িটা নিয়ে এল মুরল্যাণ্ড।

রেমি জিজ্ঞেস করল, 'এটা বেয়ে উঠবে ব্যালকনিতে? বাঁধবে কীভাবে?'

'খুব সহজ,' বলল রানা। 'এক মাথায় পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দেব। পাথরের ওজনে রেলিঙের সঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে যাবে দড়ি।'

'কিন্তু সেজন্য ব্যালকনির তলায় পৌঁছাতে হবে! যাবে কীভাবে? অ্যাসিডের পানিতে সাঁতার কাটার কথা ভাবছ নাকি?'

'উঁহু। আমাদের সঙ্গে নৌকা থাকবে।'

হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। রানার প্ল্যান বুঝতে পেরেছে। বলল, 'নৌকাটা আমাকেই পানিতে নামাতে দাও।'

মাইডাসের কফিনের পাশে চলে গেল ও। ডালাটা আলগা

করে বলল, 'সরি, ইয়োর হাইনেস!'

এরপর কফিনটা কাত করে ফেলল ও। মাইডাসের লাশটা এক গড়ান খেয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে।

আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রেমি। 'ওহ্ গড! ববি, আপনি একটা অমূল্য মমি ধ্বংস করে দিলেন।'

'জান বাঁচানো ফরজ,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'তার জন্য দু'চারটে মমি নষ্ট করলে কিচ্ছু হয় না। তা ছাড়া লাশটা ভিতরে রাখলে কফিনের ওজন বেড়ে যেত। আমরা তিনজন ওঠার পরে ডুবে যেতে পারত নৌকা।'

ডালা বন্ধ করে এক ধাক্কায় কফিনটা প্ল্যাটফর্ম থেকে টেরাসের মেঝেতে নামিয়ে ফেলল ও। তারপর ঠেলা দিয়ে নিয়ে গেল সিঁড়িতে। ওজনের কারণে পিছল খেয়ে এবার ওটা নিজে থেকেই নেমে গেল পানিতে।

'লেটস্ গো,' বলল মুরল্যাণ্ড।

রেমিকে ধরাধরি করে দাঁড় করালো ওরা, সিঁড়ি ধরে নেমে এল নীচে। চড়ে বসল ডালাবদ্ধ কফিনের উপরে। পানি ইতিমধ্যে চার ফুট উঁচু হয়ে গেছে, ওখানে ভাসছে কফিনটা। মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে মায়ার সাবমেশিনগানটা আছে, ওটাকে লগির মত ব্যবহার করল ও, সিঁড়ির ধাপে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল। গতি পেল ভাসমান কফিন, সাবলীল ভঙ্গিতে এগোল ব্যালকনির দিকে। অস্ত্রটাকে বৈঠার মত ব্যবহার করে দিক আর গতি ঠিক রাখল মুরল্যাণ্ড।

হঠাৎ রানার বাহু খামচে ধরল রেমি, আঙুল তুলল পানির দিকে। সেদিকে চোখ ফেরাতেই রাজকন্যার স্বর্ণমূর্তিটা দেখতে পেল রানা। পাশে পানির তলায় ফুটে উঠেছে আরেকটা অবয়ব... আরেকটা মূর্তি! মায়া লরেঞ্জো!

অ্যাসিডিক ওয়াটারের সংস্পর্শ পেয়ে পুরোপুরি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে মাফিয়া নেত্রীর দেহ। যে-সোনার জন্য সবকিছু

তুচ্ছ করে ছুটে এসেছিল সে, ভাগ্যের পরিহাসে সেই সোনার সঙ্গেই বাঁধা পড়ে গেছে তার ভাগ্য... অনন্তকালের জন্য। মনটা হঠাৎ করেই খুব খারাপ হয়ে গেল রানার।

একটু পরেই ব্যালকনির তলায় পৌঁছে গেল কফিন। ব্যালান্স ঠিক করে নিল রানা, দড়িটা ছুঁড়ে দিল উপরে; রওনা হবার আগেই ওটার ডগায় একটা পাথর বেঁধে নিয়েছে ও। প্রথমবারে ব্যর্থ হলো, তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় রেলিঙের সঙ্গে পেঁচিয়ে গেল দড়ি। টানাটানি করে সন্তুষ্ট হলো রানা—খুলে আসার ভয় নেই। তাই ঝুলে পড়ল দড়িতে। বানরের মত তর তর করে বেয়ে উঠে গেল ব্যালকনিতে। ওকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। সবশেষে একটা লুপ বানিয়ে দড়ির নীচের অংশ নিজের বগলের তলায় আটকে নিল রেমি। টেনে ওকে উপরে তুলে আনল রানা আর মুরল্যাণ্ড।

বোধহয় ওদের মুক্তির অপেক্ষাতেই ছিল মাইডাসের সমাধি। রেমি ব্যালকনিতে পা রাখতেই বিচ্ছিরি শব্দে ভরে গেল গুহার অভ্যন্তর, ছাত থেকে খসতে শুরু করল একের পর এক চাঁই।

'এহ্-হে! গুহাটা ধসে পড়ছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'রেমিকে বাইরে নিয়ে যাও,' বলেই ব্যালকনির আরেক দিকে ছুটে গেল রানা।

'কোথায় যাচ্ছে ও?' ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি।

'কোথাও না,' বলেই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল মুরল্যাণ্ড, ছুট লাগাল এণ্ট্রান্সের দিকে। প্রকোষ্ঠে পৌঁছে থামল, উল্টো ঘুরে তাকাল ফোকরের দিকে। কোথায় গেল রানা?

ধুলোর পর্দা ছাড়া আর কোনোকিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না দরজার ওপাশে। বাড়ছে পাথর ধসে পড়ার আওয়াজ। শঙ্কিত হয়ে রেমিকে নামিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, বন্ধুর খোঁজে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় ছিটকে গুহা থেকে বেরিয়ে এল

রানা—বগলের তলায় ধরে রেখেছে কী যেন, নাকে-মুখে ধুলো ঢুকে যাওয়ায় কাশছে অনবরত।

'কী ব্যাপার?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওখান থেকে বেরুতে মন চাইছিল না বুঝি?'

'এটা ছাড়া নয়,' বগলের তলা থেকে জিয়োলেবটা বের করে দেখাল রানা। ব্যালকনিতে পড়ে ছিল ওটা, কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। 'আফটার অল, এটার ভিতরে আমাদের ধার করা একটা কম্পোনেন্ট রয়ে গেছে... ওটা অ্যাথেন্স মিউজিয়ামে ফিরিয়ে দিতে হবে না?'

শ্রাগ করল মুরল্যাণ্ড। 'রানা, তুমি পারোও বটে!'

কমবেশি আহত হয়েছে তিনজনেই, তাই টানেলের গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে আসতে প্রচুর সময় লেগে গেল রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের। গ্যারেটের নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো না, তবে দেয়ালের গায়ে তার আঁকা চিহ্নগুলো থাকায় সঠিক পথে এগোতে পারল ওরা।

যেন অনন্তকাল হাঁটার পরে রিজার্ভয়ারের চেম্বারে পৌঁছুল ওরা। কুয়োর গা থেকে এখন ঝুলছে দড়ি—খুলে নেবার ঝামেলায় যায়নি গ্যারেট। বোধহয় ভেবেছে মাইডাসের সমাধিতে পাথর চাপা পড়ে মারা গেছে ওরা, এখানে আর কখনোই ফিরে আসবে না।

দড়ি বেয়ে মুরল্যাণ্ড আগে উঠে গেল উপরে। এরপর রেমিকে দড়ির সাহায্যে টেনে তুলে নিল, রানাকেও উঠতে সাহায্য করল। গির্জার উঠানে পা রেখে ঘড়ি দেখল রানা—মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। সঙ্গে ফোন বলতে আছে গ্যারেটের পাসওয়ার্ড দেয়া সেটটা—ওটাকে অচলই বলা চলে। রানা আর রেমিকে অপেক্ষা করতে বলে ফোনের খোঁজে গেল মুরল্যাণ্ড।

রেমিকে নিয়ে আঙিনার একপাশে চলে এল রানা, বসে পড়ল মাটিতে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে রেমি, হাঁটাহাঁটির ধকলে পৌঁছে গেছে শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায়—জ্ঞান হারাবার দশা ওর। ওকে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল রানা। হাত বোলাতে শুরু করল মাথায়।

আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রেমির বুক চিরে। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তা হলে বেঁচে গেছি, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আর গ্যারেট?'

'পালিয়ে গেছে, তবে বেশি সময়ের জন্য নয়। ওকে খুঁজে বের করব আমি।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল রানার গলায়।

ডুকরে কেঁদে উঠল রেমি। 'কিন্তু র‍্যাচেল...' শেষ করতে পারল না কথাটা।

কী বলবে ভেবে পেল না রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের জন্য ওর বুকও খাঁ খাঁ করছে। গ্যারেটের চেহারা মনে পড়লেই রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়, তীব্র ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইছে মনটা। প্রিয় মানুষটিকে বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের উপরও ক্ষুব্ধ ও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, পার পেতে দেবে না অ্যান্থনি গ্যারেটকে। দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে তাড়া করবে... নেবে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ।

'শান্ত হও,' নরম গলায় রেমিকে বলল ও। 'এভাবে ভেঙে পোড়ো না।'

'কী করে বলছ এ-কথা?' ভেজা গলায় বলল রেমি। 'একমাত্র বোনটিকে আমি হারিয়েছি, রানা। কীভাবে সামলাব এই কষ্ট?'

'শোককে শক্তিতে পরিণত করে,' বলল রানা। 'গ্যারেটকে শাস্তি দেবার জন্য কাজে লাগাবে ওই শক্তি।'

নীরবতা নেমে এল। নিঃশব্দে কেঁদে চলল রেমি, আর কোনও কথা বলল না। রানাও নিশ্চুপ।

খানিক পরে ফিরে এল মুরল্যাণ্ড। হাতের মুঠোয় বিজয়ীর ভঙ্গিতে একটা সেলফোন ধরে রেখেছে। কাছে এসে বলল, 'ইমার্জেন্সি সার্ভিসে খবর দিয়েছি। রেমির জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসছে খুব শীঘ্রি। ওদেরকে হার্ট অ্যাটাকের কথা বলেছি, যাতে এখুনি পুলিশে খবর না দেয়।'

'ফোন কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তার এক লোকের কাছ থেকে। কী দেমাগ ব্যাটার... ফোন তো নয়, যেন যখের ধন চেয়ে বসেছি। শেষ পর্যন্ত আমার দামি রোলেক্স ঘড়িটা দিয়ে দিতে হয়েছে ওকে।'

মুরল্যাণ্ডের হাত থেকে সেটটা নিল রানা। ডায়াল করল আমেরিকায়—নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের নাম্বারে। প্রথম রিঙেই কল রিসিভ করলেন তিনি।

'ইয়েস?'

'মি. রেডক্লিফ, রানা বলছি।'

'রানা! মাই গড! কোথায় ছিলে তোমরা? আমরা গত কয়েক ঘণ্টা থেকে চেষ্টা করছি তোমার আর ববির সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'সরি, এতক্ষণ কোনও ফোন ছিল না আমাদের সঙ্গে। বিরাট বিপদে পড়েছিলাম, এখন সেটা কাটিয়ে উঠেছি। বিস্তারিত পরে শুনবেন।'

'এখন তোমরা কোথায়?'

'নেপলসে। রেমি আহত, ওর জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসছে, পিয়াৎজা স্যান গেতানোর একটা চার্চে অপেক্ষা করছি আমরা।' এটুকু বলে একটু ইতস্তত করল রানা। 'মি. রেডক্লিফ, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সম্ভবত মারা গেছেন...'

'এমন উড়ো খবর কে দিয়েছে তোমাকে?' অবাক কণ্ঠে বললেন রেডক্লিফ।

'উড়ো খবর!'

'নয়তো কী? হ্যাগার্সটাউনের একটা ওয়্যারহাউস থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে অ্যাডমিরালকে। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে তাঁর, খানিক আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ডাক্তার বলেছে, অপারেশন সাকসেসফুল। তিনি এখন বিপদমুক্ত।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার। 'অ্যাডমিরাল বেঁচে আছেন? আপনি শিয়োর?'

'আমি এ-মুহূর্তে অ্যাডমিরালের ওয়ার্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আর র‍্যাচেল হ্যাডলি?'

'ওর তো কিছুই হয়নি, পুরোপুরি সুস্থই বলা যায়। আপাতত এফবিআইয়ের জিম্মায় আছে।'

চোখ বন্ধ করে প্রশান্তিটুকু উপভোগ করল রানা, তারপর ডাকল রেমিকে। 'রেমি, শুনতে পাচ্ছ? র‍্যাচেলের কিচ্ছু হয়নি, ওকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

চোখ মেলল রেমি। 'কী! তুমি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

আবারও কাঁদতে শুরু করল রেমি। তবে এবার সেটা আনন্দের কান্না... স্বস্তির কান্না।

'মি. রেডক্লিফ,' ফোনে বলল রানা, 'গ্যারেট পালিয়ে গেছে। আপনারা ওর আস্তানায় স্ট্রনটিয়ামের খোঁজ পেয়েছেন?'

'না,' বললেন রেডক্লিফ। 'তবে ওখানে অস্বাভাবিক মাত্রার রেডিওঅ্যাক্টিভিটির আলামত পেয়েছে ডিকন্টামিনেশন টিম।'

দমে গেল রানা। স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে ওর ধারণা ভুল হবার

যে-সম্ভাবনা ছিল, তা আর রইল না। জিজ্ঞেস করল, 'বোমাটা তা হলে সরিয়ে নিয়েছে গ্যারেটের লোকেরা?'

'কোনও সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা তেমনটাই বলছে।'

'প্রত্যক্ষদর্শী?'

'দু'জন মুসলিম ছাত্রকে কিডন্যাপ করেছিল গ্যারেট। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণের জন্য ওদেরকে ফাঁসাবার প্ল্যান করেছিল ও। ওই দু'জনকে জেরা করে জানা গেছে, ওয়্যারহাউসে বিস্ফোরণ ঘটার আগে একটা ট্রাক বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে।'

'কীসের বিস্ফোরণ? আচ্ছা থাক, সামনাসামনি শুনব সব। যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকায় ফিরে আসছি আমি আর ববি। মাইডাস টাচ নিয়ে গেছে গ্যারেট, আর ওটাকে কাজে লাগাবার সঙ্গে ওই বোমার কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে। আমেরিকায় পৌঁছে তা-ই করবার চেষ্টা করবে ও।'

'এতকিছুর পরেও?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন রেডক্লিফ।

'সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয় গ্যারেট,' বলল রানা। 'তা ছাড়া এখনও ওর প্ল্যান মোতাবেকই এগোচ্ছে সব।'

'আমি তা হলে এফবিআই আর হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটিকে বলে দিচ্ছি, আমেরিকায় ঢোকার সমস্ত এণ্ট্রি পয়েন্টে যেন নজর রাখে। রিল্যাক্স, গ্যারেটকে এয়ারপোর্টেই অ্যারেস্ট করব আমরা।'

'কাজটা সহজ হবে না। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ নেবে ও। তবে একটা খুঁত থাকবে ওতে—আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বাম চোখ খুইয়েছে গ্যারেট। খবরটা জানিয়ে দিন সবাইকে। এক চোখঅলা কোনও লোককে পেলেই যেন আটক করে।'

'ঠিক আছে। তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।'

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা মুরল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দিল রানা।

'আমাদের পাইলটকে খবর দাও—জেট নিয়ে চলে আসতে বলো নেপলসে। এখান থেকেই বিমানে চড়ব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। রেমি জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকায় ফিরছি আমরা?'

'শুধু আমি আর ববি,' বলল রানা। 'তুমি আহত, এ-অবস্থায় জার্নি করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু আমি যে র‍্যাচেলকে দেখতে চাই!'

'তার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে। কিচ্ছু ভেবো না, ও এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার জন্য এ-মুহূর্তে সুস্থ হওয়াটা বেশি জরুরি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'বেশ, তা হলে আর জোরাজুরি করব না। যাও তোমরা। আমার হয়ে শাস্তি দিয়ো গ্যারেটকে।'

'দেব,' কথা দিল রানা।

'র‍্যাচেলকে বোলো, আমি ওকে ভালবাসি।'

'সেটা তুমি নিজেই বলতে পারবে।'

'কাছে এসো,' ডাকল রেমি। রানা মাথা নিচু করতেই গাঢ় চুমো খেলো ওর ঠোঁটে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, রানা। সবকিছুর জন্য।'

হাসল রানা। ঠাট্টার সুরে বলল, 'স্রেফ চুমো? আমি আরও অনেক কিছু আশা করছিলাম।'

'সবই পাবে,' সংক্ষেপে বলল রেমি। 'যথাসময়ে।'

গলা খাঁকারি দিল মুরল্যাণ্ড। দূরে সাইরেন শোনা যাচ্ছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'প্রেমালাপে বাদ সাধতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার। পুলিশ এসে গেলে আটকা পড়ে যাব।'

'যাও তোমরা,' বলল রেমি। রানা ইতস্তত করছে দেখে যোগ করল, 'আমার জন্য ভেবো না, অ্যাম্বুলেন্স তো আসছেই। ববির

কথাই ঠিক, পুলিশ এসে পড়লে আর যেতে পারবে না তোমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। রেমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ছায়া খুঁজে নিয়ে সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল গির্জার সামনে। স্ট্রেচার নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল দু'জন ক্রু, কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল রেমিকে নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো ওকে।

আর কিছু দেখার নেই। মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে উল্টো ঘুরল রানা, হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে থামাল। পিছনের সিটে উঠে নির্দেশ দিল, 'এয়ারপোর্টে চলো।'

সাতাশ

ষোল ঘণ্টা পর।

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিছানার পাশে গত দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছে রানা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি তাঁর, নাকে-মুখে টিউব লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে অক্সিজেন; তারপরেও নিয়মিত লয়ে বুকের ওঠানামা লক্ষ করে স্বস্তি অনুভব করছে ও। ইতিমধ্যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর, অ্যাডমিরাল যে সুস্থ হয়ে উঠবেন, সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

নড়েচড়ে বসতে গিয়ে ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল রানার। হাসপাতালে পৌঁছেই এক্স-রে করিয়েছিল ও, পাঁজরের দুটো হাড়ে

চিড় ধরা পড়েছে তাতে। ছোটখাট আরও কাটাছেঁড়া তো রয়েছেই। আপাতত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কাজ চালাচ্ছে ও। ডাক্তারের পরামর্শমত পেইনকিলার খায়নি, তাতে বোধবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে চায় ও, তৈরি থাকতে চায় গ্যারেটকে মোকাবেলার জন্য। বিমানে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়ায় শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। বুকের ব্যথাটা না থাকলে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট বলে দাবি করতে পারত।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। মুরল্যাণ্ড ফিরে এসেছে।

'কী ব্যাপার, হাত খালি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি না কফি আনতে গেলে?'

'সুযোগ পাইনি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বাইরে দু'জন এফবিআই এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। মি. রেডক্লিফ তাই তোমাকে ডাকতে পাঠালেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রানা, বেরিয়ে এল আইসিইউ থেকে। করিডোরে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলছেন মি. রেডক্লিফ ও ল্যারি কিং। রানা আর মুরল্যাণ্ড হাজির হতেই পরিচয় করিয়ে দিলেন রেডক্লিফ, 'মাসুদ রানা, ববি মুরল্যাণ্ড... প্লিজ, মিট স্পেশাল এজেন্ট হাওয়ার্ড কার্টার অ্যাণ্ড জোনাথন জেনকিন্স।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' রানা আর মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মেলাল দুই এজেন্ট।

'আশা করি সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন?' বলল রানা।

'ইয়ে... না,' ইতস্তত করে বলল কার্টার। 'আমরা আসলে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'জেরা? সেটা পরে করলে হয় না? আপাতত অ্যান্থনি গ্যারেটকে অ্যারেস্ট করাটাই তো সবচেয়ে জরুরি কাজ।'

'চিন্তা করবেন না। সবখানে খবর চলে গেছে। লোকটা আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ে যাবে। ইন দ্য মিনটাইম... আপনাদের সঙ্গে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। মি. রেডক্লিফ অবশ্য মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছেন, তারপরেও ফার্স্টহ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টের গুরুত্ব তো বোঝেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

করিডোরের বেঞ্চেই বসল ওরা।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'কী জানতে চান?'

'একেবারে গোড়া থেকে সব,' বলল জেনকিন্স। 'প্লিজ, কোনোকিছু লুকোছাপা করবেন না। এমনিতেই অবৈধ নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালের ব্যাপারটা আগেভাগে আমাদেরকে না জানিয়ে মস্ত ঝামেলা বাধিয়েছেন আপনারা। তা হলে স্রেফ কিডন্যাপিঙের কেস হিসেবে এটাকে ডিল করতাম না আমরা।'

'নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালের ব্যাপারে আমরা আসলে শিয়োর ছিলাম না,' বলল রানা। 'অযথা প্যানিক সৃষ্টি করতে চাইনি।'

'ওটা করলেই বরং ভাল করতেন,' গোমড়ামুখে বলল কার্টার। 'আমি আর জেনকিন্স এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্ট... অথচ বারো ঘণ্টা আগে জানতামই না তলে তলে কী ঘটছে।'

'যাঁদের জানা দরকার, তাঁরা জানতেন,' বললেন রেডক্লিফ। 'আপনাদের চিফের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলাম আমি। তিনি রাজি হয়েছিলেন গোপনে খোঁজখবর নেবেন বলে।'

'তা ছাড়া ঢাকঢোল পেটানোর তো উপায়ও ছিল না,' যোগ করল ল্যারি। 'কিডন্যাপাররা সেক্ষেত্রে খুন করত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।'

'যা হবার তা হয়ে গেছে,' বলল কার্টার। 'এখন পুরো ব্যাপারটা আমাদেরকে গোড়া থেকে বলুন, মি. রানা।'

ব্রেমারটনের ফেরি থেকে শুরু করে নেপলসের ভূগর্ভে মাইডাস চেম্বার আবিষ্কার পর্যন্ত সব ঘটনা ভাগাভাগি করে খুলে বলল রানা ও মুরল্যাণ্ড, উহ্য রাখল শুধু অ্যাথেন্স মিউজিয়ামে ওদের অপারেশনের অংশটা। সব শোনার পর চোয়াল ঝুলে পড়ল দুই এফবিআই এজেন্টের।

'আপনারা রাজা মাইডাসের সোনার চেম্বার খুঁজে বের করেছেন?' হতভম্ব গলায় বলল জেনকিন্স। 'কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবেন?'

'দুঃখিত, প্রমাণগুলো অ্যান্থনি গ্যারেটের কবজায়—চেম্বারের ভিডিও আর মাইডাসের হাত-সহ সবকিছু,' বলল রানা। 'গুহাটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় ধরনের এক্সক্যাভেশন করলে হয়তো বা মাইডাসের মেয়ে আর মায়া লরেঞ্জোর বডিদুটো উদ্ধার করা যাবে... তবে তাতে প্রচুর খরচ পড়বে। মনে হয় না ইটালিয়ান সরকার আগ্রহী হবে এতে।'

'কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এই উদ্ভট কাহিনি বিশ্বাস করি কী করে, বলুন?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনার কি ধারণা আমরা মিথ্যে কথা বলছি?'

'না, না, মি. রানা,' তাড়াতাড়ি বলল কার্টার। 'আমি তা বলছি না। কিন্তু আপনিই বলুন, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে যদি মাইডাস টাচের কাহিনি লিখি, লোকে আমাদের পাগল ঠাওরাবে না? কোনও প্রমাণ তো নেই!'

'রিপোর্টে ওসব না লিখলেও চলে। আসল ঘটনা তো সিম্পল—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন-সহ চারজনকে কিডন্যাপ করেছিল অ্যান্থনি গ্যারেট, এবং আমেরিকার বুকে একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চাইছে সে।'

'ওটাও আরেকটা অসঙ্গতি,' বলল জেনকিন্স। 'কেন বোমা

ফাটাবে লোকটা? মোটিভ কী? এতে কোনও নগদপ্রাপ্তির তো সম্ভাবনা নেই।'

'মাইডাস টাচের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর,' বলল রানা। 'মায়াকে গ্যারেট বলেছিল, সারা দুনিয়ার স্বর্ণের দাম এবং চাহিদা বাড়াবার জন্য নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান আছে তার। বোমাটা নিশ্চয়ই তারই অংশ।'

'একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন কীভাবে স্বর্ণের চাহিদা বা দাম বাড়াতে পারে?'

কী যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না রানার। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দুঃখিত, এর জবাব আমার কাছে নেই।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'কোথায় বোমা ফাটাতে চাইছে গ্যারেট, সেটা জানা গেলে হয়তো বা একটা আইডিয়া করতে পারব আমরা।'

'ওদিক থেকেও আমরা অন্ধকারে,' বলল কার্টার। 'বোমা নিয়ে পালিয়ে গেছে গ্যারেটের লোক। প্রায় বারো ঘণ্টার হেডস্টার্ট পেয়েছে সে। এর ভিতরে ওয়াশিংটন, শিকাগো, কেন্টাকি বা ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক... যে-কোনও জায়গায় পৌঁছুনো সম্ভব।'

'আপনি পুরো ইস্টার্ন সিবোর্ডের কথা বলছেন!'

'হ্যাঁ। কেন আমরা অসহায় বোধ করছি, তা আশা করি বুঝতে পারছেন। এত বড় এরিয়ায় সার্চ চালানো সম্ভব নয় কারও পক্ষে।'

'গ্যারেটকে খুঁজে পেতে হবে আমাদের,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'যেভাবেই হোক!'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।'

আইসিইউ-র দরজা খুলে গেল এই সময়। একজন নার্স বেরিয়ে এল। বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে।'

আলোচনা মুলতবি রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল রানা। ছুটে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পাশে। ওকে দেখতে পেয়ে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

হাত ধরল রানা। 'কেমন বোধ করছেন আপনি, স্যর?'

চোখ পিট পিট করলেন অ্যাডমিরাল। ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন, স্যর?'

মৃদু মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। আবারও পিট পিট করলেন চোখ। মোর্স কোড!

মুরল্যাণ্ড, ল্যারি কিং আর মি. রেডক্লিফ-সহ দুই এফবিআই এজেন্টও এসেছে রানার পিছু পিছু। ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রানা বলল, 'আমাকে কাগজ-কলম দিন... কুইক!'

পকেট থেকে নোটপ্যাড আর কলম বের করে দিল কার্টার। সেগুলো হাতে নিয়ে দ্রুত হাতে একটার পর একটা হরফ লিখতে থাকল রানা। দুটো শব্দ পেল—*নীল ট্রাক*।

'যেটা পালিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'কী বলছেন উনি?' পিছন থেকে জানতে চাইল জেনকিন্স।

'বোমা-সহ যে-ট্রাকটা পালিয়ে গেছে, সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন,' বলল রানা। ফিরল অ্যাডমিরালের দিকে। 'স্যর, আর কোনও ডিটেইলস্ দিতে পারেন আমাদের?'

আবারও চোখ পিট পিট করলেন হ্যামিলটন। একে একে ছ'টা অক্ষর লিখল রানা—ডব্লিউ, আই, এল, বি, আই, এক্স।

'উইলবিক্স?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'উইলবিক্সটা আবার কী?' বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল জেনকিন্স।

সেলফোনের সাহায্যে নুমার সুপার কম্পিউটার ভিনাসের

ডেটাবেজে সার্চ করল ল্যারি। বলল, 'ওই নামে একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি আছে দেখছি। অ্যাডমিরাল, আপনি কি উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনসের কথা বলছেন?'

শেষবারের মত মাথা ঝাঁকালেন হ্যামিলটন, তারপরেই আবার চেতনা হারালেন। ল্যারির দিকে ফিরল রানা, 'কোম্পানিটার হেডকোয়ার্টার কোথায়?'

'নিউ ইয়র্কে,' জানাল ল্যারি। পরক্ষণে সেলফোনের ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। 'ওহ্ গড!'

'কী হয়েছে?'

'নিউ ইয়র্ক ডাউনটাউনে একটা হাসপাতাল তৈরি করছে উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনস্। লোকেশনটা ওয়াল স্ট্রিট থেকে মাত্র এক মাইল দূরে!' মুখ তুলল ল্যারি। 'সোনার সঙ্গেও জায়গাটার সম্পর্ক আছে, রানা। ওখানেই রয়েছে আমাদের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোল্ড ডিপোজেটরি!'

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। মাথার ভিতরে যেটা খোঁচাখুঁচি করছিল, মনে পড়ে গেল সেটাও। জেমস বণ্ডের মুভি *গোল্ডফিঙ্গার!* ওই ছবির ভিলেনের মত গ্যারেটও আমেরিকার সোনা মজুদ নষ্ট করে দিতে চাইছে!

'আপনি বলতে চাইছেন, লোয়ার ম্যানহাটনে বোমা ফাটাতে চাইছে গ্যারেট?' বিস্মিত গলায় বলল কার্টার। 'কেন?'

'যাতে রেডিয়েটেড হয়ে যায় ডিপোজেটরির সমস্ত সোনা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এভাবেই নিজের বানানো সোনার চাহিদা সৃষ্টি করবে ও। ইচ্ছেমত দাম হাঁকতে পারবে।'

'কী বলছেন!' আঁতকে উঠল কার্টার। 'তা হলে তো এক্ষুণি নিউ ইয়র্কে যাওয়া দরকার আমাদের।'

'আমরাও যাব,' বলল রানা। 'গ্যারেটকে আইডেন্টিফাই করবার জন্য আমাকে আর ববিকে প্রয়োজন হবে আপনাদের।'

সেলফোনের কন্ট্যাক্ট লিস্ট ঘাঁটতে শুরু করল জেনকিন্স। 'আমি দেখছি একটা বিমান ম্যানেজ করা যায় কি না।'

'ব্যস্ত হবেন না,' মুরল্যাণ্ড হাত রাখল তার কাঁধে। 'আমাদের সঙ্গে একটা প্রাইভেট জেট আছে!'

আটাশ

অ্যান্থনি গ্যারেট সাবধানী প্রকৃতির লোক। অতিমাত্রায় সতর্কতার কারণেই আজ পর্যন্ত আইনের হাতে ধরা পড়েনি। এবারও ঠিক তাই। রানা ও তার সঙ্গীরা মারা গেছে ভাবা সত্ত্বেও সামান্যতম অসতর্ক হয়নি সে, ইটালি থেকে সরাসরি আসেনি আমেরিকায়। চার্টার করা ফ্লাইটে প্রথমে কানাডার মন্ট্রিয়লে নেমেছে সে, সেখান থেকে একটা বোটে চড়ে পাড়ি দিয়েছে লেক অন্টারিও, পৌঁছেছে নায়াগ্রা ফলসে। কানাডিয়ান টুরিস্ট সেজে ওখানেই সীমান্ত অতিক্রম করেছে, ঢুকে পড়েছে আমেরিকায়। ইমিগ্রেশনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু এয়ারপোর্টের মত কড়া চেকিং হয় না ওখানে, ফলে কোনও ধরনের বিপদে পড়তে হয়নি। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দেখে ইমিগ্রেশন অফিসার একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল বলে তাকে সামাল দিয়েছে গ্যারেট। এরপর ট্যাক্সি ভাড়া করে সড়কপথে রওনা হয়ে গেছে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে।

ফেয়ারফিল্ডে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল গ্যারেট। রেনফিল্ডের

সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করে নিয়েছিল, রাস্তার পাশে একটা ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে। ট্যাক্সি থেকে নেমে রেনফিল্ডের গাড়িতে উঠে বসল গ্যারেট। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল বোমা বিশেষজ্ঞের।

টানেল থেকে বেরিয়েই নেপলসের পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে চলে গিয়েছিল গ্যারেট, মোটা টাকার বিনিময়ে মুখ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে তার কাছ থেকে, এরপর শুশ্রূষা করিয়েছে ক্ষত-বিক্ষত মুখের। বাম চোখের ব্যাপারে কিছু করতে পারেনি ডাক্তার, আই ট্রান্সপ্ল্যান্ট ছাড়া ওটা আর ঠিক হবে না। আপাতত একটা কালো পট্টি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে চোখটা। সব মিলিয়ে রীতিমত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে গ্যারেটের চেহারা।

রেনফিল্ড জানতে চাইল, 'কী হয়েছে? তোমার এ-অবস্থা কেন?'

'লম্বা কাহিনি,' বলল গ্যারেট। 'পরে নাহয় শুনবে।'

'অপারেশন সাকসেসফুল?'

'হ্যাঁ। লেটস্ মুভ। এভাবে খোলা জায়গায় থাকা নিরাপদ নয় আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল রেনফিল্ড, গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়াল গাড়ি। পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা ট্রাক স্টপে পৌঁছুল ওরা, ওখানকার পার্কিং লটে নিজের ট্রাকটা রেখে গেছে বোমা বিশেষজ্ঞ।

গাড়ি ছেড়ে ট্রাকে উঠে বসল দুই অপরাধী। রেনফিল্ড বলল, 'কোথায় তোমার মাইডাস টাচ? দেখাও আমাকে।'

ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের কন্টেইনারটা বের করল গ্যারেট, ভিতরে শোভা পাচ্ছে রাজা মাইডাসের বিচ্ছিন্ন হাত। সঙ্গীকে দেখাল ওটা।

'এ-ই?' একটু যেন হতাশ হলো রেনফিল্ড। 'আমি

ভেবেছিলাম ওটা থেকে কোনও ধরনের রশ্মি-টশ্মি বের হবে।'

'জানি, দেখতে অসাধারণ কিছু মনে হচ্ছে না,' স্বীকার করল গ্যারেট। 'কিন্তু নিশ্চিত থাকো, এটা জেনুইন মাল। সত্যিই সোনা তৈরি করা সম্ভব এটা দিয়ে।'

'প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' ব্যাগ থেকে ভিডিও ক্যামেরা বের করল গ্যারেট। গোল্ডেন চেম্বার থেকে পালাবার সময় ওটাও নিয়ে এসেছে।

নিজের ল্যাপটপের সঙ্গে ক্যামেরার কানেকশন দিল রেনফিল্ড। চালু করল ভিডিও। ল্যাপটপের পর্দায় ভেসে উঠল মাইডাসের সমাধির দৃশ্য। রেমির শুট করা সবকিছুই আছে ওতে, মাইডাস টাচের এক্সপেরিমেন্টও। দেখতে দেখতে কয়েক দফা বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল রেনফিল্ড, শেষ হলে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হুঁ,' ক্যামেরা ফিরিয়ে দিল রেনফিল্ড। আর কোনও কথা না বলে চাবি ঘোরাল ইগনিশনের।

মিনিটখানেকের ভিতর পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক। রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল সাবলীল গতিতে। লিঙ্কন টানেল হয়ে ম্যানহাটনে ঢুকবে।

'কোন্ লোকেশন ব্যবহার করছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট। ইটালিতে যাবার আগেই সম্ভাব্য পাঁচটা লোকেশন সম্পর্কে তাকে জানিয়েছিল রেনফিল্ড—আবহাওয়া এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে চূড়ান্তভাবে একটাকে নির্বাচন করবার কথা।

'ভিজি স্ট্রিট,' বলল রেনফিল্ড, 'চার্চ স্ট্রিটের পুবের লোকেশনটা।' পোর্ট অথোরিটির ট্রেন স্টেশন থেকে ওটা মাত্র এক ব্লক দূরে।

প্ল্যানটা খুবই সিম্পল—রাস্তার পাশে ট্রাকটা পার্ক করবে ওরা, ডিটোনেটরের টাইমার অন্ করে কেটে পড়বে ওখান থেকে। বোমা বিস্ফোরণের আগেই চলে যাবে অনেকদূরে। কোনও জটিলতা নেই এতে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটল গ্যারেটের, কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে সে। এখন আর কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

নুমার জেটে ওয়াশিংটন থেকে নিউ জার্সির টেটারবোরো এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে এক ঘণ্টা লাগল রানা ও তার সঙ্গীদের। ট্রাফিক জ্যাম এড়াবার জন্য এরপর একটা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করল এজেন্ট কার্টার, সেটা নিয়ে আরও আধঘণ্টা পরে ইস্ট রিভারের একটা হেলিপোর্টে ল্যাণ্ড করল ওরা। এফবিআই-এর লোকাল অফিস থেকে পাঠানো একটা লিমাযিন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য, সেটায় চড়ে দ্রুত ম্যানহাটনের উদ্দেশে রওনা হলো দলটা।

গাড়ির সঙ্গে বেশ কিছু সার্ভেইলান্স ডেটা পাঠিয়েছে লোকাল অফিস। সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই এফবিআই এজেন্ট। খানিক পরে একটা ফটোগ্রাফ রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকেন্স। 'এই ছবিটা দেখুন, মি. রানা। ডকুমেন্টস্ বলছে, ওর নাম হ্যাল এলিসন, কানাডার নাগরিক। কিন্তু লোকটার সঙ্গে আপনাদের ডেসক্রিপশনের যথেষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছি।'

চোখ বোলাল রানা। সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা সাদা-কালো একটা ছবি। খুব স্পষ্ট বলা যাবে না, তারপরেও চোখে কালো পট্টি বাঁধা মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। থমথমে গলায় রানা বলল, 'ইট'স্ গ্যারেট।'

ববির চেহারাও কঠিন হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তোলা হয়েছে এ-ছবি? কখন?'

'দু'ঘণ্টা আগে, নায়াগ্রা ফলসের ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে,' বলল জেনকিন্স।

'বলেন কী! ওকে আটক করা হয়েছে তো?'

'না,' মাথা নাড়ল জেনকিন্স। 'আমাদের মেসেজটা অনেক দেরিতে পেয়েছে ওরা। গ্যারেটও কোনও সন্দেহজনক আচরণ করেনি, তাই...' ইতস্তত করল সে। 'ইয়ে... দোষটা আসলে আমাদেরই। এয়ারপোর্টগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম, বর্ডার চেকপয়েন্ট নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।'

'এ-নিয়ে এখন আর কপাল চাপড়ে লাভ নেই,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'দু'ঘণ্টা আগে নায়াগ্রা ফলস্ পার হয়েছে গ্যারেট, সময়টা নিউ ইয়র্কে পৌঁছুনোর জন্য যথেষ্ট।'

'ওর ট্রাকটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে,' বলল কার্টার। 'ট্রাকটা পেলে ওকেও পাওয়া যাবে।'

লিমাযিনের ড্রাইভারকে ডাউনটাউনের নির্মাণাধীন হাসপাতালের সাইটে যেতে বলল জেনকিন্স। লুকানোর জন্য গ্যারেট ওই জায়গাই বেছে নেবে বলে আশা করছে। উইলবিক্স কনস্ট্রাকশনের অন্যান্য ট্রাকের মাঝে মিশিয়ে রাখতে পারবে নিজের ট্রাকটাকে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে পনেরো মিনিট পরেই ওদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দিল ড্রাইভার। পুলিশের একটা টিম আগে থেকেই ঘিরে রেখেছে পুরো সাইট, ওরা গাড়ি থেকে নামলে বয়স্ক এক সার্জেন্ট এগিয়ে এল।

'সার্জেন্ট বিল ফারগুসন, স্যর,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'আমি এখানকার ইনচার্জ।'

জেনকিন্স, রানা আর মুরল্যাণ্ডকে পরিচয় করিয়ে দিল কার্টার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খবর বলুন, সার্জেন্ট। ট্রাকটাকে লোকেট করতে পেরেছেন?'

'জী না,' মাথা নাড়ল ফারগুসন। 'সাইটে যতগুলো ট্রাক আছে, সবগুলোই ভাল করে দেখেছি আমরা। ওয়াশিংটনে হাইজ্যাক হওয়া ট্রাকটার সঙ্গে মিলছে না কোনোটাই। তারপরেও গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তল্লাশি চালিয়েছি সব ট্রাকে, কিন্তু রেডিয়েশনের কোনও চিহ্ন পাইনি।'

হতাশায় ঠোঁট কামড়াল কার্টার। 'থ্যাঙ্ক ইউ, সার্জেন্ট। আপনি এখন যেতে পারেন। তবে আমি না বলা পর্যন্ত সাইট কর্ডন করে রাখুন। কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ফারগুসন।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল কার্টার। 'এখন কী করব? এখানে নেই গ্যারেট।'

'এখানে না থাকলেও নিউ ইয়র্কেই আছে,' জোর গলায় বলল রানা। 'আমি শিয়োর!'

'কীভাবে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন? নায়াগ্রা ফলস্ থেকে আরও বহু জায়গায় যাওয়া যায়।'

'উইলবিক্সের কানেকশনটাকে অগ্রাহ্য করছেন কেন? ট্রাকের চেহারা পাল্টে উইলবিক্সের নাম লিখেছে গ্যারেট। কোম্পানিটা এমন এক জায়গায় বিল্ডিং বানাচ্ছে, যার খুব কাছেই রয়েছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোল্ড ডিপোজেটরি। সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে না?'

'কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট আর ফেডারেল ব্যাঙ্কের চারদিকে পাহারা বসিয়েছি আমরা। সন্দেহজনক কোনও ট্রাক দেখলেই আটক করবে। ওখানে পৌঁছাবার কোনও উপায় নেই গ্যারেটের।'

'বোমা ফাটাবার জন্য ওয়াল স্ট্রিটে পৌঁছাবার দরকার নেই ওর, দূর থেকে ফাটালেও চলে।'

'কিন্তু এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার!' প্রতিবাদ করল কার্টার। 'স্ট্রনটিয়াম দিয়ে অত শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি

করা সম্ভব নয়।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন আমরা? স্ট্রনটিয়াম তো অন্যভাবেও ব্যবহার করা যায়!'

'কীভাবে?'

'খুব সিম্পল, নরমাল একটা বোমা ফাটাবেন আপনি, স্ট্রনটিয়ামের লোড থাকবে তার পাশে। জিনিসটা তা হলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে, রেডিয়েশন ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। ঠিক নিউক্লিয়ার বোমা নয়, একে আপনি রেডিওলজিক্যাল বোমা বলতে পারেন।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা। 'বোধহয় ঠিকই ধরেছ তুমি, ববি! হাইজ্যাক হওয়া ট্রাকে সওডাস্ট ছিল, তাই না? ওটাকে গুরুত্বহীন ভাবছিলাম আমরা... কিন্তু ভেবে দেখো, যদি নরমাল বোমার সঙ্গে স্ট্রনটিয়াম আর ওই সওডাস্ট রাখা হয়, তা হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যাবে। এয়ার সার্কুলেশনের ডাক্ট দিয়ে রেডিয়েটেড সওডাস্ট ছড়িয়ে যাবে সবখানে... এমনকী ফেডারেল রিজার্ভের ভিতরেও!'

'কংগ্রাচুলেশন্স! মনে হচ্ছে গ্যারেটের পুরো প্ল্যান ধরে ফেলেছি আমরা!' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এবার ওটাকে বানচাল করে দেবার পালা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রেডিয়েটেড সওডাস্ট ছড়িয়ে দেবার জন্য বাতাসের উপর নির্ভর করতে হবে গ্যারেটকে। এজেন্ট কার্টার, এখুনি খোঁজ নিন, আজ বাতাস কোন্‌দিক থেকে বইছে।'

সেলফোন বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কার্টার, যোগাযোগ করল মিটিওরোলজিকাল ইন্সটিটিউটের সঙ্গে। খানিক পরে জানাল, 'পশ্চিম দিক থেকে, মি. রানা।'

নিউ ইয়র্কের ম্যাপ স্মরণ করল রানা—হাসপাতালটা

ম্যানহাটনের উত্তর দিকে। এখানে বোমা ফাটালে ওয়াল স্ট্রিটে যাবে না গ্যাস ক্লাউড। কাজটা করতে হবে টার্গেটের পশ্চিমে।

গাড়ির দিকে পা বাড়াল রানা। 'লেটস্ গো। আমি জানি গ্যারেট কোথায় গেছে।'

উনত্রিশ

লিঙ্কন টানেল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণমুখী নাইন্থ অ্যাভিনিউ ধরল রেনফিল্ড, হাডসন স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে মোড় নিল। রাশ আওয়ার চলছে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, স্পিড তোলা গেল না। পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল চার্চ স্ট্রিট আর ভিজি স্ট্রিটের ইন্টারসেকশনে পৌঁছুতে।

সেইন্ট পল'স্ চ্যাপেলের গোরস্থানের সামনে ট্রাক থামাল রেনফিল্ড। রাস্তার উল্টোপাশে রয়েছে একটা স্মোক শপ, ক্যামেরার দোকান আর ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট। ওগুলোর পাশে পরিত্যক্ত এক বিল্ডিঙের রেনোভেশন চলছে, সেটার সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল এক ব্যানার:

সুখবর! শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন!

দ্য সেইফ ক্র্যাকার:

নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে অনবদ্য রেস্টুরেন্ট,

যেখানে শতাব্দী-প্রাচীন ব্যাঙ্ক ভল্টে বসে

আপনি উপভোগ করতে পারবেন লোভনীয় সব খাবার!

ব্যানারের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল গ্যারেট। পুরনো ব্যাঙ্ক ভল্টের ভিতরে রেস্টুরেন্ট খোলার বুদ্ধি কোন্ গর্দভের মাথা থেকে বেরিয়েছে কে জানে! এর মধ্যে আকর্ষণ কোথায়? জায়গাটা জেলখানা হলে নাহয় ইন্টারেস্টিং বলা যেত। পরিত্যক্ত বিল্ডিংটার উপর দৃষ্টি বোলাল সে—নড়বড়ে দশা, একশো বছরের কম হবে না বয়স। বিল্ডিঙের সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ এক লোক ওটা থেকে নামাচ্ছে রেনোভেশনের বিভিন্ন সাপ্লাই, এ ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না ওখানে।

চাবি ঘুরিয়ে ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ করল রেনফিল্ড, তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা রিমোট কন্ট্রোল। 'তুমি রেডি?' গ্যারেটকে জিজ্ঞেস করল সে।

ব্যাকপ্যাকের মুখ আটকাল গ্যারেট। 'হ্যাঁ। কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

'বেশি না, দশ মিনিট।'

ভুরু কোঁচকাল গ্যারেট। 'একটু কম হয়ে গেল না?'

'উঁহুঁ। ব্লাস্ট এরিয়া থেকে সরে যাবার জন্য দশ মিনিটই যথেষ্ট। স্রেফ একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে।'

'তাতে নাহয় বিস্ফোরণের আওতা থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু রেডিয়েশন?'

'পশ্চিমদিকে চলে যাব আমরা, বায়ুপ্রবাহের উজানে। রেডিয়েটেড সওডাস্ট ওদিকে যাবেই না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'বেশ। আশা করি ভালমত ক্যালকুলেশন করেছ। চলো।'

ঘড়িতে সময় মিলিয়ে নিল দু'জনে, তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বাটন চাপল রেনফিল্ড। চালু হয়ে গেল স্ট্রনটিয়াম বোমার টাইমার। নেমে যাবার জন্য দরজায় কেবল হাত দিয়েছে গ্যারেট, তখুনি আঁতকে উঠল রেনফিল্ড।

'ও মাই গড!'

ঝট্ করে তার দিকে তাকাল গ্যারেট। 'কী হয়েছে?'

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আছে রেনফিল্ড—সরকারি লাইসেন্স প্লেট লাগানো কুচকুচে কালো রঙের একটা লিমাযিন এসে থেমেছে ওদের ট্রাকের পিছনে। এ-ধরনের গাড়ি শুধু একটা এজেন্সিই ব্যবহার করে। থমথমে মুখে গ্যারেটের দিকে তাকাল সে। বলল, 'এফবিআই!'

জানালা দিয়ে মাথা বের করে পিছনে তাকাল গ্যারেট। তার মুখেও মেঘ জমল। সোজা হয়ে বলল, 'রিল্যাক্স, উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমি ওদেরকে সামলাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কোনও আর্মস্ আছে?'

'গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।'

ড্যাশবোর্ডের ডালা খুলল গ্যারেট, ভিতরে লোডেড অবস্থায় পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের একটা রিভলবার পাওয়া গেল, সঙ্গে ছ'রাউণ্ড স্পেয়ার অ্যামিউনিশন। অস্ত্রটা কোমরে গুঁজল সে। রেনফিল্ডকে বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। আমি না ডাকলে নেমো না।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো,' বলল রেনফিল্ড। 'টাইমার ক্যানসেলের কোনও ব্যবস্থা রাখিনি আমি। দশ মিনিট পরেই ফাটবে বোমাটা।'

মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। ব্যাকপ্যাকটা সিটের উপর রেখে দরজা খুলল, এক লাফে নেমে এল পেভমেন্টে। লিমাযিনের দিকে ঘুরতেই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার, বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। গাড়ি থেকে যে-মানুষটা নেমে আসছে সে আর কেউ নয়... স্বয়ং মাসুদ রানা!

বিস্ময়ে খাবি খেতে শুধু বাকি রইল গ্যারেটের। এ কী করে হয়? সুদূর নেপলসে মাটির নীচে বাঙালিটাকে নিজ হাতে খতম

করে দিয়ে এসেছে সে, স্বচক্ষে দেখেছে ওকে পাথরের তলায় চাপা পড়ে যেতে। তা হলে রানা নিউ ইয়র্কে পৌঁছায় কী করে? ওকেই বা খুঁজে পেল কীভাবে? সব গোলমাল হয়ে গেল তার।

রানাও থমকে গেছে গ্যারেটকে দেখতে পেয়ে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য পরস্পরের উপর দৃষ্টি আটকে রইল ওদের, তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্যারেটের শরীরে, ঝট্ করে তুলল রিভলবার, নিমেষে ট্রিগার চাপল। রানা তার আগেই ডাইভ দিয়েছে, গুলিটা বিঁধল ওর পিছন পিছন লিমাযিন থেকে বেরিয়ে আসা কার্টারের কাঁধে। আধপাক ঘুরে গিয়ে পেভমেণ্টে মুখ থুবড়ে পড়ল এফবিআই এজেণ্ট।

চিৎকার আর হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল চারদিকে। পথচারীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেছে। ট্রাকের সিটের দিকে হাত বাড়াল গ্যারেট, কিন্তু তার আগেই ব্যাকপ্যাকটা ছোঁ মেরে তুলে নিল রেনফিল্ড, নিজের পাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল রাস্তায়। পরক্ষণে আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো।

এক ছুটে ড্রাইভারস্ ক্যাবের সামনে চলে এল গ্যারেট, কাভার নিল। গালাগালির তুবড়ি ছুটছে তার মুখ দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর আড়াল থেকে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিল। রাস্তার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রেনফিল্ড। প্রতিপক্ষের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে সে। পাশে পড়ে আছে ব্যাকপ্যাকটা। ওটা হাতে পাবার কোনও উপায় নেই আর।

'অ্যান্থনি গ্যারেট!' চিৎকার ভেসে এল লিমাযিনের দিক থেকে। 'দিস ইজ স্পেশাল এজেণ্ট জোনাথন জেনকিন্স ফ্রম এফবিআই। সারেণ্ডার করো!'

'নিকুচি করি সারেণ্ডারের!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল গ্যারেট। এক লাফে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, রিভলবার তুলে একের পর এক গুলি ছুঁড়তে শুরু করল লিমাযিনের দিকে, সেই সঙ্গে লাগাল

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। কাভার নেয়ার জন্য লিমাযিনের পিছনে চলে গেছে প্রতিপক্ষ, পাল্টা গুলি চালাল না। ফলে সহজেই রাস্তা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছে গেল সে। ঢুকে পড়ল ওটার ভিতরে।

ততক্ষণে পুলিশের সাইরেন শোনা যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে এজেন্ট কার্টারের পাশে গেল রানা, পরীক্ষা করল তার ক্ষত।

'আ... আমি ঠিক আছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কার্টার। 'আপনি গ্যারেটকে আটকান।'

লিমাযিনের পিছনে কাভার নেয়া মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কোথায় ও?'

'গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তবে এজেন্ট জেনকিন্স ওর সাগরেদকে ঘায়েল করেছেন।'

কার্টারের কাছ থেকে তার পিস্তলটা চেয়ে নিল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়াতেই ওর হাত টেনে ধরল জেনকিন্স, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'গ্যারেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে,' কঠিন গলায় বলল রানা।

'একা? পাগল হয়েছেন?'

'ওর জন্য আমি একাই যথেষ্ট।'

'হয়তো। কিন্তু আপনাকে আর মি. মুরল্যাণ্ডকে অন্য কাজে প্রয়োজন আমার। আপনাদের ফাইল দেখেছি আমি, বোমা-টোমার ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা আছে দু'জনেরই। প্লিজ, ট্রাকের বোমাটা ডিজআর্ম করুন।'

'কীভাবে? ওটার ব্যাপারে কোনও আইডিয়া নেই আমাদের।'

রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা রেনফিল্ডের দিকে ইশারা

করল জেনকিন্স—ঊরুতে গুলি লেগেছে তার, গোঙাচ্ছে। 'ওই ব্যাটাই গ্যারেটের বম্ব-মেকার, আমি শিয়োর। ওকে ইন্টারোগেট করুন।'

'আর গ্যারেট?'

'ওর পিছনে আমিই যাচ্ছি।'

দুটো পুলিশ ক্রুজার এসে পড়েছে, ব্রেক কষেছে রাস্তার ধারে। আরোহীদের ডাক দিল জেনকিন্স, অস্ত্র বাগিয়ে সবাই একযোগে এগোল রেস্টুরেন্টের দিকে।

ঠোঁট কামড়াল রানা, গ্যারেটকে নিজ হাতে শাস্তি দেবার তাড়না অগ্রাহ্য করতে পারছে না। কিন্তু এ-ও ঠিক, ঘৃণ্য ওই অপরাধীকে ধরার চাইতে ম্যানহাটনের কয়েক লক্ষ লোকের জীবন বাঁচানো অনেক বেশি জরুরি।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'চলে এসো, রানা। গ্যারেটকে নিয়ে ভেবো না। রেস্টুরেন্টের ভিতরে নির্ঘাত কাউকে জিম্মি করে বসে আছে ও। পুলিশ-এফবিআই ওকে ঘিরে ফেলবে, পালাতে দেবে না। নেগোশিয়েশনেও প্রচুর সময় লাগবে। বোমা ডিজআর্ম করে ওদিকে যোগ দিতে পারব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরল রানা। পিছু নিল মুরল্যাণ্ডের। রাস্তার উপর পড়ে থাকা গ্যারেটের ব্যাকপ্যাকটা চিনতে পেরে হাতে তুলে নিল। মুখ খুলে দেখে নিল ভিতরটা। হ্যাঁ, সবই আছে—আর্কিমিডিসের কোডেক্স, সোনার হাত, ভিডিও ক্যামেরা আর প্লাস্টিকের কন্টেইনারে মাইডাস টাচ। ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে নিল ও। মুরল্যাণ্ড ততক্ষণে রেনফিল্ডের ঊরুর ক্ষতের উপর পা রেখে চাপ দিতে শুরু করেছে। ব্যথায় কাতরে উঠল ধরাশায়ী লোকটা।

'নাম কী তোমার?' রুক্ষ গলায় জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'রেনফিল্ড...' ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ শব্দ বেরুল বোমা

বিশেষজ্ঞের গলা দিয়ে, '...অগাস্ট রেনফিল্ড। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাদের এখুনি সরে যেতে হবে এখান থেকে!'

'কেন? স্ট্রনটিয়ামের বোমাটা কি অ্যাকটিভেট করে দিয়েছ তোমরা?'

'আ... আমি কোনও বোমার কথা জানি না।'

রেনফিল্ডের উরুর উপর পায়ের চাপ বাড়াল মুরল্যাণ্ড। ককিয়ে উঠল সে। 'এখন মনে পড়ছে? নাকি আরেকটু চাপ দেব?'

'না, না! প্লিজ!!' আঁতকে উঠল রেনফিল্ড। 'হ্যাঁ, বোমার টাইমার চালু করেছি আমি... কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে।'

'কখন ফাটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল রেনফিল্ড। 'আর নয় মিনিট পর।'

চমকে উঠল রানা। মাত্র নয় মিনিট? এত অল্প সময়ে এফবিআই বা পুলিশের বম্ব-ডিসপোজাল ইউনিট কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না অকুস্থলে। এগিয়ে গেল ও, কলার ধরে দাঁড় করালো রেনফিল্ডকে।

'বোমাটা ডিজআর্ম করো... এক্ষুণি!'

মাথা নাড়ল রেনফিল্ড। 'সম্ভব নয়। ডিজআর্ম করবার কোনও ব্যবস্থা রাখিনি আমি। ওটা ফাটবেই।'

ঠোঁট কামড়াল রানা, লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। 'কোথায় রেখেছ বোমাটা?'

'ট্রেইলারের ঠিক মাঝখানে। প্লিজ, অযথা সময় নষ্ট করবেন না...'

'ওটার কনফিগারেশন বলো,' রেনফিল্ডকে থামিয়ে দিল রানা।

কয়েক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল বোমা বিশেষজ্ঞ, গলার উপর চাপ পড়তেই হার মানল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলছি। দুটো অংশ আছে বোমার—আনকানেক্টেড, তবে আইডেন্টিক্যাল টাইমার-সহ। টাইমার দুটো সিনক্রো-

নাইজড। কালো রঙের একটা বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে স্ট্রনটিয়াম—রেডিয়েশন ঠেকাবার জন্য সীসার শিল্ডিঙের ভিতর। বাক্সের ভিতরটা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভে ভরা। মূল ডেটোনেশনের এক সেকেণ্ড আগে ভেঙে যাবে শিল্ড, যাতে বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কা লাগে স্ট্রনটিয়ামের গায়ে।'

'মূল বোমাটা কত বড়?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'পাঁচশো পাউণ্ডের। সেইসঙ্গে তিনশো পাউণ্ড গ্যাসোলিন রাখা হয়েছে সওডাস্ট পোড়ানোর জন্য।'

বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার। বোমাটা অন্তত এক বর্গমাইল এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

'তুমি বলছ ওটা ডিজআর্ম করা যাবে না?'

'না,' জোর গলায় বলল রেনফিল্ড। 'একেবারেই অসম্ভব। কলাপসিবল সার্কিটের সাহায্যে ওটার ডিজাইন করেছি আমি। যদি বাঁচতে চান তো এখুনি পালান এখান থেকে।'

মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কী বলো তুমি, ববি?'

'লেজ তুলে পালাবার অভ্যেস নেই আমার,' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

'গুড। তা হলে একটা চেষ্টা করে দেখা যাক, কী বলো? লিমাযিনে একটা গাইগার কাউণ্টার আছে, ওটা নিয়ে এসো।'

গাড়ির দিকে ছুটে গেল মুরল্যাণ্ড।

'আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' হতভম্ব গলায় বলল রেনফিল্ড। 'যা করতে চাইছেন, তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু না।'

'দেখাই যাক,' বলল রানা। ইতিমধ্যে আরও দুটো পুলিশ ক্রুজার এসে গেছে। ওদের হাতে রেনফিল্ডকে সোপর্দ করল রানা, আহত এজেণ্ট কার্টারকে একটা গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালে। গাইগার কাউণ্টার নিয়ে মুরল্যাণ্ড ফিরে এলে

উঠে পড়ল রানা ট্রেইলারে।

কাঠের গুঁড়োয় ভরে আছে গোটা ট্রেইলার, তেরপল দিয়ে ঢাকা। তেরপল সরিয়ে গাইগার কাউন্টার অন্ করল ওরা, রিডিং নিতে শুরু করল। ট্রেইলারের মাঝামাঝি জায়গায় যেতেই বেড়ে গেল রেডিয়েশনের কাউন্ট। হাত দিয়ে জায়গাটা খুঁড়ে ফেলল দু'জনে।

কালো রঙের একটা বাক্স পাওয়া গেল, ওটার ভিতরে রয়েছে স্ট্রনটিয়াম। গায়ে জ্বলজ্বল করছে টাইমারের ডিসপ্লে। মাত্র সাত মিনিট বাকি বিস্ফোরণের। তার আগেই মূল এক্সপ্লোসিভের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিতে হবে স্ট্রনটিয়াম, যাতে বিস্ফোরণ ঘটলেও রেডিয়েশন না ছড়ায়।

বাক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'বন্ধু—বেশ ভারী ওটা, দু'জনকেই হাত লাগাতে হলো জিনিসটা সওডাস্টের ভিতর থেকে বের করে আনতে।

ট্রেইলার থেকে লাফ দিয়ে নামল মুরল্যাণ্ড। পিছনের ডালা খুলে দিল। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়তে শুরু করল কাঠের গুঁড়ো, চোখের পলকে বড় একটা স্তূপে পরিণত হলো। স্তূপের উপর দিয়ে বাক্সটা পিছলে নামিয়ে আনল রানা। মাটিতে পা রাখতেই একটা হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে উদয় হতে দেখল বন্ধুকে।

'কোথায় পেলে হ্যাণ্ডকার্ট?' জিজ্ঞেস করল ও।

হাত তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো ডেলিভারি ট্রাকটা দেখাল মুরল্যাণ্ড। 'ওখান থেকে এনেছি।'

'ভাল করেছ। জিনিসটা বইবার ঝামেলা থেকে বাঁচলাম।'

'কিন্তু নেবে কোথায়?'

চারদিকে নজর বোলাল রানা। সেইফ ক্র্যাকার রেস্টুরেন্টের ব্যানারটার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখের দৃষ্টি। 'ওখানে! পুরনো ব্যাঙ্কটায়। ভল্টে ঢুকিয়ে যদি দরজা আটকে

দিতে পারি, আশা করি বিস্ফোরণের ধাক্কা হজম করে নেবে পুরু দেয়াল। ভল্ট থেকে রেডিয়েশন বেরুনোর সম্ভাবনাও কম।'

'গুড আইডিয়া।' বাক্সটা হ্যাণ্ডকার্টে তুলতে রানাকে সাহায্য করল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু ট্রাকে এখনও পাঁচশো পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ রয়ে গেছে। ওটার ব্যাপারে কী করা যায়?'

'ট্রাক-ড্রাইভার হয়ে যাও,' বলল রানা। 'ওটাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাও কোনও ফাঁকা জায়গায়।'

'ফাঁকা জায়গা? ম্যানহাটনে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'ঠাট্টা করছ?'

'ট্রাই ইয়োর বেস্ট। আমি চললাম।' হ্যাণ্ডকার্ট ঠেলে ছুটতে শুরু করল রানা। রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল পুরনো বিল্ডিংটার দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর জেনকিন্সকে রাস্তার ওপারের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল মুরল্যাণ্ড। চেহারায় হতাশা।

'গ্যারেট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রেস্টুরেন্টের পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে,' বলল জেনকিন্স। 'তবে পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছি আমরা, ও পালাতে পারবে না।'

'হোয়াটএভার,' তড়িঘড়ি করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার পুলিশ এসকর্ট দরকার, এজেন্ট জেনকিন্স। স্ট্রনটিয়াম সরিয়ে নিয়েছি আমরা, কিন্তু ট্রেইলারে পাঁচশো পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ রয়ে গেছে। ট্রাকটা দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল জেনকিন্স। 'কোথায় নেবেন?'

একটু ভাবল মুরল্যাণ্ড। 'অলব্যানি স্ট্রিট। প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন। হাতে সময় নেই।'

হাঁকডাঁক শুরু করল জেনকিন্স। পুলিশের একটা গাড়িকে সাইরেন বাজিয়ে রওনা করিয়ে দিল সামনে। ট্রাক নিয়ে ওটাকে

অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। জানে না, যা করতে চাইছে তাতে আদৌ সফল হবে কি না।

হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে পুরনো ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। ভিতরে কেউ নেই, বাইরে গোলাগুলি শুরু হতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে ওয়ার্কাররা। আশপাশে নজর বোলাল ও। রেনোভেশনের কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে—মেঝে চেঁছে ফেলা হয়েছে, মুখ ব্যাদান করে রেখেছে নগ্ন কংক্রিট। দেয়ালের ফাটলগুলো বুজিয়ে দেয়া হয়েছে সিমেন্ট দিয়ে, রঙ করা হয়নি।

ভল্ট খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না, সিঁড়ি ধরে ভূগর্ভে নামতেই চোখে পড়ল দশ ফুট ব্যাসের বিশাল এক বৃত্তাকার দরজা, দুই ফুট পুরু ব্রোঞ্জের তৈরি। প্রায় একশো বছরের পুরনো হলেও দরজাটা আজও ধরে রেখেছে পুরনো শৌর্য-বীর্য, সগর্বে জানান দিচ্ছে সেই আমলের নির্মাতাদের দক্ষ নির্মাণশৈলীর। ওটার কিনারে উঁকি দিচ্ছে ছয় ইঞ্চি ডায়ামিটারের এক সারি লকিং বোল্ট, অপারেটিং মেকানিজমটাও অক্ষত বলে মনে হলো। খুশি হয়ে উঠল রানা। ভারী ওই দরজা এবং ভল্টের চারপাশের পুরু কংক্রিটের দেয়াল সহজেই হজম করতে পারবে বোমা বিস্ফোরণের ধাক্কা, ঠেকাতে পারবে স্ট্রনটিয়ামের রেডিয়েশনও।

হ্যাণ্ডকার্ট নিয়ে ভল্টের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল ও। ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া, পঁচিশ ফুট গভীর। রেস্টুরেন্টের স্পেস হিসেবে মন্দ নয়। বাইরের চেয়ে এখানকার রেনোভেশন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। ভল্ট-ডোরের পাশে বসানো হয়েছে একটা হোস্টেস স্ট্যাণ্ড। বার-ও তৈরি করা হয়েছে একপাশের দেয়াল ঘেঁষে। বাকি জায়গায় অনায়াসে বিশটা টেবিল এঁটে যাবে। এককোণে হার্ডউডের স্তূপ দেখা গেল, মেঝেতে

বসানোর জন্য এনে রাখা হয়েছে।

তক্তাগুলোর কাছে হ্যাণ্ডকার্টটা নিয়ে গেল রানা। একটু খারাপই লাগল রেস্টুরেন্টটা আর কোনোদিন চালু হবে না ভেবে। রেডিয়েশন যদি শেষ পর্যন্ত দূরও করতে পারে মালিকপক্ষ, কোনও কাস্টোমার আসবে না এই রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি, আবছা আলোয় প্রথম দর্শনে তার চেহারা বোঝা গেল না। কিন্তু দূরত্ব কমতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। দেখা গেল চোখে কালো পট্টি বাঁধা একটা মুখ, সেইসঙ্গে হাতে ধরা একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট রিভলবার।

অ্যান্থনি গ্যারেট!

পরক্ষণে ট্রিগার চাপল সে। বদ্ধ ভল্ট কেঁপে উঠল রিভলবারের আওয়াজে।

ত্রিশ

স্রেফ কপাল, রানার গায়ে লাগল না গুলিটা। এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ডেপথ পারসেপশন হারিয়েছে গ্যারেট, তার ওপর আলোকস্বল্পতা... নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি। দ্বিতীয় গুলি হবার আগেই মাটিতে ঝাঁপ দিল রানা, পাগলের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল কাঠের স্তূপের আড়ালে। কার্টারের কাছ থেকে আনা

পিস্তলটা ইতিমধ্যে চলে এসেছে হাতে। গুলি করল ও।

ধপ্ করে মাটিতে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো। তবে তার পিছু পিছু কাপড়ের খসখসানি শুনে বোঝা গেল, ও-ও মিস করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ওরই মত কাভার খুঁজে নিচ্ছে গ্যারেট। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে আরেকবার গুলি করল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। হাসি শোনা গেল গ্যারেটের।

'অযথা বুলেট নষ্ট করছ তুমি, রানা!'

'এখানে তুমি কী করছ, গ্যারেট?'

'গ্রেট মাইগুস্ থিঙ্ক অ্যালাইক, রানা। স্ট্রনটিয়ামের রেডিয়েশনের বিরুদ্ধে এই ব্যাঙ্ক ভল্ট কতখানি কার্যকর, তা তোমার মত আমিও ধরতে পেরেছি। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, তুমি বোমাটা ভিতরে ফাটিয়ে রেডিয়েশন ঠেকাতে চাইছ; আর আমি চাইছি এখানে লুকিয়ে রেডিয়েশন থেকে রক্ষা পেতে। আফটার অল, পালিয়ে তো আর যেতে পারছি না; পুলিশ পুরো এলাকা কর্ডন করে রেখেছে।'

'এখানে পৌঁছুলে কী করে?'

'পিছনের দরজা দিয়ে। ব্যাঙ্ক আর রেস্টুরেন্টের পিছন দিকটা একই গলিতে মিশেছে। একটুও অসুবিধে হয়নি আমার।'

'অসুবিধে যা হবার এবার হবে। হ্যাণ্ডকার্টে রাখা বাক্সটা দেখতে পাচ্ছ? আর মাত্র দু'মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে ওটা।'

'জানি। তোমার পিঠে ঝোলানো ব্যাকপ্যাকটাও দেখতে পেয়েছি। ওটার ভিতরে আছে মাইডাসের হাত। জিনিসটা আমাকে দিয়ে দাও, রানা। নইলে দু'জনেই মরব।'

'মরতে আমি ভয় পাই না, গ্যারেট।'

'আমি পাই ভাবছ? দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমার, রানা। মাইডাস টাচের মালিক হতে না পারলে এমনিতেও বাঁচার উপায় নেই। গত কয়েকদিনে যা ঘটিয়েছি, তার জন্য আইন আমাকে

বাকি জীবন কুকুরের মত তাড়া করে ফিরবে। ওভাবে বাঁচতে চাই না আমি। এখানে যদি মারা যাই, তা হলে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরব—যার কারণে সর্বনাশ হয়েছে আমার, তাকে সঙ্গে নিয়ে মরছি।'

গ্যারেটের মরিয়া মনোভাবের কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম পণ্ড হয়ে গেছে তার। ধরা পড়েছে রেনফিল্ড। আমেরিকার বুকে বোমা ফাটাতে চেয়েছে সে, এবার টেরোরিজমের অভিযোগে ওর পিছনে লাগবে এফবিআই আর সিআইএ থেকে শুরু করে আমেরিকার সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থা। দুনিয়ার কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না সে। এখন মাইডাস টাচই তার শেষ ভরসা। সোনা বানাবার জাদুকরি ক্ষমতা হাতে থাকলে অনেকেই তাকে দলে ভেড়াতে চাইবে, দেবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। না, পিশাচটাকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না ও। চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক খুলল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'এতই খায়েশ তোমার মাইডাস টাচের মালিক হবার?' ব্যাকপ্যাকটা সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের পিছনে। 'যাও, পারলে কুড়িয়ে নাও!'

এক লাফে বারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেট, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেরুল মাঝখানের দূরত্ব, তারপর ডাইভ দিয়ে চলে গেল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের পিছনে।

ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার। ফাঁদে পা দিয়েছে ঘুঘু, এবার ওর চাল দেবার পালা।

ভিজি স্ট্রিট থেকে অলব্যানি স্ট্রিটের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল, তারপরেও মুরল্যাণ্ডের ভয় হলো, সময়মত পৌঁছুতে পারবে না ওখানে। সামনের পুলিশ এসকর্ট খুব একটা সুবিধে করতে পারছে

না, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। স্পিড তোলা যাচ্ছে না। তার ওপর একটার পর একটা মোড় পেরুতে হচ্ছে ওকে—ছোট গাড়ির জন্য ওগুলো কিছুই নয়, কিন্তু ভারী ট্রাকটার জন্য প্রতিটি মোড় হয়ে উঠছে সময় নষ্ট করার ফাঁদ। শঙ্কিত চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল ও—আর মাত্র দু'মিনিট বাকি, অথচ এখনও অলব্যানি স্ট্রিটের এন্ট্রান্সে পৌঁছুতে পারেনি।

যদিও চকিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুরল্যাণ্ড, তারপরেও একেবারে ঝোঁকের মাথায় নেয়নি। মনে মনে স্মরণ করেছে নিউ ইয়র্কের ম্যাপ—অলব্যানি স্ট্রিটে পৌঁছুতে মাত্র এগারো ব্লক পেরুতে হবে ওকে। সবচেয়ে বড় কথা, রাস্তাটা গেছে ম্যানহাটন আইল্যাণ্ডের একেবারে সীমানা ঘেঁষে।

শেষবারের মত একটা মোড় নিল মুরল্যাণ্ড, ট্রাক নিয়ে ঢুকে পড়ল অলব্যানি স্ট্রিটে। ট্রাকের উঁচু ড্রাইভারস্ ক্যাব থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে রাস্তার শেষ প্রান্ত, রোদে উদ্ভাসিত নীল পানি ঝিলমিল করছে ওখানে।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ডের। গিয়ার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। পুলিশ এসকর্টকে ওভারটেক করে ছুটে গেল সামনে। ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ ভর করল মনে—কাজটা ঠিক করছে তো? পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। আর কোনও উপায় নেই।

ট্রাক নিয়ে হাডসন নদীতেই ঝাঁপ দিতে হবে ওকে।

পরিস্থিতি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে রানা, ভল্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোনও অবস্থাতেই সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ওদিকে পা বাড়ালেই গুলি খাবে। বাঁচার উপায় একটাই, গ্যারেটকে ব্যস্ত রাখতে হবে। আর সেজন্যেই ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে দিয়েছে ও। সবকিছু ভুলে ওটার দিকে ছুটে গেছে গ্যারেট।

গুলি থামতেই গড়ান দিয়ে তক্তার স্তূপের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা, এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ব্যাকপ্যাক নিয়ে গ্যারেট এখুনি উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিতে রাজি নয় ও। হ্যাণ্ডকার্টের হ্যাণ্ডেল দু'হাতে আঁকড়ে ধরল, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে ঠেলে দিল হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের দিকে। ছুটে গিয়ে হোস্টেস স্ট্যাণ্ডের ডায়াসের গায়ে সজোরে ধাক্কা দিল হ্যাণ্ডকার্ট। ভারী ডায়াসটা সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হেলে গেল, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেল গ্যারেটের গায়ের উপর।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল গ্যারেট, কিন্তু সে-দিকে মনোযোগ নেই রানার। প্রাণপণে ছুট লাগিয়েছে ভল্টের দরজার দিকে। ডায়াসের তলা থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে শরীরের অর্ধেকটা বের করতেই ওকে দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে দেখল গ্যারেট। ক্রুদ্ধ গর্জন করে গুলি করল সে।

রানার ঊরুর পিছনে লাগল গুলিটা। দৌড়াতে থাকা অবস্থায় হুমড়ি খেলো ও, কিন্তু পড়ে যাবার আগেই ঝাঁপ দিল সামনে। বাতাস ভেদ করে ভল্টের প্রবেশপথ পেরিয়ে গেল দেহটা, ওপাশে পৌঁছেই একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো।

টের পেল রানা, রক্তে ভিজে যাচ্ছে ওর প্যান্ট, কিন্তু পরোয়া করল না। ব্যথা অগ্রাহ্য করে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভল্টের দরজার উপর। ঠেলতে শুরু করল পাল্লাটা। ভল্টের ভিতর থেকে ভেসে এল গ্যারেটের শাপ-শাপান্ত। গুলি ছুঁড়ছে সে একের পর এক, দু'ফুট পুরু দরজার গায়ে মাথা কুটে মরল বুলেটগুলো।

চেম্বার খালি হয়ে গেলে বোধোদয় হলো গ্যারেটের। গোলাগুলি না করে দরজার দিকে ছুট লাগানো দরকার তার। সর্বশক্তি খাটিয়ে দেহকে টেনে বের করল ডায়াসের তলা থেকে, ব্যাকপ্যাক বুকে জড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল সে। কিন্তু

দশ ফুট যেতেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আঁধারে ছেয়ে গেল ভল্টের অভ্যন্তর।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল গ্যারেট।

জবাবে ক্লিক করে লকিং মেকানিজমের মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। হুইল ঘুরিয়ে তালা আটকে দিয়েছে রানা। বন্দি হয়েছে গ্যারেট ভল্টের ভিতর। পাল্লার গায়ে আক্রোশ নিয়ে দমাদম কিল বসাল, কিন্তু লাভ হলো না কোনও।

হঠাৎ খেয়াল করল গ্যারেট, ডান পাশ থেকে আসছে আলোর আভা। ওদিকে মাথা ঘোরাতেই কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। নিকষ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে কালো বাক্সটার গায়ে লাগানো ডিজিটাল টাইমার।

ছয়... পাঁচ... চার...

অ্যাকসেলারেটরের প্যাডাল ট্রাকের মেঝের সঙ্গে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে মুরল্যাণ্ড, ফুল স্পিডে ছোটাচ্ছে ট্রাক। চকিতে ঘড়ি দেখল, এক মিনিটও বাকি নেই বিস্ফোরণের। এয়ার হর্ন চাপতে শুরু করল পাগলের মত, সামনে থেকে সরে যেতে সঙ্কেত দিচ্ছে সমস্ত গাড়ি আর মানুষকে।

দু'পাশে গাছ লাগানো সংকীর্ণ রাস্তা অলব্যানি স্ট্রিট, চত্বরের মত একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। চত্বরের পরে রয়েছে একটা কোর্টইয়ার্ড, সেটা ঘেঁষে চলে গেছে নদীর পার ছুঁয়ে তৈরি করা এসপ্ল্যানেড... মানে পায়ে হাঁটা পথ। নিঃসঙ্গ দু'একজন পথচারী ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। কোর্টইয়ার্ডও খালি।

সামনে কী ধরনের বাধা আছে, তা দেখে নিল মুরল্যাণ্ড। কোর্টইয়ার্ডের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো সমস্যা করবে না, করবে ইয়ার্ডের সীমানার ভীমদর্শন সাতটা কংক্রিট পিলার। ট্রাকের মুখ একটু ঘুরিয়ে নিল ও। রাস্তার প্রান্তদেশের অ্যাপার্টমেন্ট

বিল্ডিং আর বামদিকের শেষ পিলারটার মাঝে মোটামুটি একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছে।

গাছপালা ভেঙে পেভমেন্টের উপর উঠে গেল ট্রাকের দুটো চাকা, ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল ফাঁকের দিকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল মুরল্যাণ্ড, হিসেবে সামান্য ভুল করেছে ও—ফাঁকটা যথেষ্ট চওড়া নয়। তবে তখন আর কিছু করার নেই। সরোষে ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাক, প্রচণ্ড এক ঝাঁকিতে চুরচুর করে ঝরে পড়ল উইণ্ডশিল্ড।

ভয় হলো মুরল্যাণ্ডের, বুঝি দাঁড়িয়ে গেল ট্রাকটা; কিন্তু চল্লিশ টন ওজনের যন্ত্রদানবটার শক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল না ওর। পিলার আর বিল্ডিঙের কোনা ভেঙেচুরে ফেলল ওটা, ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে পেরিয়ে গেল কোর্টইয়ার্ড, উঠে পড়ল এসপ্ল্যানেডে। নদীর কিনারায় তিন ফুট উঁচু রেলিং আছে, তবে সেটা পাগলা ট্রাকের জন্য কিছুই নয়। রেলিং ভেঙে সোজা পানিতে ঝাঁপ দিল ওটা।

শেষ মুহূর্তে ট্রাকের ভাঙা জানালা গলে লাফ দিয়েছে মুরল্যাণ্ড। এসপ্ল্যানেডের কংক্রিটে ধপাস করে পড়ল ও, কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো। ট্রাকটা গিয়ে আছড়ে পড়ল পানির বুকে। ফুলঝুরির মত কয়েকশ' লিটার পানি ছিটকে উঠল, কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর ওজনের টানে নদীতে তলিয়ে গেল যন্ত্রদানব। মাথা তুলতেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই তরুণ-তরুণীকে দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড। শরীর একটু উঁচু করে ঝাঁপ দিল ও, ওদেরকে জাপটে ধরে শুইয়ে ফেলল মাটিতে। আর তখুনি ঘটল বিস্ফোরণ।

নদীর পানিতে বিশাল এক আলোড়ন উঠল, আকাশের দিকে উঠে এল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলস্তম্ভ, পরক্ষণে ভেঙেচুরে ছিটকে গেল চারদিকে। প্রবল কম্পনে ফাটল ধরল এসপ্ল্যানেডে,

আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে উড়ে গেল গাছে বসে কিচিরমিচির রত পাখির দল।

ঠিক একই সময়ে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল চাপা গুম গুম আওয়াজ। রানার পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মাটি, ছাত থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল সিমেন্ট আর পাথরের চাঙড়। তাল হারিয়ে পড়ে গেল ও। শরীরে আর কোনও শক্তি পাচ্ছে না।

কাঁপন থেমে যাবার পর উঠে বসল রানা। অপেক্ষা করল দরজার ওপাশ থেকে আর কোনও আওয়াজ হয় কি না শোনার জন্য। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। ঘটবার কথাও নয়। বোমা বিস্ফোরণে যদি মারা না-ও গিয়ে থাকে গ্যারেট, রেডিয়েশনে মরবে। বড়ই ভয়ঙ্কর এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু সেটা। একটুও করুণা অনুভব করল না রানা। পিশাচটা তার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পেয়েছে।

শার্ট ছিঁড়ে উরুর ক্ষত বাঁধল ও। তারপর উঠে দাঁড়াল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে।

ভাঙাচোরা বারের পিছন থেকে কাশতে কাশতে উঠে বসল গ্যারেট, ধোঁয়ায় ভরে গেছে ভল্টের অভ্যন্তর। কান ভোঁ ভোঁ করছে, রক্ত ঝরছে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে, তারপরেও বেঁচে আছে দেখে অবাক হলো। স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে কাউন্টারের পিছনে ঝাঁপ দিয়েছিল, বাঁচবে বলে আশা করেনি। এবার বুঝল, বাক্সে যথেষ্ট পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ রাখেনি রেনফিল্ড... অন্তত এই ভল্টকে ধ্বংস করবার মত তো নয়ই।

হাতের পেশিতে গেঁথে যাওয়া একখণ্ড শ্র্যাপনেল নখ দিয়ে খুঁটে খুলে আনল গ্যারেট। ওটা চোখের সামনে তুলতেই থমকে গেল। সীসার একটা ভাঙা টুকরো! রেনফিল্ডের এক্সপ্লোসিভ

ঠিকমতই কাজ করেছে—ভেঙে দিয়েছে সীসার বর্ম, বাক্সের ভিতর থেকে বের করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে মারাত্মক স্ট্রনটিয়াম। পুরো লোয়ার ম্যানহাটনে যে-পরিমাণ রেডিয়েশন ছড়িয়ে দেবার কথা ছিল, সেটাই এখন একাকী হজম করছে গ্যারেটের শরীর।

চোখ পিট পিট করল গ্যারেট। পুরো দুনিয়া তার চোখের সামনে যেন দুলছে, বমি বমি একটা ভাবও অনুভব করল সে। গলা বেয়ে তরল পদার্থ উঠে আসছে, কোনোমতেই ঠেকাতে পারল না, বমি করে দিল হড় হড় করে। শ্বাস ফেলতে লাগল ঘন ঘন, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস। তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল মাথায়, দু'হাতে চেপে ধরল খুলির দু'পাশ। হাত দুটো যখন নামিয়ে আনল, দেখল আঙুলে পেঁচিয়ে রয়েছে মাথার চুল।

আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল গ্যারেট। মারা যাচ্ছে, সে-কথা ভেবে নয়; মৃত্যুটা কতখানি ভয়ানক হতে চলেছে, সেটা উপলব্ধি করে। রেডিয়েশন পয়েজনিঙে আক্রান্ত রোগীর ছবি দেখেছে সে। বীভৎস ছবি! কিছুতেই ওভাবে মরবার কথা ভাবতে পারছে না। মেঝে হাতড়ে রিভলবারটা কুড়িয়ে নিল সে। কপালের পাশে ঠেকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার।

খটাস করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার। ত্রস্ত ভঙ্গিতে আবারও ট্রিগার চাপল সে, লাভ হলো না। রানার পিছনে সবগুলো বুলেট খরচ করে ফেলেছে, এখন আর কিচ্ছু করার নেই। রেডিয়েশনে জীবন্ত দগ্ধ হতে হবে তাকে। বরণ করতে হবে ভয়ঙ্করতম পরিণতি।

রাগে, হতাশায় চিৎকার করে উঠল গ্যারেট উন্মাদের মত।

ভিজি স্ট্রিট লোকে লোকারণ্য। পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টদের ভিড় তো রয়েছেই, তাদের সঙ্গে হাজির হয়েছে

হাজারো ইমার্জেন্সি ভেহিকল এবং সেগুলোর ক্রু। লোকজনের হাঁকডাকে কান ঝালাপালা।

একটা অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে বসে আছে রানা, নিজেকে সঁপে দিয়েছে এক নার্সের হাতে। ওর উরুর ক্ষত ড্রেসিং করছে মেয়েটা।

সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশ ক্রুজার হাজির হলো। ওটার পিছনের সিট থেকে নেমে এল মুরল্যাণ্ড। জামা-কাপড় ছেঁড়া, সারা দেহে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ ফুটে আছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে উঠল।

'এ ভারি অন্যায়,' রানাকে দেখেই স্বভাবসুলভ দুষ্টুমির সুরে বলে উঠল সে। 'আগেভাগে এসে একজন সুন্দরী নার্সকে বগলদাবা করে বসে আছ!'

হাসল রানা। 'সুন্দরী নার্সের অভাব নেই। ডাকলেই আরও দু'চারজন হাজির হয়ে যাবে। তোমার সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে ওরা।'

'ম্যাম,' নার্সের উদ্দেশে বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটু ডাকবে নাকি কাউকে? আমার বন্ধুটি সত্য না মিথ্যা বলছে প্রমাণ হয়ে যাক।'

'নিশ্চয়ই!' হেসে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল মেয়েটা।

'তুমি ঠিক আছ?' মুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পায়ের একটা লিগামেন্ট বোধহয় ছিঁড়ে গেছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটা অপারেশন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। খরচটা আশা করছি কোনও ওজর-আপত্তি না করে তুমি দেবে।'

'দেব, যদি আমার হাসপাতালের বিলগুলো তুমি দাও,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'বোমাটা কোথায় ফেললে?'

'হাডসন নদীতে। কেউ আহত হয়নি... আমি ছাড়া আর কী। তোমারটা কোথায়?'

'যেখানে থাকার কথা। ওই ব্যাঙ্ক ভল্টে।'

'আর গ্যারেট?'

'ও-ও ওখানেই আছে। বেঁচে আছে কি না বলতে পারি না। বারো ঘণ্টার আগে দরজা খোলা নিরাপদ নয় বলে জানিয়েছে এক্সপার্টরা। ডিকন্টামিনেশন টিমও তখনই কাজ শুরু করবে।'

'ভাল,' রানার পাশে বসে শরীর এলিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

অ্যাম্বুলেন্সের দরজায় এ-সময় উঁকি দিল এজেন্ট জেনকিন্স। বলল, 'আপনাদের কিছু লাগবে?'

'বিশ্রাম, আর কিছু না,' বলল রানা। 'ভাল কথা, এজেন্ট কার্টারের কী খবর?'

'ভাল আছে, ইনজুরিটা সিরিয়াস ছিল না।'

'আর রেনফিল্ড?'

'ওকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুস্থ হয়ে উঠলে ইন্টারোগেট করব। জেনে নেব এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল জেনকিন্স। 'আপনাদেরকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আজ যদি আপনারা না থাকতেন...'

'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'যদি কিছু করতেই চান, ড. রেমি হ্যাডলির জন্য করুন। ইটালিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে একাকী পড়ে আছে ও। কবে ফিরতে পারবে কে জানে। বোনকে দেখার জন্য উতলা হয়ে আছে ও। যদি সম্ভব হয়, র‍্যাচেলকে আজই পাঠান ওর কাছে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বলল জেনকিন্স। 'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

'আর হ্যাঁ,' চোখ খুলে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিছু খাবারও পাঠাতে পারেন। আমার পেটের ভিতরে ছুঁচো ডাকছে।'

একত্রিশ

এক মাস পর। সিসিলি, ইটালি।

জুলাই মাসের কড়া রোদ চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে রানার, সানগ্লাসের আড়ালেও কুঁচকে রাখতে হচ্ছে চোখ, কিন্তু তাতে অভিযোগ নেই ওর। বারো ঘণ্টার বিমানযাত্রায় হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে, খোলা আকাশের নীচে হাঁটাচলা করতে ভালই লাগছে এখন।

একটু থেমে ভূমধ্যসাগরের অপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল রানা। সাইরাকিউজ থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে, পাহাড়ি এক ঢালে দাঁড়িয়ে আছে ও, এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অবারিত সুনীল পানি, তার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় জেলে নৌকা। কল্পনার চোখে দু'হাজার বছর আগের দৃশ্যও দেখল, যখন দ্বীপের দিকে ছুটে আসছিল রোমান নৌ-বহর। এদিকেই কোথাও থেকে আর্কিমিডিস তাঁর মারণরশ্মি নিক্ষেপ করেছিলেন, পুড়িয়ে একাকার করে দিয়েছিলেন একের পর এক শত্রু-জাহাজ। ভাবতেই শিহরিত হচ্ছে শরীর।

'অদ্ভুত! তাই না?' রানার পাশে এসে দাঁড়াল রেমি। 'এখানে আসার শখ ছিল আমার বহুদিন থেকে। তোমার জন্য সম্ভব হলো। ধন্যবাদ।'

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে ও, কপালে আঘাতের চিহ্নও

মিলিয়ে গেছে অনেকখানি, ভালমত না তাকালে বোঝা যায় না। কালো রঙের একটা ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস পরেছে, চুলগুলো লম্বা হয়েছে আগের চেয়ে। দেখতে ভারি ভাল লাগছে ওকে।

ঘণ্টাদুই আগে রানাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছে রেমি, সরাসরি নিয়ে এসেছে এক্সক্যাভেশন সাইটে। একদিন আগেই সিসিলিতে এসেছে ও। তিনজন টেলিভিশন ক্রু-ও আছে রেমির সঙ্গে, তবে এখনও ক্যামেরা চালু করেনি ওরা। রানা শর্ত জুড়ে দিয়েছে, টিভিতে ওকে দেখানো চলবে না।

'ধন্যবাদ আমাকে নয়, এটাকে দাও,' হাতে ধরা জিয়োলেবের দিকে ইশারা করল রানা। অ্যাথেন্স মিউজিয়াম আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওটার ব্যাপারে—অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকাকে রিপ্লেস করবে ডিভাইসটা। তবে তার আগে শেষ একটা কাজ করতে এসেছে রানা ওটাকে নিয়ে।

নোটবুকে টুকে রাখা ডেটা দেখে নিল রানা, তারপর জিয়োলেবটা মুখের সামনে তুলে নব ঘোরাল। রিডিং দেখে হাত তুলল বামে। 'ওই দিকে যেতে হবে।'

ইউরিয়ালো কাসলের দিকে এগোল ওরা। প্রাচীন স্থপতি ডায়োনিসিয়াস এবং আর্কিমিডিসের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়া প্রাচীন এক দুর্গ ওটা, তলায় রয়েছে বেশ কিছু দীর্ঘ টানেল। আর্কিমিডিসের বুদ্ধিতে তৈরি করা হয়েছিল টানেলগুলো, শত্রুরা হামলা চালাতে এলে ওখান থেকে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হতো, ফলে কোনোদিন এই দুর্গ বেদখল হয়নি।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কেমন আছেন?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'সম্পূর্ণ সুস্থ,' বলল রানা। 'ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে অফিসেও যেতে শুরু করেছেন গত সপ্তাহ থেকে।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু ববি তোমার সঙ্গে আসতে পারল না

দেখে খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিছু নেই। ও নিজেই আসেনি। দুনিয়ার প্রথম রেডিও-অ্যাকটিভ এগজিবিটের জন্য ডিসপ্লে-কেইস তৈরি করছে ও। এমন ইন্টারেস্টিং আর চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ... এখন হাতি দিয়ে টেনেও ওকে অন্য কোথাও সরানো যাবে না।'

আর্কিমিডিসের কোডেক্স আর সোনার হাতের কথা বলছে রানা—ভল্টের ভিতরে স্ট্রনটিয়ামের বিস্ফোরণে রেডিয়েটেড হয়ে গেছে দুটোই। তাই বলে ওগুলো নষ্ট করা হয়নি। অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট দুটোর জন্য বিশেষ ধরনের ডিসপ্লে কেইস তৈরির দায়িত্ব যেচে নিয়েছে নুমা, ওই প্রজেক্টেই কাজ করছে মুরল্যাণ্ড। সফল হতে পারলে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অ্যাথেন্স মিউজিয়াম এবং ইটালির জাতীয় জাদুঘরে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করা হবে ওগুলো। আর্টিফ্যাক্টের মালিকানার ব্যাপারে এভাবেই সমঝোতা হয়েছে তিন দেশের মাঝে।

ভল্ট থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল অ্যান্থনি গ্যারেটকে, হাসপাতালে পাঁচ দিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার পর মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে তাকে। মাইডাসের হাতটাও উদ্ধার করা হয়েছিল তার ব্যাকপ্যাক থেকে, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রেডিয়েশনে মরে গেছে ওটার গায়ে লেগে থাকা সব মাইক্রোব। রাজার মমিটাও ধ্বংস হয়ে গেছে নেপলসের সেই গুহায়। ফলে চিরতরে হারিয়ে গেছে মাইডাস টাচ।

একমাত্র প্রাপ্তিটা রয়েছে কোডেক্সের ভিতরে। রেডিয়েশনে ওটার কয়েকটা পাতায় ফুটে উঠেছে নতুন কিছু লেখা, আগে সেগুলো অদৃশ্য ছিল। লেখাগুলো অনুবাদ করে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে আর্কিমিডিস সিসিলির ইউরিয়ালো কাসলে কিছু লুকিয়ে রেখে গেছেন। কীভাবে সেগুলোর কাছে পৌঁছুনো যাবে, তার নির্দেশনাও রেখে গেছেন তিনি। জিয়োলেব নিয়ে সেই

রহস্যই ভেদ করতে এসেছে রানা।

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না,' বলল রেমি, 'ইটালিয়ান সরকারকে এমন একটা ঐতিহাসিক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে কীভাবে রাজি করালে তুমি?'

'ওফফো, তোমাকে বলিনি বুঝি? হাডসন নদীতে, ট্রাকের ধ্বংসাবশেষে তল্লাশি চালিয়ে গ্যারেটের অ্যাসিসটেন্ট রেনফিল্ডের ল্যাপটপ কম্পিউটার উদ্ধার করেছে এফবিআই। জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেলেও হার্ড ডিস্ক থেকে একটা ভিডিও রিকভার করা সম্ভব হয়েছে—তোমার করা মাইডাস চেম্বারের ভিডিও! ওটা দেখিয়েই কনভিন্স করা হয়েছে ইটালিয়ান অথোরিটিকে।'

'আমার ভিডিও?' অবাক হলো রেমি। 'ওটা রেনফিল্ডের কম্পিউটারে গেল কী করে?'

'ভিডিওটা ওকে দেখতে দিয়েছিল গ্যারেট। দেখার ফাঁকে ক্যামেরা থেকে জিনিসটা কপি করে রেখেছিল ও।'

'তা-ই? কিন্তু ওটা যে অথেনটিক, তা ইটালিয়ানরা বুঝল কী করে? চেম্বারটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে অ্যাসিডিক পানির তলায়। ওখানে তো ডাইভ দিয়ে ভিডিও-র সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব। এ-ধরনের পানিতে নামাবার মত স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আছে নুমার। সেগুলোই কয়েকদিনের জন্য ইটালিয়ান সরকারকে ধার দিয়েছিলাম আমরা।'

দাঁড়িয়ে গেল রেমি। 'মাই গড! তারমানে চেম্বারের অস্তিত্বের ব্যাপারটা প্রমাণ করে দিয়েছ তোমরা?'

'গত সপ্তাহে,' হাসল রানা। 'ইটালিয়ানরা খুবই খুশি হয়েছে। অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি বলেছি কাজটার জন্য আরও যোগ্য একজন দাবিদার আছে।'

'আমি?' রেমি হতভম্ব। 'এত বড় একটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব

আমাকে দেবে ওরা?'

'যদি আগামী শুক্রবারে তুমি ফ্রি থাকো। ওইদিনই প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা দেবে ওরা।'

নিজেকে আর ঠেকাতে পারল না রেমি। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথাটা দু'হাতে টেনে নামিয়ে ঠোঁটে গাঢ় চুমো খেলো।

কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'করছ কী! এখানে আরও মানুষ আছে তো!'

টিভি ক্রু-রা মুচকি মুচকি হাসছে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল রেমি। রানা বলল, 'সেলিব্রেশনটা নাহয় পরে হবে, কী বলো? আজ রাতে?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। হাঁটতে শুরু করল রানার পাশাপাশি।

'মাইডাসের গল্পটা কিন্তু আমাকে বলোনি তুমি,' বলল রানা। 'ওই যে, প্যাডেস্টালের গায়ে যেটা লেখা ছিল। কী ছিল ওখানে?'

'রাজা মাইডাসের সত্যিকার ইতিহাস,' বলল রেমি। 'প্রচলিত গল্প-কাহিনিগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। সত্যিই প্রাচীন তুরস্ক থেকে বাবার সঙ্গে ফ্রিজিয়ায় এসেছিলেন তিনি। রাজধানীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরাকলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গর্ডিয়াসকে রাজা বানায় সে-দেশের লোকেরা। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন মাইডাস। তার কয়েক বছর পর, শিকারে বেরিয়ে বনের ভিতরে একটা ভলক্যানিক স্প্রিং আবিষ্কার করেন তিনি, ওখানে সাঁতার কাটতে নামেন। কিন্তু সাঁতার শেষে ঝর্ণার পারে ওঠার সময় একজন ভৃত্য তাঁর হাত ধরে, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য ব্যথায় চেঁচাতে চেঁচাতে পানিতে পড়ে যায় লোকটা—সোনায় পরিণত হয়। সেই থেকেই শুরু হয় মাইডাস টাচের কাহিনি। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে রাজার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা। কিন্তু মাইডাস এতে খুশি ছিলেন না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল তাঁর জন্য ভয়ানক এক

অভিশাপ। নিজের মেয়েকে পর্যন্ত তিনি আদর করতে পারতেন না ওই অভিশাপের কারণে।

'যা হোক, পারস্যের রাজা মাইডাসের টাচের গল্প শোনার পরে লোভী হয়ে ওঠেন। ফ্রিজিয়া আক্রমণ করে বসেন মাইডাস টাচের মালিক হবার জন্য। পরাক্রমশালী পার্সিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে একেবারেই অসহায় ছিল মাইডাসের সৈন্যরা, তাই পরিবার ও বিশ্বস্ত সহযোগীদের নিয়ে নিয়াপোলিসে পালিয়ে যান রাজা। পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে রাজকন্যা, মারা যায়। মাইডাসের স্পর্শে দুর্ঘটনাবশত সে যে মূর্তি হয়ে গিয়েছিল, তা সত্যি নয়। যা হোক, নিয়াপোলিস... মানে নেপলসে পৌঁছানোর পর মেয়ের জন্য সমাধি খুঁজতে শুরু করেন মাইডাস। শহরের তলায়, প্রাচীন এক গুহার ভিতরে একটা হট পুল আবিষ্কার করেন তিনি। জায়গাটা শুধু মেয়ের জন্য নয়, নিজের জন্যও পছন্দ হয়ে যায় তাঁর। দীর্ঘ সময় নিয়ে পুরো গুহাকে সোনার আবরণে মুড়ে দেন তিনি, মেয়ের লাশকেও মূর্তি বানিয়ে রেখে দেন ওখানে। কয়েক বছর পর মারা যান মাইডাস, তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে বিশ্বস্ত অনুচরেরা ওই সোনালি গুহায় সমাহিত করে তাঁকে।'

'ইন্টারেস্টিং কাহিনি,' মন্তব্য করল রানা। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

দুর্গের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ইটালিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে ড. জিয়োসেপ্পি বুগেরা নামে স্থানীয় এক আর্কিয়োলজিস্ট তাঁর ডিগিং টিম নিয়ে অপেক্ষা করছেন ওখানে। অতিথিদের স্বাগত জানালেন তিনি। এ-ও জানালেন, খোঁড়াখুঁড়ির মাধ্যমে দুর্গের ক্যাটাকুম উন্মুক্ত করা হয়েছে, খুঁজে বের করা হয়েছে প্রাচীন টানেলগুলোর মুখ।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল রানা, রেমি আর টিভি ক্রু-রা। সিঁড়ি ধরে চলে গেল মাটির নীচের ক্যাটাকুমে।

টানেলগুলোর দিকে এগোল না রানা, বরং জিয়োলেবের রিডিং দেখে চলে গেল একপাশের দেয়ালের সামনে। বলল, 'এখানে খুঁড়তে হবে।'

'তুমি শিয়োর?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। দেয়ালটা অতি সাধারণ—ক্যাটাকুমের অন্যান্য দেয়ালের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

'আমি বলছি না, বলছেন আর্কিমিডিস,' বলল রানা।

ইশারা পেয়ে নিজের টিমকে কাজে লাগিয়ে দিলেন ড. বুগেরা, আধঘণ্টার মধ্যে দেয়াল খুঁড়ে নতুন একটা টানেলের মুখ বের করে ফেলল তারা।

'অ্যামেজিং!' বিস্মিত গলায় বললেন বুগেরা। 'এখানে যে আরেকটা টানেল আছে, তা তো কল্পনাও করিনি আমি!'

'লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মুখটা,' বলল রানা। 'কেন, তা এখুনি জানা যাবে।'

হাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল ও। ওকে অনুসরণ করল বাকিরা। মোটামুটি একশো গজ এগোনোর পর বিশাল এক প্রকোষ্ঠে পৌঁছুল ওরা। চারদিকে আলো ঘোরাল রানা, দম আটকে এল ওর। মাইডাসের স্বর্ণসমাধির চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এ আবিষ্কার।

রোমানদের হাতে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় টের পেয়ে এই গুপ্তপ্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিলেন আর্কিমিডিস, এখানেই লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান কীর্তিগুলো। পুরো কামরা জুড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রাচীন আমলের অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর নথি! ছাত থেকে একটা গ্লোব ঝুলতে দেখল রানা—তাতে আঁকা আছে দু'হাজার বছরের পুরনো পৃথিবীর মানচিত্র। আরেকটা ডিভাইসে রয়েছে সৌরজগতের রেপ্লিকা—সূর্যের চারপাশে ঘোরানো যাচ্ছে গ্রহগুলোকে। একটা গণনাযন্ত্র-ও দেখল ও—দুনিয়ার প্রথম

কম্পিউটার!

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। বড্ড ভুল করেছে গ্যারেট—কোডেক্সে দুটো ট্রেজারের বর্ণনা ছিল, তার মাঝ থেকে কঠিন ও বিপজ্জনকটা বেছে নিয়েছিল সে। অথচ এই একটা প্রকোষ্ঠে যা লুকানো রয়েছে, তার মূল্য সোনা-দানার চেয়ে অনেক... অনেক বেশি। এখানে অনেক সহজে পৌঁছুতে পারত লোকটা, অনেক সহজে বাগিয়ে নিতে পারত লক্ষ-কোটি ডলারের সম্পদ। সোনার দাম বাড়াবার পাগলাটে ষড়যন্ত্র আঁটতে গিয়ে প্রাণ দিতে হতো না তাকে।

একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওঅর্কটেবিলের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগোল রানা। ওটার উপরে পড়ে আছে একটা জিয়োলেব, আর্কিমিডিসের নিজের হাতে বানানো! কালের প্রবাহে ব্রোঞ্জের শরীরে পড়েছে সবুজ ময়লার পরত। এ ছাড়া রানার হাতে ডিভাইসটার সঙ্গে কোনও অমিল নেই ওটার।

জিয়োলেবের পাশেই রয়েছে বেশ কিছু ড্রয়িং। সাবধানে কাগজগুলো তুলে দেখল রানা। প্রথমটা নিয়াপোলিসের ম্যাপ। কাসল ডেলোভোর দ্বীপটা পরিষ্কারভাবে মার্ক করা আছে ওটায়, সেই সঙ্গে আছে কাসল সান্তেলমো-র মার্কিং। কুয়ো খুঁজে বের করবার জন্য এ-দুটো রেফারেন্স দরকার হয়েছিল ওর।

ম্যাপের পরেই রয়েছে বেশ কিছু ড্রয়িং। প্রথমে ওগুলোর মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না, কিন্তু হঠাৎ একটা ছবিতে হেরাক্লিসের আসন চিনতে পারল ও। তাড়াতাড়ি মেলাল ছবিটা—আফ্রোদিতির পা-ও আছে পাশে। কোনও সন্দেহ নেই, পার্থেননের ইস্ট পেডিমেন্টের ড্রয়িং এটা—অক্ষত অবস্থার ড্রয়িং। বাকিগুলোও বোঝা গেল এবার—সবই পার্থেননের ছবি, বিভিন্ন দিক থেকে আঁকা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনোর ধাঁধাটা তৈরি করেছিলেন আর্কিমিডিস।

রেমিকে ডেকে ছবিগুলো দেখাল রানা। চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। বলল, 'জানো, কী আবিষ্কার করেছ তুমি, রানা? দু'হাজার বছর আগে পার্থেনন দেখতে কেমন ছিল, তা কেউ জানে না। সেই রহস্য ভেদ করে দিয়েছ তুমি। শুধু তা-ই নয়, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে এখান থেকে অমূল্য সব তথ্য পাওয়া যাবে, জানা যাবে অজানা হাজারো কাহিনি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই হয়তো পাল্টে যাবে মানব-সভ্যতার উত্থানের ব্যাপারে।'

'বাপ রে, এত কিছু?' হাসল রানা। 'কিন্তু মাই ডিয়ার রেমি, এই আবিষ্কার আমার নয়, তোমার হতে চলেছে। শর্তের কথা ভুলে যেয়ো না। ক্যামেরায় আমার ছবি তোলা চলবে না, কোথাও আমার নাম বলবে না তুমি। ঠিক আছে? ক্লাসিকস্ তোমার নেশা, তোমার প্যাশন... আমার নয়। কাজেই এখান থেকে যদি কোনও প্রাপ্তি থাকে, সেটা তোমারই প্রাপ্য।'

মুখের ভাষা হারাল রেমি। কোনও মানুষ এত নির্মোহ, এত প্রচারবিমুখ, বা এতটা নির্লোভ হতে পারে, তা ও কল্পনাও করতে পারেনি। দুনিয়াজোড়া খ্যাতি আর সম্মানের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করছে রানা, সব দিয়ে দিচ্ছে ওকে... মাত্র এক মাসের পরিচয়ে! কী বলবে ভেবে পেল না রেমি, মাথা নিচু হয়ে যেতে চাইল কৃতজ্ঞতায়।

ক্যামেরা অন্ করেছে টিভি ক্রু-রা, তার সামনে রেমিকে ঠেলে দিল রানা। 'যাও... ইট'স্ ইয়োর মোমেন্ট।'

নিজে সরে গেল অন্ধকারে। বরাবরের মত।

★★★

মাসুদ রানা

ট্রেজার হান্টার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা!
গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের তৈরি করা যে-ধাঁধা
দু'হাজার বছরেও ভেদ করতে পারেনি কেউ,
সেটাই সমাধান করতে চাইছে রানা মাত্র চারদিনে!
নইলে খুন করা হবে পিতৃসম অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।
পাগলের মত চষে বেড়াচ্ছে ও দু-দুটো মহাদেশ।
পাঠক, চলুন ওর সঙ্গে ঘোড়া ছোটাই ইংল্যাণ্ডের প্রান্তরে;
চুরি করি গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরের অমূল্য সম্পদ;
দুইশ' মাইল বেগে গাড়ি চালাই জার্মানির ফ্রিওয়ে-তে;
অথবা হারিয়ে যাই ইটালির ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সুড়ঙ্গে,
কিংবা আমেরিকার রাস্তায় জড়িয়ে পড়ি মরণপণ সংঘর্ষে।
নিষ্ঠুর দুই শত্রু পিছু নেবে আপনার।
পদে পদে থাকবে মৃত্যুর হাতছানি।
কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, রানা পাশে রয়েছে আপনার।
সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে ওর সঙ্গে একসময় ঠিকই পৌঁছুবেন
আপনি রাজা মাইডাসের সেই সোনার সমাধিতে।
লোভ হচ্ছে? তা হলে চলুন, রওনা হই!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০